শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সাধনা ও উপদেশ।

শ্রীঅমৃতলাল সেনগুপ্ত প্রণীত

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪/৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১৩৫৯ সন

উৎসর্গ

পরমারাধ্যতমা

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী

শ্রীচরণারবিন্দেষু

মা !

তোমাদের সাধন-কানন হইতে ফুল-পাতা কুড়াইয়া যেমন তেমন করিয়া একটী স্তবক প্রস্তুত করিয়াছি। মা ভিন্ন অবোধ বালকের এই ব্যর্থ প্রয়াস আর কেইবা সুন্দর দেখিবে? তাই তোমারই করপুটে ইহা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। অধম কাঙ্গালের এই আন্তরিক অর্চ্চনায় মালীর আনন্দ ও তোমার প্রীতি হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি তোমার স্নেহদৃষ্টিপূত এই নির্ম্মাল্যে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। ইতি—

তোমার দীনহীন সন্তান

অমৃত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীঅমৃতলাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের "শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : সাধনা ও উপদেশ" গ্রন্থখানির (প্রথম প্রকাশ ১৩১৯) চতুর্থ সংস্করণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সন) দীর্ঘকাল পূর্বে নিঃশেষিত হয়। অর্ধশতাব্দীরও পরে গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হইল।

বাংলাদেশের ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রসঙ্গে ধর্মআন্দোলন এবং ধর্মসংস্কার বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকদের জিজ্ঞাসা ইতিমধ্যে ক্রমশ বাড়িয়াছে। বিষয়টি এমনকি বর্তমানে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গোস্বামী-প্রভুর জীবন ও ধর্ম-উপদেশ সম্পর্কে আকর-গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে পাঠকসমাজ আমাদের কাছে খোঁজ লইয়াছেন। এতদিনে তাঁহাদের আশা পূরণে সমর্থ হওয়ায় আমরা স্বভাবতই আনন্দিত। পাঠকসমাজে গ্রন্থখানি পূর্বের মতোই সমাদৃত হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।

অধুনা মুদ্রণ ব্যয়ের ক্রম-ঊর্ধ্বগতির কথা চিন্তা করিয়া বর্তমান মুদ্রণে পূর্বের সংস্করণের আকার এবং বানান রাখা হইয়াছে। আশা করি আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পাঠক আমাদের মার্জনা করিবেন।

বিনীত

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিংশ পরিচ্ছেদ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ড।

উপদেশ-সংগ্রহ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ওঁ হরিঃ

শ্রীমদাচার্য্য

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সাধনা ও উপদেশ

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

মঙ্গলাচরণ

ওঁ স্বর্ণাভজটাজূটপরিশোভিতং স্বর্ণাভশ্মশ্রুধারিণং,
কৃতং জটয়া চূড়কং ফণিভূষণং পৃষ্ঠদেশে লম্বিতবেণীকং বা,
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রং শ্রীমন্‌মহাদেবং বা শ্রীবৃন্দাবনবিলাসিনীং বা,
কলৌ পতিতবন্ধুং পতিত-প্রেমদাতারং দণ্ডকমণ্ডলুহস্তং,
গৈরিককৌপীনবহির্বাসবাসসং কণ্ঠে দোলিতং সপ্তলহরিমালং,
নখাগ্রাৎ কেশাগ্রপর্য্যন্তং সুমধুরং,
মধুরহাসং মধুরভাষং ব্যবহারেণ চ মধুরং,
মধুরং মধুরং পরিপূর্ণমানন্দং সদ্‌গুরুং তং নমাম্যহং।*

যিনি সুবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট শ্মশ্রু ও জটাদ্বারা পরিশোভিত, সর্পফণার ন্যায় যাঁহার জটাজাল কখনো চূড়ার আকারে মস্তকোপরি, কখনও বা পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকিত; যাঁহাকে দর্শন করিলে (স্ব স্ব ভাবানুরূপ) কোন ব্যক্তির শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের, কোন ব্যক্তির শ্রীমন্‌মহাদেবের এবং কোন ব্যক্তির বা শ্রীবৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধারাণীর কথা স্বতঃই মনে উদয় হইত; এই ঘোর কলিযুগে যিনি পতিতগণের বন্ধু ও প্রেমদাতাস্বরূপ ছিলেন; যাঁহার হস্তদ্বয়ে দণ্ড কমণ্ডলু, কোটীদেশে গৈরিকরাগরঞ্জিত কৌপীন ও বহির্বাস এবং কণ্ঠে সপ্তলহরী মালা বিরাজ করিত; যাঁহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সুমধুর, এবং যাঁহার আচার-ব্যবহার বাক্যালাপ, হাস্য-পরিহাস সমস্তই মধুক্ষরণ করিত, সেই পরিপূর্ণ আনন্দ ও মধুময় সদ্‌গুরুকে নমস্কার করি।

যং ধ্যায়ন্তে বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণং।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং
তং সংসারহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদং॥

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য ও সহচর পণ্ডিত ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কৃত স্তোত্র।

বুধগণ সমাধিকালে, জলদবিরহিত গগনবৎ নির্ম্মল, প্রসন্ন, নির্গুণ, নিত্যানন্দময় যে দেবাদিদেব বিভুকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যানগম্য, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, মায়াদিপরিশূন্য, জগন্নিয়ন্তা, জরামৃত্যু-বিবর্জ্জিত গুরুদেবকে নমস্কার।

অভিরামাভিরূপায় নমো ভুভারহারিণে।
জটাহিবলয়প্রেঙ্খাচারুতাণ্ডবচারিণে॥
মুহুশ্চ হরিহুঙ্কারৈরন্তকাতঙ্কবারিণে।
নমো মানসহংসায় স্বান্তধ্বান্তান্তকারিণে॥

যিনি অভিবাম ও ভুভারহারী; জটারূপ সর্পমন্ডলীর নৃত্যসহকারে যিনি তাণ্ডব করিয়া থাকেন, এবং মুহুর্মুহু হরিহুঙ্কার দ্বারা যিনি যমভয় নিবারণ করেন; হৃদয়ান্ধকারের বিলোপ-বিধায়ক সেই মানস-হংসকে কোটি কোটি নমস্কার।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

চিত্তদর্পণের পরিমার্জ্জক, ভবরূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণশ্বেতোৎপলের জ্যোৎস্নাপ্রদায়ক, ব্রহ্মবিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন, সর্ব্বাত্মস্নেহন, পরম সাধন শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হয়।

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যে উন্নতোজ্জ্বলভক্তিরসাস্বাদ হইতে জীব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, সেই পরমবস্তু প্রদান করিবার জন্য, করুণাবশে কলিতে অবতীর্ণ, মনোহরকান্তিপটলে সমুদ্ভাসিত শ্রীহরি শচীনন্দন তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

গ্রন্থ-সূচনা

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'ব্রহ্মসূত্রের' ভাষ্যে, পদ্মপুরাণ হইতে প্রমাণস্বরূপ কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"দ্বাপরে সর্ব্বত্র জ্ঞান আকুলিভুতে তন্নির্ণয়ায় ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভিরর্থিতো ভগবন্নারায়ণঃ ব্যাসরূপেণাবততার। অথেষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিপরিহারেচ্ছূনাং তদ্যোগ্যতামবিজানতাং তজ্জ্ঞাপনার্থং বেদমুৎসন্নং ব্যঞ্জয়ংশ্চতুর্ধা ব্যভজৎ চতুর্ব্বিংশতিধা একশতধা সহস্রধা দ্বাদশধা চ। এবং তদর্থনির্ণয়ায় ব্রহ্মসূত্রাণি চকার।" অর্থাৎ—দ্বাপর-যুগে ব্রহ্মবিদ্যা বিলুপ্ত

হইলে, সেই জ্ঞানবিপ্লব নিবারণ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান নির্ণয়ার্থ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সমবেত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিজ্ঞান নিরূপণার্থ প্রার্থনা জানাইলে নারায়ণ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন, যাঁহারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারে সমুৎসুক, তাঁহারা সকলেই যোগবিজ্ঞানবিহীন। কেহই যোগের দ্বারা সদসৎ নির্ণয় করিতে পারেন না। তখন ব্যাসদেব যোগানভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যোগ-বিজ্ঞানের নিমিত্ত সমস্ত বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। পরে ঐ বেদকে চতুর্ব্বিংশতি, একশত, একসহস্র ও দ্বাদশ প্রকারে বিভাগ করিয়া, সেই বেদার্থ নিরূপণ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন।”

“এবং বিধানি সূত্রাণি কৃত্বা ব্যাসো মহাযশঃ।
ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবেষু মনুষ্যপিতৃপক্ষিষু।
জ্ঞানং সংস্থাপ্য ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ॥”

পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ—“এইরূপে মহাযশাঃ ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রসকল প্রণয়ন করিয়া, ব্রহ্মা, রুদ্র ইত্যাদি দেবগণ ও মনুষ্য-পিতৃ-পক্ষী ইত্যাদি জীবগণে ব্রহ্মবিজ্ঞান স্থাপন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।”

সম্প্রতি আমরাও যে মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বসাধারণসমক্ষে উপস্থিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, তাঁহার ধরাধামের আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে এতদ্দেশে ধর্ম্মের অবস্থার বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে যে, তখনও ব্রহ্মবিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্বোক্ত দ্বাপরযুগের তাৎকালিক অবস্থার অনুরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নদীয়াবিহারী শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থাও ঐরূপ ছিল। গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে সাধারণের নিকট ধর্ম্ম কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতাতে পরিণত হইয়াছিল; অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস হারাইয়া, শুষ্কজ্ঞান, অপ্রতিষ্ঠতর্ক, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ধর্ম্মের বাহিরের খোসাভুষি লইয়া টানাটানি করিতেছিলেন। এই সুযোগে চতুর শাস্ত্রব্যবসায়িগণ, ধর্ম্মের নামে ঘোর অধর্ম্মের স্রোত খরতরবেগে প্রবাহিত করিয়া, দেশের সর্ব্বনাশসাধনে ব্যাপৃত ছিল। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মহানুভব ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আত্মার পিপাসা নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করিয়াও পাইতেছিলেন না। এমন সময়ে পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্ম নব-কলেবরে, নূতন-আকারে, আপাতমনোহরবেশে এক অভিনব আদর্শ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে গ্রাস করিবার মানসেই যেন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিল। অদূরদর্শী বহু লোক এই নূতন ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য আকর্ষণে, খৃষ্টান পাদ্রীদিগের শ্রুতিমধুর উপদেশে, ইংরাজী

শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অনেকে বিমোহিত হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অম্লানবদনে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের বিষম সমস্যার দিন উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ সুধিগণ ভাবিলেন হিন্দুস্থানে হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝি আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

দেশের এইরূপ ভয়ানক দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, ভারতমাতার সুসন্তান প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইল। কেমন করিয়া, কি উপায়ে, ভারতকে এই ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা করা যায়, দিবানিশি এই চিন্তা তাঁহার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, এবং উপস্থিত বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষে তিনি সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সত্যসনাতন প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এবং এই অধঃপতিত দেশের পুনরুদ্ধারসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ভক্তের প্রাণে এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, ভারতমাতার সর্ব্বদুঃখাপহ মহৌষধি ব্রহ্মবিদ্যার বীজ রোপণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারই প্রেরণায় মহাত্মা রামমোহন রায় বৈদিক ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মানসনেত্রের সম্মুখে ধরিলেন, যাহার নিকটে সুসভ্য খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শ, চন্দ্রালোকে খদ্যোতের ন্যায়, একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। শিক্ষিত ভারতবাসী, এমন কি বিচক্ষণ খৃষ্টান পাদ্রিগণও বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; খৃষ্টধর্ম্মের প্রবল স্রোতের মুখে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা পতিত হইল। এইরূপে ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের পীঠস্থানে লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

যিনি যে কার্য্যের জন্য জগতে আগমন করেন, ভগবদিচ্ছায় তাহা সম্পন্ন হইয়া গেলে, তাঁহার জীবনের আর কোনও আবশ্যকতা থাকে না। মহাত্মা রামমোহন রায়ও, বঙ্গদেশের তদানীন্তন ঊষর-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মবৃক্ষ রোপণ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মঙ্গলময়ের ইঙ্গিতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি বেদান্ত উপনিষদ্ হইতে বহু উপাদেয় সূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন, এবং নবীন-উৎসাহে সমধিক আগ্রহ সহকারে এই অভিনব ধর্ম্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্য মহাত্মা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক রোপিত ধর্ম্মবৃক্ষের বেষ্টনস্বরূপ হইল; এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাশালী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু কি জানি কেন, কিসের অভাবে, বৃক্ষ আর তেমন বর্দ্ধিত হইতেছে না দেখিয়া, প্রচারক-প্রবর বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে, ভক্তের আহ্বানে, ভগবানের শুভ-ইচ্ছায়, জীবের বহুভাগ্যে পুণ্যশ্লোক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রভু শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের আহ্বানে, শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর, নাম-যজ্ঞভূমি শ্রীবাসের অঙ্গনে

প্রবেশের ন্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-বিনির্ম্মিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-রঙ্গমঞ্চে মহোল্লাসে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহায়তায়, অদম্য উৎসাহে এবং অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে, মহাত্মা রামমোহন রায় রোপিত ধর্ম্মবৃক্ষের মূল হইতে, দুর্নীতি-মৃত্তিকা খনন-পূর্ব্বক কুসংস্কার আবর্জ্জনা অপসারিত করিলেন। ভগবৎ-প্রীতিবারিসেচনে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ আলোক ও বায়ুর ব্যবস্থায়, অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বৃক্ষ শাখাপল্লবে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বঙ্গদেশের বহুস্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, শিক্ষিত যুবকগণ দলে দলে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের কলেবর পুষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং আপামরসাধারণ এই অপূর্ব্ব বৃক্ষের দিকে অনিমেষনেত্রে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! এ কি হইল? এই শোভন বৃক্ষে ফুলফল ধরে না কেন? কত স্বার্থত্যাগ, কত আত্মবলিদান, কত অসাধ্য-সাধন করিয়া যে বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইল, তাহাতে ফল ধরিতেছে না, ইহা অপেক্ষা গভীর দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাগানের মালিগণ ইহা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবদ্বিধানে দৃঢ়বিশ্বাসী অমিততেজাঃ আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ কিছুতেই হতাশ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য, ভগবন্নির্দ্দেশে ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টন অতিক্রম করিয়া, 'এই মহাব্যাধির ঔষধের অনুসন্ধান যদি পাই তবেই ফিরিব, নচেৎ এই শেষ প্রস্থান'—এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, অনন্ত উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া পড়িলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায়, অনাহার অনিদ্রা ইত্যাদি অশেষবিধ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া, সেই ভবরোগ-মহৌষধির সন্ধানে, পদব্রজে দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যমহিষাদি হিংস্র জন্তু ও দস্যু-তস্কর প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের করাল কবল হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়া, অসংখ্য নির্জ্জন কানন ও অগণ্য গিরিকন্দরে অনুসন্ধানপূর্ব্বক, বহুসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাত্মাগণের সেবা ও সঙ্গের পর, অবশেষে গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে অনাবিষ্কৃত সুদূর মানস্-সরোবরবাসী ভগবান্ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের নিকট হইতে উক্ত ব্যাধির অমোঘ ঔষধ সংগ্রহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মসমাজে পুনঃ-প্রবিষ্ট হইলেন ও কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মবিদ্যাবৃক্ষের সেবার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

অতঃপর তাঁহার কার্য্য-প্রণালীতে কিছু কিছু নূতনত্ব অনুভব করিয়া, সহকারীদিগের কেহ কেহ বিস্মিত হইতে লাগিলেন; অনেকে তাঁহাদের অভীপ্সিত ফললাভ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ভগবৎশক্তির প্রেরণায় নিজ মনে, আপন প্রাণে, সংস্কারকার্য্যে তৎপর হইলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম বাহিরের বস্তু নয়, অন্তরের জিনিষ; ধর্ম্ম প্রণালীতে নাই, অনুষ্ঠানে

আছে ; মতের বিশৃঙ্খলতাতে নাই, পবিত্র জীবনে আছে ; কোনও দলে বা তীর্থে আবদ্ধ নহে, অথচ সকল দলে ও তীর্থেই আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে এবং মানবহৃদয়ই এই ধর্ম্ম-পাদপের মূল ; সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ এবং তদুপদিষ্ট শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত পন্থার অনুসরণ না করিলে যথার্থ ধর্ম্মলাভ সম্ভবপর নহে।

তিনি স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে যে সজীব ধর্ম্মবীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা সাধন-ভজনরূপ অনুকুল জলবায়ুর সাহায্যে এবং ক্ষেত্রের গুণে, অচিরকালমধ্যেই অঙ্কুরিত ও শাখাপল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া ফুলফলে সুশোভিত হইল ; তাহার সৌরভে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল ; এবং চতুর্দ্দিক হইতে ধর্ম্মপিপাসু-ভ্রমরনিকর পুঞ্জে পুঞ্জে আসিয়া মধুরগুঞ্জনে ধর্ম্মকাননকে মুখরিত করিয়া তুলিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে, অসংখ্য ভক্তকোকিল, সমবেত হইয়া, বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া, মনের উল্লাসে পঞ্চমস্বরে গাহিতে লাগিলেন ; স্বর্গ হইতে দেবগণ যেন পুষ্পবর্ষণ করিলেন। আমাদের 'কৃষ্ণ-মালীর' চিরদিনের আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার অদম্য চেষ্টা সফল হইল। ধর্ম্মের জন্য তাঁহার আশৈশব অক্লান্ত পরিশ্রম এতদিনের পরে সুফলপ্রসব করিল।

গোস্বামী-প্রভু উত্তম আহার্য্য বস্তু পাইলে তাহা অপরকে না দিয়া কখনও খাইতে পারিতেন না। এখন তিনি যে ত্রিতাপহারক, ভবব্যাধি-বিনাশক, সর্ব্বাভিষ্টপ্রদ, অমূল্য নামসুধারস সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলেন, যাহা পান করিলে জীব শিব হয়, মানুষ দেবতা হয়, তাহা সমস্ত নরনারীকে আস্বাদন করাইতে ব্যাকুল হইলেন এবং স্বীয় গুরুদেবের আদেশে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে, উপস্থিত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই বিনামূল্যে অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে গোস্বামী-প্রভু আজীবন বিরোধী শক্তির ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া, ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মসংস্থাপনপূর্ব্বক, লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ, যুগ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সুনির্ম্মল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব ধর্ম্মকে সৎশাস্ত্রানভিজ্ঞ উপধর্ম্মীদিগের কবল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আহ্বানে, জগন্নাথক্ষেত্রে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তিনি যে সনাতন ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া গেলেন, তাহা কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। উপযুক্ত জলবায়ুর সংযোগ হইলেই, তাহা হইতে বহু বিশাল ও বৃহৎ বৃক্ষের উদ্ভব হইবে, এবং সেই সকল বৃক্ষের সুপক্ক ফল হইতে পুনরায় নূতন নূতন অসংখ্য পাদপ উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এই প্রকারে কালক্রমে সমগ্র দেশই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মকাননে পরিণত হইবে। সেদিন এখনও

আসে নাই, কিন্তু নিশ্চয় আসিবে। সেই সত্যযুগ ও সত্যধর্ম্মের জয়পতাকা মহাত্মগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে।

আজ ঊনত্রিংশবর্ষ অতীত হইল, (১৩০৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে) প্রভুজী নরলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রকট অবস্থায় যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মস্রোত তিনি বঙ্গদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যে মহোচ্চধর্ম্মের আদর্শ লোকসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাই সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলদেহ ধারণের শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবের পরম হিতসাধন-কার্য্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" এই মহামন্ত্রের প্রেরণায় তিনি সাধকের অবস্থায় পূর্ণ-পুরুষকে লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হন নাই। জীবনের প্রথমভাগেই তিনি যে সকল অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্পসংখ্যক সাধুমহাত্মার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। পূর্ণকাম হইবার মানসে তিনি বংশমর্য্যাদা, জাত্যভিমান, জ্ঞান-গরিমা, আত্মসুখ, সাংসারিক সম্পৎসমৃদ্ধি সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুদিগের আনুগত্যে তাঁহাদের ভজন-প্রণালী অবলম্বন ও আস্বাদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গোস্বামী-প্রভু এইভাবে প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেক স্থূলদর্শী লোক তাঁহার জীবনের ঘটনাসমূহের সামঞ্জস্য দর্শন করিতে অসমর্থ। কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে তাঁহার জীবনলীলা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, শাস্ত্র-সদাচারানুমোদিত অপূর্ব্ব ঘটনাপ্রবাহ। তিনি পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইবে আমার জীবনের পূর্ব্বাপর প্রত্যেক কার্য্য ও বাক্যের মধ্যে একটী সামঞ্জস্য রহিয়াছে।" অপর এক সময়ে বলিয়াছিলেন— "জীবন একখানি নৌকার ন্যায় এক স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইতেছে, কখন মরুভূমি, কখনও পুষ্পবন ; কখন সমতল ক্ষেত্র, কখনও বন্ধুর প্রদেশ। যখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি। যাহারা শুনিতেছে, তাহারা অনেক কথারই অসামঞ্জস্য দেখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ত আর সত্য গোপন করা যায় না।" ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবের যে অবস্থা হয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে তাঁহাতে তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে যুঞ্জান ও যুক্তযোগীর অবস্থা শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে, তৎসমুদয় ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। শেষজীবনে তিনি, সর্ব্বাঙ্গে সুশোভন তিলক, মস্তকে অপূর্ব্ব জটা, বক্ষে পবিত্র মালালহরী ও অঙ্গে ভগবান্ বস্ত্র ধারণ করিয়া, ভক্তি-শাস্ত্রোল্লিখিত সমস্ত বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা জীবের কল্যাণার্থ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি," প্রভুজীর দর্শনে সর্ব্বথাই এ বিষয়ে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইয়াছে। সাধক যোগারূঢ় হইলে এবং প্রেম-ভক্তি লাভ করিলে, জীবনে কি আশ্চর্য্য অবস্থা ঘটে, তাহা তাঁহার সমসাময়িক মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ গোস্বামী-প্রভুর অপূর্ব্ব জীবন শাস্ত্র ও সদাচারের একখানি অত্যুজ্জ্বল চিত্রপট মাত্র।

ভক্তিশাস্ত্রে সাধনপন্থার তিনটী ক্রমের কথা উল্লিখিত আছে—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্।

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"—শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়।

প্রাগুক্ত তিনটী তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ-সাধন-সাপেক্ষ।

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অর্থাৎ জ্ঞানসাধন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব, যোগসাধন দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব ও ভক্তিসাধন দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব লাভ হয়।

জীবজগতে ইহারও নিম্নতর আরও কয়েকটী স্তর আছে—জড়ত্ব, পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব। ভগবৎকৃপায় জীব পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব স্তরে আরোহণ করিতে পারিলেই ব্রহ্মবিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান), যোগ ও ভক্তি এই তিন স্তর অতিক্রম করিতে পারিলেই, সাধক পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি অর্থাৎ পরাভক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবানের আনন্দময় অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে উক্ত তিন শ্রেণীর সাধকই স্ব স্ব শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এক এক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, প্রত্যেকেই আপন আপন উপরের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং নিম্নতর শ্রেণীর উত্তীর্ণ সাধকগণ তত্তৎ স্থান অধিকার করেন। যে সাধক যে শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই শ্রেণীর এবং তাহার নিম্নতর শ্রেণীর অধীত বিষয়ের কথাই বলিতে পারেন, উচ্চতর শ্রেণীর কোন কথা বলিতে তাঁহার অধিকার জন্মে না। যিনি জ্ঞানের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তিনি জ্ঞানের কথাই আলোচনা করিতে পারেন এবং ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কোনও উচ্চতর অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণায় আসে না। এই প্রকার যিনি যোগসাধনা করেন, তিনি জ্ঞান ও যোগের কথাই বলিতে পারেন, ভক্তিতত্ত্ব তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হয় না—ইত্যাদি। এই বিদ্যালয়ে আবার এক শ্রেণী অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধতন শ্রেণীতে

উন্নয়নের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়িয়া কেহ যোগতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং যোগ ছাড়িয়া কেহ ভক্তিতত্ত্বে অধিকারী হয় না—ইত্যাদি। গোস্বামী-প্রভুর জীবন আলোচনা করিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে তিনিও পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই তিনটী সোপান ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া যখন যে সোপানের সাধক সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দীক্ষা দান করিয়া, সমর্থকে সঙ্গে লইয়া, অসমর্থকে স্বীয় শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিপক্কতা লাভের জন্য পশ্চাতে রাখিয়া, কি জানি কিসের জন্য, উধাও হইয়া, 'হুমা' পক্ষীর ন্যায় অনন্তের দিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে সেই 'রসো বৈ সঃ' রসের সায়রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাধনপথের ক্রমসম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভুর স্বহস্তলিখিত উপদেশ এইরূপ, "প্রত্যেক সাধককে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ১ম—ব্রহ্মভাব; এই অবস্থায় সাধক দেখেন যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময়! উহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। দ্বিতীয় অবস্থা—যোগ; ইহা হঠযোগ নহে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ। এই অবস্থায় সাধক দেখিতে পান যে তাঁহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির অধীন। কেবল শরীর নহে, আত্মার সমস্ত বৃত্তি সেই শক্তির অধীন। সেই শক্তি নড়িতেছে চড়িতেছে, তাহার স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ অনুভূত হইতেছে; কিন্তু এই স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ অব্যক্ত। গর্ভবতী নারী যেমন গর্ভস্থ সন্তান অনুভব করেন, ইহাও সেইরূপ। ৩য়—ভগবদ্-ভাব অর্থাৎ লীলা। এই অবস্থায় সাধকের নিকট ব্রহ্ম অনন্তভাবে দেখা দেন। কালী, দুর্গা প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার প্রত্যক্ষীভূত হন। এই জগতে মনুষ্য যেমন ব্রহ্মের লীলার পরিচয়, সেইরূপ অসংখ্য জগতে যতভাবে যেরূপে ব্রহ্ম লীলা করেন, সমস্তই সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ, কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধক এইরূপে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—এই ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, ব্রহ্মরূপ অনন্ত-সাগরে ঝম্প প্রদান করেন। তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দ-সাগরে' আপনাকে ভুলিয়া তাহাতেই সাঁতার দেন, কখনও নিমগ্ন হন।"*

আমরাও গোস্বামী-প্রভুর স্বীয় জীবনের পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্তরের অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবন ও ধর্ম্মবিষয়ক অপরাপর অত্যাবশ্যক কতিপয় ঘটনা বিবৃত করিয়া, এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিব। কারণ, তাঁহার জীবন-কাহিনী এত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং তাহাতে এত অপূর্ব্ব ও অভিনব বিচিত্রতার সমাবেশ যে, তাহা যথাযথ সংগ্রহ ও তত্ত্বতঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিপিবদ্ধ করা অস্মাদৃশসাধনহীন, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যার

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী-প্রভুর স্বহস্ত লিখিত উপদেশ।

পুনরুত্থার কার্য্য সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

বিদ্যা দুই প্রকার, অপরা-বিদ্যা ও পরা-বিদ্যা। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ অপরা-বিদ্যা নামে অভিহিত ; এবং যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ ও সম্ভোগ করা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা অর্থাৎ—ব্রহ্মবিদ্যা। এই পরাবিদ্যা সৎগুরুর কৃপা-লব্ধ সাধন-সাপেক্ষ—"সাধন বিনা সাধ্যবস্তু কেহ নাহি পায়।" শিব, শুক, নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, গুরু নানক, এবং (অধুনাতন) পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষদিগের জীবনী এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সাধনবস্তু কি, তাহা নিজে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইলে অপরের পক্ষে অনুসরণ করা অসম্ভব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে লিখিত আছে—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।' প্রকৃতপক্ষে আচার ও প্রচার একাধার হইতে উদ্ভূত না হইলে সম্যক্ ফলদায়ী এবং জনসমাজ কর্ত্তৃক গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। গোস্বামী-প্রভুর জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি আপনার উপদিষ্ট ধর্ম্ম যথাযথ স্বীয় জীবনে আচরণ করিয়া তাহার অমৃতময় ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশ অতিমানুষের আবির্ভাব জীবের বহু ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন, জ্ঞান-সূর্য্য উদিত করিয়া অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার উপযুক্ত, অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রলোভনময় উপধর্ম্মের খরবেগ-স্রোত ফিরাইয়া অনন্ত শান্তিময় পূর্ণধর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিতে সমর্থ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যখন তখন, যেখানে সেখানে প্রকটিত হন না। গোস্বামী-প্রভুর আগমনে আজ চিরপূত অদ্বৈতবংশ অধিকতর পবিত্র, বঙ্গদেশ ধন্য, বাঙ্গালা-জাতি গৌরবান্বিত, এবং মুমুক্ষু জীবগণের আশা-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাতাপিতা ও পূর্ব্বপুরুষ

চারিশত বৎসর অতীত হইল, নদীয়া-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মহাপুরুষ জগৎকে ভক্তিশূন্য দৃষ্টি করতঃ জীবের দুঃখে অতীব কাতর হইয়া, তাহাদিগকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নান করাইয়া পরাশান্তি প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাগ্রহ আহ্বানে ও ঘন ঘন হুঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু গোলক-বিহারী শ্রীহরি, ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, নিত্যানন্দরূপী শ্রীমদ্‌বলদেবের সমভিব্যাহারে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং গদাধর-শ্রীবাসাদি পার্ষদবৃন্দের সহযোগে, কলিহত জীবকে ত্রিতাপজ্বালা নিবারক ভবব্যাধিবিনাশক হরিনামামৃত পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন; বঙ্গদেশের তদানীন্তন ঊষরক্ষেত্রকে অপ্রাকৃত ব্রজধামের প্রেমবারি বর্ষণ করিয়া পরিষিক্ত করিলেন; নাম-তরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইল, এবং লক্ষ লক্ষ পাপী-তাপী নর-নারী তাহাতে অবগাহনপূর্ব্বক নবজীবন লাভ কবিয়া উদ্ধার পাইয়া গেল।

কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের অন্তর্দ্ধানের পর চারিশত বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অতিশয় মলিন হইয় পড়িল। ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার অধর্ম্মের স্রোত বঙ্গমাতার বক্ষের উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিল। শাস্ত্র ও সদাচার-ভ্রষ্ট আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরীসাধক প্রভৃতি উপধর্ম্ম যাজকগণের অত্যাচারে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত সুনির্ম্মল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে মহা 'হাহাকার'ধ্বনি উত্থিত হইল। এমন সময়ে শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতবংশে অদ্বৈতাচার্য্যোপম, পরদুঃখকাতর, পরমভাগবত একজন পুরুষ-প্রবর আবির্ভূত হইলেন। ইঁহার নাম শ্রীমৎ আনন্দকিশোর গোস্বামী।

প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ঈদৃশ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারসাধন হইবে, কিসে জীবের দুঃখ দূর হইবে, এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন; এবং অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের শ্রীচরণে আপনার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা নিবেদন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইতেন। সংসারের যাবতীয় ভোগ-বিলাস-বিবর্জ্জিত, পরসেবানিরত এই মহাপুরুষ দিবসের

অধিকাংশ সময়ে ৺শ্যামসুন্দরের সেবায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় যাচঞাদ্বারা শিষ্য-সেবকদিগের নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাহারা অযাচিতভাবে যাহা প্রদান করিত তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু, তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের দিকে একেবারেই দৃষ্টি না রাখিয়া, মুক্তহস্তে সৎকার্য্যে সেই সকল অর্থ ব্যয় করিতেন। দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি কোন প্রকার যাচকই তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। নিরাশ্রয় দরিদ্র শিষ্যদিগকেও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। সেবাবিষয়ে তিনি এতদূর নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে, ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করিবার কাষ্ঠাদি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'লাক্ড়ী ধোয়া' গোঁসাই বলিত।

শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় অতিশয় উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিবার সময় চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া অবশেষে গ্রন্থের পাতা পর্য্যন্ত সিক্ত হইত, পুলকাদি অপরাপর সাত্ত্বিক ভাব-কদম্ব সর্ব্বাঙ্গে বিকসিত হইয়া উঠিত; এবং সময়ে সময়ে রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইয়া উত্তরীয় বসন রঞ্জিত হইত। কখনও কখনও প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাসে 'রাধা-শ্যাম', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি বাক্য তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এমন তেজের সহিত উচ্চারিত হইত যে, তাহা শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও ভগবদ্ভাবে বিগলিত হইয়া যাইত। একদিন হঠাৎ তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি তাঁহাব নিত্যপূজার শালগ্রামচক্র গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-সীতানাথকে স্মরণ করিয়া পদব্রজে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবদর্শনে যাত্রা করিলেন; এবং শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে প্রায় একবৎসরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। কঠিন মৃত্তিকাঘর্ষণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ও জানুর সন্ধিতে ঘা হইয়াছিল। তিনি ক্ষতস্থানে ন্যাকড়া জড়াইয়া লইতেন, তবুও সাষ্টাঙ্গ করিতে নিরস্ত হন নাই। এইরূপ ভয়ানক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ক্ষেত্রস্বামীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহবাসে এতদূর আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; এমন সময়ে একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, জগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন—"তুই বাড়ী যা, আমি তোর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব, এবং তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" অকস্মাৎ এইরূপ শুভ বর লাভ করিয়া তিনি পূর্ব্ব-সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের আনন্দে, প্রফুল্ল-হৃদয়ে জন্মভূমি শান্তিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এতদিন পরে তিনি শান্তিপুরকে

যথার্থ শান্তিপুর বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে জীবের দুঃখে কাতরতাপ্রযুক্ত, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের গ্লানিদর্শনহেতু তাঁহার মুখমণ্ডলে যে একপ্রকার কালিমার আভা প্রকটিত হইয়াছিল, এখন তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইল। সূক্ষ্মদর্শিগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মনে মনে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীমৎ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় ইতঃপূর্ব্বে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ দুইবার বিপত্নীক হন। পত্নীদ্বয়ের কোন সন্তানাদি হয় নাই। আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় মৃত্যুর প্রাক্-কালে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিকটে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন—"ভাই! আমার অন্তিমকালের একটী বাক্য তোমাকে রাখিতে হইবে। আমি নিঃসন্তান, অতএব তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটী আমার পত্নীকে দত্তক প্রদান করিও।" এই কথা শুনিয়া আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"সে কি? আপনি কি প্রলাপ বকিতেছেন? আমি যে বিপত্নীক এবং আমার কোন সন্তানাদিও নাই। এ যে আপনি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন!" তদুত্তরে ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোমার বিবাহ হইয়াছে এবং দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে; অতএব তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। পুত্র হইলে একটী পুত্র অবশ্য আমাকে দত্তক প্রদান করিও, কারণ আমি অপুত্রক।" কিন্তু আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় পুনরায় বিবাহ করিবেন না বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই বাক্যে তখন তেমন আস্থা স্থাপন করেন নাই। কিন্তু জগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই ভবিষ্যদ্-বাণীর কথা স্মরণ হওয়ায় মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ ভগবন্নির্দ্দেশে তিনি এখন বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুল গ্রাম নিবাসী পরমভাগবত ৺গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে শ্রীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় দুইটী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন, প্রথমটীর নাম ব্রজগোপাল এবং দ্বিতীয়টীর নাম বিজয়কৃষ্ণ। ১২৫১ সনে রংপুর জেলার অন্তর্গত আমলাগাছি গ্রামে শ্রীমদানন্দ-কিশোর গোস্বামী মহাশয়, তদীয় জমীদার শিষ্য ৺মুকুন্দনারায়ণ চৌধুরীর বাটীতে একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ অচৈতন্য হন। তদবস্থায় তাঁহাকে গোপীনাথপুরের খামার বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তথায় শুভ অক্ষয়া তৃতীয়ার দিবস তিনি ঐ সমাধি অবস্থায়ই নিত্যধামে গমন করেন। অদ্যাপি শান্তিপুরে তিনি 'ঋষি-গোস্বামী' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বিজয়কৃষ্ণের জননী স্বর্ণময়ী দেবী, অসামান্য গুণে সমালঙ্কৃতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় দয়াবতী নারী জগতে দুর্ল্লভ। জীবের দুঃখ ইনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন করিলে, তিনি সর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হাতে অর্থ না থাকিলে, দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া থালা, ঘটি, বাটী ইত্যাদি তৈজসপত্রও কোন কোন সময়ে গৃহের যাবতীয় আহার্য্য বস্তু পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন; এবং গৃহস্থদিগকে অনেক সময়ে উপবাসী থাকিতে হইত। একবার তাঁহার ভাসুরপুত্রের জন্মোপলক্ষে, সমাগত ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর প্রভৃতিকে গৃহের সমুদয় ঘটী, বাটী, বস্ত্রাদি দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল।

জননী স্বর্ণময়ী জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, রোগীকে ঔষধপথ্য, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান—ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃতা থাকিতেন। অপরকে খাওয়াইয়া ইনি বড় সুখী হইতেন। প্রত্যহ চারি পাঁচজনের উপযুক্ত অতিরিক্ত অন্নব্যঞ্জন রন্ধন পূর্ব্বক গরীব-দুঃখীদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আহার করাইতেন, এবং পরে নিজে আহার করিতেন।

শান্তিপুরের বাজারে অনেক গরীব-দুঃখী স্ত্রালোক শাকসব্জী ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসিত। কিন্তু তাহাদের ক্রয়বিক্রয়কার্য্য সমাধা করিয়া বাটী যাইতে অনেক সময়ে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। দেবী স্বর্ণময়ী এই সকল অনাহার-ক্লিষ্ট, দীন-দুঃখীদিগকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া, আদরের সহিত পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিতেন। তিনি বলিতেন— "যে একাকী আপনার জন্য রান্না করে, সে ত শেয়াল কুকুরের মত। পাঁচজনের কম কিছুতেই রান্না করা উচিত নয়।" কৃপণদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন —"আহা! উহারা বড়ই দয়ার পাত্র, নিজেদের থাকিতে খাইতে পায় না।" এজন্য তিনি কৃপণদিগকে অধিকতর যত্নসহকারে খাওয়াইতেন।

একবার শান্তিপুর কোথা হইতে একটী পাগলিনী আসিয়াছিল। তাহার রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বেশ ইত্যাদি দেখিয়া, দুষ্ট বালকের দল তাহাকে নানা প্রকারে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু পাগলিনী কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া, একপ্রকার অব্যক্ত করুণ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে দারুণ মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিত। দেবী স্বর্ণময়ী পাগলিনীকে এইরূপ অসহায় দেখিয়া, স্নেহভরে হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং স্বহস্তে তাড়াতাড়ি তাহার মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল মাখাইয়া দিয়া তদুপরি কলসে কলসে জল ঢালিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ জলের ধারা দিবার পর পাগলিনীর সহসা চৈতন্য হইল। চেতন পাইয়াই বলিল—"মা!

তুমি আমায় জুড়াইয়া দিলে, আর কেউত আমায় এমনটী কল্লে না। সবাই আমায় পাগল বলে, ক্ষ্যাপায়, জ্বালার উপর জ্বালা দেয়। তুমি কি মা দেবতা ?" পরে জানা গেল যে পাগলিনী একটী পুত্র-শোকাতুরা দরিদ্রা জননী। অতঃপর দেবী স্বর্ণময়ী পাগলিনীকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

একবার শীতকালে সন্ধ্যার সময়ে জননী স্বর্ণময়ী কলিকাতার রাজপথ দিয়া ৺কালীমাতা দর্শন করিবার জন্য কালীঘাটে গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, পথের পার্শ্বে একখানি খোলার ঘরের সম্মুখে একজন বারাঙ্গনা দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তখন সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন করিবার সময়ে যখন দেখিলেন যে, উক্ত স্ত্রীলোকটী তদবস্থায়ই দুরন্ত শীতে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছে, তখন দেবী স্বর্ণময়ীর দয়া শতগুণে উছলিয়া উঠিল। তিনি, তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল তৎসমস্তই ঐ বারাঙ্গনাকে প্রদান করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"বাছা, আর শীতে কষ্টভোগ করিও না, এখন ঘরে গিয়া শয়ন কর।"

এই দয়াবতী নারী আত্ম-পর বিচার-বিরহিতা হইয়া সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। এমন কি, পরিচারিকার পুত্রের সঙ্গেও তাঁহার নিজের পুত্রের কোনরূপ প্রভেদ করিতেন না। গোস্বামী-প্রভু একদিন মায়ের সমদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তিনি দাসীপুত্রকে আমার সহিত তুল্যরূপে ভালবাসিতেন। একখানা থালা, একটী ঘটী, একটি গ্লাস তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।" যে সকল মুটে-মজুরদিগকে সাধারণতঃ লোকে অবহেলার চক্ষে দর্শন করে, তাহাদিগকে ইঁনি অতিশয় দয়ার চক্ষে দেখিতেন। একদিন একজন কাঠুরিয়ার সঙ্গে মজুরীর পয়সা লইয়া গোস্বামী-প্রভুর কথাবার্ত্তা হইতেছিল। মজুরের দাবী অপেক্ষা গোস্বামী-প্রভু কিছু কম দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া মজুর বলিল—"দাদা গোঁসাই, আপনার সঙ্গে দর ঠিক হইবে না, আপনি মা-গোঁসাইকে ডাকুন।" গোস্বামী-প্রভু মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিলে, তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন—"গরীব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া তুই কি বড়লোক হবি রে ? ইহাদের সহিত গোল করিস্ না। ইহারা যা চায় তাই দে। ইহাদিগকে বরং কিছু বেশী দিতে হয়, নতুবা ইহাদের স্ত্রীপুত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে ?"

স্বর্ণময়ী দেবী বাৎসল্যপ্রেমের আধারস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী-প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—"আমি বিদেশে যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইতাম অথবা কোন হিংস্রজন্তুর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা আশ্চর্য্যভাবে উল্লেখ করিতেন। গয়ার

পাহাড়ে একদিন পাথরে পা ঠেকাতে এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে, 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। পরে বাড়ী আসিলে মা বলিলেন—'তুই খুব আঘাত পেয়েছিলি? পায়ে পাথর ঠেক্‌লে যেমন আঘাত লাগে, হঠাৎ একদিন আমার তেমনি হ'ল। আমি ভাবলুম—ঘরে ব'সে আছি পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কানে বাজলো, মনে হ'ল তুই কষ্ট পেয়েছিস'।"*

স্বর্ণময়ীর মাতাপিতা অনেক দিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান অবস্থায় ছিলেন। পরে একটী মুসলমান ফকিরের বরে ইঁহার জন্ম হয়। বর-দানকালে স্বর্ণময়ীর মাতা-পিতা ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দ্বিতীয় সন্তানটী তাঁহাকে দিবেন, কিন্তু সময়কালে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"এই সন্তান অনেক সময় স্ববশে থাকিবে না।" এই ঘটনার পর বহুদিন নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ফকিরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। ফকিরের দেহান্তের পরে সময়ে সময়ে স্বর্ণময়ীর দেহে তাঁহার আবির্ভাব হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণময়ী ফকিরী ভাষায় নানা প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেন, এবং অধিকাংশ সময়ে উন্মাদের ন্যায় থাকিতেন। এতদবস্থায় একবার তিনি বনগ্রামের কোন জঙ্গলের মধ্যে একটী বন্য ব্যাঘ্রের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্র তাঁহাকে কোনরূপ হিংসা করে নাই। ঘটনাটী গোস্বামী-প্রভুর স্ব-কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—"আমি যখন লাহোরে ছিলাম, তখন একদিন হঠাৎ বাড়ীর চিঠি পাইলাম যে, আমার মাতাঠাকুরাণী পাগল হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পত্র পড়িয়া যেন আমার সমস্ত শরীরে তড়িৎ বহিতে লাগিল। তখনই বাড়ী রওয়ানা হইলাম। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় মাতাঠাকুরাণীর এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন, কাহারও মুখ মলিন দেখিলে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। ইহাতে বাড়ীর লোকে তাঁহাকে বড় জ্বালা দিত। সে যাহা হউক, আমি বাড়ী আসিয়াই অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে পাইলাম না। তখন ঘোষণা করিয়া দিলাম, যে আমার মাকে আনিয়া দিবে তাহাকে যাতায়াতের খরচ ও পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিব। সমস্ত জেলায় ও থানায় এই ঘোষণা দেওয়া হইল; কিন্তু কেহই মাকে আনিয়া দিতে পারিল না। তখন আমি নিজে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া একদিন রাণাঘাটে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, কয়েকটী লোক বলিতে বলিতে যাইতেছে—'ভাই পাগলিনী স্ত্রীলোকটী যেন নক্ষত্রের মত ছুটিয়া চলে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'মহাশয়! তাঁহাকে কোথায় দেখিলেন?' তাহারা বনগ্রামের নিকটস্থ একটী গ্রামের নাম করিল। তখন রেলগাড়ী হয় নাই। ওখান হইতে হাঁটিয়া উক্ত

---

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

গ্রামে যাইতেছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, রাস্তায় কতকগুলি কাঠুরিয়া বলাবলি করিয়া যাইতেছে—'ভাই কি অদ্ভুত স্ত্রীলোক! বাঘের গায়ে শিয়র দিয়া ঘুমাইতেছে।' আমি উক্ত স্ত্রীলোকটীর কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—'বনে কাঠ কাটিতে গিয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি। এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক একটা বাঘের পেটে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে, আর বাঘটী স্ত্রীলোকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। এই কথা শুনিয়া আমি বনের ভিতর প্রবেশ করিলাম, এবং কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর একস্থানে দেখিতে পাইলাম যে, সত্য সত্যই বাঘের গায়ে মাথা রাখিয়া মাতাঠাকুরাণী ঘুমাইতেছেন। তখন গ্রামে গিয়া কতিপয় ভদ্রলোককে এই কথা জানাইলে তাঁহারা আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। সকলে একত্র হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, মাতাঠাকুরাণী জাগিয়া বাঘকে বলিতেছেন—'বাঘ, তুই কার? আমার? আমার যদি হোস্, তবে আমায় পিঠে কর দেখিনি? —বুঝিয়াছি তুই আমার নোস্। আমি উলঙ্গ কালী, দশভুজা নই, দশভুজা দুর্গা হ'লে তুই আমায় পিঠে চড়াতিস্।' মাতাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। কি আশ্চর্য্য! বাঘটা কিন্তু মাকে একটুকুও হিংসা করিতেছে না! কতক্ষণ পরে মা আবার বলিলেন—'বাঘ তুই থাক্, আমি তোর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি।' এই কথা বলিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া আমি দ্রুতগতিতে যাইয়া তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—'তুই কে রে?' আমি ভাবিলাম, যদি এখন ঠিক পরিচয় দেই, তবে কোনও ফল হইবে না। তাই বলিলাম—'আমি আপনার দাস।' মা বলিলেন—দাস কি রে? দাস কি মুখে বল্লেই হয়? ওহো! তোকে ত চেনা চেনা বোধ হচ্ছে।' আমি বলিলাম—'আপনি জগতের সমস্ত জানেন, আমাকে চিনিবেন না কেন?' মা উত্তর করিলেন —'তা নয়, তোকে যেন কোথায় দেখেছি।' আমি পুনঃ পুনঃ মাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন 'তুই এতদিন কোথায় ছিলি?' আমি দেখিলাম, মায়ের চৈতন্য হইয়াছে। তখন বলিলাম—'আমি লাহোরে ছিলাম।' মা উত্তর করিলেন—'তা ত জানি, কবে এসেছিস্?' আমি বলিলাম—'বাড়ী আসিয়া দেখি, তুমি বাড়ীতে নাই, তাই তোমার তল্লাসে বাহির হইয়াছি।' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া মায়ের মাথায় দিলাম। তৎপরে স্নান করাইলাম। এইরূপ দুই তিনবার স্নান করাইবার পর মায়ের গায়ে যে একপ্রকার দুর্গন্ধ হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। তখন নূতন কাপড় পরাইয়া তুলসীতলায় আসন পাতিয়া মাকে বলিলাম —'মা, আহ্নিক কর।' মা বলিলেন—'আহ্নিক কাকে বলে?' আমি বলিলাম—'মা, আহ্নিক কি তোমার মনে নাই? আমি ব'লে দেব?' মা বলিলেন—'বল্

তো ?' তখন মা বাল্যকালে আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাণে বলিলাম। শ্রবণমাত্র মায়ের চোক্ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন তাঁহাকে লইয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলাম।"*

আর একবার দেবী স্বর্ণময়ী উন্মাদ অবস্থায় শান্তিপুর হইতে একাকিনী ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে, গোস্বামী-প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তুমি একাকিনী কি-প্রকারে এত দূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিলে ?" তদুত্তরে দেবী স্বর্ণময়ী বলিলেন—"আমাকে সকলে পাগলা-গারদে দিতে চেয়েছিল। আমি ভয় পাইয়া শ্যামসুন্দরকে (কুলদেবতা) বলিলাম—'শ্যামসুন্দর ! তুমি আমাকে আমার ছেলের কাছে রেখে এস।' তিনি বলিলেন—'তোর ছেলে কোথায় ?' আমি বলিলাম—'আর চালাকি কর্‌তে হবে না ? শীঘ্র রেখে আয়।' তখন শ্যামসুন্দর তোকে দিবার জন্য তাঁহার গাত্রবস্ত্র আমার হাতে দিয়া আমাকে এইমাত্র ঢাকায় রাখিয়া গেলেন।" এই বলিয়া তিনি ৺শ্যামসুন্দরের একখণ্ড উত্তরীয় বস্ত্র গোস্বামী-প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। গোস্বামী-প্রভু ভাবে অভিভুত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। †

এই অদ্ভুত রমণীর সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, অনেক পরলোকগত আত্মার সঙ্গে ইঁহার নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইত। ইঁহাদের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরদেবের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইঁহার নানাপ্রকার কথোপকথন হইত, সূর্য্যে ও বৃক্ষাদির পত্রে পত্রে ইনি রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিতেন। গোস্বামী-প্রভু ৺পুরুষোত্তমধামে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, ইহা বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। সেই-জন্য তিনি মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে পুরী গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এইরূপ অসাধারণ মাতাপিতার গৃহেই দেশের ভাবী গৌরব-রবি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সমুদিত হইয়াছিলেন।

---

* নোয়াখালী, লামচর নিবাসী গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামী-প্রভুর উক্তি।

† ঢাকা, গেণ্ডারিয়া নিবাসী স্বর্গীয় রাধারমণ গুহ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী প্রদত্ত বিবরণ। ইনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বাল্যাবস্থা

১২৪৮ সনের শ্রাবণ মাস। দিবাকর এইমাত্র অস্তমিত হইয়াছেন। প্রকৃতিদেবী সমস্ত দিবসের কোলাহলের পর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পরিশ্রান্তা প্রকৃতিদেবীকে যেন ব্যজন করিতে লাগিলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া দশদিক্ আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া তুলিল। তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঝুলনযাত্রাপ্রযুক্ত আজ গৌড়মণ্ডল কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়া, কৃষ্ণগুণগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে মঙ্গল শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। সকলেরই চিত্ত সুবিমল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। পুরোহিতগণ "ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই সর্ব্বগুণোপেত পরম শুভমুহূর্ত্তে, নদীয়ার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্ত্তী দহকুল নামক গ্রামের এক নিভৃতপ্রান্তরে একটী বৃক্ষতলে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন (বঙ্গাব্দ ১২৪৮ সন, ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার, ঝুলন পূর্ণিমা)। শাক্যকুল-গৌরবরবি ভগবান বুদ্ধদেবও বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের মাতামহ ৺গৌরীপ্রসাদ জোৰ্দ্দার মহাশয় অতিশয় দাতা ও পরোপকারী লোক ছিলেন। জনৈক বিপন্ন ব্যক্তির জামিন হওয়ায়, এবং মোকদ্দমার সময়ে লোকটী পলায়ন করাতে তাঁহার বাটীর দ্রব্যাদি ক্রোক হয়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার দিন জোৰ্দ্দার মহাশয়ের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটী পিটুলী বৃক্ষের তলে শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়। ইহার অনতিদূরে একটি ডোবা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সেই ডোবাটি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পিটুলী বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এবং যে স্থানে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেই স্থানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই যেন উক্ত বৃক্ষের একটি শাখা নত হইয়া স্থানটিকে সযত্নে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে।

জননী স্বর্ণময়ী কিয়দ্দিন হইতে আমাশয়ের পীড়ায় কাতর ছিলেন। এদিকে ক্রোকের হাঙ্গামা উপস্থিত। ভয়ে বাটিস্থিত স্ত্রীলোকেরা যিনি যেখানে পারিলেন, সরিয়া পড়িলেন। আসন্নপ্রসবা জননী স্বর্ণময়ী, বাড়ীর পশ্চাৎভাগে একটি পিটুলী বৃক্ষের নীচে কচুবনের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। বর্ষাপ্রযুক্ত সেখানে অল্প অল্প জলও জমিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন 'লালপাগড়ী'র ভয়ে পুরুষদিগকেও কিরূপ বুদ্ধিহারা ও ত্রস্ত হইতে হইত, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, একটি কুলবধূর পক্ষে এই ঘটনা বিস্ময়কর বোধ হইবে

না। অতঃপর ক্রোকের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে দেবী স্বর্ণময়ীকে ঘরে না দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা কিঞ্চিৎ ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে, তিনি উক্ত বৃক্ষতলে একটী মৃতপ্রায় অজ্ঞান শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধ্যানমগ্নাবস্থায় উপবিষ্টা রহিয়াছেন। শিশুর দিব্যকান্তিতে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল বোধ হইতেছে, নেত্রজলে জননীর বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কেহই সাধারণ মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেন নাই। সকলের জন্মের সঙ্গেই অল্পাধিক পরিমাণে অলৌকিক ঘটনা বিজড়িত রহিয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের জন্মও সমধিক বিস্ময়জনক। অনুসন্ধানকারিগণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন অনুভব করিয়া দেবী স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—"দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্মায় নাই। আকাশ হইতে একটী দিব্যদেহধারী পুরুষ ইহাকে আমার ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক, সমধিক যত্নসহকারে ইহার লালনপালন করিতে করযোড়ে অনুনয় বিনয় করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্ব্ভলক্ষণও তিরোহিত হইল।"* তিনি অপর কোন কোন সময়ে তাঁহার গর্ব্ভাবস্থার কথাপ্রসঙ্গে যে সকল অদ্ভুত ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেন, তাহা "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—"স্বর্ণময়ী বলিলেন—'আমার স্বামী পুরীধামে গমন করিয়া একদিন নিশীথে স্বপ্নে দেখিলেন যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—'আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব, গতজন্মে আমার যে কার্য্যটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাই সম্পাদন করিবার জন্য আমি পুনরায় আমারই বংশে তোমাকে যোগ্য পাত্র দেখিয়া তোমার পুত্ররূপে আগমন করিতেছি।' এই স্বপ্ন দর্শনের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই বৎসরের রাসপূর্ণিমার দিন আমি গৃহ-দেবতা ৺শ্যামসুন্দরের রাসপূজা দর্শন করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যেন, ৺বিগ্রহ হইতে একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বাহির হইয়া, আমার অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে গৃহে আগমন করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু ফিরিয়া আর কিছু দেখিলাম না। ঐ দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, একটি শিশু আসিয়া বলিতেছে

* এই অদ্ভুত কথা দেবী স্বর্ণময়ী ইহার পরেও একাধিকবার অনেকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ঐ কথায় কেহ আস্থা স্থাপন করেন নাই। কারণ জনৈক ফকিরের আবেশে তিনি সময়ে সময়ে উন্মাদগ্রস্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহার ঐ কথাকে অনেকে পাগলের প্রলাপ বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার ঐ সকল কথা একেবারে পাগলের প্রলাপ নহে, উহার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত ছিল।

—'মা, আমি তোমার নিকট আসিলাম!' সেই দিনই আমার গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভাবস্থায় আমি নানাবিধ দেব-দেবী দর্শন করিতাম। সূর্যের প্রতিরশ্মিতে, বৃক্ষাদির প্রতি পত্রে রাধা-কৃষ্ণ দর্শন করিতাম। শয়ন করিয়া আছি, দেখিতাম, আমার গর্ভস্থ সন্তান বাহির হইয়া আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। তাহার অঙ্গপ্রভায় গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমি চলিয়া যাইতাম, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে যেন নূপুর পায়ে দিয়া আমায় অনুসরণ করিত। আমি সর্ব্বদা ভয় পাইতাম। কোন কোন দিন গৃহ স্বর্গীয় গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিত, কে যেন এককালে শত শত আতর-গোলাপের ভাণ্ডার খুলিয়া দিত। কিছুতেই কিছু বুঝিতে পারিতাম না। ভীত হইয়া স্বামীর নিকটে গল্প করিতাম। তিনি অভয় প্রদান করিয়া বলিতেন—'তোমার গর্ভে বড় সাধারণ ছেলে আসেন নাই, আমি জানি এরূপ কত হবে।' এবং অপরের নিকটে এ সকল কথা বলিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু আমার পেটে কথা একদণ্ডও জীর্ণ হইত না।"* গোস্বামী-প্রভু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন স্বর্ণময়ী দেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ্, তোর যে জন্ম, এ স্ত্রীপুরুষসংসর্গের দ্বারা যেরূপ হয় সেরূপে হয় নাই। তোর পিতা শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া মনের দ্বারা আমার ভিতর তোকে স্থাপন করিয়াছিলেন।" গোস্বামী-প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি স্থাপন করিয়াছিলেন?" স্বর্ণময়ী বলিলেন—"শালগ্রামের কি চোখ্ কাণ্ আছে বে? কোন ভাল পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিবি।" †

সমাগত আত্মীয়বর্গ সদ্যোজাত শিশুকে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন। শিশুসহ প্রসূতিকে তাড়াতাড়ি সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া চিকিৎসক ডাকা হইল। কবিরাজ আসিয়া দুইটী ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন—বুকে মালিশ করিবার জন্য অহিফেনসংমিশ্রিত একটী এবং সেবন করিবার জন্য মুসব্বর নামক অপর একটী। সরলা মাতা ভুলক্রমে অহিফেন সংযুক্ত ঔষধটীই খাওয়াইয়া দিলেন; কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধান! তাহাতেই সন্তানের উপকার দর্শিল। শিশুটী অল্পক্ষণ পরেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। কুলকামিনীগণ আনন্দে উলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন। জননী স্বর্ণময়ীর গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে দেশের ভাবী ধর্ম্মস্থাপয়িতা, সত্যধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য ধরাধামে আবির্ভূত হইলেন।

* শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস শ্রীমৎ সীতানাথ গোস্বামী মহাশয় প্রণীত "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

† শ্রীমদ্ যোগজীবন গোস্বামী-প্রমুখাৎ শ্রুত।

এই অদ্ভুত বালকের জন্মের ছয় মাস পরে জননী স্বর্ণময়ী শান্তিপুরে পতিগৃহে উপনীতা হইলেন। শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীমৎ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় পুরুষোত্তমকৃপালব্ধ পুত্রের মুখ দর্শন করতঃ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গরীবদুঃখীদিগকে যথাসাধ্য দান করিলেন। এবং কিছুদিন পরে মহা-সমারোহের সহিত পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সমাধান করেন। প্রভুপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বালকের সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ সুলক্ষণ দর্শন করিয়া মনে মনে নিজকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন; এবং পুরুষোত্তমধামে অবস্থানকালে ভাবীপুত্র সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন এতদিনে সাফল্য লাভ করিল নিশ্চয় করিয়া মহানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার দুইটী কমল চক্ষু হইতে দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আনন্দাধিক্যহেতু মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া উপস্থিত লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি, কে আমাদের পুত্ররূপে আসিতেছেন। জন্মান্তরীণ বহু তপস্যা-ফলে এইরূপ পুত্র লাভ হয়। এ বড় সামান্য ছেলে নয়। প্রেম-ভক্তির প্রভাবে ইনি সমস্ত দিক্ জয় করিবেন।" রাশি-চক্রেও বালকের দুইটী নাম উঠিল—দিগ্বিজয় ও বিজয়কৃষ্ণ। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পরম ভাগবত আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় শান্তিপুরস্থ জ্ঞাতিবর্গ ও বিভিন্ন জাতীয় দীনদুঃখীদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বালকের রূপ লাবণ্য দর্শনে ও আহারে পরিতুষ্ট হইয়া বালকের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ইহার প্রায় তিন বসৎর পরে বিজয়কৃষ্ণ পিতৃহীন হন। অতঃপর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের কালে তদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৺গোপীমাধব গোস্বামী মহোদয়ের অন্তিম কালের ঐকান্তিক অনুরোধ অনুসারে, তাঁহাকে উক্ত গোস্বামী-পাদের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কৃষ্ণমণী দেবীকে দত্তক প্রদান করা হয়। তদবধি শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ স্বীয় গর্ভধারিণীকে 'দুদুমা' ও দত্তক গ্রহণকারিণী মাতাকে 'মা জননী' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ দত্তক গ্রহণকারিণী মাতার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিলেন না। প্রথম প্রথম তাঁহাকে মা বলিয়াই ডাকিতে চাহিতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেন—'আমি মা ছাড়িয়া অপরকে মা বলিতে পারিব না।' ইহাতে দেবী কৃষ্ণমণী মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁহাকে এই কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, কারণ কিয়ৎকাল পরেই তিনি পরলোকে গমন করেন।

অতঃপর উভয় সন্তানের লালনপালনের ভারই শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবীর উপরে পড়িল। তিনি শিষ্যবাড়ী ভ্রমণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারাই কোন প্রকারে কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মাতা,

পিতৃহীন বালক দুইটীকে লইয়া কখনও পিত্রালয় শিকারপুরে, কখনও বা শান্তিপুরে বাস করিতেন।

অতি শিশুকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণের সুকোমল পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ দেখা দিয়াছিল। তিনি মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের অনুকরণে পূজা-অর্চ্চনা, সন্ধ্যা-বন্দনা, ঠাকুর-নমস্কার, তুলসীবৃক্ষে জলদান ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে বড়ই ভালবাসিতেন; এবং আপন মনে, নিজের ভাবে ঐ সকল কার্য্যের এমন সুন্দর অনুকরণ করিতেন, যাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

বালক বিজয়কৃষ্ণ সময়ে সময়ে স্বীয় কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে স্বহস্তে সেবা করিতে অত্যন্ত জেদ করিতেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত শিশু ও উপবীতসংস্কার হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ প্রকাশ করিতেন এবং বাল্য-বুদ্ধিবশতঃ ইহার জন্য ৺শ্যামসুন্দরকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া, কখনও মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া, কখনও বা স্বপ্নযোগে তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা ও হাবভাবে প্রকাশ পাইত যেন স্বয়ং শ্যামসুন্দরের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ ও ভাব বিনিময় চলিতেছে।

"একদিন কার্ত্তিক মাসে জননী স্বর্ণময়ী ৺শ্যামসুন্দরের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রভাতে গৃহে আসিয়া দেখেন শয্যায় বিজয় নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বিজয় ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করিতেছে; দ্বার মোচন করিতে না পারিয়া কখন দ্বার খুলিবার জন্য ৺শ্যামসুন্দরকেই কাকুতি মিনতি করিতেছে। এইরূপে সমস্ত কৌশল ব্যর্থ দেখিয়া, প্রভুর শ্রীবিগ্রহকে বিস্মৃত বালক আরক্ত-নয়নে শাসাইতেছে—'একটু পরে দুয়ার খুলিলে তোমাকে কে রক্ষা করিবে দেখিব?' এই বলিয়া দীর্ঘ যষ্টিহস্তে বালক দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারী আসিয়া দ্বার খুলিল। কিন্তু অনুপবীত বালক শ্রীমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না। তখন বালক রাগে (কি অনুরাগে কে বলিবে) ৺শ্যামসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—'আমার ভাঁটা চুরি করিয়া পলাইয়া আসিলে। আবার আমাকে ঘরে যাইতে দেওয়া হইল না। আচ্ছা কাল আবার খেলিতে আসিও? আমি এর প্রতিশোধ না লইয়া জল গ্রহণ করিব না।' সেদিন আর বালক কিছুতেই আহার করিল না। জননী অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি শয়নগৃহে অন্ন রাখিয়া শয়ন করিলেন। মধ্যরাত্রে জননী দেখিলেন প্রেমাবিষ্ট বালক শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্যামসুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—'যাই আমার কাছে ঘাট্ মানিলে, তাই বাঁচিলে। নতুবা আজ তোমাকে ভাল

করিয়া মজা দেখাইতাম।' আবার বালক বলিতে লাগিল—'আমি যেন ভাই তোমার উপর রাগ করিয়া খাই নাই। তুমিও কেন আজ খাও নাই? এখন এস দুইজনে খাই।' এই বলিয়া বালক আহারে বসিল এবং আহার শেষে পুনরায় শয়ন করিল। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে দেখিতে জননী স্বর্ণময়ী একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় পরে আর ভীত হইতেন না। আশ্চর্য্য যে, পরদিন বালককে এসকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলিতে পারিল না। তবে, সেই রাত্রিতে পূজারী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের মধ্যাহ্নিক ভোগ হয় নাই।

"বিজয়কৃষ্ণের বাল্য জীবনে আরও একটী অতি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বালক অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। তৎকালে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আত্মীয়স্বজনের অনেক ডাকাডাকির পর যেন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। পরে যখন সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বালক বলিল—'আজ বাবা আমায় চাঁদের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে তাঁহার কোলে বসাইয়া কত নদী, কত পাহাড়, কত সুন্দর সুন্দর ফুল বাগান দেখাইয়া বলিলেন—'দেখ বাবা, আমার বংশে একজন খুব বড় সাধু, আর একজন খুব বড় বৈষ্ণব হইবে। তুই কি সেই বড় সাধু হইতে পারিবি?' আমি বলিলাম—হাঁ বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি পারবো। তারপর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।" *

শিশুকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণ সন্ন্যাসী সাজিতে ভালবাসিতেন। কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপীন পরিধান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটা ছিল। তজ্জন্য সকলে তাঁহাকে 'জটে-গোঁসাই' বলিত।

এই সময়ে শান্তিপুরে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। বালক বিজয়কৃষ্ণ কাহাকে কিছু না বলিয়া, একাকী তাঁহাদের সঙ্গতে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেন, সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের ঠাকুরের ভোগ পূজা আরতি দর্শন করিতেন, আর অবিরলধারে তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইত। তাঁহার এই সকল অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া উপস্থিত সাধু-সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে সাতিশয় আদর যত্ন করিতেন।

এক দিবস অপরাহ্নে বিজয়কৃষ্ণ গৃহ হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া স্নেহময়ী জননী অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলেন। সমস্ত রজনী অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া, আত্মীয়স্বজন প্রমাদ গণিলেন, গৃহে 'হাহাকার' ধ্বনি উত্থিত হইল। পরদিন প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ৺শ্যামচাঁদের বাড়ী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বালক বিজয়কৃষ্ণ হাসিমুখে বসিয়া আছেন। সাধুগণ তাঁহাকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক

* "বালক বিজয়কৃষ্ণ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

আহার করাইয়া পূর্ব্বরাত্রে তাঁহাদের নিকটে রাখিয়াছিলেন। অপর একদিন বিজয়কৃষ্ণকে গৃহের সন্নিকটে বনের মধ্যে একটী বিল্ববৃক্ষমূলে সাধুদিগের অনুকরণে মুদ্রিতনেত্রে ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

বালক বিজয়কৃষ্ণ, সহচরগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়া খেলা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। সহচরগণ, বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রজগোপালকে কৃষ্ণ বলরাম সাজাইয়া, এবং আপনাদিগের মধ্যে কেহ শ্রীদাম, কেহ সুদাম, কেহবা সুবল সাজিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিতেন। বালসুলভ সরলতাবশতঃ তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্য সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিত। দিবসের খেলা অন্তে, সহচরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যখন দুই ভ্রাতা, দুই হস্ত দ্বারা পরস্পরের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের অপর হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া—

"কানাই বলাই দুই ভাই।
পথ ছেড়ে দে বাড়ী যাই॥"

এই গান করতঃ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতেন, তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত চেষ্টা নিরীক্ষণ করিত।

শিকারপুরের পাঠশালাতেই বিজয়কৃষ্ণের বিদ্যারম্ভ হয়। শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালে যদিও অতিশয় চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় তিনি কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। শান্তিপুরে অবস্থানকালে তিনি ৺ভগবান্ সরকার মহাশয়ের পাঠশালাতে বিদ্যাভাস করিতেন।

এই সময়ে একবার শান্তিপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের কতিপয় সহপাঠীও মারা পড়েন। তাঁহাদের মৃত্যুতে শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, এবং তিনি এত অল্পবয়সেই জন্মমৃত্যুর রহস্য লইয়া বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। সহপাঠিগণের মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা করিতেন যে, "আমার সহপাঠিগণ যে স্থানে বসিতেন, যে পুস্তক পাঠ করিতেন, যাহা লইয়া খেলাধুলা করিতেন, তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে, অথচ তাঁহারা নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। তাঁহারা নিশ্চয়ই কোনও স্থানে আছেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি একদিবস পাঠশালায় যাইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তাঁহার পরলোকগত সহপাঠিগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বিজয়! এই দেখ ভাই, আমরা আছি, আমাদের জন্য দুঃখ করিও না।" অকস্মাৎ এইপ্রকার বাণী শুনিয়া, তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, এবং দ্রুতপদে পাঠশালায় গিয়া গুরু ভগবান্ সরকার মহাশয়ের নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয় এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, বিজয়কৃষ্ণ

তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরুমহাশয় তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে তাহাদের কথা শুনাইতে পারিবে ত?" বিজয়কৃষ্ণ সরলপ্রাণে উত্তর করিলেন—"হাঁ, নিশ্চয় পারিব।" এই কথা শুনিয়া ৺সরকার মহাশয় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় পরলোকগত ছাত্রদিগকে না দেখিয়া, অথবা তাহাদের কথা শুনিতে না পাইয়া, বিজয়কৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত ভয় পাইয়া পরলোকগত আত্মাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"দেখ ভাই সব, তোমরা যেমন পূর্ব্বে আমার সহিত কথা বলিয়াছিলে, সেইরূপ আবার বল, নচেৎ আর রক্ষা নাই।" এই কথা বলিবামাত্র পরলোকগত বালকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"গুরুমহাশয়! উহাকে প্রহার করিবেন না, এই দেখুন আমরা আছি।" এই কথা শুনিয়া গুরুমহাশয় স্তম্ভিত, বিহ্বল ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিজয়কৃষ্ণকে কোলে করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।*

৺ভগবান্ সরকার মহাশয় একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ সাধকপুরুষ ছিলেন। তিনি বালক বিজয়কৃষ্ণের অসাধারণ সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অতিশয় স্নেহের সহিত লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। বিজয়কৃষ্ণও তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। পরবর্ত্তীকালে ৺ভগবান্ সরকার মহাশয়ের কথাপ্রসঙ্গে একদিন গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন—"গুরু মহাশয় একদিন পাঠশালায় ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—'ওরে ছেলেরা কা'ল সকালে আসিস্, একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যা'ব। সেখানে আমি দেহত্যাগ করিব।' সেই রাত্রিতে এই সংবাদ লোকের মুখে মুখে শান্তিপুরময় ব্যাপ্ত হওয়ায়, পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে পাঠশালা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধে পূর্ণ হইল। গুরুমহাশয়, সকলকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাঘাটে উপনীত হইলেন, এবং স্নানাদি-ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সকলকে প্রণাম করতঃ গঙ্গাজলে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে জনতায় গঙ্গাঘাট পূর্ণ হইল। জয়ধ্বনিতে যেন গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন—'ছেলে সব, আমি কায়স্থ, তোমরা অনেকে ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি, এখন বাপু সকল, আমার মাথায় পা দেও, আর সময় নাই, ঐ দেখ আমার রথ আসিতেছে।' ইহা বলিয়া তিনি দণ্ডায়মান্ হইলেন এবং নাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দেহ টলিয়া পড়িল না। তখন

* গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত

সমস্ত ব্রাহ্মণ শূদ্র ছাত্র মিলিয়া, যেমন পিতামাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়, তেমনি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।*

উত্তরকালে যাঁহার স্নেহশীতল পদচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ শতসহস্র নরনারী প্রাণ জুড়াইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম শিক্ষা এইরূপ হরিভক্তিপরায়ণ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আরম্ভ হয়।

ভগবান সরকার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঠশালা উঠিয়া যাওয়ায়, বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত 'হেজল' নামক জনৈক পাদ্রি সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা— এই তিনটী বিভাগ ছিল। বিজয়কৃষ্ণ অগ্রজ ব্রজগোপালের সহিত সংস্কৃত বিভাগে ভর্ত্তি হন, এবং কিয়দ্দিনের মধ্যে স্বীয় স্বাভাবিক গুণাবলী দ্বারা পাদ্রি সাহেবের ভালবাসা আকর্ষণ করেন।

অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাল্যজীবনে চঞ্চল ও উদ্ধতের শিরোমণি ছিলেন। ভগবান্ যশোদানন্দনের চঞ্চলতা ও দৌরাত্ম্যে ব্রজমণ্ডল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্য লোকপ্রসিদ্ধ। ইহার কারণ আর কিছু নয়, মহাপুরুষগণের সমস্ত মানসিক বৃত্তি, নিখিল শক্তিই সাধারণ মনুষ্য হইতে অত্যধিক। সেই সকল বৃত্তি অথবা শক্তি, দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যখন যেদিকে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই দিকেই তাহা অসাধারণ রূপে প্রকাশ পায়, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। তাঁহাদিগের বাল্যজীবনের চঞ্চলতা, ঔদ্ধত্য, একগুঁয়েমি ইত্যাদি বৃত্তিগুলি, উত্তরকালে সৎকার্য্যে নির্ভীকতা, সত্য প্রতিপালনে দৃঢ়তা, দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্য নিবারণে লোকোত্তর তেজস্বিতা ইত্যাদি গুণে পরিণত হয়।

বিজয়কৃষ্ণও বাল্যকালে অনেক সময়ে অনেক প্রকার চঞ্চলতা ও কৌতুহলোদ্দীপক চতুরতা প্রকাশ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে গোয়ালিনীরা প্রত্যহ অপরাহ্নে ছানা লইয়া বাজারে ময়রার দোকানে বিক্রয় করিতে যাইত। শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ সহচরগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের যাতায়াতের পথে গর্ত্ত খননপূর্ব্বক উহার উপরিভাগ কচুর পাতা, কলার পাতা ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া তদুপরি ধূলি ছড়াইয়া রাখিতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন ছানার হাঁড়ি মস্তকে লইয়া গোয়ালিনীরা সেই সকল পথ অতিক্রম করিত, তখন দৈবাৎ তাহাদিগের পা উক্ত গর্ত্তে পড়িয়া হাঁড়িসহ পড়িয়া যাইত। কোন কোন দিন একগাছি লম্বা দড়ি পথের উপরে আড়াআড়িভাবে ফেলিয়া দুইজনে উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া পার্শ্বস্থিত কচুবন ইত্যাদির মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং

* গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।

গোয়ালিনীরা নিকটবর্ত্তী হইলেই দড়ি ধরিয়া টান্ দিতেন। উহার ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া হাঁড়ির সহিত তাহারা পড়িয়া যাইত এবং ছানাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। পরে সন্ধ্যার সময়ে সেই ছানা কুড়াইয়া লইয়া সকলে মিলিয়া খাইতেন, সময়ে সময়ে তাহা হইতে কিছু কিছু হনুমান বানর ইত্যাদিকেও বাটিয়া দিতেন। ঐ সকল দুষ্ট ছেলেদিগের নাম ধাম গোয়ালিনীদিগের জানিতে বাকী ছিল না। এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহারা বিজয়কৃষ্ণের মাতার নিকটেই উপস্থিত হইয়া দুঃখের কথা ব্যক্ত করিত, কারণ তাঁহার দয়াপ্রবণতার কথা শান্তিপুরের সকলেই অবগত ছিল। দয়াময়ী মাতাও গোয়ালিনীদিগকে নানারূপ সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক্ উপযুক্ত মূল্য দিয়া বিদায় করিতেন।

শান্তিপুরের মহিলাগণকে গঙ্গাপূজার জন্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি উপকরণ লইয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতে দেখিলে, শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ সহচরগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাস্নানাভিলাষী সুবোধ বালকের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করিতেন, এবং সুযোগ পাইলেই নৈবেদ্য অপহরণপূর্ব্বক্ পলায়ন করিতেন। কখনও কখনও স্নান করিতে করিতে ডুব দিয়া সমবয়স্কা বালিকাদিগের পা ধরিয়া অধিক জলে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। তাহারা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলে পা ছাড়িয়া গভীর জলে সরিয়া পড়িতেন। কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের কলহ অনুকরণ করিয়া শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব ও ক্রোধকালীন তাহাদিগের বিকৃতস্বরের অনুকরণ করিয়া এতই জ্বালাতন করিতেন যে, তাহারা বিজয়কৃষ্ণের সম্মুখে পুনরায় কলহ করিতে সাহস করিত না। কোন কোন দিন গাছের উপরে লুকাইয়া থাকিয়া দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বাঙ্গে থুতু নিক্ষেপ করিতেন, কখনও প্রস্রাব করিয়া দিতেন। কিন্তু নানা কারণে বাল্যাবধি শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণে দেবতার আবেশ আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকায় তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না। এইরূপ তাঁহার বালসুলভ চপলতাও কোনও না কোনও প্রকারের অসত্য বা দুর্নীতি নিবারণের চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইত।

বাল্যকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণ অতীব পরদুঃখকাতর ছিলেন। জীবের দুঃখ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। ছয় সাত বৎসর বয়সের সময়ে তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন যে, শান্তিপুরের অমুক জমিদারবাবু টাকার জন্য একটী গরীব লোককে বাঁশদলন দিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি দ্রুতপদে উক্ত জমিদারবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র উন্মত্তের ন্যায় অত্যাচারী জমিদারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া তারস্বরে বলিতে লাগিলেন—"তুমি ডাকাত! লোকটী যে ক্লেশে মারা গেল, তোমার লাগ্‌ছে না? ভাল চাওত এখনি ইহাকে ছেড়ে দাও।" এই কথা বলিতে বলিতে বিজয়কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। বলা

বাহুল্য জমিদার মহাশয় বালকের এইরূপ ভাব দেখিয়া তখনই লোকটীকে ছাড়িয়া দিলেন। আর একবার তিনি স্বীয় মাতৃদেবীর সঙ্গে শিষ্যমহলে গমন করিয়া জনৈক জমিদার শিষ্যের, গরীব প্রজার প্রতি অত্যাচার দর্শন করতঃ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া একখণ্ড যষ্টিদ্বারা জমিদার মহাশয়কে বেদম প্রহার করিয়াছিলেন।

একবার জনৈক নিষ্ঠুর ব্যক্তির বাঁটুলের আঘাতে একটী ঘুঘুপক্ষী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, বিজয়কৃষ্ণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী-মহাশয়ের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ— "এক দিন রাম, বিজয় ও গ্রহপতি ধর্ম্মাচার্য্য—এই তিনজন আমার সহিত আমাদের নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, পান্তঘাসী নামক একটী লোকের বাঁটুলের দ্বারা আহত হইয়া সম্মুখস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে একটী ঘুঘুপক্ষী ধরাশায়ী হইল। আহত পক্ষীটাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া বিজয় সজল নয়নে আমাকে বলিল, "জয়গোপালদা! কে এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করিল?" তাহার প্রাণ এই নৃশংস দৃশ্য সহিতে না পারিয়া পক্ষীটাকে বুকে লইয়া 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাম ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী 'চোরপুকুর' হইতে জল আনিয়া পক্ষীর মুখে ও গাত্রে প্রদান করিল। মরণোন্মুখ পক্ষী দুই একবার কণ্ঠনালী নড়াইয়া পক্ষীজন্ম শেষ করিল। মৃত পক্ষী হস্তে বিজয়কে কাঁদিতে দেখিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়েরও চক্ষে জল আসিয়াছিল। তিনি সস্নেহে বালককে কোলে টানিয়া লইয়া বহু চেষ্টায় তাহাকে শান্ত করিলেন! এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া পান্তু চিরদিনের মত শিকার ত্যাগ করিয়াছিল।"*

শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বাল্যসহচর শ্রীযুক্ত গোলক কিশোর গোস্বামী-মহাশয় বলিয়াছিলেন—"বিজয়ের মধুর শৈশব প্রকৃতি আমাদের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিতাম। বিজয়ের ধীরতা, বিজয়ের স্নেহালাপ, বিজয়ের মৃদু মধুর বিচিত্র ভাব দেখিয়া কেহই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার স্নেহ-কোমল-হৃদয়ে আর্ত্তজনের জন্য করুণার উৎস সদাই প্রবাহিত হইত। তাঁহার সুকোমল হৃদয়স্থিত সকরুণ স্নেহ, রোগ-শোকক্লিষ্টকে সহানুভূতি দান করিতে, বিপন্নজনকে বিপন্মুক্ত করিতে স্বতঃই উৎসাহিত থাকিত। সেই পুণ্যময়ের পবিত্র প্রভাত জীবনের কথা অদ্যাপি স্মরণপথে উদিত হইলে পাপ-ভারাক্রান্ত, সংসারক্লিষ্ট মলিন জীবন এখনও যেন উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়া উঠে।

* "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

"বৈশাখ মাসে পথিকদিগের জন্য শান্তিপুরের নানাস্থানে পথিমধ্যে জলসত্র দেওয়া হইত। করুণার প্রতিমূর্ত্তি বিজয় মধ্যাহ্নকালে ঐ সকল সত্রে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পথিকদিগকে পিপাসার বারি প্রদান করিত। একসময়ে গঙ্গা-স্নানোপলক্ষে শান্তিপুরে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে একটী বালক বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হওয়ায়, সহযাত্রিগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পীড়িত বালকের মাতা আশ্রয়হীন অবস্থায় পথিপার্শ্বে মৃত্যুকবলগ্রস্ত সন্তানকে লইয়া কাঁদিতেছিলেন। রোগযন্ত্রণায় বালক ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার পিপাসায় জল প্রদান করে, অথবা তাহার দিকে চাহিয়া 'আহা' বলে, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। বিজয় এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাড়াতাড়ি গ্রাম হইতে শিবিকা লইয়া সেই বালককে আমাদের নাট্যমন্দিরে আনয়ন করিলেন। কয়েকদিন যাবৎ অবিরত শুশ্রূষা ও যথারীতি ঔষধাদির ব্যবস্থা হওয়াতে বালক রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। বিদায়-কালে মাতা তাহার হাতখানি বিজয়ের সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া-ছিলেন। বিজয় সেই বালকের শীর্ণ, দুর্ব্বল হাত দুইখানি ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা সকলে হাঁ করিয়া সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। পরের জন্য এইরূপ করিয়া যে কাঁদিতে পারে, সে নিশ্চয়ই দেবতা। শত কার্য্যে আমরা বিজয়ের করুণার পরিচয় পাইয়াছি। বিজয়ের সংস্পর্শে অতি মলিন জীবনও পুণ্যময় হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, স্পর্শমণি লোহাকে সোনা করে। পাপমলিন মনকে যে চিন্তামণি নিষ্পাপ উজ্জ্বল করিয়া তুলে, লৌহকে সোনা করার স্পর্শমণি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। জীবনপথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া এখনও কৈশোরের সেই কথা বিস্মৃত হই নাই। মনে হয় সে কোন স্বর্গচ্যুত দেব বালক। খেলাচ্ছলে দুদিনের জন্য আসিয়া খেলার ঘর বাঁধিয়া-ছিল, খেলা সাঙ্গ হইলে ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দেবতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরিত্যক্ত মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে। বিজয় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ের জীর্ণপিঞ্জরে অঙ্কিত রহিয়াছে।"*

কিছুদিন হইল, শান্তিপুরনিবাসী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—"গোস্বামী-মহাশয় আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। শিশুকালে চঞ্চলতার মধ্যেও তাঁহার অদ্ভুত সত্যপ্রিয়তা ও অসাধারণ তেজস্বিতা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। সাক্ষাৎ অদ্বৈতপ্রভু পুনঃ শান্তিপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আদর মর্য্যাদা করিতে পারিলাম না। তোমরা ধন্য, তাঁহার সঙ্গসুখ ভোগ করিয়াছ।" এই বলিয়া সাশ্রুনয়নে আমাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

একদিবস বিজয়কৃষ্ণ সহচরদিগের সহিত মিলিত হইয়া শান্তিপুর মহকুমার

---

* "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্‌টর ৺ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের অশ্ব ধরিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। অশ্বরক্ষক ইহা জানিতে পারিয়া, সুযোগক্রমে বালকদিগকে ধৃত করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা সকলে পলায়ন করিল; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ পলায়ন করিলেন না। তিনি নির্ভয়চিত্তে অশ্বরক্ষকের সহিত ডেপুটী-বাবুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটীবাবু সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন—"তোমরা আমার অশ্ব লইয়াছিলে?" বিজয়কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"হাঁ লইয়াছিলাম।" ডেপুটীবাবু—"কেন লইয়াছিলে?" বিজয়কৃষ্ণ—"আরোহণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তাই লইয়াছিলাম।" ইহাতে ডেপুটীবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার অশ্ব লইতে তোমাদের ভয় হইল না? জান আমি কে?" বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন—"জানি আপনি এই স্থানের ডেপুটীবাবু, আপনার অশ্ব লইতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও ভয় হয় নাই।" তাঁহার এই প্রকার নির্ভীকতা, সত্যপ্রিয়তা ও সরলতা দর্শন করিয়া সহৃদয় ডেপুটীবাবু অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বালকের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বলিলেন—আচ্ছা! তোমাদের যখন আবার ঘোড়া চড়িবার ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে বলিও, আমি অশ্ব সজ্জিত করিয়া দিব, নচেৎ পড়িয়া যাইতে পার।"

বালক বিজয়কৃষ্ণ যাত্রাগান শুনিতে ভালবাসিতেন। যে কোন স্থানে যাত্রাগান হইবে বলিয়া সংবাদ পাইতেন, সেই স্থানে কখনও একাকী, কখনও বা সহচরদিগের সহিত উপস্থিত হইতেন। সেখানে যাইয়াও দুষ্টামী করিতে ছাড়িতেন না। তামাকখোরেরা হুঁকা লইয়া অনেক সময়ে যাত্রাগানের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত করিত। ইহার একটা প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া, বালক কোনও সুযোগে হুঁকায় একগাছি সূতা বাঁধিয়া রাখিতেন, এবং তামাক খাইবার সময় উপস্থিত হইলে যখন হুঁকা লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিত, তখন দূর হইতে সূতা টান্ দিতেন। ইহাতে কল্কীর আগুন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে যাত্রার আসরের মধ্যে একটা 'হৈ চৈ' পড়িয়া যাইত, আর দুষ্টু বালকেরা 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিত। ফলতঃ শৈশবকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণের অসীম সাহস ও অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকায় তিনি বালক দলের নেতা হইয়াছিলেন।

বাল্যকালে একটী পরলোকগত আত্মা, গোস্বামী-প্রভুকে বিপদে আপদে রক্ষা করিতেন। রাত্রিতে যাত্রাগান শুনিতে গিয়া দৈবাৎ সহচর বালকদিগের সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িলে, অথবা বিপক্ষীয় দলের বালকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আত্মা মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক্ অন্ধকার রাত্রিতে লণ্ঠন ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে পেঁছাইয়া দিতেন এবং দুর্দ্দান্ত বালকদিগের কবল হইতে রক্ষা করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন:—"একদিন রাত্রিতে বাড়ী হইতে অনেক দূরে একস্থানে বারোয়ারী গান শুনিতে গিয়া

ঘুমাইয়া পড়ি। জাগিয়া দেখি, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, লোকজন সব যে যার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, আমি একাকীই ফরাসের উপরে পড়িয়া রহিয়াছি। তখন ভাবিতে লাগিলাম, এখন কেমন করিয়া বাড়ী যাই। এমন সময়ে একজন লোক খড়ম পায়ে দিয়ে চট্‌পট্‌ শব্দ করিতে করিতে লণ্ঠন হস্তে করিয়া আমার নিকটে আগমনপূর্ব্বক্‌ বলিল—'চল্‌ এখন বাড়ী চল্‌।' নিকটে আসিলে দেখিলাম, ইঁনি আমার পূর্ব্বপরিচিত পথপ্রদর্শক! ঐ দিনের ন্যায় পূর্ব্বেও ইঁনি দুই তিন বার আমাকে রাত্রিতে পথ দেখাইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। আমি তখন মনে করিতাম, মা বুঝি আমাকে বাড়ী নিবার জন্য ইঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। একদিন মায়ের মনে সন্দেহ হওয়াতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কার সঙ্গে রাত্রিতে গান শুনিয়া বাড়ী আসিস্‌?' আমি বলিলাম—'সে কি? তুমি যাহাকে পাঠাও, সেই ত আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে।' এই কথা শুনিয়া মা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন, এবং আমাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—'খবরদার, আর কখনও রাত্রিতে যাত্রাগান শুনিতে যাইতে পারিবি না। শান্তিপুরে অনেক ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। কোন দিন তোকে ঘাড় মট্‌কাইয়া মারিয়া ফেলিবে।' তারপর বলিলেন—'এই সকল প্রেতাত্মার গয়ায় পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয়।' লণ্ঠনধারী পুরুষটীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে?' সে উত্তর করিল—'তা দিয়া তোর কাজ কি? তুই এখন বাড়ী চল্‌।' আমি বলিলাম—'মা আমাকে বলিয়াছেন—'এ সকল স্থানে অনেক ব্রহ্মদৈত্য বাস করিয়া থাকে, তাহারা লোকের উপর অনেক সময়ে অনেক অত্যাচার করে, তবে ইহাদের নামে গয়ায় পিন্ড দিলে ইহারা উদ্ধার হইয়া যায়।' এই কথা শুনিয়া সে উত্তর করিল- 'হাঁ, গয়ায় পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয়।' এই কথা বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু আমার কোন ভয় উপস্থিত হইল না, তাঁহার সঙ্গেই বাড়ী চলিলাম। পথিমধ্যে একস্থানে সে আমাকে বলিল—'দেখ বাঁধা রাস্তা দিয়া গেলে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু (একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ী লক্ষ্য করিয়া) এই পুরাতন ভিটার উপর দিয়া গেলে, অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী যাওয়া যাইবে। তবে এ স্থানের বৃক্ষাদিতে অনেক বানর বাস করে, তাহারা হয়ত যাইবার সময়ে গাছের ডাল নাড়িতে পারে। তুমি তাহাতে ভয় পাইও না।' এমন সময়ে গাছের উপর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—'তুমি উহাকে কি মিথ্যা বুঝাইতেছ? আমি যদি প্রকৃত কথা বলিয়া দি?' তখন আমার পথ-প্রদর্শক আত্মা তাহাকে খুব ধম্‌কাইয়া উত্তর করিল—'বটে! এখনও তোদের শিক্ষা হইল না? যাহার জন্য এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিস্‌, সেই দুষ্টপ্রকৃতি এখনও ত্যাগ করিতে পারিতেছিস্‌ না?' ইত্যবসরে আর একটি আত্মা বৃক্ষের উপর হইতে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—'পরলোক দেখ!' এই সকল দেখিয়া শুনিয়া

আমি ত অবাক্! পথপ্রদর্শক আর বাক্যব্যয় না করিয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। মা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরের বাহিরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরলোকগত আত্মা আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী এক তাল গাছের উপর উঠিয়া গেল। মা তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিলেন।' পরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—'ইনি আমাদের কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের পূজারী ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল পুরন্দর পূজারী, সেবার জিনিষ অপহরণ করার অপরাধে এই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই পরলোকগত পুরন্দর পূজারীর কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে,—'ইনি আর একদিনও আমাকে বিপক্ষদলের বালকদিগের হস্ত হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের পাড়ার একটী দল ছিল। অপর পাড়ার দলের সঙ্গে অনেক সময়ে নানা বিষয় লইয়া ঝগড়া মারামারি হইত। একদিন অজ্ঞাতসারে বিরুদ্ধদলের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। তাহারা আমাকে একাকী পাইয়া প্রহার করিবার জন্য লাঠিহস্তে উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম, আজ আর রক্ষা নাই। এমন সময়ে হঠাৎ পুরন্দর পূজারী উপস্থিত হইয়া, আমার চতুর্দ্দিকে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহাতে রাশি রাশি ধূলি উত্থিত হইয়া বিরোধীদলের লোকদিগের চোখে-মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না। আমি ইত্যবসরে দৌড়িয়া নিজের দলের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।' পরবর্ত্তীকালে আমি যখন গয়ায় গিয়াছিলাম, তখন ইঁহার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিয়াছিলাম।"*

গোস্বামী-প্রভু বাল্যকালে অনেকবার এই প্রকার অতি অদ্ভুত উপায়ে প্রাণসঙ্কট বিপদ হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন। একবার একটা চোর অলঙ্কারের লোভে তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যায়। তারপর কি জানি, কি ভাবিয়া, অথবা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া, বালককে তদবস্থায়ই বাটীর নিকট রাখিয়া প্রস্থান করে!

আর একবার জননী স্বর্ণময়ী, বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। বিবাহের গোলমালের মধ্যে কয়েকজন দস্যু নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে চুরি করিয়া কোন নির্জ্জন অরণ্যস্থিত একটী কালীবাড়ীতে লইয়া গিয়া, দেবীর নিকট বলি দিবার উপক্রম করিয়া-ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে এক পাগল তথায় আগমনপূর্ব্বক্ দস্যুদিগের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া, তাহাদিগকে ভয় খেদাইয়া তাড়াইয়া দেয়; এবং অবশেষে বিজয়কৃষ্ণকে সে-ই ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আত্মীয়গণের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে।

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

অপর এক সময়ে স্বর্ণময়ীদেবী শ্রীমান্ ব্রজগোপাল ও বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া পিত্রালয় হইতে নৌকাপথে শান্তিপুর যাত্রা করেন। নদী ঘুরিয়া যাইতে হইলে শান্তিপুর পৌঁছিতে দুই তিন দিবস সময়ের আবশ্যক, এতদ্ভিন্ন একটী সোজা পথও ছিল। কিন্তু, সে পথে জল অতি অল্প থাকা প্রযুক্ত নৌকা চলিবে কি না, সে বিষয়ে মাল্লাগণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কিন্তু অবশেষে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেই পথেই নৌকা চালাইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইলে, নৌকা বালু-চড়ায় আট্‌কাইয়া গেল, তখন অগ্রসর হওয়া অথবা পিছনে হটিয়া যাওয়া দুইই অসম্ভব হইয়া পড়িল। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত। সে সকল অঞ্চলে তখন চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। জননী স্বর্ণময়ী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। নৌকা আপনাআপনিই চড়ার উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। উপস্থিত সকলে ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, নৌকা শান্তিপুরের ঘাটে রহিয়াছে। তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে জননী স্বর্ণময়ী, বালক দুইটীকে সঙ্গে লইয়া স্বামীগৃহে উপস্থিত হইলেন।* ভাবী জীবনে যাঁহার দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত, লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনর্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে, বাল্যকাল হইতেই এইরূপে তাঁহাকে ভগবান্ পুনঃ পুনঃ ভয়ানক ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

* গোস্বামী-প্রভুর বাল্যজীবনের উক্ত তিনটী ঘটনা শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত ঘটনাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

টোলে অধ্যয়ন, উপবীত সংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

পাঠশালার শিক্ষা সমাপনান্তে বিজয়কৃষ্ণ, শান্তিপুরনিবাসী পরমভাগবত ৺গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় এক বৎসরের মধ্যে সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। বালকের এইরূপ মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া, শান্তিপুর ও নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস ষড়দর্শনবেত্তা পণ্ডিতপ্রবর ৺কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন মহাশয় গায়ত্রী মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক্ বিজয়কৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার করেন। উপনয়নের পরে কুলপ্রথা অনুসারে তিনি তাঁহার জননীর নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে, দীক্ষার প্রণালী ও অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষা করিবার জন্য অপর একজন সদাচারী পণ্ডিত ব্যক্তিকে "উপগুরু" রূপে বরণ করিবার প্রথা এই পরিবারে বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকায়, শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ, আচার্য্য কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকেই "উপগুরু" স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহারই চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই তাঁহার জীবনের গতি অদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ এখন বাল্য চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এ সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণগোপাল বলিয়াছেন—"দীক্ষা গ্রহণের পর বিজয় 'হরিবোলা' হইয়া উঠিল। প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরের পূজা করিত। পৃথিবীতে পরপীড়ন, ব্যথা, হাহাকার দেখিয়া তাহার হৃদয় মমতায় ভরিয়া যাইত। বিজয় জাতিস্মরের ন্যায় স্বতই জীবে দয়া ও ভগবানে ভক্তি—এই দুইটী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এরূপ পুণ্যের সংসারে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রের মধ্যে, পারিপার্শ্বিক শুভ সংযোগে, সর্ব্বোপরি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এত অধিক উচ্চ সংস্কার লইয়া যাহার জন্ম, সে যে ভবিষ্যতে এই দাবদগ্ধ সংসারকে স্বর্গের সুষমায় পরিণত করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"*

যে নীতি, ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ, যাহার উপর ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই সময়ে দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সমস্ত টোল নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, এখন তাহারই অন্তর্ভুক্ত ছাত্রগণের দুর্নীতিমূলক অত্যাচারে প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে

* "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

হইত। শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যে ব্যভিচার ও মদ্যাদি পান করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। দেশের নীতি-ধর্ম্মের এইরূপ ভয়ানক দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ প্রাণে প্রাণে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশের ছোট বড় বহু লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন ; এবং বাল্য-সহচরদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীতিপরায়ণ তেজস্বী কতকগুলি বালক হইয়া একটী দল গঠন করিলেন। নীতিভ্রষ্ট লোকদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সমিতির সভ্যগণ প্রথমে দুষ্ট লোকদিগকে তাহাদিগের অন্যায় কার্য্যের দোষ দেখাইয়া দিতেন ; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে তাহাদিগের উপর অন্য প্রকার শাসন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সমিতির সভ্যদিগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—"দরিদ্রের নিরন্ন কুটীরে, রোগীর রোগশয্যা-পার্শ্বে করুণাপূর্ণ হৃদয় লইয়া, তাহাদের অন্ন ও পথ্যদানে তাহারা (সমিতির লোকেরা) সকলেই আত্মোৎসর্গই করিয়াছিল। দেশে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ সময়ে যখন গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার ও রোগীর আর্ত্তনাদ উঠিত, নিরাশ্রয় নীরব কুটিরদ্বার হইতে যখন আত্মীয়স্বজনগণ জীবনাশঙ্কায় নানা অজুহাত ও প্রতিবন্ধকতা দেখাইয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইতেন, তখন বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। সকলের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও দেবশিশুর ন্যায় সেখানে সদলবলে আবির্ভূত হইয়া, পীড়িতের সেবা ও মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

"জ্যৈষ্ঠের এক নিশীথ রাত্রিতে ছারপোকা ও মশকের উপদ্রবে শয্যায় শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে কাতরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছি, এমন সময়ে 'আগুণ, আগুণ' এই ভীষণ কোলাহলে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম তাঁতিপাড়ায় একখানি চালায় আগুন লাগিয়াছে ও বিজয় তাহার দলবল লইয়া সেই প্রবল দাবানল নির্ব্বাপিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। সে দিন বিজয় যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই নাই। তাহারই চেষ্টাতে সেই রাত্রে অনেক দরিদ্র তন্তুবায়ের কুটির বৈশ্বানর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

"আর একবার বর্ষার সময়ে 'বাওরের' (জলাশয়ের) বাঁধ কাটিয়া দিয়াছিল, আমার মাতা আর্দ্রবস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—"বাবা! বোনো! বিজয় যে আজ কি করে একটি ছেলেকে খড়-ভাঙ্গা স্রোতের মুখ হইতে বাঁচাইয়াছে তুই দেখিয়া নয়ন সার্থক ক'রে আয়! ছেলেটি এখনও পুলের উপরে আছে।" ছুটীয়া গিয়া দেখিলাম যে স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়া

আছে। বালকটি তখন সকলের যত্নে ও চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতেছে, আর নিমজ্জিত বালকের উন্মাদিনী মাতা তাহার পরিজনবর্গসহ বিজয়ের নিষেধ সত্ত্বেও তাহার অবশ ও শিথিল হস্ত-পদাদি টিপিয়া দিতেছে।"*

শান্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে তখন স্ত্রী-পুরুষে এক ঘাটেই স্নানাদি করিতেন। মহিলাগণ শান্তিপুরের সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্নান করিয়া উঠিবার সময়ে দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিত। বিজয়কৃষ্ণ প্রকাশ্যভাবে এইরূপ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এবং এই দুর্নীতি নিবারণ করিবার জন্য তিনি শান্তিপুরের বিশিষ্ট লোকদিগের সাহায্যে মহিলাগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থূল বস্ত্র প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন কোন মহিলার তাহা আদৌ পছন্দ হইল না। তাহারা বিজয়কৃষ্ণকেই ঐ কার্য্যের প্রবর্ত্তক জানিয়া, তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য গোপনে গোপনে পরামর্শ করিল যে, বিজয়কৃষ্ণ যখন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে যাইবে, তখন তাহাকে 'বেদম' প্রহার করিতে হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদের এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। তাহারা একদিন অন্ধকারের মধ্যে ভুলক্রমে বিজয়কৃষ্ণ ভাবিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজগোপালকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কারণ দুই ভ্রাতা আকারে প্রকারে প্রায় একই রকম ছিলেন। পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহারা লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদিগের দুরভিসন্ধির কথাও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে শান্তিপুরের বিশিষ্ট-লোকদিগের অভিপ্রায়ানুসারে পুরুষ ও রমণীদিগের স্নান করিবার জন্য দুইটী স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্দিষ্ট হইল। নীতিপরায়ণ তেজস্বী বালকের সদিচ্ছাই পূর্ণ হইল।

শান্তিপুরে রাসোৎসবের সময়ে দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই সময়ে নীতিভ্রষ্ট দুষ্ট লোকেরা সুযোগক্রমে অসহায়া রমণী-দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সকল দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে অবলা রমণীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সমিতির সভ্যগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া যাত্রীদিগের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে অত্যাচারীদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সত্যপ্রতিজ্ঞ নীতিস্মান পরদুঃখকাতর তেজস্বী বালকদিগের ভয়ে অতঃপর আর কেহই যাত্রীদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিতে সাহসী হইত না।

একদিন বিজয়কৃষ্ণ একটী দুর্নীতিপরায়ণ বালককে কোনও প্রকারে ভুলাইয়া গঙ্গগর্ভে বিচরণ করিবার জন্য তাহার সহিত একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত বালকটীকে

---

* "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বলিলেন—"তুমি যদি তোমার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য এখনই প্রতিজ্ঞা না কর, তবে তোমাকে হাত-পা বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিব।" বালক ভয়ে 'জড়সড়' হইয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর, শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় নিলেন। বলা বাহুল্য, বালকটী তদবধি সংশোধিত হইয়া গিয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণের জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহধর্ম্মিণী, তাঁহার স্বামীর উপপত্নীর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে বিজয়কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি একদিন সুযোগ বুঝিয়া সদলবলে 'মার্ মার্' রবে আত্মীয়ের ঘরে প্রবিষ্ট হইলে, ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটী ভয়ে প্রস্থান করিল। বয়ঃজ্যেষ্ঠ আত্মীয়টী বিজয়কৃষ্ণকে এই কার্য্যের জন্য তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিলেন বটে, কিন্তু সত্যের বলে বলীয়ান্ নির্ভীক বালক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পরে তাঁহার ভয়ে পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়টী পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকটিকে স্বগৃহে প্রবেশ করাইতে সাহস করেন নাই।

একদিন বিজয়কৃষ্ণের একটি প্রিয় সহচর তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মুখে মদ্য মাখিয়া নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি সহচরের মুখে চপেটাঘাত করিলে, এবং আর তাঁহার মুখ দর্শন করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সহচরটি, এই লঘু পাপে এত গুরুদণ্ড হইবে, একথা আদৌ মনে করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সহিত কথা না বলাতে তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন যে, একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে উক্ত সহচরটি সন্ন্যাসীর বেশে গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য শান্তিপুরে উপস্থিত হন। গোস্বামী-প্রভু তখন অশ্রু-জলে অভিষিক্ত হইয়া বাল্য-বন্ধুকে দুই বাহু প্রসারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, এবং নিজকৃত কঠোর শাসনের কথা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উত্তরে বন্ধুপ্রবর বলিলেন—"বিজয়, তুমিই আমার ধর্ম্মজীবনের মূল। তোমার শাসনেই আমার চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল এবং আমি মানব-জীবনের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম—ইত্যাদি।"

এই প্রকারে বিজয়কৃষ্ণ নিজে নীতিপরায়ণ হইয়া, অপরকে নীতি-বিষয়ক উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক নিষ্ঠা সহকারে কুল-প্রথানুসারে স্বধর্ম্ম যাজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, ইষ্টমন্ত্রজপ ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যসকল তিনি এমন পরিপাটিরূপে অনুষ্ঠান করিতেন যে, বৃদ্ধেরাও তাহা দেখিয়া বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেন, এবং এই অদ্ভুত বালকের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন। কণ্ঠে তুলসীর মালা, মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, ললাটে মনোহর তিলক, গলদেশে লম্বমান শুভ্র যজ্ঞোপবীত, নধরকান্তিবিশিষ্ট এই নবকিশোর বালকটিকে দেখিয়া শান্তি-

পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা মোহিত হইতেন। তাঁহার বালসুলভ চপলতার সঙ্গে এমন এক অপূর্ব্ব কমনীয় ভাব বিদ্যমান ছিল, তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতার সঙ্গে এমন এক সুস্নিগ্ধ সরলতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য্য বিজড়িত ছিল, তাঁহার কঠোর শাসনের মধ্যে এমন এক কল্যাণময় সহৃদয়তা মিশ্রিত ছিল যে, তাঁহার একান্ত বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহাকে সমাদর না করিয়া থাকিতে পারিত না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ অধিকতর আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে, আচার্য্য কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত ও দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। অসাধারণ মেধা ও তীব্র অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রযুক্ত তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই ঐ সকল শাস্ত্রের গূঢ়াভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। বেদান্ত প্রতিপাদ্য শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। উত্তরকালে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজাইয়া তিনি দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিত ও সর্ব্বত্র নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার সূচনা এইরূপেই আরম্ভ হয়। এতৎ সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণগোপাল বলিয়াছেন—"বিজয়ের অদ্ভুত মেধা আমি দেখিয়াছি, সে আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিল। প্রথমে কয়েকদিন সাংখ্যদর্শন দেখিয়া পরে বেদান্ত শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বেদান্ত পরিভাষা ও বেদান্তদর্শন পড়াইয়াছিলাম। অল্প আয়াসেই বালক শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিতে লাগিল—ব্রহ্মজ্ঞান তাহার ভিতর দেখিতে লাগিলাম। মুখ মানব হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। হৃদয়ের ভাব মুখেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব ভাব সকল খেলা করিত। এইরূপে 'হরিবোলা' বিজয় ব্রহ্মরসাস্বাদনে আত্মনিয়োগ করিল।"*

* "বালক বিজয়কৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ, ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন, মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, উপবীত ত্যাগ, শান্তিপুর সমাজ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জন, বাগআঁচড়ায় অবস্থান

টোলের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ১২৬৬ সনে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার বাল্য-সহচর শান্তিপুরনিবাসী ৺অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় আগমনকরতঃ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে তিনি কিয়ৎকাল স্বীয় ভগ্নীপতি শ্রদ্ধেয় কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের মাতুলালয়ে সাঁতরাগাছি অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন তিন চারি মাইল পদব্রজে অতিক্রমপূর্ব্বক নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া কলেজে আসিতে হইত। এই কারণে তাঁহাকে ঝড়বৃষ্টির জন্য পথে কতদিন কতপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার বাল্যবন্ধু অঘোরনাথ অতিশয় সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে সম্মান করিয়া 'সাধু অঘোরনাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। উভয়ের চরিত্রে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকা হেতু বাল্যকাল হইতেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই ভালবাসা গভীর প্রণয়ে পরিণত হয়; এবং পরবর্ত্তীকালে উভয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া, জ্বলন্ত উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ভারতের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মনামের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের করাল আবর্ত্তনে অসময়ে অঘোরনাথ, তাঁহার বাল্যসখা, অকপট বন্ধু ও জীবনের ধ্রুবতারা প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হন। সাধু অঘোরনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পর, গোস্বামী-প্রভু তাঁহার কথা বলিতে বলিতে অনেক সময়ে অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিতেন না।

সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়নকালে গোস্বামী-প্রভুর উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদীয় মাতুলালয় শীকারপুর গ্রামবাসী পূজ্যপাদ ৺রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সহিত গোস্বামী-প্রভু বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ ও তদীয় পত্নীর বয়স মাত্র ছয় বৎসর ছিল।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা ও আপাতমনোহর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এই সময়ে দেশে

এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ সকলের প্রভাবে ছাত্রবৃন্দ দিন দিন উদ্ধতপ্রকৃতি ও অতিশয় উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছিলেন। যথেচ্ছ পান ভোজন তাঁহাদের নিকটে সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। এই সুযোগে সুচতুর খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক্ শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে খৃষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্রুতিমধুর উপদেশ ও অসংখ্য প্রলোভনপূর্ণ বাক্য-বিন্যাসে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে যুবকগণ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে রামময় ও কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য নামক গোস্বামী-প্রভুর দুইজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধুও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। উঁহাদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে গোস্বামী-প্রভুর কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল, এবং তদানীন্তন প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার অনাস্থা উপস্থিত হইল ; কারণ তিনি দেখিলেন যে ঐ সকলের দ্বারা আর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে না। ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও হিন্দুধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানাদির প্রতি তাঁহার অনাস্থা উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি, "আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্ম এই সত্য বিশ্বাস করিতাম, উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না।" এই সময়ে একদিবস রংপুর জেলার অন্তর্গত আমলাগাছি নামক গ্রামে গোস্বামী-প্রভুর জনৈক পৈত্রিক শিষ্য—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ইত্যাদি

মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার পদপূজা করিতেছিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাহাতে সহসা চমকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমাতে এ সকল ক্ষমতা নাই, আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই, দূর হউক, এরূপ কপটাচরণ আর করিব না।" মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অতঃপর তিনি শিষ্যবাড়ী গমন পরিত্যাগ করিলেন ; এবং স্বাধীনভাবে স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কলিকাতা মেডিকেল-কলেজে অধ্যয়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এক দিন দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন— "পরলোক চিন্তা কর।" কে বলিল, লোক দেখিতে না পাইয়া ভয়ে তাহার জ্বর হইয়াছিল।* এই দুইটি আকস্মিক ঘটনাই অবশেষে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গতি পরিবর্ত্তন করাইয়া দিল।

এই সময়ে কোন কার্য্যোপলক্ষে গোস্বামী-প্রভু বগুড়া জেলায় গমন করেন।

---

* গোস্বামী-প্রভু প্রণীত "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তথায় শিববাটিনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল রায়, হারাধন বর্ম্মন্ ও গোবিন্দ-চন্দ্র দাস নামক তিনজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মের সহবাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লোকমুখে নানা কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদিগকে যথেচ্ছাচারী, সুরাপায়ী বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু বগুড়াবাসী এই তিনজন ব্রাহ্মের সংস্পর্শে তাঁহার সে সন্দেহ নিরাকৃত হইল। উক্ত তিনজন ব্রাহ্ম, গোস্বামী-প্রভুকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

বগুড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া, গোস্বামী-প্রভু একজন বন্ধুর দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইলেন। বন্ধুটি তাঁহার সমস্ত অর্থ চুরি করিয়া, জুয়া খেলিয়া পলায়ন করে। হাতে একটী পয়সাও নাই, অথচ কলিকাতায় থাকিয়া সংস্কৃত-কলেজে পড়িতেও প্রবল ইচ্ছা। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু, ইতঃপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসাস্থ কতিপয় ভদ্রসন্তানের অসদাচরণে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আর কাহাকেও বাসায় স্থান দিবেন না। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, বিপন্ন গোস্বামী-প্রভু ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আবেদন করিলেন। তিনি তাঁহার আবেদনপত্র প্রাপ্তি মাত্রই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু, ঠাকুর মহাশয়ের এই কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, কারণ তিনি বগুড়াস্থ ব্রাহ্মত্রয়ের নিকটে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। মনে করিলেন, অনেক লোকে ইঁহাদিগকে নানারূপে প্রতারণা করে, এজন্য তাঁহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহার দোষ কি? দিবসে উপবাস, রাত্রে গোলদিঘীর পাড়ে সংস্কৃত-কলেজের বারাণ্ডায় শয়ন, এই অবস্থায় দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা-শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া জনৈক পরিচিত ব্যক্তি জলযোগ করিবার জন্য তাঁহাকে চারি আনার পয়সা প্রদান করিলেন। কলিকাতায় যদিও গোস্বামী-প্রভুর অনেক বন্ধুবান্ধব ছিলেন, কিন্তু বিপদকালে তাঁহাদের নিকটে গেলে কোনরূপ অবজ্ঞায় পাছে বন্ধুতা নষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের বাটীতে গেলেন না। যাঁহার জন্য তিনি এত কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সেই বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও অনাহারে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাঁহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া গোস্বামী-প্রভুর কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে কোনরূপ ভর্ৎসনা না করিয়া, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি যে চারি আনার পয়সা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা খাবার কিনিয়া দুইজনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন; এবং অবশেষে একত্রে একটী ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটী ভয়ানক মাতাল ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে গোস্বামী-প্রভুকে মদ খাওয়াইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু

গোস্বামী-প্রভু তাঁহার সমক্ষেই সুরাপানের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলে, তিনি গোপনে মদ খাইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন— "সুরাপান-নিবারণ-বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের শাসন অতি চমৎকার।* ইংরাজি ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজদিগের সহবাস, খৃষ্টানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বিলাতি সভ্যতার বাহ্যিক আকর্ষণ, এই সকল কারণে সুরাপান এদেশে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির একটিরও সাহায্য না পাওয়াতে, ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া, সুরাপায়ীদিগকে বিলক্ষণরূপে গালিবর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান লোকের ন্যায়, আমিও সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।" †

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর বগুড়াস্থ বন্ধুত্রয়ের ব্রাহ্মসমাজে যাইবার অনুরোধের কথা তাঁহার মনে হইল। সেই দিন বুধবার ছিল, সায়ংকাল উপস্থিত হইলেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। সমাজে গিয়া সে স্থানের আলোকমালা, সুমধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র-পাঠ, বহুসংখ্যক লোকের গম্ভীর ভাব ইত্যাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গধাম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্বের ভ্রান্ত-সংস্কার দূর হইল। সেই দিন আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পাপীর দুর্দ্দশা ও ঈশ্বরের করুণা' সম্বন্ধে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভুর পূর্ব্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল। এতদিন যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল; অশ্রু, কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাব তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি নিজকে নিতান্ত নিরাশ্রয় অনুভব করিয়া, মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময় ঈশ্বর, ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পূর্ব্বে ইষ্ট-দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম, এখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আমি আর কোথায়ও যাইব না। তোমার দ্বারেই পড়িয়া রহিলাম।"** এই প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিলেন এবং প্রাণে অধিকতর বল অনুভব করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, মনে মনে তাঁহাকে ধর্ম্মজীবনের গুরু

* "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" ইহাই মদ্যপাননিষেধক শ্রুতিবাক্য।

† গোস্বামী-প্রভু প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

** "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বলিয়া ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক্ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে অনন্তলীলাময়ের একটী অপূর্ব্ব লীলারস প্রকটন করিবার জন্য, ভারতের লুপ্ত প্রায় ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃসংস্থান করিবার অভিপ্রায়ে, কলিকলুষনাশন তারকব্রহ্মনাম জীবের ঘরে ঘরে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, নিষ্ঠাবান, নীতিপরায়ণ, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, পরদুঃখকাতর, সত্যের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনক্ষম, শান্তিপুরের অকলঙ্ক চন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ, শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন।

তৎকালীক ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহার সাধন-প্রণালী নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বিরাজমান্ রহিয়াছেন। তিনি অনন্ত মঙ্গল ও করুণার আধার। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, নিরাকার ও অনন্ত। তাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। তিনি অন্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপী। মনুষ্য আপন আপন দুঃখ দৈন্য ও অন্তরের মলিনতা সরল মনে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলে তিনি তাহা জানিতে পারেন ও যথার্থ কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। কোন বিষয় তাঁহাকে জানাইতে ও তাঁহার শুভ ইচ্ছা অবগত হইতে প্রার্থনাই একমাত্র উপায়; তজ্জন্য তন্ত্র-মন্ত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই।

দিবসের প্রতি কার্য্যে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য, সরল ও ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার আদেশ পাইবার জন্য নিবিষ্ট-চিত্তে অপেক্ষা করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তাঁহার সুস্পষ্ট অভিপ্রায় না জানা যায় সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া স্থির-চিত্তে লক্ষ্য করিতে হইবে তিনি অন্তরে কি প্রেরণা দিতেছেন। যাহা সুনিশ্চিত ও সিদ্ধিপ্রদ হইয়া আগত হয়, তাহাই তাঁহার আদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ যখন যে সত্য অবগত হওয়া যায় তৎপ্রতিপালনই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জীবন।

প্রতি কার্য্য তাঁহার সাক্ষাতে করিতেছি এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। সরল প্রার্থনাই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার সহজ উপায়। পরমেশ্বর ও সাধক এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী গুরুর কোন প্রয়োজন নাই। দিনযামিনী পরমেশ্বরের সহবাস ও তৎপ্রিয়কার্য্য সাধনরূপ সেবাই ব্রাহ্ম জীবনের লক্ষ্য। তাঁহাদের সার্ব্বজনীন প্রার্থনার বিষয় ছিল—হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে, অসত্য হইতে সত্যে, এবং মৃত্যু হইতে অমৃতত্ত্বে লইয়া যাও। হে সত্য স্বরূপ! তোমার সত্যং-শিবং-সুন্দরং রূপ আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর।

তৎকালীন ব্রাহ্মদের সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মোৎসাহ ও ব্যাকুলতা, আবেগময়ী প্রার্থনা ও আত্মনিবিষ্টতার গভীরতা, অকপট প্রীতি ও ধর্ম্মের বুভুক্ষাপূর্ণ জীবন এবং অশ্রুসিক্ত আনন্দপূর্ণ বদন যাঁহারা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্যের ছবি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাদের

সংস্পর্শে আসিয়া, কত অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাস, কত পাষাণহৃদয় অনুতাপে বিগলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সময় হইতে গোস্বামী-প্রভু, প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা করিয়া অপার শান্তিসুখ অনুভব করিতেন; এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে অভিলাষী হইতেন, নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট হইতে তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইতে লাগিলেন। যে দিন যে সত্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন; এবং সেই লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া 'ধর্ম্মশিক্ষা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু কলিকাতা হইতে শান্তিপুর গমন করিলেন। তথায় একদিন মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন যে, ভগবান্ সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই সকলের মাতা-পিতা, সুতরাং প্রত্যেক নরনারীকে ভাইভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যখন সকলের প্রাণেই বাস করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, এজন্য মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিলে নিশ্চয়ই মহাপাপ হয়। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি প্রকারে? এই প্রকার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একাদশবর্ষীয় একটী বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"যদি তুমি জাতিভেদ না মান তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন?" বালকের কথা ঠিক বোধ হওয়াতে, গোস্বামী-প্রভু তৎক্ষণাৎ উপবীত ত্যাগ করিলেন। জননী স্বর্ণময়ী এই ব্যাপার অবগত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে, মাতৃহত্যাভয়ে গোস্বামী-প্রভু পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে একদিন শ্রবণ করিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়, দীক্ষিত না হইলে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায় না। এই কথায় বিশ্বাস হওয়াতে তিনি উক্ত সমাজের প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিতে না পারিয়া, গোস্বামী-প্রভু অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে গোস্বামী-প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"উপবীত রাখা উচিত কি না, মৎস্য-মাংস আহার করা উচিত কি না?" তদুত্তরে তিনি বলিলে—"উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ, আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য-মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না; মশা ছারপোকা যখন মার, তখন অন্য জীব হত্যায় দোষ কি?" এই দুইটী উত্তর শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অন্যান্য গুণ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধও হইলেন না।*

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

গোস্বামী-প্রভুর মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে একবার কলেজের অধ্যক্ষের সহিত বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া অযথা একটী ছাত্রকে ঔষধ চুরির অপবাদ দিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশে গর্হিত গালিগালাজ করিতেও ত্রুটী করেন না। গোলযোগের ইহাই হেতু; কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে এই কার্য্য অতীব অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন এবং বাঙ্গালা বিভাগের অপরাপর ছাত্রদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া একযোগে কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী হন। তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ছাত্রগণের পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ তদানীন্তন ছোটলাট মহামতি বিডন্ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহায়তায় সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া দেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় লাট সাহেবের আদেশে ছাত্রগণের নিকট তাঁহার কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে তাহাদিগকে কলেজে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা উপলক্ষে গোস্বামী-প্রভু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি, গোস্বামী-প্রভুর অমানুষিক তেজস্বিতা, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা, তীব্র ধর্ম্মানুরাগ ইত্যাদি গুণে মুগ্ধ হন; এবং একদিবস তাঁহার মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তখন প্রসঙ্গক্রমে গোস্বামী-প্রভু বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত 'বোধোদয়' নামক গ্রন্থে প্রকৃত বোধ উদয়ের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ভগবদ্বিষয়ক কোন কথা না থাকাতে, অতীব দুঃখ প্রকাশ করেন। উদার চরিত্র গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সুক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, পরবর্ত্তী সংস্করণে ভগবদ্বিষয়ক কথা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, এবং তাহার পরের সংস্করণেই উক্ত গ্রন্থে ঈশ্বরবিষয়ক একটি নূতন পাঠ সংযুক্ত করেন।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী মেডিকেল কলেজের কতিপয় ছাত্র একত্র হইয়া 'হিতসঞ্চারিণী' নামে একটী সভা সংগঠনপূর্ব্বক তাহাতে নীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। গোস্বামী-প্রভু এই সভাতেও রীতিমত যোগ দিতেন। একদিন এই সভায় আলোচিত হইল যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তাহা প্রতিপালন না করা মহাপাপ ও কপটতা। এই আলোচনার পরই বাটীতে পত্র লিখিয়া গোস্বামী-প্রভু পুনরায় উপবীত ত্যাগ করিলেন। ইহা লইয়া চতুর্দ্দিকে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে এই কার্য্যে উৎসাহ দান, এবং উপবীত ত্যাগের বিরোধী বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী-প্রভু বাল্যকাল হইতেই অতীব পরদুঃখকাতর ছিলেন। মানুষের কথা দূরে থাকুক, সামান্য জীবজন্তুর ক্লেশ দেখিলেও তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। এবং তাহা অপনোদন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই বৃত্তি অধিকতর প্রস্ফুটিত ও অনন্তদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসা অবধি ধর্ম্মের অবনতি, নরনারীর পাপতাপ, সমাজের ভ্রম কুসংস্কার ইত্যাদি তাঁহাকে অত্যধিক ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। কেমন করিয়া, কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল যে প্রকাশ্য পথে দণ্ডায়মান্ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে, এবং সেই দিনই অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান্ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সরল সত্যসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ, অপার্থিব ভক্তিরস-সিক্ত প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রায় চারি পাঁচশত লোক বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান থাকিত। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রচারপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারক ছিল না, অথবা বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ভাবও কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় 'সঙ্গত্‌সভা' নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধাভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বন্ধুবর্গ লইয়া এই সভায় ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই স্থানে কেশবচন্দ্রের সহিত গোস্বামী-প্রভুর প্রথম পরিচয় হয়। গোস্বামী-প্রভু তদবধি 'সঙ্গতসভা'য় যোগদান উপলক্ষে যতই কেশবচন্দ্রের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাঁহার সরলতা, তেজস্বিতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যেই দুই স্বভাবসাধু গভীর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, দুইজনই দুইজনের প্রধান অবলম্বন হইলেন। দুইজনের এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য হইল। এইরূপে দুইটী শক্তিশালী মহাপুরুষ হাত ধরাধরি করিয়া জ্বলন্ত উৎসাহে, নির্ভীক হৃদয়ে, অশেষবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া জীবের ঘরে ঘরে সর্ব্বসুমঙ্গল পরিত্রাণ-বার্ত্তা প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে একবার গোস্বামী-প্রভু শান্তিপুরে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে উপবীত ত্যাগ ব্যাপার লইয়া ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। শান্তিপুরবাসীরা গোস্বামী-প্রভুর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। পথে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহাকে গালি দিত, কেহ গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হইত।

একদিবস কোন গোস্বামী-বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া, তিনি অঙ্গনের প্রাচীর ঘেঁষিয়া অপরাপর গোস্বামী-সন্তানগণের সহিত একাসনে উপবেশন

করিয়াছিলেন। এই সুযোগে শান্তিপুরবাসী কতিপয় নীচ প্রকৃতির লোক একটী দীর্ঘ জুতার মালা গাঁথিয়া ছাদের উপর হইতে গোস্বামী-প্রভুর গলদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। উক্ত মালা প্রাচীরসংলগ্ন একটী লৌহশলাকায় ঠেকিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, সেই বাটীস্থিত একটী গোস্বামী সন্তানেরই গলদেশে নিপতিত হইয়াছিল।

অপর এক দিবস কোন স্থানে কীর্ত্তনের মধ্যে গোস্বামী-প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভাবাবেশে তিনি কখন হাস্য কখনও ক্রন্দন করিতেছিলেন। ইহাতে তাঁহার বিদ্বেষী কতিপয় অরসজ্ঞ গোস্বামী-সন্তান তাঁহাকে কীর্ত্তনের বিঘ্নকারী মনে করিয়া কীর্ত্তনস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; এবং সেই সময়ে অপর একজন জিঘাংসাপরায়ণ লোক গোস্বামী-প্রভুকে কপটাচারী জ্ঞান করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য একটি চিমটা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহার গায়ে চাপিয়া ধরে। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু তখন ভাবাবেশে ইহজগৎ ছাড়িয়া অপ্রাকৃত্য রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, অনন্ত লীলারসময়ের লীলারস সম্ভোগ করিতেছিলেন, সুতরাং ইহার কিছুই তখন জানিতে পারেন নাই।

প্রবাদ আছে যে, যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণানন্তর শান্তিপুর হইতে পুরীধামে যাত্রা করেন, তখন শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে শান্তিপুরের কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হওয়াতে অদ্বৈতপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন যে, "তুমি যেমন আমাদের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ প্রাণে ব্যথা দিয়া চলিয়া যাইতেছ, তেমনি তোমাকেও একদিন ক্লেশভোগ করিতে হইবে, আবার এই বংশেই তোমাকে আসিতে হইবে। তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেও কেহ তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে না; অপিচ লোকেরা তোমার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবে, তোমাকে উপহাস করিবে, আরও সহস্র অপমানে নির্য্যাতন করিবে।" বস্তুতঃ গোস্বামী-প্রভুর উপর এই সময়ে শান্তিপুরবাসিগণ যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বোক্ত অভিসম্পাতের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। সে যাহা হউক, উপবীত ত্যাগ করাতে গোস্বামী-প্রভুর ব্রাহ্ম-বন্ধুগণও তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অগ্রজ হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। শান্তিপুরেরর অপরাপর গোস্বামীগণ তাঁহাকে শীঘ্র শান্তিপুর ত্যাগ করিতে জেদ করাতে তিনি নির্ভীক-হৃদয়ে উত্তর করিলেন—"আমি কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া ইহার উপকার করিতে চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস যে, কালে এই শ্যামসুন্দরের মন্দির ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইবে।" অতঃপর তিনি কিয়ৎকাল শান্তিপুরে অবস্থানপূর্ব্বক তথায় একটী ব্রহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তদীয় ভগিনীপতি স্বর্গীয় কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। অধিকন্তু এই অপরাধে মৈত্র মহাশয়কেই শান্তিপুর ত্যাগ করিতে হইল। তিনি গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে সপরিবার কলিকাতায় আগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব তখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রাম হইতে অনেকগুলি ধর্ম্মার্থী লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কলিকাতাস্থ প্রচারকদিগের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে যায় কে? উপযুক্ত প্রচারক কোথায়? এই ঘটনা অবগত হইয়া গোস্বামী-প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তথায় যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে তখন তাঁহার মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার সময় অতি নিকটবর্ত্তী। এই সময়ে কলেজে ত্যাগ করিলে ভবিষ্যতে কি প্রকারে তাঁহার পরিবার প্রতিপালিত হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া গোস্বামী-প্রভুর কতিপয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বাগআঁচড়ায় যাইতে বাধা দিতে লাগিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "যিনি মরুভূমিতে তৃণগুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর নীরমধ্যে প্রাণিপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কি অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন?" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলে নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। গোস্বামী-প্রভু পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং যথারীতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে কেশববাবু আদেশ করিলেন যে, প্রথম হইতে সমস্ত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পাঠ করিতে হইবে। গোস্বামী-প্রভু প্রায় দুই মাস পরিশ্রম করিয়া তত্ত্ববোধিনীও পাঠ করিলেন। অতঃপর আচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। অনুমতি পাইয়া গোস্বামী-প্রভু শ্রীরামপুরে দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন; এবং কিয়ৎকাল তাঁহার নিকটে তৎকৃত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিতে বলিলেন। অধ্যয়ন শেষ হইলে ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রথমতঃ কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তিন চারি মাস যাবৎ পটলডাঙ্গা, নেবুতলা, শ্রীরামপুর, কোন্নগর ইত্যাদি স্থানে প্রচার করিলে পর আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাগআঁচড়ায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে গোস্বামী-প্রভু ১৭৮৫ শকের ১০ই পৌষ বাগআঁচড়ায় আগমন করিলেন। এস্থানের ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। মূর্খ লোকের হাতে পড়িয়া ধর্ম্মের কিরূপ অধোগতি হইতে পারে,

তাহা তিনি এইস্থানে বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। এসম্বন্ধে তিনি "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'মহাত্মা চৈতন্যের বিশুদ্ধভক্তিময় ধর্ম্ম অধিকাংশ মূর্খ লোকের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইয়া গেল। বাগআঁচড়ার অবস্থা প্রায় সেইরূপই হইতেছে। কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্ম্মের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞানচর্চা ভিন্ন এই সকল অভদ্র ব্যবহার হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়? দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন দান না করিলে, মহামারীতে পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্য প্রদান না করিলে লোকে নিষ্ঠুরতা বলে, কিন্তু জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আন্তরিক দুর্দ্দশা, ধর্ম্মহীন পাপদগ্ধ মনুষ্যের হৃদয় যন্ত্রণা দূরীভূত না করিলে কেহই নিষ্ঠুরতা মনে করে না। দুঃখ দূর করাই যদি দয়ার কার্য্য হয়, তবে পাপযন্ত্রণা দূর করা অপেক্ষা পৃথিবীতে দয়ার কার্য্য আর কিছুই নাই। যাহারা কখনও পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে অন্ন দান অপেক্ষা স্বর্গীয় উপদেশের মূল্য কত অধিক! যে পাপের-যন্ত্রণা ভোগ করে সেই ব্যক্তিই পাপদগ্ধ মনুষ্যের জন্য অশ্রুপাত করে। বাগআঁচড়ার শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে ক্রন্দন না করিয়া থাকা যায় না।"

অতঃপর, এই স্থানের অনেকগুলি ধর্ম্মপিপাসু লোক গোস্বামী-প্রভুর নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। জ্ঞানের চর্চা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া তিনি এইস্থানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, এবং কিছুদিন থাকিয়া প্রত্যহ তথায় ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই স্থানের অধিবাসীদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি বিদ্যালয়, ব্রাহ্মসমাজ এবং একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলে আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রতে পার্থিব লাভালাভ বা স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত হইলে উহার সমূহ বিঘ্ন ঘটিবে এই আশঙ্কায়, নিজের সাংসারিক বহু অভাব অনটন সত্ত্বেও গোস্বামী-প্রভু প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করাই ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায়রূপে গণ্য। এই প্রতিবাদের ফলে তৎকালের জন্য প্রচারকের বৃত্তি নির্দ্ধারণ স্থগিত থাকে।

এই সময়ে একদিন রাত্রে গোস্বামী-প্রভু একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্নটী যথাযথ বিবৃত করা যাইতেছে ঃ—

তিনি দেখিলেন যে, কালী মল্লিক নামক জনৈক পরলোকগত ব্রাহ্ম তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একটি কুকুর ও হাতে একগাছা ছড়ি আছে। তিনি আসিয়া বলিলেন যে—"আমি আমার মৃত্যুসময়ে একটি উইল করিয়া গিয়াছি, সে উইলে এইরূপ লেখা আছে যে, আমার স্ত্রী স্বধর্ম্মে থাকিলে ও

স্বধর্ম্মানুযায়ী আমার শ্রাদ্ধ করিলে, জীবিতাবস্থায় আমার সম্পত্তি ভোগ করিতে পাইবে। তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি আমার ভাগিনেয়তে পর্য্যাপ্ত হইবে, আমার স্ত্রী স্বধর্ম্মনিরত না থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি আমার ভাগিনেয় পাইবে, এবং আমার ভাগিনেয় ধর্ম্মানুযায়ী আমার শ্রাদ্ধাদি করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু আমার ত্যক্ত-সম্পত্তি বর্ত্তমানে আমার জ্ঞাতিগণ ভোগদখল করিতেছে, তাহারা আমার শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত করে নাই। বর্ত্তমানে আমি বিশেষ কষ্টে আছি। আপনি একটা ব্যবস্থা করিয়া আমার কষ্ট অপনোদন করুন।" গোস্বামী-প্রভু স্বপ্ন দেখিয়া পাছে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ভুলিয় যান, এইজন্য শেষরাত্রে উঠিয়াই ভগবানের গুণগান করিতে থাকেন, পরে প্রাতঃকালে সকলকে ডাকাইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সকলেই স্বীকৃত হইলেন। পরলোকগত কালী মল্লিকের ভাগিনেয়কে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে উইল আনা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উইলে যে সব সর্ত্ত লেখা ছিল, সমস্ত গুলিই কালী মল্লিক স্বপ্নে লিখিয়া দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর কালী মল্লিকের শ্রাদ্ধের দিন নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে গোস্বামী-প্রভু কালী মল্লিকের শ্রাদ্ধ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। কাঙ্গাল দুঃখীদিগকে অর্থ দান করা হইল। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক্ যে সময়ে কালী মল্লিকের শ্রাদ্ধকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল, সেই সময়ে নিতান্তই অকারণে সন্নিকটস্থ একটি কাঁঠাল গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল, সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল। কালী মল্লিক স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে, রীতিমত শ্রাদ্ধ হইলে তিনি তাঁহার পরিচয় দিবেন। বস্তুতঃ তাহাই হইল।*

এই স্থানে অবস্থানকালে একদিবস ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বাঁগআঁচড়া-নিবাসী ৺প্রাণনাথ মল্লিক নামক একজন ব্রাহ্ম, গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন যে, যদি ব্রাহ্মমতে উপবীত ধারণ করা কপটতা ও মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত ত্যাগ না করিয়া কি প্রকারে বেদীর কার্য্য করিতেছেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে। এই সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মের কথা গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সঙ্গত মনে হওয়াতে, তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক কেশবচন্দ্রের নিকটে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) সকল সমাজের আদর্শ। ইহার সমস্ত দোষগুণই অপরাপর ব্রাহ্মসমাজে অনুকরণ করিবে। উপবীত

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য লামচরনিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় সংগৃহীত বিবরণ।

রাখা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ যদি উপবীতধারী হন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন, গোস্বামী-প্রভুর মত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া এই পত্র ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। অতঃপর কেশববাবুর বিশেষ অনুরোধে গোস্বামী-প্রভু এবং দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে শ্রীযুক্ত অন্নদাবাবু ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইতে স্বীকৃত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদগ্রহণ, ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকাতে অভিমত ব্যক্তকরণ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, উত্তর পশ্চিমাচলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার, শান্তিপুর, কালনা, নবদ্বীপ ভ্রমণ, কলিকাতায় অবস্থান।

বাগআঁচড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া, গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দৌহিত্রের নামকরণ উপলক্ষে, গোস্বামী-প্রভুকে উপাচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করিয়া, একখণ্ড গরদের কাপড় ও একটী অঙ্গুরীয় সহ তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। এই সকল কার্য্য প্রশ্রয় পাইলে পাছে ব্রাহ্মসমাজে পৌরোহিত্যের ব্যাপার প্রচলিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া গোস্বামী-প্রভু বরণের দ্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথকে এক পত্র লিখিলেন, ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই গোস্বামী-প্রভুর উপর বিরক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দেখা দিল। ইহাতে গোস্বামী-প্রভু এতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, এই বিষয় উল্লেখ করিবার সময়ে দেবেন্দ্রনাথের নিকটে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, তিনি গোস্বামী-প্রভুকে যেখানে যাইতে বলিবেন, তাঁহাকে সেই স্থানেই যাইতে হইবে। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু ঠাকুর মহাশয়কে বলিলেন—"ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচারকার্য্যে গমন না করিলে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।" এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকলস্থানে গমন করিতে পারি না; এজন্য আমার যেস্থানে যাইতে ইচ্ছা হয়, সেখানে যদি তুমি গমন কর তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।" পরে বলিলেন—"স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, বীজ বপন কর, ঈশ্বরের কৃপাতে সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না। ফলদাতা ঈশ্বর, তিনি তোমার সহায় থাকুন।" *

এই আদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে, "প্রচারকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য" বিষয়ক আলোচনা

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গে তৎকালীন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকাতে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার অভিমত সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

"আমি একজন ব্রাহ্মধর্ম্মের অধম প্রচারক। আমি নামের বা গৌরবের জন্য প্রচারব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে, ইহা আমার যত্নসাপেক্ষ নহে; ইহার উপর কোনও প্রভুত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে ও ইহার সঙ্গে প্রায় কোনও সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অশ্বের ন্যায় পরিচালন করে, এবং ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালন করিবে বলিতে পারি না। ইহা আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কার্য্য সম্পাদনে ইহাই আমাকে উত্তেজিত করে, এবং নিজ আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতে ব্যাকুল করে। ইঁহার আদেশ এরূপ পরিষ্কার ও বোধগম্য যে, আমি কখনও ইহা বিস্মৃত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি না।"

"ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি সর্ব্বদা মনকে বুঝাই, বলি—'হৃদয়,' তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি অত্যন্ত মলিন ও অধম? তুমি কি সাহসে প্রচার কার্য্যের গুরুভার বহন আপনার মস্তকে লইতে সাহসী হইলে? কিন্তু পরক্ষণেই উপরিলিখিত শক্তি আমার অন্তরে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে, 'তুমি অগ্রসর হও।' আমার বিশ্বাস, এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাক্য; ইহা প্রচারকের জীবন। ইহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া যাই।"

"আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বই হউক, তাহা প্রতিপালন করি, এবং যখনই প্রতিপালন করিতেই সাহসী হই, তখনই সফলতা লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে আলোক আসে। আমি যাহা বলি, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি, তাহাতে আমার অনুমাত্র গৌরব নাই। কারণ, আমি নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে ইহা আমার শক্তি হইতে নহে। কার্য্যের সময় আপনার প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, ইহা মনে হইলে—যথার্থ বলিতেছি—আমার শরীর কম্পিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে না এবং কোন কার্য্যের গৌরবেই আমার অধিকার নাই। পাপ পুণ্যে, সুখে অসুখে, সম্পদে দারিদ্র্যে, আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয় তখন ইহা আমাকে বলে, 'তুমি এমন সুন্দর জগতের এক স্থানে বসিয়া কি করিবে?' যখন সুমন্দ সুমিষ্ট মারুত আমার সমস্ত শরীরকে সুখী করে, তখন

ইহা বলে, 'তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ ?' এই অনিল-হিল্লোল কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইতেছে, বিবেচনা কর এবং তুমিও সেইরূপ সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ কর। ইহার রমণীয়তা দেশভেদে, কালভেদে অসমান নহে; তোমার অনুরাগ ও চেষ্টা সেইরূপ মধুরবাহিণী হইবে। 'অগ্রসর হও।' অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং যেখানে তাঁহার কার্য্য, সেইখানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। 'অগ্রসর হও' এই প্রকার উক্তির আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়, ভয়ে দুঃখে, বিশ্বাসে বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। আমি কোনক্রমেই ঐ আদেশ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব নহে, কিন্তু মনের কথা; এবং কেনই যে একথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্ত্তী হইয়াছি এবং সকল অবস্থাতেই হইব। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া সকল সময়েই আমি আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি। অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও নিরাশা ইহারই জন্য আমাকে গতাসু করিতে পারে না। এই জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড শক্তির ইঙ্গিতে যে তীর্থস্থানে গমন করিবার আমার এত আশা, যেখানকার কথা শুনিলে আমার নয়নবারি নিগলিত হয়, এবং যেখানে যাইবার জন্য আমার দুর্ব্বল চরণ ব্যস্ত রহিয়াছে, পরিণামে নির্ব্বিঘ্নে আমি সেই প্রাণসম তীর্থস্থানে উপনীত হইতে পারিব। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি কারণে আমি প্রচারক হইয়াছি এবং কেনই যে আমি অদ্যাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।"

এদিকে বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবুকে পদচ্যুত করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোকদিগকে আচার্য্যপদ প্রদান করাতে, দেবেন্দ্রনাথের উপর প্রাচীন ব্রাহ্মগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহচরদিগের উদ্যোগে দুইটী অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হইল। নব্য ব্রাহ্ম-দিগের এই সকল কার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ ভীত হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন; এখন সর্ব্বপ্রকার সংস্কার-কার্য্য হইতেই যুবকদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই ঘোরতর আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও গোস্বামী-প্রভুর নেতৃত্বে যুবকগণ অদম্য উৎসাহে, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে আপনাদের বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল। রাজপথে বুক-সমান জল দাঁড়াইয়াছিল। সেই প্রবল ঝটিকা-বেগে বহু গৃহ ভগ্ন, অসংখ্য বৃক্ষ উন্মূলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ নদীর স্রোতে পরিণত হইল। অগণ্য মৃতদেহ সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। নরনারীর আর্ত্তনাদে এক মহাপ্রলয়ের দৃশ্যের সূচনা হইয়াছে। সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। দিবসেই ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন

হইয়াছে। গোস্বামী-প্রভু ছাদে উঠিয়া প্রকৃতিদেবীর সেই তাণ্ডবলীলা দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, অদ্য বুধবার উপাসনার দিন, কিন্তু কাহার সাধ্য যে ঘরের বাহির হয়? উপাসনার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল গোস্বামী-প্রভু ততই অস্থির হইতে লাগিলেন। এই দুর্যোগের মধ্যে বন্ধুগণ গৃহের বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার নিকটে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন পরাস্ত হইল। তিনি কোমর বাঁধিয়া গৃহের বাহির হইলেন। হ্যালিডে ষ্ট্রীটের নিকট গিয়া দেখিলেন গলাজল হইয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সাঁতার জলে পড়িলেন। অবশিষ্ট সমস্ত পথ প্রায় সন্তরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখেন ঘর জনশূন্য এবং সমাজগৃহও ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে। তখন মন্দিরের ভৃত্যদ্বারা একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তদুত্তরে লিখিলেন—"আজ প্রকৃতির মধ্যে যে ভীষণ ব্যাপার চলিতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশ্বরের লীলা দর্শন কর।" সুতরাং গোস্বামী-প্রভুকে একাকী বসিয়াই উপাসনা করিতে হইল। উপাসনান্তে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে কেশববাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি পালকিতে চড়িয়া সমাজে গমন করিতেছিলেন। পুনরায় দুজনে একত্র হইয়া সমাজে আগমনপূর্ব্বক্ উপাসনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে কলিকাতার অনেক পুরাতন গৃহের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গেলে, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া যায়। এই বাটীতে যে দিন প্রথম উপাসনা হয়, সেই দিন গোস্বামী-প্রভু প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বের উপবীতধারী জনৈক আচার্য্য বেদীতে উপাসনা করিতেছেন। এইরূপ কার্য্য তাঁহাদের অসহ্য বোধ হওয়াতে, গোস্বামী-প্রভু বাহিরে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান্ হইয়া ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। অভ্যাসবশতঃ কেশববাবু প্রথমতঃ উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন, পরে গোস্বামী-প্রভুর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই যুবকদল গোস্বামী-প্রভুকে অগ্রণী করিয়া অন্যত্র গিয়া উপাসনা করিলেন।

সময়ান্তরে গোস্বামী-প্রভু প্রমুখ তেজস্বী ব্রাহ্মগণ দেবেন্দ্রনাথকে ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। যুবকগণ বুধবার ব্যতীত অন্য একদিন উপাসনা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেও আপত্তি করিলেন। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া উক্ত ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করতঃ ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিবার সময়ে যুবক ব্রাহ্মগণ দেবেন্দ্রনাথকে 'মহর্ষি" আখ্যা প্রদান

করিয়া এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। দেবেন্দ্রনাথও কেশবাবুকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার নিজের ব্রাহ্মসমাজের নাম 'আদি-ব্রাহ্মসমাজ' রাখিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্ম ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন। প্রচারকগণ নবীন উদ্যমে, জ্বলন্ত উৎসাহে ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুর তীব্র বৈরাগ্য, অসাধারণ অধ্যবসায়, অকপট স্বার্থত্যাগ, আলোকসামান্য ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া বহু শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ প্রচার ক্ষেত্রে নামিলেন। স্বর্গ-দূতের ন্যায় প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় নামিলেন। 'যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান।' যেমন কথা তেমনি কাজ। দেহ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' মহামন্ত্র সার করিয়া প্রভুর মহাকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্য্যে তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার অবসর ছিল না। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্‌পাত করিলেন না, এবং নিন্দা প্রশংসার মুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল অধ্যবসায়ে, পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গতি অবারিত এবং বাণী অপরাঙ্মুখা হইল।" * তাঁহার অদম্য চেষ্টায় বঙ্গদেশের বহুস্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু সাংসারিক ভয়ানক অভাব অনটনের মধ্যে, মানুষের উপর কোনরূপ প্রত্যাশা না রাখিয়া নিজের এবং পরিজনের সামান্য সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, যে প্রকারে স্বীয় জীবনের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তাহার উদাহরণস্বরূপ দুইটীমাত্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। ১। নির্জ্জনে উপাসনা করিবার জন্য একদিন প্রাতে গোস্বামী-প্রভু কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। তখন সেই স্থানে আহারাদির কোন বন্দোবস্ত ছিল না। গোস্বামী-প্রভু প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া উপাসনা করিয়া অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় প্রহরে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে, উপাসনায় মন বসিতেছে না দেখিয়া নিকটস্থ জলাশয় হইতে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম ও জলপান করিলেন। পরে সমস্ত দিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়া সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতাস্থ স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন অর্থাভাবে গৃহে সেই দিন পাক হয় নাই। গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, গোস্বামী-প্রভুর ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের ভুক্তাবশিষ্ট একমুষ্টি অন্ন খাইয়া রহিয়াছেন, ও তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পাতকুয়ার জলমাত্র পান করিয়া রহিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গোস্বামী-

* "তত্ত্বকৌমুদী।"

প্রভু ধীরে ধীরে গিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্রাহ্ম ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার মুখ শুষ্ক দেখিয়া বলিলেন—"গোঁসাই, আজ আপনাদের আহার হয় নাই বোধ হয়?" তিনি উত্তর করিলেন—"অন্যদিন ভগবানের উপর নির্ভর করি, আর আজ নিজের উপর নির্ভর করিতে গিয়াছিলাম, তাই এই দশা।" এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধেয় যদুনাথবাবু নিজের জামার পকেটে হাত দিয়া মাত্র দেড় পয়সা প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দ্বারা মুড়ি ক্রয় করিয়া সপরিবার গোস্বামী-প্রভু আহার করিলেন। পরদিন যদুনাথবাবু শ্রীযুক্ত কান্তিবাবুর (জনৈক ব্রাহ্ম) নিকটে পূর্ব্বদিনের কথা প্রকাশ করিলে, তিনি একখণ্ড আধুলী গোস্বামী-প্রভুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। উহা দ্বারা আহার্য্য দ্রব্যাদি আনাইয়া রন্ধন করা হইল। এমন সময়ে হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর শ্বশুর ও শ্যালক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবুর শ্বশুর মহাশয় বলিলেন যে, তাহার পুত্রের তিন দিন আহার হয় নাই। তখনই তাঁহাদিগকে আহার করিতে বলা হইল। তাঁহাদের আহার শেষ হইলে অবশিষ্ট যাহা ছিল তদ্দ্বারা গোস্বামী-প্রভুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবী ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন এবং গোস্বামী-প্রভুর জন্য যৎ-কিঞ্চিৎ রাখিয়া দিলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু ও মহেন্দ্রবাবু আসিলেন। তাঁহারা দুইজনে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই আহার করিয়া কোন প্রকারে দিনযাপন করিলেন। তৎপর দিবস স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবীর পূজার বাসন বিক্রয় করিয়া যাহা প্রাপ্ত হওয়া গেল, তদ্দ্বারা সে দিনের আহারে কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। ২। গোস্বামী-প্রভুর ঐ সময়ের সাংসারিক অভাবঅনটন সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"আমি তখন কৃষ্ণনগরে বাস করিতাম। সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিলে আমার অন্য কোন বন্ধুর গৃহে না গিয়া গোস্বামী-মহাশয়ের নিকট যাইতাম। তাঁহার সঙ্গে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, এবং তিনি আমাকে এত অধিক ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার গৃহের তেঁতুলগোলা ভাতই আমার নিকট অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। তাঁহাদের অবস্থা তখন এরূপ যে অনেক সময়ে তরকারী জুটিত না, তেঁতুল গোলাইয়া তদ্দ্বারা তরকারী ও ব্যঞ্জনের অভাব পূর্ণ করিতেন; এবং পরমানন্দে আহার সম্পন্ন হইত। সময়ে সময়ে তাঁহাদের আবাস স্থানে এত জনতা হইত যে, উপরের একটী ঘরে স্ত্রীলোকেরা বাস করিতেন এবং অপর ঘরগুলি পুরুষদিগের দ্বারা অধিকৃত হইত। ইঁহারা প্রায় অধিকাংশ সময় কেশবচন্দ্রের গৃহে তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে ও ধর্ম্মালাপে যাপন করিতেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধুচক্র; তাঁহারা মৌমাছির দলের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে রাত্রি দুই তিনটা পর্য্যন্ত

অতিবাহিত হইত। প্রায়ই রজনীর শেষভাগে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। প্রতিদিনের আহার্য্য সামগ্রী প্রায়ই কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকিত না। আশ্রমস্থ মহিলারা অনেক সময় অপেক্ষা করিয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন। অনেক সময়ে অনাহারেই রজনী অতিবাহিত হইত। ভাত জুটিলেও কত সময়ে কেবল নুন ভাতই অমৃতের স্থান অধিকার করিত।

"কেবল রজনীতেই এরূপ হইত তাহা নয়; কত সময়ে দিবসেও আহারের সংস্থান হইত না। একে সমস্ত দিন অনাহারে ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন, তদুপরি সময়ে সময়ে দারিদ্র্য-ক্লেশে জর্জ্জরিত পরিবারদিগের অভিসম্পাতে তাঁহাকে আরও ক্লেশ পাইতে হইত। অল্প কয়েকজন চাঁদাদাতা ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রধান ছিলেন। সময়ে সময়ে দুই তিন জন প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া, প্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া বিশেষ অভাবের কথা বলিয়া তাঁহার দেয় চারি আনা, কি আট আনা অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। অনেক সময়ে কাঁটানটে শাক, যাহা প্রাঙ্গণে বহুল পরিমাণে ছিল তাহার ব্যঞ্জন হইত। অনেক সময়ে অন্নের কোন উপকরণ সংগৃহীত না হওয়ায় হলুদ মিশাইয়া খেচরান্ন করা হইত এবং প্রাঙ্গণস্থ দোপাটি ফুল ভাজিয়া লওয়া হইত।"* এই প্রকারে কত সময়ে গোস্বামী-প্রভু ও তাঁহার পরিবারস্থ লোকদিগকে অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

এতদিন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ নানা প্রকার অনুকুল অবস্থার মধ্য দিয়া বিনা বাধায় ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, এবং আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া এতদূর উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, অচিরকালমধ্যেই সমগ্র ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবেন, এরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এখন তাঁহারা এই অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর উহার অসামান্য প্রভাব দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন; এবং কি করিয়া এই নতুন ধর্ম্মস্রোতের গতিরোধ করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিলাতের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় পাদ্রীসাহেব পরামর্শ করিয়া, এই নবীন ধর্ম্মের প্রচারকদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, একজন সুপণ্ডিত বিচক্ষণ পাদ্রীকে নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু, শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। পাদ্রীসাহেব বিলাত হইতে বোম্বাই হইয়া বরাবর তাঁহাদের কাছে এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদিন প্রচারকগণ উপাসনান্তে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে পাদ্রী সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

* শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর প্রণীত গোস্বামী-প্রভুর জীবনী হইতে উদ্ধৃত।

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রদ্ধেয় কেশববাবু তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক্ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, ভারতবর্ষে এক নতুন ধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বাধা প্রদান করিতেছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি বিলাত হইতে আগমন করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করিতে চাহেন। সুবিচক্ষণ গুণগ্রাহী পাদ্রীসাহেব এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে তিনি গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ধীর স্থির অটলভাবে বসিয়া আছেন, ইঁহার নাম কি?" কেশববাবু বলিলেন—"বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।" পরে পাদ্রীসাহেব বলিলেন—"আমি জানি এবং বিশ্বাস করি খৃষ্ট ভিন্ন পৃথিবীর নরনারীর আর কোন উপাস্য নাই। আর তাহাদের পাপভার মোচন করিবার উপযুক্ত পুরুষই বা অন্য কে থাকিতে পারে? এই সকল বিষয় জানিতে আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে যিনি এখনও উপাসনার স্থান পরিত্যাগ করেন নাই, যঁাহার নাম তুমি বিজয়কৃষ্ণ বলিলে, তঁাহার সহিতই আমি আলাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি যদি দয়া করিয়া এই টেবিলের কোন চেয়ারে আসিয়া বসেন, তবে সুবিধা হয়। আমি ইংরাজ, এই প্রকারে বসিবার আমার অভ্যাস নাই। আমার ইচ্ছা হইতেছে না যে উহার উপাসনা ভঙ্গ করি।"

এইরূপ কথোপকথনের পর গোস্বামী-প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। প্রথমে তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু নড়িতে লাগিল। শরীরের স্পন্দনহীন অবস্থা ধীরে ধীরে অপসৃত হইল। অতঃপর উপাসনার অবসানকালীন শান্তিবাচক শব্দ—'হরিঃ ওঁ, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' উচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে শ্রদ্ধেয় কেশববাবু তাঁহাকে পাদ্রীসাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামী-প্রভু, সাহেব বাঙ্গালা ভাষা জানেন শুনিয়া, বাঙ্গালাতেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন; এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"সাহেব, ধর্ম্মত অনেক প্রচার করিয়াছেন, গ্রন্থাদিও বিস্তর পাঠ করিয়াছেন এবং এখন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ভাল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক্ আমার এই কয়েকটী প্রশ্নের আগে উত্তর দিন:—১। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ২। ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান কোথায়? ৩। আত্মা কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ কি? ৪। সত্য কি বস্তু এবং সত্য কাহাকে বলে? ৫। মায়া কি বস্তু এবং মায়া কাহাকে বলে? ৬। অসত্য কি এবং পাপ কি?" সুবিজ্ঞ ও উদারমনা পাদ্রীসাহেব এই সকল প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"এই সকল প্রশ্ন কেহ আমাকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, নিজের অন্তরেও কখনও উদয় হয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না, কেবল বিশুখৃষ্ট ও বাইবেলই জানি।" তখন

কেশববাবু সাহেবকে বলিলেন—"সাহেব, এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। এই দেশ হইতে সভ্যতা এবং ধর্ম্ম প্রথমে গ্রীস দেশে যায়, তথা হইতে সমস্ত ইউরোপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই ভারতবর্ষ যে মহাদেশের অন্তর্গত তাহার নাম এসিয়া। এই এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তোমাদের যিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমাদের অপেক্ষা আমরা খৃষ্টকে অধিকরূপে জানি এবং তাঁহাকে মহাপুরুষজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু তিনি আমাদের উপাস্য নহেন। আমাদের উপাস্য তাঁহার পিতা পরমেশ্বর। তিনি এক এবং অবিভক্ত। এই যে আমাদিগকে দেখিতেছ, আমরাও সেই এক এবং অবিভক্ত ঈশ্বরের পুত্র। যদি তুমি ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চাও, তবে এখান হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাও এবং আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সেখানে গিয়া বল। পরে তথা হইতে উত্তর সংগ্রহ করিয়া পুনরায় এ দেশে আসিও।" এইরূপ কথোপকথনের পর পাদ্রীসাহেব আর বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া একেবারেই বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। *

অতঃপর, গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পাঞ্জাবদেশে উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি যে, এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন সহসা তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিকমণির সম্মুখে নীল লোহিত ইত্যাদি যখন যে বর্ণ-বিশিষ্ট দ্রব্যাদি উপস্থাপিত করা যায়, তখন তাহাতে সেই বর্ণেরই সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হয়। গোস্বামী-প্রভুর এই মনবিকারও তদ্রূপ কোন কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকিবে, নচেৎ তাঁহার ন্যায় আজন্ম পবিত্রাত্মার হৃদয়ে সামান্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় এইরূপ ভাব উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। সে যাহা হউক, নিশীথে আত্ম-চিন্তাকালে ঐ বিষয় স্মরণ হওয়াতে, তিনি মনে মনে অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে শান্তি পাইবার আশায় তাঁহার সেই সময়ের মনের অবস্থানুরূপ একটী গান রচনা করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আকুল অন্তরে কাঁদিতে কাঁদিতে গান করিলেন। গানটী এই ;—

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে (নাথ) ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে যে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায় জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।

* সাধু শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত।

এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে' কেশে ধরে' দাও চরণে আশ্রয়।"

এই গান করিবার পরেও তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া, তিনি আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়া গভীর রাত্রিতে রাভি নদীর তীরে উপনীত হইলেন, এবং পরিধেয় বস্ত্রে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড জড়াইয়া গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক যেই জলে ঝাঁপ দিবেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"ইএ বাচ্চা, শরীর ছোড়নেসে পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধর। তেরা ভালা হোগা। যব্ পাপ ছুটেগা, তু কুচ্ নেহি জানোগে। আভি বহুত রোজ দের হায়। খোদা সব কামকা বখৎ ঠিক্ কর্ রাখা। বাতাস্‌সে ধূর উড়তা, ওভি খোদাকা ইচ্ছাসে হোতা। ঘাবড়াও মৎ। দুনিয়ামে খোদাকা খেল্ দেখ্।" অর্থাৎ—"বৎস! শরীর-নাশে পাপের নাশ হয় না। ধৈর্য্য ধর, তোমার মঙ্গল হইবে। যখন পাপ তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে, তখন তুমি তাহা জানিতেও পারিবে না। কিন্তু এখন তাহার অনেক দেরী আছে। ভগবান্ সমস্ত কার্য্যেরই সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বায়ুতে যে ধূলি-রাশি উত্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। অতএব চিন্তিত হইওনা। জগতে জগদীশ্বরের লীলা দর্শন কর।" গোস্বামী-প্রভু অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ফকির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এই ব্যাপার কিরূপে অবগত হইলেন?" ফকির সাহেব হিন্দিতে বলিলেন—"আমি ভজন করিতেছিলাম, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, এক মহাত্মা আত্মহত্যা করিতেছে, শীঘ্র রক্ষা কর।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু পুনরায় বলিলেন—'দেখুন, আমার মন বড় অপবিত্র। এই অপবিত্র জীবন ধারণ করিয়া ফল কি?" ফকির হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তবে এই অপবিত্র জীবন লইয়া পরকালে যাইয়াই বা লাভ কি? ভগবানের নাম কর, তিনিই তোমাকে পবিত্র করিবেন। জীবন পবিত্র করিয়া পরলোকে যেও। তুমি নিজেকে অতিশয় অপবিত্র মনে করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর বস্তু তাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। সাধনপথে অগ্রসর হইলে যখন তোমার নিকটে একখানি আয়নার মত প্রকাশিত হইবে, তাহাতে তোমার স্বরূপ দেখিলে, তুমি যে কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রতিদিন শয়ন করিবার সময়ে ভগবানের মাতৃবাচক নাম জপ করিবে। জপ করিতে করিতে যখন মন তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন নিদ্রা যাইবে। এইরূপ করিলে কোন প্রকার মলিন চিন্তায় তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না—ইত্যাদি।" এই প্রকার সান্ত্বনাসূচক উপদেশ প্রদান করিয়া ফকির সাহেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; এবং গোস্বামী-প্রভুও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিলেন। এই ঘটনার বহুদিন পরে হরিদ্বারে গোস্বামী-

প্রভুর সঙ্গে উক্ত ফকিরের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোস্বামী-প্রভু তখন যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া অপরিমেয় উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন। ফকির সাহেব, গোস্বামী-প্রভুর অবস্থা দর্শন করিয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"দেখ ত এখন কি অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিয়াছ! তখন আত্মহত্যা করিলে কি লাভ হইত?—ইত্যাদি।" *

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু, শিখ-সম্প্রদায়ের প্রধানতম তীর্থস্থান গুরুদরবার দর্শন করিবার জন্য অমৃতসরে উপনীত হন। কথিত আছে যে, কোন সময়ে গুরু নানকজী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একটী শুষ্ক পুষ্করিণীর নিকট জল যাঞা করিলে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম পানীয় জল আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই হইতে উক্ত পুষ্করিণী 'অমৃতসায়র' নামে অভিহিত হয়। এই অমৃতসায়র হইতে 'অমৃতসর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিখ-সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু রামদাসজী ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতসায়রকে বৃহদাকারে খনন করাইয়া, তদভ্যন্তরে একটী মনোহর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দিরকে শিখগণ গুরুদরবার বা 'দরবার সাহেব' বলিয়া থাকেন। কালের কুটিল গতিতে এই স্থান কিছুদিনের জন্য আফগান মুসলমানদিগের হস্তগত হয়, এবং সেই সময়ে তাহারা মন্দিরটীকে বিধ্বস্ত ও অশেষ প্রকারে কলঙ্কিত করে। পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ অমৃতসর অধিকার করেন, এবং মন্দিরটী পুনঃসংস্কৃত করিয়া উহা স্বুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দেন। সেই দিন হইতে উহা স্বুবর্ণমন্দির (Golden Temple) নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

স্ববিস্তীর্ণ অমৃতসরোবর দীর্ঘে ও প্রস্থে সমান। ইহার চতুঃপার্শ্ব শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। বায়ু দ্বারা ঈষদান্দোলিত স্বচ্ছসলিল সরোবরের মধ্যস্থলে স্বুবর্ণমন্দির বিরাজিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তীর হইতে মন্দিরে যাইবার জন্য একটী মর্ম্মর-সেতু আছে। মন্দিরটীও মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহার অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রকোষ্ঠে গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি শিখগুরুদিগের রচিত গ্রন্থসমূহের সারসংগ্রহ 'গ্রন্থসাহেবজী' সুরক্ষিত হইয়া অতীব জাঁকজমকের সহিত প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তথায় অন্য কোন দেবতার বিগ্রহাদি নাই।

এই স্থানের অষ্টপ্রহরব্যাপী জাগ্রত জীবন্ত ধর্ম্মস্রোতঃ সন্দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দিবারাত্রের অধিকাংশ সময়ে মন্দির অভ্যন্তরে পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, ভোগ, আরতি ইত্যাদি অতিশয় পরিপাটিরূপে স্বুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল রাত্রি চারি ঘটিকা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কীর্ত্তনাদি বন্ধ থাকে। কিন্তু তখনও অনেকে জাগ্রত থাকিয়া ধ্যানধারণাদি

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

করিয়া থাকেন। অদ্যাবধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী-প্রভু অনেক সময়ে গুরুদরবারের মাহাত্ম্য-সূচক অনেক কথা ব্যক্ত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

কিছুদিন পাঞ্জাবদেশে অবস্থান করিবার পর, গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মথুরা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। তথায় একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার সময়ে শ্রীভগবানের গোষ্ঠলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎশ্রবণে সঙ্গীয় ব্রাহ্মগণ উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতান্তে আসন গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের মধ্যে একজন গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা করিতে গিয়া এ সব কি বলিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"স্থানমাহাত্ম্য আছে, আমি কিছু কল্পনা করিয়া বলি নাই; যে দৃশ্য সম্মুখে পড়িয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলাম।" পরবর্ত্তীকালে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরেও এইরূপ কত ঘটনা ঘটিত। অনেক সময়ে জগজ্জননীর আবির্ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ বর্ণনা করিতেন, "মা! মা!" বলিয়া অধীর হইতেন, কিন্তু উপস্থিত উপাসকমণ্ডলী, উহা ভগবতী কি জগদ্ধাত্রীর আরাধনা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেন না; এবং প্রত্যেকেই আপনার ভাবে গোস্বামী-প্রভুর ঐ সাক্ষাৎ পূজায় যোগদান করিতেন। *

শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে মথুরা হইয়া আগ্রা গমন করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি একটী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। তৎকথিত স্বপ্নের বিবরণ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—"তাজ (তাজমহল) দর্শনান্তে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করি। বোধ হইল আমি তাজের প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানে গিয়াছি। উদ্যানের বৃক্ষগুলি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল। সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য-দর্শনে তাঁহাদিগকে দেবকন্যা মনে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি জন্য এই পবিত্র স্থানে আসিয়াছ?' এবং আমি দেখিলাম তাঁহারা একবার বৃক্ষ আর একবার স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। আমি তাঁহাদের এইরূপ বেশ-পরিবর্ত্তনে বিমুগ্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিলাম এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আমি আপনাদের নিকট একটী উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী তাহা কিরূপে বুঝিব?' তাঁহারা বলিলেন—'তুমি আজও ঈশ্বরবিষয়ে অনভিজ্ঞ? যাঁহার রাজ্যে বাস কর, যাঁহার দয়া ভিন্ন এক দণ্ড বাঁচ না, তাঁহার বিষয়ে কোন্ প্রাণে সংশয় করিতেছ? আমি লজ্জিতভাবে উত্তর করিলাম যে, 'আমি একজন ঘোর মূর্খ, কিছুই জানি না; আপনারা উপদেশ দিয়া আমাকে সুখী করুন।' তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

* রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

'আমাদের মত সুন্দরী কোথাও দেখিয়াছ ?' উত্তর—'না, স্বপ্নেও দেখি নাই।' তাঁহারা—'একমাত্র ঈশ্বরই আমাদিগকে এত সুন্দরী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের শোভা আমাদের শরীর দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া আমাদের এমন শোভা সৌন্দর্য্য হইয়াছে। তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হইতে পারে না। ইহার গূঢ় অর্থ যদি বুঝিয়া থাক, তবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে পরম সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইবে।' ইহা বলিয়া তাহারা বৃক্ষ রূপ ধারণ করিল। অপর দিকে চাহিয়া দেখি, শুভ্র-শ্মশ্রু-ধারী কতিপয় বৃদ্ধ কহিতেছেন—'যে ঈশ্বরকে সুন্দর বলিয়া জানিলে, তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া জান। কেবল তিনি আমাদের প্রাণরূপে আছেন বলিয়া আমরা এতদূর সারবান্ হইয়াছি।' ইহা বলিতে বলিতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষরূপ ধারণ করিলেন। এই সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি এই স্বপ্নটী দ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পূর্ব্বে যাহা শূন্যমাত্র জ্ঞান হইত, এখন দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবে তাহা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।"

আগ্রা হইতে গোস্বামী-প্রভু লক্ষ্মৌ, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক সেই সকল অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময়ে একদিবস তিনি মহাভারতে একটী আখ্যায়িকা পাঠ করিলেন; তাহাতে লেখা আছে যে, কোন সময়ে একজন ঋষি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি ইন্দুর কোন একটী উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে গিয়া পুনঃ পুনঃ নিম্নে পড়িয়া যাইতেছে। এতদ্দর্শনে ঋষি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইন্দুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা সামান্য উচ্চ স্থানটুকু অতিক্রম করিতে পারিতেছ না কেন?" ইন্দুরগণ বলিল—"আমরা তোমার পূর্ব্বপুরুষ। তুমি বিবাহ করিয়া বংশ-রক্ষা না করাতে আমাদের পিণ্ডলোপ হইয়াছে। তাহাতে আমাদের দুর্গতি। যদি আমাদের এই দুর্দ্দশা মোচন করিতে চাও, তবে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর।" এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোস্বামী-প্রভু বংশরক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বহুদিবস বিবাহ হইলেও গোস্বামী-প্রভুর এতদিন পর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি হয় নাই। ইহার পর তাঁহার সন্তোষিণী নামক প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

"১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গোস্বামী-মহাশয় ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন। তিনি পূর্ব্ব-বাঙ্গালাতে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন। গোস্বামী-মহাশয় এখানে আগমন করিয়া কয়েকটী প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাতে অনেক শিক্ষিত লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। * * * তিনি এই সময়ে এবং তৎপরে ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে

ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার ফল পূর্ব্ব বাঙ্গালা বহুকাল ভোগ করিবে।" *

গোস্বামী-প্রভুর এই সময়ের প্রচার-প্রসঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কলিকাতা হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"জয় জগদীশ।

প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার,

জয় জয় বিজয়ের জয়! তুমি যে পতাকা ধারণ করিয়াছ, তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আসিয়া আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভুত করিয়া ফেলিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আবার বলি জয় জয়! ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারক অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইতেছে, আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একমাত্র নেতা জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। বৈরাগী হইয়া সংসারকে পদানত কর, উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর, প্রীতিসূত্রে সকলকে বন্ধ কর, এবং দেশ বিদেশ জয় করিয়া আমাদের রাজ্য বিস্তৃত কর; এবং তোমার সঙ্গের দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে সম্রাট্ অপেক্ষা ধনবান্ কর। আমরা আশাপূর্ণহৃদয়ে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি; তুমি যত প্রচার করিবে, ততই আমাদের ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে।

ভাল একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এত স্বার্থপর কেন? তুমি কি একা সমুদয় সুখভোগ করিবে? ঢাকাতে যে সকল অমূল্য রত্ন "ঢাকা" ছিল, তাহা কি কেবল আপনিই গ্রহণ করিতে হয়? আমাকে কি একবার ডাকিতে নাই? নিতান্ত দরিদ্রভাবে এখানে পড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি আমাকে অংশী হইতে দিবে না? আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন সুবিধা নাই? তুমি পথ না দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই। ইতি

কলিকাতা, কলুটোলা,
২৪শে মাঘ ১৭৮৬ শক

অভিন্নহৃদয় বন্ধু
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

এইরূপে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ব্রহ্ম-নামের জয়-নিশান প্রোথিত করিয়া গোস্বামী-প্রভু কিছুদিন বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য শান্তিপুর গমন করেন। এই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া ১২৭২ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতা পুনরাগমন করেন, এবং তথা হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া

* ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

১৯এ কার্ত্তিক পুনরায় প্রচারার্থে ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হন। ইঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঢাকানিবাসী ব্রাহ্মগণ অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুড়ীগঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অবশেষে ইঁহাদিগকে পাইয়া তাঁহাদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। বাঙ্গালাবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী জীবনবাবুর বহির্ব্বাটীতে এই বিচিত্রকর্ম্মী ক্ষণজন্মা প্রচারকদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইঁহারা প্রায় এক মাস কাল ঢাকায় অবস্থান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন; পরে ১১ই অগ্রহায়ণ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও সাধু অঘোরনাথ মৈমনসিংহ যাত্রা করিলেন, এবং গোস্বামী-প্রভু স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণিটোলাস্থিত বাটীতে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ প্রচার কার্য্যে ব্রতী রহিলেন।

অতঃপর, পৌষ মাসে গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে বরিশাল আগমনপূর্ব্বক্ স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের গৃহে পনের দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি', 'উপাসনাই মনুষ্যের জীবন,' 'পরকাল,' আত্মদৃষ্টি' 'ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কতিপয় বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনায়, তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রতিদিন শত শত লোক উপাসনা স্থলে উপস্থিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু, বরিশালবাসীর তাৎকালিক নীতি-বিষয়ক ঘোর দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া, পরার্থে উৎসৃষ্ট প্রাণ এই প্রেমময় প্রচারকবর এতদূর মর্ম্মাহিত হইয়াছিলেন যে, একদিন রাত্রিতে ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে যন্ত্রণার মাত্রা একেবারে সহ্য-সীমা অতিক্রম করিলে, তিনি নদীতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র দৈববাণী হইল—'আত্মহত্যা করিও না, সময়ে সমস্ত ঠিক্ হইয়া যাইবে।' অকস্মাৎ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন।

বরিশাল হইতে গোস্বামী-প্রভু নোয়াখালী গমন করেন। তাঁহার আগমনে স্থানীয় লোকের ধর্ম্মোৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের ভয়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতেন না, তাঁহারাও গোস্বামী-প্রভুর জ্বলন্ত উৎসাহ ও জীবন্ত ভক্তিভাবপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে দলে দলে সমাজগৃহে উপস্থিত হইতেন।

নোয়াখালি হইতে গোস্বামী-প্রভু চট্টগ্রাম গমনপূর্ব্বক, 'ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন,' 'উপাসনা', 'ঈশ্বরোপলব্ধি' 'পরকাল' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও জীবন্ত উপাসনায় স্থানীয় লোকের মধ্যে বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ জন্মে। চট্টগ্রামের পথে তিনি চট্টগ্রাম পাহাড়, রঘুনন্দনের পাহাড় ও চন্দ্রনাথ পর্ব্বত দর্শন করেন। চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের গুরুধ্বনিকুণ্ড,

সূর্য্যকুণ্ড, লবণাখ্যকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও সহস্রধারা ইত্যাদি প্রস্রবণ ও পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।—"বহুদিন হইল একবার পদব্রজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তখন গমনকালে একটী আশ্চার্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। অবশেষে আমি সীতাকুণ্ডের নিকটে পর্ব্বতপার্শ্বে নিদ্রিত হই। শরীর ক্লান্ত ছিল, শীঘ্রই নিদ্রা হইল। তখন এক ব্যাপার দেখিলাম যে, সমস্ত বৃহদাকার নক্ষত্রমণ্ডল, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার সম্মুখে ঘোর বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার পশ্চাদ্দেশে দেখিলাম—এক মহান্ পুরুষ! এই দৃশ্য আমি আর অধিক দেখিতে পাইলাম না। তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে, পরিচয় দাও।' তিনি বলিলেন—'আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ, ইহা প্রকৃতি।' প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছিলাম। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সত্তা মাত্র। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—ইহা পুরুষ। এই পুরুষ। এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ্ ও শ্রুতি পূর্ণ।" *

চট্টগ্রাম হইতে গোস্বামী-প্রভু কুমিল্লায় গমন করিয়া স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বাসভবনে ১৪।১৫ দিন অবস্থান করেন। তাঁহার শুভাগমনে ত্রিপুরা-নিবাসী ব্রাহ্মগণের মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার হয়। এই স্থানে অবস্থানকালে ত্রিপুরা ব্রহ্মমন্দির, ত্রিপুরা শাখাসমাজ, ব্রজসুন্দরবাবুর বাসভবন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে 'উপাসনা,' 'ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা' 'ঈশ্বরই মানব-জীবনের লক্ষ্য' 'ঈশ্বর-প্রেমই আনন্দের প্রস্রবণ'—ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী বক্তৃতা শ্রবণে বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের প্রাণে নব আশার সঞ্চার হইয়াছিল।

অতঃপর ফাল্গুন মাসে তিনি কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাত্রা করেন। তথায় ৪।৫ দিন অবস্থান করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?' 'উপাসনার আবশ্যকতা,' 'পরিত্রাণের উপায়' প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে গোস্বামী-প্রভু পুনরায় বরিশাল গমন করেন, এবং তথায় ২৫।২৬ দিন অবস্থানপূর্ব্বক 'ঈশ্বর লাভ', 'বাহ্য পৌত্তলিকতা', 'আন্তরিক পৌত্তলিকতা' প্রভৃতি বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতার সূত্রপাত হয়। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস.

* শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

প্রমুখ তেজস্বী ব্রাহ্মগণের চেষ্টায় একটি পতিতা নারী ও কয়েকটী বিধবা মহিলার পুনর্ব্বিবাহ হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—"ঈশ্বরের অধীন হওয়া—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। সমাজভয়ে সত্য-প্রতিপালনে বিরত থাকাই প্রকৃত অধীনতা। আন্তরিক রিপুদিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই যথার্থ স্বাধীনতা। রিপুদিগের অধীন হইয়া পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা। পুরুষের সহিত প্রকাশ্যরূপে আলাপ করা, প্রকাশ্য পথে পদব্রজে অথবা অনাবৃতযানে বিচরণ করা, পুরুষদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া স্বাধীনতা প্রদর্শন করা, ইহার একটীকেও স্বাধীনতা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করে, সর্ব্বদা পুরুষমণ্ডলীতে অবস্থিতি করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন বলা যায় না।"*

অতঃপর তিনি বরিশাল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময়ে বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল; দুর্ব্বল ব্রাহ্মগণ আদি-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে 'যিশুখৃষ্ট, ইউরোপ ও আসিয়া' এবং 'গ্রেট ম্যান' নামক কেশববাবুর দুইটি বক্তৃতার গূঢ় ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, আদি-ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে খৃষ্টান বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। অসন্তোষ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। "মনুষ্য বিদ্বেষ-পরবশ হইলে কোন দুষ্কর্ম্মই তাহার অকৃত থাকে না। ধর্ম্ম লইয়া যেমন পরস্পরে অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া থাকে, ধর্ম্মের নামে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের পিতা হইয়াও পুত্রের প্রতি যে সকল দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা কে না অবগত আছেন? রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কে বলিতে পারে ব্রাহ্মসমাজ শান্তির নিকেতন?"†

ব্রাহ্মসমাজের এই সকল গোলযোগে গোস্বামী-প্রভুর মন বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অন্তরে সহিষ্ণুতা ছিল না; এবং তিনি পূর্ব্ববৎ দীর্ঘকাল যাবৎ উপাসনা করিতে পারিতেন না। তাহাতে উদ্বেগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তিনি শান্তির আশায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন ও প্রকৃতির শোভা দর্শনপূর্ব্বক হৃদয়ের জ্বালা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রতি রাত্রিতে একাকী গঙ্গাতীরে গমন করিতে লাগিলেন। বসন্তকালে

* গোস্বামী-প্রভুকৃত "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

† "ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

শান্তিপুরের গঙ্গাতীরের শোভা অতিশয় মনোরম। বহুবিস্তৃত শুভ্র বালুকা-রাশির উপরে চন্দ্রের কিরণ নিপতিত হইলে যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকটিত হয়, তাহা না দেখিলে অনুভূত হয় না। ঊর্দ্ধে সুনীল আকাশে নক্ষত্ররাজি-পরিবেষ্টিত নির্ম্মল চন্দ্রমার মনোহারিণী শোভা, নিম্নে স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী মৃদুমন্দ-গতিতে ক্ষীণ-কল্লোল বুকে লইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন; সেই তরঙ্গমালায় পূর্ণচন্দ্র যেন শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা বিস্তার করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে নিশাচর পক্ষিগণের সুমধুর ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। এই সকল শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে কাহার প্রাণ না শীতল হয়? গোস্বামী-প্রভু প্রতিদিন গঙ্গা-তীরে উপবেশন করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। জনসমাজের কুটিলতা, কপটতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির সংঘাতে হৃদয় উত্তপ্ত হইলে সাধুরা এইরূপেই প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে শান্তি ও বিশ্রামসুখ লাভ করেন।

এই সময়ে শান্তিপুরনিবাসী ৺হরিমোহন প্রামাণিক নামক একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের সহিত গোস্বামী-প্রভুর বন্ধুত্ব জন্মে। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে স্বীয় প্রাণের অবস্থা খুলিয়া বলিলে, তিনি গোস্বামী-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে অনুরোধ করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব, অতএব আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী—ইত্যাদি কোমল মধুর বাক্যে তাঁহাকে অনেক সময়ে সান্ত্বনা দিতেন। প্রামাণিক মহাশয়ের অনুরোধে গোস্বামী-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিনয়, ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সম্ভোগ প্রভৃতি তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে নিমজ্জিত করিল। 'জীবে দয়া ও নামে রুচি' এই তত্ত্বদ্বয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া গোস্বামী-প্রভু ভাবে বিভোর হইলেন এবং মনে মনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলেন।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় প্রামাণিক মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপাট কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে গমন করেন। আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন মাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপান করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, অতএব তাঁহাকে যেন স্বতন্ত্র পাত্রে পানীয় দেওয়া হয়। ইহা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"সে কি প্রভো! ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কি ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়? প্রভো! আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন না। দয়া ক'রে এই পাত্রেই জলপান করুন।" এই বলিয়া সুনির্ম্মল গঙ্গোদকপূর্ণ স্বীয় কমণ্ডলু তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভু নিরুত্তর হইয়া জলপান

করিয়া কমণ্ডলু রাখিয়া দিলে বাবাজী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীয় ললাটে ঠেকাইয়া অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া, উপস্থিত জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন—"বাবাজী! এ কি করিলেন? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন না।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আরে, আমার অদ্বৈতেরও ত পৈতা ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোঁসাই আচার্য্য!" ইহাতে পূর্ব্বোক্ত লোকটী একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তা ঠিকই ব'লেছেন, আচার্য্য! কেমন আচার্য্য দেখ্‌তে তো পাচ্ছেন? কেমন ধুতি-চাদর, কেমন জামা, কেমন জুতা, বাঃ!" বাবাজী মহাশয় সজলনেত্রে উত্তর করিলেন—"আহা! প্রভুকে পরিপাটী করে সাজান, এ তো আমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা তাহা পারিলাম না। প্রভু নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা যে একটু আনন্দ করিব, হায়! হায়! তাহাও আমাদের ভাগ্যে নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় বালকের মত 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।*

কাল্‌নাস্থিত এই আশ্রমেই গোস্বামী-প্রভু সর্ব্বপ্রথম ৺নাম ব্রহ্মের পূজা সন্দর্শন করেন এবং কলিযুগে এই পূজাই যে শ্রেষ্ঠ, ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হয়। উত্তরকালে কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যাদেশক্রমে, গোস্বামী-প্রভু ঢাকা নগরীতে স্বীয় গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে ৺নাম-ব্রহ্ম স্থাপনকরতঃ তাঁহার পূজা প্রচলিত করেন। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর, গোস্বামী-প্রভু তদীয় বন্ধু স্বর্গীয় নীলকমল দেবকে সঙ্গে লইয়া সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপ আগমন করেন। কালনার ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের ন্যায় ইনিও একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। এই দুইজন মহাপুরুষ গৌড়মণ্ডলে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মৃতপ্রায় ধর্ম্মকে কথঞ্চিৎ সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। তজ্জন্য সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ ইঁহাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। গোস্বামী-প্রভু নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় এই নবাগত অতিথিকে সাদরে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার আগমনে অতীব হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সদালাপের পর গোস্বামী-প্রভু বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভক্তি কিসে হয়?' এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সে কি প্রভু! তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ?

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য ও সেবক শ্রীমৎ কুলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "সৎগুরু সঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত।

ভক্তির ভাণ্ডারী হইয়া তুমি আমার মত জীবাধমের নিকট ভক্তি-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তোমার ললাটে তিলক, মস্তকে জটাভার ও গলদেশে তুলসীর মালা সন্দর্শন করিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয়ের এতদূর প্রেমোচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার সর্ব্বশরীর সিমুলের কাঁটার ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ও মস্তকের শিখাটী পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।* বলা বাহুল্য যে, সিদ্ধ-পুরুষের এই ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণেই সফল হইয়াছিল। গোস্বামী-প্রভু শেষজীবনে তিলক, মালা, জটা ইত্যাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর অনুরোধ পালনার্থ বাবাজী মহাশয় ভাব সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে উপদেশ দিলেন—"যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও তবে দীনহীন অকিঞ্চন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাকিতেও ভক্তিলাভ হইতে পারে না। জলের স্রোতঃ যেমন ঊর্দ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তদ্রূপ অহঙ্কারীর হৃদয়ে উদিত হয় না।"†

অতঃপর বাবাজী মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুকে একটী পাত্রে করিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য সাদরে প্রদান করিলেন। তিনি আহার করিয়া পাত্রটী একধারে রাখিয়া দিলে, তাহাতে যে ভুক্তাবশিষ্ট ছিল বাবাজী মহাশয় তাহা হঠাৎ স্বীয় মুখবিবরে প্রদানপূর্ব্বক ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—"চিত্রগুপ্ত সাক্ষী, আজ আমি আমার প্রভু-সন্তানের প্রসাদ পাইয়াছি।" গোস্বামী-প্রভু তাহার ঐ কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনি আমার ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিবেন না, আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হও আর যেই হও, অদ্বৈত-বংশে জন্মেছ। তোমার প্রসাদ আমি খাবো না? নিশ্চয়ই খা'ব।" অতঃপর গোস্বামী-প্রভু সিদ্ধ প্রেমিক মহানুভব চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শান্তিপুর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে গোস্বামী-প্রভু নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সার, কলিহত জীবের একমাত্র সাধন—'জীবে দয়া, নামে রুচি' তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক্ তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। কেশববাবু তখন প্রচারকদিগকে লইয়া প্রতিদিন বিশেষভাবে উপাসনা ও আলোচনাদি করিতেছিলেন। এই সময়ে এক দিবস গোস্বামী-প্রভুর অগ্রজ প্রভুপাদ ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতায় আগমন করিয়া, গোস্বামীজীর বাসভবনে নিম্নলিখিত সংকীর্ত্তনটী গান করিলেন।

---

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

† গোস্বামী-প্রভু প্রণীত "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

কীর্ত্তনের সুর।
"কাণু পরশমণি আমার।
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন,
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ গান,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের কি আর বাকী আছে)
আমি কৃষ্ণচন্দ্র-হার প'রেছি গলে॥"

তাল-লয়যুক্ত এই সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, উপস্থিত সকলেই ভক্তিভাবে বিগলিত হইয়াছিলেন। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজেও সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কেশববাবুকে অনুরোধ করিলে, তিনি সম্মতি প্রকাশ করিলেন। এই প্রকারে তদবধি ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন প্রচলনের সূত্রপাত হইল।

প্রভুপাদ ব্রজগোপাল, গোস্বামী-প্রভু অপেক্ষা ২৷৷০ বৎসরের বড় ছিলেন। ইনিও মাতুলালয় শিকারপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে দুই ভ্রাতার মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল। কেহই কাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইঁহাদের আহার নিদ্রা, শয়ন, উপবেশন, খেলাধুলা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই একত্র সম্পাদিত হইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের ভালবাসা অত্যধিক ঘনীভূত হইয়াছিল এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রভুপাদ ব্রজগোপাল বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতার অমতে কোন কার্য্যই করিতেন না। গোস্বামী-প্রভু উপবীত পরিত্যাগ করিলে, শান্তিপুর-সমাজ কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া যদিও ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয় প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরের বন্ধন বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই।

যুগাবতার নদীয়াবিহারী শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত সুবিমল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গ্লানি দূর করা দুই ভ্রাতার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল; এবং দুইজনে দুইটী স্বতন্ত্র প্রণালী দ্বারা সেই কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ইত্যাদির সহায়তায় শিক্ষিত সমাজের ভিতরে কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী-মহাশয় অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে কথকতা ও সংকীর্ত্তন দ্বারা শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত বৈষ্ণবাচার সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করাইবার জন্য শান্তিপুরের বড় গোস্বামী বাড়ীর প্রসিদ্ধ কথক প্রভুপাদ তারণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে কথকতা শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

প্রভুপাদ ব্রজগোপাল গোস্বামী অতীব সুগায়ক ছিলেন। শেষ রাত্রে তিনি যখন গৃহের ছাদে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভোর কীর্ত্তন করিতেন, তখন সুদূর গুপ্তিপাড়া, কালনা, সাড়াগড়, ছোট রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে তাহা শুনা যাইত, এবং সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁহার ভক্তিবিগলিত গানে আকৃষ্ট হইয়া তত্তৎ অঞ্চলের ভগবদ্ভক্তগণ স্ব স্ব ইষ্টদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার গানে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, শুধু গান শুনিবার জন্যই তিনি দুই তিন বার শান্তিপুরে তাঁহার আলয়ে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৺ব্রজগোপাল গোস্বামী কথকতার সময়েও মধ্যে মধ্যে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে ধর্ম্ম বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে যত্ন করিতেন; এবং উহার ফলও অতীব সন্তোষজনক হইত। তাঁহার ভক্তিরসপূর্ণ কথকতা, তাঁহার তাল-লয়সমন্বিত সুমধুর গান শ্রবণে বহুলোকের ধর্ম্মভাব বিকশিত হইত। তিনি কথকতা করিতে যখন যে স্থানে গমন করিতেন, তখন সেই স্থানেই একটী ছোটখাট মহোৎসব সম্পন্ন হইত। তাঁহাব সুমিষ্ট প্রাণস্পর্শী কথকতা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বহুদূর হইতেও দলে দলে লোক আগমন করিত; এবং কথা অন্তে তাঁহার সহিত একত্র তারকব্রহ্ম হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া গ্রামবাসিগণকে মাতাইয়া তুলিত। এইরূপে স্বীয় জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করতঃ, তিনি ৩৭।৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রংপুর জেলার অন্তর্গত রসুলপুর নামক গ্রামে, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মণ্ডল গোপের বাটীতে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

তাঁহার তিরোধানের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কতিপয় শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে মৃত্যু অন্তে তাঁহার দেহ সৎকার না করিয়া যেন সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু গোস্বামী-সন্তানের দেহ সমাধিস্থ করিয়া রীতিমত ভোগ পূজাদি দিতে না পারিলে অপরাধ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া উপস্থিত গরীব শিষ্যগণ তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ সৎকার করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিকটবর্ত্তী তিস্তা ও মানস নদীর সঙ্গমস্থলে শবসহ উপনীত হইল। এই সময়ে একটী অতীব বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। পরিত্যক্ত দেহ নদীতীরে জনৈক সঙ্গীয় লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, অবশিষ্ট শব দাহকগণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য ইতস্ততঃ গমন করিল; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তথায় শব অথবা প্রহরীকে না দেখিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অতঃপর প্রহরীকে অনুসন্ধান করিয়া শবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল যে, তাহারা কাষ্ঠ-সংগ্রহ করিবার জন্য অন্যত্র গমন করিবার কিয়ৎকাল পরে উক্ত শবে জীবনসঞ্চারের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া ভয় পাইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। শবের কথা সে কিছুই বলিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া তাহারা পুনরায় নদীতীরে আগমনপূর্ব্বক, জলে স্থলে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও শবের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে স্ব স্ব

স্থানে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার পর দিবস রংপুর, চিলমারীনিবাসী, জনৈক ভগবদ্ভক্ত, ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী-মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য রসুলপুর আগমন করেন। তিনি প্রভুপাদের তীরোধানের কথা অবগত ছিলেন না। পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি প্রভুপাদের দর্শন পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী-মহোদয় তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবন রওয়ানা হইয়াছেন, আর দেশে ফিরিবেন না; অতএব দুর্গানন্দ নামক তদীয় শিষ্যের নিকটে তাঁহার যে গচ্ছিত ধন আছে, তদ্দ্বারা যেন শীঘ্রই মহোৎসব করা হয়। লোকটী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে দুর্গানন্দের বাটীতে উপনীত হইয়া ঐকথা উল্লেখ করিলে তাহারা আনন্দে বিস্ময়ে অভিভুত হইল, কারণ তাহারা প্রভুপাদের দেহত্যাগের কথা অবগত ছিল। অতঃপর একাদশ দিনে শ্রীমান্ দুর্গানন্দ, স্বীয় গুরুদেব কর্ত্তৃক গচ্ছিত অর্থাদির দ্বারা মহাসমারোহে মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

গোস্বামী-প্রভু কোন এক সময়ে স্বীয় অগ্রজের তিরোধানের স্থান দর্শন করিবার জন্য তিস্তা-মানস সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে তর্পণ করিয়াছিলেন। *

গোস্বামী-প্রভুর উদ্যোগে অতঃপর কলিকাতার অন্তর্গত উল্টাডিঙ্গির ৺মনোহরদাস বাবাজী মহাশয় দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন করান হইল। তিনি গান করিলেন—

"প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন,
বিলাইছেন প্রেমসুধা দেখি দীনহীন রে।"—ইত্যাদি।

এই দিবস ব্রাহ্মসমাজে এক অপূর্ব্ব ভাবের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কিছু দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেকে অহৈতুকী ভক্তিরসে পরিষিক্ত হইতে লাগিলেন। ৺গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচলনের পর ব্রাহ্মসমাজের এক অপূর্ব্ব কল্যাণকর যুগান্তর উপস্থিত হয়। কলিকাতায় যেমন কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তদ্রূপ অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজেও কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। ঢাকা-ব্রহ্মসমাজে কীর্ত্তনের বিশেষ প্রচলন হইল। যে সংকীর্ত্তন-মদিরাপানে এক সময়ে সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, যাহার উত্তাল তরঙ্গ-সংঘাতে দেশ হইতে জাতিগত, বর্ণগত, অর্থগত সর্ব্বপ্রকারের হিংসা-বিদ্বেষ তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল; বলিতে কি, যাহার প্রভাবে সমগ্র বাঙালী জাতি এক দিব্য নবজীবন লাভ করিয়াছিল, সেই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ কীর্ত্তনকে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরা এতদিন ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। তাঁহারা ইহাকে নিম্নশ্রেণীর লোকের ও আউল, বাউল প্রভৃতি শাস্ত্র-সদাচার-বিবর্জ্জিত উপধর্ম্ম-যাযকদিগের ভজন-

---

* ৺ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের পৌত্র এবং 'বালক বিজয়কৃষ্ণ' নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রভুপাদ সীতানাথ গোস্বামী-প্রদত্ত বিবরণ।

প্রণালী বলিয়াই জানিতেন। কলিহত জীবের উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরণায়, গোস্বামী-প্রভু এতদিন পরে আবার সেই সংকীর্ত্তন পুনঃপ্রচলন করিলেন, এবং শিক্ষিত-সমাজে ইহা সাদরে পরিগৃহীত হইল।

গোস্বামী-প্রভুর প্রথম-রচিত ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তন দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। কীর্ত্তনের সুর—লোফা।

পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব ক'রো না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।

২। কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

পতিতপাবন ভকতজীবন অখিলতারণ
বল রে সবাই।
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে।
যাঁরে ডাক্‌লে পাপী ত'রে যাবে।
ওরে, এমন নাম আর পাবি না রে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঢাকা-সহরে প্রচারক্ষেত্র-স্থাপন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও চিকিৎসা-ব্যবসায়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে হৃদ্‌রোগের উদ্ভব, তন্দ্রাবস্থায় মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তি, কেশববাবুর সহিত মতভেদের সূচনা।

১৭৮৭ শকে গোস্বামী-প্রভু ঢাকা সহরে স্থায়ীভাবে প্রচার-ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, স্বোপার্জ্জিত অর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অভিপ্রায়ে, চিকিৎসা-ব্যবসায় ও ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্য একত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার উদ্যোগে "১২৭২ সনে 'ঢাকা সঙ্গতসভা' সংস্থাপিত হয়। বাবু বঙ্গচন্দ্র রায়, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ভুবনমোহন সেন, রজনীকান্ত ঘোষ এবং আরও কয়েকটী শিক্ষিত যুবক এই সভার সভ্য ছিলেন। * * * ১২৭৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ব্রহ্মমন্দির-কার্য্য শেষ হইলে, ২১।২২শে অগ্রহায়ণ অতি-সমারোহসহকারে গৃহ-প্রবেশ-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে কেশববাবুকে পুনরায় আহ্বান করা হয়। গোস্বামী-প্রভু তৎকালে এখানকার উপাচার্য্য ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিলে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন।

"এমন সময় কিপ্রকার লোক সমাজের উপাচার্য্য নিযুক্ত হইতে পারেন এবং সমাজ-গৃহে খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তন হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া যুবক ও অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ হয়। যে সকল ব্যক্তি নিজে পৌত্তলিক-ক্রিয়া করেন কিংবা তাহাতে যোগ দেন, এমত লোক ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য নিযুক্ত হইতে পারেন না, যুবকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন। বয়স্কদিগের উহাতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু সমাজ-গৃহে খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তনে আপত্তি করেন। যুবকগণ খোল-করতাল ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিক বয়স্কদিগের মত প্রবল হওয়াতে, যুবকগণ 'ঢাকা-প্রকাশ' পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে একটী উপাসনা-সমাজ স্থাপন করেন। ১২৭৭ সনের ভাদ্র মাসে এই ঘটনা ঘটে। প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে এখানে থাকিয়া যুবকগণকে পরিচালিত করেন। ১২৮০ সনে পুনর্ব্বার যুবকমণ্ডলী আহূত হন।"

* ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজচন্দ্র-প্রচারক-নিবাসে প্রবেশের দিন পঠিত।

ভগবিধানে পুনর্ব্বার দুই দল মিলিত হইলে, প্রবলবেগে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল। গোস্বামী-প্রভু ঢাকা-সহরীকে কেন্দ্র করিয়া মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলার কোন স্থানে নৌকা-যোগে, কোন স্থানে পদব্রজে গমন করিয়া, কখনও সম্পূর্ণ অনাহারে, কখনও বা চিড়ামুড়ি মাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক, অক্লান্ত-পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব বাঙ্গালা মাতিয়া উঠিল, এবং সহস্র সহস্র নরনারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

এখনকার মত সেই সময়ে যাতায়াতের সুবিধা না থাকাতে এবং অনেক সময়ে অর্থাভাবে, দূরবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণকালে গোস্বামী-প্রভুকে কিরূপ ভয়ানক ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার ঢাকা হইতে শিবসাগর যাইবার সময়ে গোস্বামী-প্রভু ষ্টিমারের মধ্যে ৫।৬ দিন উপবাসী ছিলেন। পথিমধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ষ্টিমার লাগিলে, তিনি তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্নানাদিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নদীর কিনারা হইতে কিছু পলিমাটি ও জল পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। নিজের প্রয়োজনের জন্য অপরের নিকট যাঞা করাকে তিনি এতদূর হেয় জ্ঞান করিতেন যে, উক্ত ষ্টিমারের মধ্যে পরিচিত লোক থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের নিকটে আপনার এই প্রাণান্তকর অসহ্য অভাব আভাসেও জ্ঞাপন করেন নাই।

এক সময় জনৈক পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পদব্রজে মৈমনসিংহ যাইবার পথে গোস্বামী-প্রভু ভয়ঙ্কর বন্য-মহিষের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। হিংস্র বন্য মহিষ দূর হইতে তাঁহাদিগের প্রতি শৃঙ্গ খাড়া করিয়া বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পথপ্রদর্শক ইহা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। গোস্বামী প্রভুও অন্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া, পথিমধ্যে উপবেশন করিয়া মুদ্রিত-নয়নে ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সেই গ্রাম্য পথটি খুব অপ্রশস্ত ও উহার দুই পার্শ্বে সুদীর্ঘ কাশবন বিদ্যমান ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হইয়া কাশবন অন্দোলিত হওয়াতে, মহিষের গতি কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হইল। ইত্যবসরে পথপ্রর্শক অদূরে একটী কুম্ভকারের গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, গোস্বামী-প্রভুর হস্তধারণপূর্ব্বক তথায় লইয়া গেল। তখন বিপদবারণ মধুসূদনের কৃপা স্মরণপূর্ব্বক গোস্বামী-প্রভু মনের উল্লাসে গান ধরিলেন, পথপ্রদর্শক পুনরায় বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাহাতে বাধা প্রদান করিল। ক্ষণকালের মধ্যে বায়ুবেগ শান্ত হইল, মহিষও ভীমবেগে লক্ষ্য স্থানে আগমন করিল; কিন্তু আগন্তুকদিগকে তথায় দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গর্জ্জন করিতে

করিতে শঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা খনন ও মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরিশেষে ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল। *

আর একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য ঢাকা হইতে নৌকাযোগে কোন স্থানে গমনকালে পদ্মা নদীতে ঝড়তুফানে গোস্বামী-প্রভুর নৌকা জলমগ্ন হয়। মাঝি-মাল্লারা কে কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। নৌকা মগ্ন হইবার পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভুর জ্ঞান ছিল। এতদবস্থায় তিনি অনুভব করিলেন যে, নৌকা একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিয়াছে এবং কে যেন তাহা টানিয়া কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে। ইহার পর গোস্বামী-প্রভু অচেতন হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কয়েকজন ধীবর তাঁহাকে একটী চড়ার উপর রাখিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিতেছে। তিনি কি প্রকারে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এই কথা গোস্বামী-প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহাদিগের মধ্যে একজন এইরূপ উত্তর করিল যে, ঝড়ের সময়ে দূর হইতে তাহারা একখানি নৌকা ডুবিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু তুফানের আধিক্যবশতঃ সাহায্যার্থে আগমন করিতে পারে নাই। ঝড় থামিয়া গেলে নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, চড়ার উপর একখানি নৌকা রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে তিনি অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে যত্ন করাতে, ভগবানের কৃপায় এখন কৃতকার্য্য হইয়াছে। গোস্বামী-প্রভু কত সময়েই যে এইরূপ কত বিপদে পড়িয়াছেন এবং ভগবানের কৃপায় আশ্চার্যভাবে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে সকল স্মরণ করিলে ভয়ে বিস্ময়ে এবং কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারে অনেক সময়ে বিঘ্ন ঘটিত, অথচ চিকিৎসা-কার্য্য পরিত্যাগও করিতে পারেন না; কারণ, তিনি কাহারও নিকটে কিছুরই প্রত্যাশা না রাখিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারাই পরিবার প্রতিপালন করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; এবং ব্রাহ্মসমাজও তখন পর্য্যন্ত প্রচারকদিগের ব্যয়ভার বহন করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। গরীব রোগীদিগের সুবিধার জন্য গোস্বামী-প্রভু আট আনা মাত্র দর্শনী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাও আবার সকলের নিকটে গ্রহণ ত করিতেনই না, বরং তাঁহাকে অনেক সময়ে রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্যের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত।

গোস্বামী-প্রভুর চিকিৎসা-ব্যবসায়ের সঙ্গে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনার সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বপ্নযোগে গোস্বামী-প্রভুকে অনেক কঠিন রোগের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন; এবং ঐ সকল ব্যবস্থানুসারে চিকিৎসা করিয়া তিনি আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন।

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত

এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। গোস্বামী-প্রভু শয়ন করিবার সময়ে কাগজ ও পেন্‌সিল বিছানায় রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। রাত্রিকালে যেদিন ঐরূপ স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা জাগরিত হইয়াই স্মরণ থাকিতে থাকিতে লিখিয়া রাখিতেন। গোস্বামী-প্রভু শান্তিপুরে অবস্থানকালে তথায় একবার ভীষণ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেক লোক মরিতে লাগিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া চিকিৎসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্ববর্ণিত ডাক্তারবাবু একখানি ব্যবস্থাপত্র লিখাইয়া দিলেন। গোস্বামী-প্রভু পরদিন প্রত্যূষেই রোগীদিগকে ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেবারও ঔষধটী অব্যর্থ ফলপ্রদ হইল। বহুলোক এই দৈব ঘটনায় বাঁচিয়া গেল। ব্যবস্থাপত্রে কৃমি-নিবারক সেণ্টনাইন ও সোডা এই দুইটী মাত্র ঔষধ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরিশেষে গোস্বামী-প্রভু দেখিলেন যে, সেবারকার বিসূচিকা রোগ কৃমি দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত অপরাপর চিকিৎসকগণ ঐ রোগে সাধারণ ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া একটী রোগীকেও বাঁচাইতে পারেন নাই।

গোস্বামী-প্রভু যখন যে রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিতেন, তখন তিনি প্রাণপণ করিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর হইতেন। একবার শান্তিপুরের অপরপাড়স্থিত গুপ্তিপাড়ার একটী রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীন হয়। তিনি প্রাতে খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, রোগী দেখিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রোগীর অবস্থা খারাপ ছিল, সুতরাং ঔষধাদি লইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে না দেখিলে চলে না। এদিকে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একে বর্ষাকাল, তাহাতে আবার ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত—কাহার সাধ্য নদী পার হয়? খেয়া-নৌকার পাটনী ঈদৃশ ঝড়তুফানের মধ্যে কিছুতেই গোস্বামী-প্রভুকে পার করিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তিনি ঔষধের শিশি বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া মস্তকে বাঁধিয়া, ভীষণ-তরঙ্গসমাকুল ভাদ্র মাসের ভরা নদী সন্তরণ পূর্ব্বক্ পার হইলেন; এবং যথাসময়ে রোগীর বাটীতে উপনীত হইয়া, উপস্থিত সকলকে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিলেন। এবম্প্রকার দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক্ সংসারক্ষেত্রে কে কবে দেখিয়াছে?

একবার একটী কঠিন রোগীর চিকিৎসার ভার গোস্বামী-প্রভুর উপর অর্পিত হইলে, তিনি যথাসাধ্য তাহার রোগ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, তাহার আত্মীয়-স্বজনকে অপর চিকিৎসক্ ডাকিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে একজন বড় ডাক্তার ডাকা হইল এবং তাঁহার চিকিৎসায় রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল। এই ঘটনায় গোস্বামী-প্রভু দেখিতে পাইলেন যে, তিনি প্রকৃত রোগ চিনিতে পারেন নাই, এবং রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিলে নিশ্চয়ই মারা পড়িত। ইহাতে তিনি এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, যাহাতে লোকের জীবনমরণের ভার

গ্রহণ করিতে হয়, এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এমন সময়ে একদিন স্বপ্নযোগে স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"তোমাকে কেবল চিকিৎসা-ব্যবসায় করিলে চলিবে না। যাহাতে লোকের ভবরোগের চিকিৎসা হয়, তাহাও করিতে হইবে।" ইহার পর গোস্বামী-প্রভু নিজের পরিবার প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর অর্পণপূর্ব্বক্ চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন এবং সাংসারিক সুখদুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অদম্য উৎসাহে বঙ্গদেশের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামী-প্রভু তদীয় বন্ধু ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অধমের নিবেদন,

আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্যবসায় করা আমার কার্য্য নহে। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম। বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই আপনার গৃহ শূন্য থাকিবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আমাকে সাহায্য করেন ভালই, না করেন তাহাও ভাল। ঈশ্বরের চরণে শরীর-মন বহুদিন অবধি বিক্রয় করিয়াছি। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর আমাকে স্নেহের সহিত সাহায্য করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক। আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক্। ১৭৮৭ শক, পৌষ, ঢাকা।"

এই বৎসর ব্রহ্মোৎসবের সময়ে গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলে, মহাসমারোহের সহিত উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইল। চারিদিকে ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, ঘরে ঘরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হইতে লাগিল। উৎসবান্তে শ্রদ্ধেয় কেশববাবু কিয়ৎকাল সপরিবার মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তথাকার কতিপয় ব্রাহ্ম, কেশববাবুকে অবতার মনে করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ, পাদপ্রক্ষালনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই কার্য্য গোস্বামী-প্রভু প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বোধ হওয়ায়, তাঁহারা কেশববাবুকে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে কেশববাবু বলিলেন যে, তিনি মানুষের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। কেশববাবুর এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, তাঁহারা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেশববাবুর অনুগত লোকেরা এই ঘটনায়, গোস্বামী-প্রভুর উপর এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে অবিশ্বাসী নাস্তিক

বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এই সকল গোলযোগ উপস্থিত হইলে, গোস্বামী-প্রভু শান্তিপুরে নির্জ্জনে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। গোস্বামী-প্রভুর কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—"আমি তোকে ঘর হইতে বাহির করিলাম, আবার তুই গৃহে প্রবেশ করিলি? আমি তোকে কিছুতেই সংসারে লিপ্ত হইতে দিব না।" গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেও অনেকবার ৺শ্যামসুন্দর, কখনও স্বপ্নে কখনও বা জাগ্রতাবস্থায় তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। কিন্তু, তিনি বেদান্ত পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পরে, ঐ সকল ব্যাপার তাঁহার নিকটে কল্পনা অথবা মস্তিষ্কের কোনরূপ ক্রিয়া বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে, কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার দর্শন ও কথাবার্ত্তা একেবারেই বন্ধ ছিল। বহুদিন পরে আজ আবার ৺শ্যামসুন্দর গোস্বামী-প্রভুর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।*

এদিকে প্রকাশ্য পত্রিকায় নরপূজার প্রতিবাদ হইতে থাকিলে কেশববাবুর চৈতন্য জন্মিল। তিনি পদধারণ, চরণে পড়িয়া ক্রন্দন ইত্যাদি কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। যে দুইজন ব্রাহ্ম কেশববাবুকে অবতার মনে করিতেন, তাঁহারা কেশববাবু অবতার কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহারা কেশববাবুকে ভণ্ড বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন। কেশববাবু শান্তিপুরে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিলেন এবং যাহাতে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় ও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই পত্র পাইয়া গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমন করিয়া, পুনরায় সর্ব্বান্তঃকরণে কেশববাবুর সহিত মিলিত হইলেন; এবং তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার বিরোধীদলের ভিতরে সদ্ভাব স্থাপিত হইল। এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি তাৎকালিক "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় যে একখানি বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

"ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েকজন ব্রাহ্মভ্রাতার ভক্তিপ্রকাশের আতিশয্য দর্শনে ব্যথিত হইয়া তন্নিবারণের জন্য আমি বিগত আশ্বিন মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে এবং অনেকস্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে উৎসাহপূর্ব্বক পরস্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির অবিশ্বাস ও

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত

কুসংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে। এই সমুদয় অনিষ্ট ফল দেখিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। আমি অনেকটা এই আন্দোলনের মূল কারণ। এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে। অতএব ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এসময় চেষ্টা লওয়া কর্ত্তব্য। আমার পূর্ব্বাবধি হৃদ্‌গত ভাব কি এবং আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট বিনীতভাবে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন, যেন এই পত্রদ্বারা সকলের সন্দেহ ও বিষাদ দূর হয় এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সদ্ভাবের বিস্তার হয়।

"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে উল্লিখিত ভ্রাতারা যে প্রণালীতে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষনীয় ও অনিষ্টকর। কিন্তু এরূপে ভক্তি প্রকাশ করা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কি না, তাহা আমি পূর্ব্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবশ্যই দূষিত মূল থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে মনুষ্য উপাসনা দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। এবং এ সম্বন্ধে মুঙ্গেরে ও এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওয়াতে আমার উক্ত সংস্কার দৃঢ়ীভুত হইয়াছিল। এখন আমার সে সংস্কার নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে কেবল বাহ্যিক কার্য্যে ও শব্দে আতিশয্য দোষ আছে; তাঁহাদের মতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনুষ্য উপাসনা করেন না এবং ঈশ্বরের অথবা মুক্তিদাতা অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তীজ্ঞানে কোন মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করেন না। কেশববাবুর প্রতি তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই অযৌক্তিক হউক না কেন, তথাপি আমি ইহা কখনও মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা উক্ত মহাশয়কে ভক্তপরিবারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য কোনভাবে দেখেন। এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুষ্যের প্রতি যতই অল্প হয়, ততই ভাল। কেননা তদ্দ্বারা অপরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে তাঁহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাঁহারা দুর্ব্বল ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য যেন এরূপ বাহ্য লক্ষণ রহিত করেন, যদ্দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদের অপকার হইতে পারে।

"ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ করি নাই। অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে সম্মানার্থ যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনি তজ্জন্য দায়ী নহেন। তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাষী নহেন; তজ্জন্য কাহাকেও অনুরোধ করেন নাই। বরং ইহা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে ঐরূপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ করেন নাই, তাঁহার কেবল এইটুকু ত্রুটি আমি দেখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহার অণুমাত্র অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি।"

"এক্ষণে আমার শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্ত্তমান আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হউন। তাঁহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই। এমন নিরর্থক ভ্রাতাদের দোষ ঘোষণা করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। তাঁহারা যখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করেন না, তখন তাহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যায়। এতকাল যাঁহাদের সংসর্গে থাকিয়া আমরা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাঁহাদিগের সরল সত্য বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য্য সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভক্তিভাজন কেশববাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীতে তাঁহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকেও যথাপরিমাণে সম্মান করেন। ইহাদ্বারা তাহাদের মত সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না। কারণ সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। অতএব আসুন পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় এক পরিবার মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন এবং উহা বিস্তারপূর্ব্বক পরস্পরে অমূল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য সম্ভোগ করি। পরিশেষে সমুদয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা কেশববাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ না করেন এবং তাঁহার অনুগত শিষ্যদিগের প্রতি মনুষ্যোপাসনা দোষারোপ না করেন। আমার হৃদ্গত বিশ্বাসসূচক এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা সকল সংশয় দূর করুন। বর্ত্তমান গোলযোগে চতুর্দ্দিকে যে ভয়ানক শুষ্কতার মহামারী উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে যত্নশীল হইয়া আপনাদিগের এবং দেশস্থ ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন।

১৭৯১ শক,
১৫ই আষাঢ়। } শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

এই ঘটনা উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন,—"১৮৬৯ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মের শেষে কেশববাবুর দলের সহিত তাঁহার (গোস্বামী মহাশয়ের) পুনর্ম্মিলন হয়। সেই সময়ে গোঁসাইজীর মহত্ত্ব দেখিলাম। তিনি যেই বুঝিলেন যে তিনি যাহাকে নরপূজা মনে করিয়াছিলেন, তাহা নরপূজা নহে, ভক্তিপ্রকাশের আতিশয্য মাত্র, অমনি কেশববাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজের বহুসংখ্যক লোক গোঁসাইজীর পশ্চাদ্গামী। তিনি মনে করিলে নিজের একটা দল বাঁধিতে পারিতেন। কিন্তু সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের জয় চাহিলেন না, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয় চাহিলেন। ইহাতে তিনি আমার হৃদয়ের নিকট সহস্রগুণে প্রিয় হইলেন।"

এই সকল গোলযোগের কিছুদিন পর, ১২৭৬ সনের ৭ই ভাদ্র, রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই দিনের জীবন্ত উপাসনায় ও স্বর্গীয় উৎসাহের স্রোতে ব্রাহ্মদিগের পূর্ব্বের মনোমালিন্য ধুইয়া গেল, এবং ৺আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কেশববাবু ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় ছয় মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পরেই ব্রাহ্ম-বিবাহ-বিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতে লাগিল। আদি-ব্রাহ্মসমাজ ইহার প্রতিবাদ করাতে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। দুই সমাজের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে সদ্ভাবটুকু আগমন করিয়াছিল, এই ঘটনায় তাহা একেবারেই বিলুপ্ত হইল। কেশববাবু প্রমুখ ব্রাহ্মগণ আদিসমাজের কথা উপেক্ষা করিয়া, যাহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাবের বৃদ্ধি হয়, তাঁহাদের উপাসনা জীবন্ত হয়, এ বিষয়ে যত্নবান হইলেন। কেশববাবুর উদ্যোগে 'ভারতসংস্কার' নামে একটী সভা স্থাপিত হইল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, 'সুলভ সমাচার' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ, দাতব্য-ঔষধালয় স্থাপন, সুরাপান নিবারণ, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্যের ভার সভা গ্রহণ করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে এক এক জন একটী অথবা ততোধিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, অতীব উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

"এই উন্নতির সময়ে কতকগুলি ব্রাহ্ম এই বলিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিলেন যে "ব্রাহ্মিকাদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে যবনিকার অভ্যন্তরে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহারা বাহিরের পুরুষদিগের সঙ্গে বসিবেন। যদি ভ্রাতা ভগ্নী এক সঙ্গে উপাসনা করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা করিতে গমন করিব না।" আচার্য্য মহাশয় (কেশবচন্দ্র সেন) এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য প্রকাশ্যস্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই অবকাশে প্রস্তাবকারিগণ স্ত্রীপুরুষে একত্রিত হইয়া পৃথক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইলেন, কেশববাবু এবং দুই একজন প্রচারকের প্রতি বিরক্ত হইয়া দেবেন্দ্রবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) রাজনারায়ণবাবুকে (রাজনারায়ণ বসু) ঐ সমাজের উপাচার্য্য মনোনীত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মেরা পৃথক হইয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রচারকদিগের দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব্ব হইতে প্রচারকদিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাঁহারা এই সুযোগে মন্দিরত্যাগী ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রচারকদিগের নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ ধর্ম্মের

অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সাধারণের দুর্ব্বলতা উল্লেখ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য অনেকেই মনে মনে বিরক্ত থাকেন, সময় পাইলেই মনের ভাব প্রকাশ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাঁহারা অত্যন্ত বিনীত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন, অল্পদিন মধ্যে তাঁহারাও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত ও অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।"

"অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রচারকগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন, তবে তাঁহাদিগের সহিত স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মদিগের বিবাদ হইল কেন? প্রচারকগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন। তাঁহারা বলেন স্বাধীনতা অন্তরে—স্বাধীনতা বাহিরে নাই। মন জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রী জাতিকে প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা কর্ত্তব্য বুদ্ধি বলবতী হইলে, বিবেক প্রস্ফুটিত হইলেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে মন নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতি যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার নাম লইয়া স্ত্রীজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী করা উচিত নহে। স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের উপর গালি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু শান্তি সদ্ভাব ছিল, এই আন্দোলনে তাহাও তিরোহিত হইতে লাগিল।"*

পূর্ব্বোক্ত কলহবিবাদে ব্রাহ্মসমাজকে একেবারে ছারখার করিবার উপক্রম করিলে, ব্রাহ্মগণের হিতসাধনমানসে গোস্বামী-প্রভু যে দশটী নিয়ম উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। "প্রতিদিন অন্যূন তিনবার পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে। অভ্যস্ত কতকগুলি বাক্য বলিয়া উপাসনা শেষ না করিয়া জীবন্তভাবে উপাসনা করিতে হইবে। প্রথমে বাহ্যজগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এমনই অভ্যাস করিতে হইবে যে, বাহ্য সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের শোভা না দেখিলে সকল সুন্দর পদার্থকেই শূন্য বোধ হইবে। যেখানে প্রকৃতি স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, সেখানে ঐ প্রকার সাধন করা কর্ত্তব্য। এই সাধন অভ্যস্ত হইলে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে সকল স্থানেই উপলব্ধি করা যাইবে। পাপ করিতে আর সাহস থাকিবে না। এই সাধন বিশেষরূপে আয়ত্ত হইলে মন আর উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তখন মনে হইবে যে চক্ষু যদি অন্ধ হয়, তবে

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনের পরীক্ষিত বিষয়" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব ? অতএব দয়াময় নামের মধ্যে তাঁহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে নাম সাধন সার্থক হইবে। নাম সাধন করিতে করিতে নাম আর তিনি অভিন্ন হইবেন, তখন নামকে গুটিকত অক্ষর বলিয়া বোধ হইবে না, নামের ভাবের মধ্যে পূর্ণব্রহ্মকে দর্শন করিয়া প্রাণ মন শীতল হইবে। নাম সাধন হইলে অন্তরে পিতার সহিত যোগসাধন করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা হইবে। অন্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত হইবেন, হৃদয় অনিমেষলোচন তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে। এই যোগসাধনই পরলোকের একমাত্র সম্বল। এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা হৃদয় বিনীত হইয়া দীনহীনভাবে পিতার চরণে পড়িয়া থাকে। নিন্দা প্রশংসায় সাধকের মন বিচলিত হয় না, সুতরাং তাহার নিকট বিবাদ বিসম্বাদ অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এরূপ সাধন আরম্ভ না করিলে ব্রাহ্মসমাজে মঙ্গল হইবে না। সাধন না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২। কেহ বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবেন না। মনে যাহা সত্য জানিবেন, কার্য্যে তাহা পরিণত করিবেন। সহস্র ক্ষতি হইলেও কপট আচরণ করিতে পারিবেন না।

৩। কেহ ভ্রাতার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

৪। সুরাসক্তি, মাদক সেবন, কোন প্রকার মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি পাপাচরণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে।

৫। ব্রাহ্ম যেমন ঘৃণার সহিত পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তেমনই শ্রদ্ধার সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাপ করা যেমন অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য পালন না করাও সেইরূপ অধর্ম্ম।

৬। কাহার দোষ দেখিলে, তাহার দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং গোপনে তাহাকে সংশোধন করিবে। ভ্রাতার দোষ লইয়া উপহাস করিবে না।

৭। যেমন নির্জ্জনে উপাসনা করিবে, তেমনি নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা করিবে।

৮। স্বীয় দুর্ব্বলতাকে সমর্থন না করিয়া বিনীতভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিবে।

৯। কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়া উপহাস করিলে কর্ণে হস্ত দিয়া তাহার কথাকে অগ্রাহ্য করিবে।

১০। ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি, অনন্ত উন্নতি

প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করা হইবে না।"*

এই সময়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেহালা নামক গ্রামে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ব্বোক্ত ভারত-সংস্কার সভা ঐ স্থানে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, তাহার পরিচালনের ভার গোস্বামী-প্রভুর উপরে ন্যস্ত করেন। তিনি অতি প্রত্যুষে ঔষধাদি সঙ্গে লইয়া পদব্রজে বেহালায় গমন করিতেন এবং ঔষধ বিতরণ করিয়া তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কোন কোন দিন দ্বিপ্রহরও অতীত হইত; তৎপরে তিনি স্নানাহার করিতেন। আহারান্তে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন; রজনীযোগে আবার সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পূর্ব্বাপর ক্রমাগত এই প্রকার পরিশ্রমে গোস্বামী-প্রভুর হৃদ্‌রোগ উপস্থিত হইল। দারুণ হৃদ্‌রোগে সময়ে সময়ে তিনি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন। এক দিন ঐ রোগে তিনি এত অধিক সময় পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন যে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে মৃতজ্ঞানে আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর, ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরী মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় সেবারের মত তাঁহার মূর্চ্ছা অপনীত হইল বটে, কিন্তু এখন হইতে গোস্বামী-প্রভু হৃদ্‌রোগের যন্ত্রণাধিক্যে যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এই জন্য অবশেষে শ্রদ্ধেয় কেশববাবু সর্ব্বদা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে, "কলিকাতার জগন্নাথঘাটে একজন সাধু অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকটে হৃদ্‌রোগের ঔষধ আছে। তুমি তথা হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সেবন কর।" কিন্তু গোস্বামী-প্রভু প্রথমতঃ স্বপ্নে তেমন আস্থা প্রদান করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন গত হইলে দ্বিতীয়বার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া উহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অতঃপর একদিন তিনি জগন্নাথঘাটে অনুসন্ধান করিয়া সেই সাধুর দর্শন পাইয়া, তাঁহার নিকটে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন? সাধুর নিকটে যে অল্প পরিমাণ ঔষধ ছিল, তাহা তিনি তখনই গোস্বামী-প্রভুকে সাগ্রহে প্রদান করিয়া বলিলেন—"ইহা দ্বারা ব্যারাম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে না, তবে মূর্চ্ছা অপনীত হইবে। আর কয়েক দিবস পূর্ব্বে আসিলে অধিক ঔষধ দিতে পারিতাম।" সেই ঔষধ সেবন করিবার পর বস্তুতই তাঁহার মূর্চ্ছা দূরীভূত হইল, কিন্তু ব্যাধির মূল উৎপাটিত হইল না।

অনন্যোপায় হইয়া অতঃপর গোস্বামী-প্রভু মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, প্রসিদ্ধ চিবার্চ্চ সাহেবের শরণাপন্ন হন। গোস্বামী-প্রভু যখন মেডিকেল কলেজে

---

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার (গোস্বামী-প্রভুর) জীবনের পরীক্ষিত বিষয়" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া, সুবিজ্ঞ গুণগ্রাহী মহামতি চিবার্চ্চ সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। প্রভুজীর ব্যারামের আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গোস্বামী-প্রভুকে পুঙ্খানুরূপে পরীক্ষা করিয়া অসহ্য রোগ যন্ত্রণা উপশমের জন্য মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থা প্রদানপূর্ব্বক, একখানি সুদীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন ; এবং বলিলেন যে, "ইহাতে তোমার ব্যারাম নির্ম্মূল হইবে না, তবে হৃৎপিণ্ডের বেদনা হ্রাস পাইবে এবং অবশেষে এই রোগেই তোমার মৃত্যু সংঘটিত হইবে" ; এই ব্যবস্থাপত্রে তিনি, গোস্বামী-প্রভুর কত বৎসের সময়ে ব্যারামের অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং তদনুসারে মরফিয়ার মাত্রা কি পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া, মৃত্যুর একটী সন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালে একদিন গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, চিবার্চ্চ সাহেবের ব্যবস্থাপত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি ব্যতীত আর সমুদয় ঘটনাই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। কারণ, ঐ সময়ে তন্নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুর সনটী উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে যাহা হউক, চিবার্চ্চ সাহেবের ব্যবস্থানুসারে সেই হইতে হৃৎপিণ্ডের সেই শ্বাস-রোধকর ভয়াবহ বেদনা-উপশমের জন্য গোস্বামী-প্রভু নিয়মিতরূপে মরফিয়া সেবন করিতে বাধ্য হন। পরবর্ত্তীকালে ঘটনাচক্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত গোস্বামী-প্রভুর সংস্রব ছিন্ন হইবার পর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবদুষ্ট, মাৎসর্য্যপরায়ণ কতিপয় অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার সাধনলব্ধ অবস্থাকে মরফিয়ার ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এতদুপলক্ষে এক দিন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রদ্ধেয় ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মরফিয়া সেবনের দরুণ তাঁহার মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কোন বিপর্য্যয় ঘটে কি না। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"না, মরফিয়া আমার পীড়িত হৃৎপিণ্ডের উপরেই কার্য্য করে, উহার বেদনার উপশম হয় মাত্র, অপর কোন অনিষ্ট করে না।" বলা বাহুল্য যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে থাকাকালীন, ইহার কার্য্যনির্ব্বাহিক সভার আদেশানুসারেই, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্স্থিত ডাক্তারী ঔষধালয়ের সত্ত্বাধিকারী ৺গুরুচরণ মহলানবিস্ মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে বিনামূল্যে মরফিয়া যোগাইতেন। কারণ, প্রচারকদিগের ব্যয়ভার তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দুইটী ঔষধে ব্যারাম উপশমিত হইলে, গোস্বামী-প্রভু দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। অনিয়মে ব্যারাম পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইলে, তিনি কিছু দিন শান্তিপুরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে, ১২৮২ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ, বেলঘরিয়ার বাগানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশববাবুর পরিচয় হয়। পরমহংসদেবের কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া, তিনি বৈরাগ্য সাধন করিতে আরম্ভ করেন; এবং গোস্বামী-প্রভুকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। পত্র পাইয়া গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে, কেশববাবু স্বহস্তে রন্ধন করেন এবং সময়ে সময়ে একতারা বাজাইয়া ভজন করেন। পরমহংসদেবের অলোকসামান্য সাধুতা দর্শন করিয়া কেশববাবু এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, একদিন ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া ফুলচন্দনাদি দ্বারা পরমহংস-দেবের পদপূজা করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালে একদিন গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন—"কেশববাবু যদি তখন উঁহাকে (পরমহংসদেবকে) প্রকাশ্যে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এত দিন ব্রাহ্মসমাজ উদ্ধার হইয়া যাইত।" এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন—"আজ আমাকে কেশব পূজা ক'রেছে, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, পাছে উহার দলের লোকেরা টের পায়। ও যেমন দরজা বন্ধ ক'রে পূজা ক'ল্লে, তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে।"* সে যাহা হউক, ইহার পর সাধন-ভজনের জন্য অনেকে ব্যাকুলতা প্রকাশ করাতে, শ্রদ্ধেয় কেশববাবু যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সাধনের জন্য কোন্নগরে মোড়পুকুর নামক গ্রামে একটী উদ্যানের মধ্যে 'সাধন-কানন' স্থাপন করা হইল।

এদিকে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া দৈনিক উপাসনা, ধর্ম্ম-গ্রন্থপাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সংযম ও যুক্তাহার-বিহারের নিয়ম শিক্ষা দ্বারা আদর্শ ব্রাহ্ম-পরিবার সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে, কেশববাবু গোস্বামী-প্রভুর পরামর্শে ও সহায়তায় 'ভারত-আশ্রম' নামে একটী আশ্রম স্থাপন করিলেন। ১২৮২ সনের মাঘোৎসবের পর, কেশববাবু সাধনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একটী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, এই তিনের মধ্যে যাহার মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে মুক্তির অধিকারী হইবেন। উক্ত বক্তৃতার পর, শ্রীমতী মুক্তকেশী ভাদুরী (গোস্বামী-প্রভুর শাশুড়ী) সেবাব্রত, অঘোরনাথ গুপ্ত জ্ঞানযোগ ও গোস্বামী-প্রভু ভক্তি-যোগ শিক্ষার্থ সংযম-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহারাও কায়মনোবাক্যে আপনাপন ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে এক বৎসর অতীত হইলে একদিন কেশববাবু গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছ।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে লেখা

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

আছে যে, ভক্তির অঙ্কুর মাত্র হইলে সাধকের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইবে। যথা—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

—অর্থাৎ ভাবের অঙ্কুর হইলে ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব, বৈরাগ্য, মানশূন্যতা, ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে বলবতী আশা, তাঁহার অপ্রাপ্তি নিমিত্ত উৎকণ্ঠা, তাঁহার নাম-গানে রুচি, তাঁহার গুণবর্ণনে আসক্তি, তাঁহার বসতিস্থল (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশেষতঃ তীর্থাদিতে) প্রীতি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু আমার মধ্যে ইহার অনেকগুলি লক্ষণই ত পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং আমি কিরূপে ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইলাম?" কেশববাবু এই কথা শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

ভারতাশ্রমে গোস্বামী-প্রভু একদিন গভীর রাত্রিতে একাকী বসিয়া ব্রহ্মনাম সাধন করিতেছিলেন। নাম করিতে করিতে তন্দ্রার আবির্ভাব হইলে তিনি অনুভব করিলেন, যেন কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দরজায় আঘাত করিতেছে। গোস্বামী-প্রভু তদবস্থায় দরজা খুলিলে, একদল জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অঙ্গের জ্যোতিতে ঘর আলোকিত হইল। তন্মধ্যে একজন আপনাকে অদ্বৈত আচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়া মহাপুরুষদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক্ 'ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, ইনি শ্রীবাস', এই কথা বলিয়া তাঁহাদের কয়েকজনের সঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দিলেন; এবং বলিলেন—"তোমার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে; এখন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। এখনই তিনি তোমাকে নাম (দীক্ষা) দিবেন। শীঘ্র স্নান করিয়া আইস।" গোস্বামী-প্রভু বিহ্বলাবস্থায় তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া পাতকুয়ায় স্নান করিয়া উপরে আসিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক্ সদলবলে অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীবৃন্দেশ্বরী যোগমায়া দেবী (গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী) পাতকুয়ার ধারে অসময়ে সিক্ত বস্ত্র দেখিয়া গোস্বামী-প্রভুকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার নিকটে পূর্ব্ব রাত্রির অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। অতঃপর একদিন তিনি নির্জ্জনে শ্রদ্ধেয় কেশববাবুর নিকটে এই অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করিলে তিনি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"এ কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না। ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিবে না, অধিকন্তু তোমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে।" পরবর্ত্তীকালে এই ঘটনা উপলক্ষে গোস্বামী-প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—"কি দুর্দ্দৈব! মহাপ্রভুপ্রদত্ত নামটী অনেক দিন পর্য্যন্ত ধামা

চাপাই ছিল ; তখন ত আর বুঝিতে পারি নাই যে, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ ! তখন ভাবিয়াছিলাম যে, কতকগুলি spirit (পরলোকগত আত্মা) বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল আমি কেমন ব্রাহ্ম, তাহাদের কথায় বিচলিত হই কি না !" *

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ৺কাশীধামে গমন করিয়া কেদারঘাটে স্বর্গীয় ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাশীধামের প্রসিদ্ধ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত গোস্বামী-প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং স্বামীজি যে প্রকারে গোস্বামী-প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

"আমি যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে ছিলাম, তখন একবার কাশীধামের বিখ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময়ে স্বামিজী "অজগরবৃত্তি" অবলম্বন করেন নাই, এবং ততটা স্থূলকায়ও ছিলেন না, কিন্তু মৌনী ছিলেন। আমি সেখানকার হোমিওপ্যাথিক্ ডাক্তার লোকনাথবাবুর বাসায় ছিলাম। তিনি পরম সমাদরের সহিত আমাকে রাখিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবুকে বলিয়াছিলাম—'দেখুন, আমি নিয়মিত আপনার বাসায় থাকিতে পারিব না, কোন্ সময় বাসায় আসি তাহার ঠিক্ নাই ; হয়ত সমস্ত দিন না আসিয়া, অনেক রাত্রেও আসিতে পারি। আমাকে বাসের জন্য একটী নির্জ্জন ঘর দিতে হইবে, এরূপ হইলে আমি আপনার নিকটে থাকিতে পারি।' ডাক্তারবাবু তাহাতেই সম্মত হইলেন। আমি প্রাতে উঠিয়া বাহির হইতাম এবং প্রায়ই তৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। কোন কোন দিন একটু বেলা হইলে, স্বামীজি ইঙ্গিতে আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিলে, রাস্তাতে সুবিধামত কাহাকেও বলিতেন—'উহার জন্য কিছু খাবার আন।' অমনি তাহারা ৫।৭ জনের খাবার নিয়া আসিত। আমি বলিতাম—'এত খাইতে পারিব না, আপনি খাবেন কি ?' তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া তাঁহার মুখের ভিতরে খাবার দেওয়ার জন্য বলিতেন। স্বামীজি খুব খাইতে পারিতেন। খাইতে খাইতে যখন প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইত, তখন আমি নিজের অংশ উহার ভিতর হইতে সরাইয়া রাখিতাম, এবং বলিতাম 'আমারটা ত আমি আগে রাখিয়া দেই'। ইহাতে তিনি একটু হাসিয়া মাটীতে লিখিয়া দেখাইতেন—'বাচ্চা সাঁচ্চা হায়।' কোন সময়ে হয়ত স্বামীজি নদীতে পড়িয়া ভোঁস করিয়া ডুব দিতেন, এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন, আমি তখন গঙ্গার পার দিয়া দৌড়িয়া যাইতাম। একদিন এক কালী-মন্দিরে গিয়া, প্রস্রাব করিয়া কালীর অঙ্গে ছিটাইয়া

* গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।

দিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'প্রস্রাব গায়ে দেন কেন ?' তিনি মাটীতে লিখিয়া দিলেন 'গঙ্গোদকং'। আমি বলিলাম—'কালীর গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন কেন ?' তিনি উত্তর করিলেন—'পূজা'। আমি প্রশ্ন করিলাম—'ইহার দক্ষিণা কি ?' উত্তর হইল—'যমালয়', অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়। ' সে সময়ে ঐ দেবালয়ে লোক ছিল না। পরে লোক আসিলে আমি বলিলাম যে—'উনি প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছেন, এবং বলেন যে উহা গঙ্গোদকং'; তাহারা উহা শুনিয়া বলিল—'ইনি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, ইঁহাকে এমন বলিতে নাই, ইঁহার প্রস্রাব যে গঙ্গোদক তাহা ঠিকই'। স্বামীজির প্রতি লোকের এইরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।"

"একদিন স্বামীজি ও আমি দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার হাত ধরিয়া মৌনভঙ্গকরতঃ বলিলেন—'আস্নান কর' এবং ধরিয়া স্নান করাইলেন। পরে বলিলেন—'তোকে দীক্ষা দিব'। আমি বলিলাম—'হ্যাঁ, তোমার কাছে আবার আমি দীক্ষা নিব; তুমি কখনও শিব-পূজা কর, কখনও প্রস্রাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয়া দাও, এবং বল যে গঙ্গোদকং, আমি তোমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিব না। বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানি না।' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'বাচ্চা সাঁচ্চা হায়'। পরে হিন্দি ভাষায় বলিলেন—'তোকে দীক্ষা দিবার আমার বিশেষ কোন গূঢ় কারণ আছে, রীতিমত দীক্ষা দিব না। গুরুগ্রহণ না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না, তোর গুরু আমি নহি, অন্য একজন, সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। তবে আমি এখন তোর শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব'। ইহার পর তিনি আমাকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—'আমার উপর ভগবানেব যে আদেশ ছিল, তাহাই পালন করিলাম মাত্র।"*

ইহার পরে যখন গোস্বামী-প্রভু যোগদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার জন্য কাশীধামে গমন করেন, তখন তৈলঙ্গ স্বামীজির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—'কেয়া, ইয়াদ হায়'? গোস্বামী-প্রভু ভক্তিবিহ্বলচিত্তে উত্তর করিলেন—'হাঁ মহারাজ'।

অতঃপর একদিন ভারত আশ্রমের জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মের প্রতি আশ্রমের অধ্যক্ষের দুর্ব্যবহারে গোস্বামী-প্রভুর কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। এই বিষয় লইয়া কতিপয় ব্রাহ্ম-প্রচারকের সঙ্গে তাঁহার বাদানুবাদ হয়। এই সকল কারণে গোস্বামী-প্রভু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সপরিবার কিছুদিন বাগ্‌-আঁচড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। এইস্থানে একদিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী জ্যোতিঃ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং

* শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়ের সংগৃহীত গোস্বামী-প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

সেই সঙ্গে দৈববাণী হইল—"তুই আর আপনাকে বন্ধ রাখিস না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না।"+

ভাদ্র মাসে এইস্থানে ব্রহ্মোৎসব হইলে এমন এক নৈসর্গিক প্রেমের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহাতে বাগআঁচড়াবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ভাসমান হইয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু সেই স্রোতে গা ঢালিয়া প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তিরস সম্ভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে কলিকাতা হইতে প্রচারকেরা তাঁহাকে এই বলিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, "তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন্য পান না করিলে (অর্থাৎ কেশববাবুর নিকটে না থাকিলে) বাঁচিবে কিরূপে?" এই পত্র পাইয়া গোস্বামী-প্রভু অবাক্ হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"সে কি? আমি নিজে ত বেশ শান্তিতে আছি। ইহারা আমাকে গালি পাড়িতেছে কেন?" এমন সময় তাঁহার নিকটে পুনরায় দৈববাণী হইল—"যদি ধর্ম্ম-জীবন চাও, আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না।"

ইহার কিছুদিন পরে কোচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে, কেশববাবু বেদী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশে সম্পন্ন হইয়াছে।" এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্ম বালক ও বালিকাদিগের বিবাহের বয়স যথাক্রমে অন্যূন ১৮ ও ১৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।* কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহের সময়ে কেশববাবু অনায়াসেই এই বিধি লঙ্ঘন করিলেন; কারণ, তাঁহার কন্যার বয়স তখনও ১৪ বৎসর হয় নাই। অধিকন্তু তিনি তাঁহার এই কার্য্যকেও ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। আন্দোলনের ইহাই মূল কারণ। কেশববাবুর এই কার্য্যে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। গোস্বামী-প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কেশববাবুর এই অন্যায় কার্য্যের তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশববাবুর অনুগত ব্যক্তিবর্গও কেশবাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে কেশববাবুর অনুগত জনৈক ব্রাহ্ম, গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে, গোস্বামী-মহাশয় যেন কেশববাবুর বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, অথবা তাঁহার বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন না করেন, করিলে বিষম বিপদে ঠেকিবেন। গোস্বামী-প্রভু এই চিঠি পাঠান্তে হাস্য করিয়া বলিলেন—"ইহারা কি পাগল হইয়াছেন? কেশববাবু কি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, না পালনকর্ত্তা? আমি কি তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি?

+ "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষিত বিষয়।"

* Civil marriage Act. Act III of 1872.

সত্যের অবমাননা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না।" গোস্বামী-প্রভুর হৃদয় একদিকে যেমন কুসুম অপেক্ষাও কোমল ছিল—পাপীর পাপ যন্ত্রণা, রোগীর আর্ত্তনাদ, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির শোকাবেগ, ক্ষুধার্ত্তের কাতরতা ইত্যাদি দেখিলে তিনি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেন না; সেইরূপ অপরদিকে, ধর্ম্মের অবমাননা, সত্যের অপলাপ, শক্তির অপব্যবহার ইত্যাদি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহার চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইয়া উঠিত। তখন বন্ধুতার খাতির, স্বীয় স্বার্থের ব্যাঘাত, প্রতিষ্ঠা হানির ভয়—ইত্যাদি কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। তিনি ভীমপরাক্রমে অসত্যের, অন্যায়ের প্রতিবিধানকল্পে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেন। ভারতের যশস্বী কবি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর-চরিত বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

অর্থাৎ—মহৎ ব্যক্তিদিগের চিত্ত কে যথাযথ বুঝিতে সক্ষম হইবে? কারণ, তাহা অবস্থাবিশেষে কখনও কুসুমের ন্যায় কোমল, কখনও বা বজ্রাপেক্ষাও কঠিনবৎ প্রতীয়মান হয়।"

কেশববাবুর দলীয় লোকের পূর্ব্বোক্ত পত্র পাইয়া গোস্বামী-প্রভু বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়া, অধিকতর তীব্রতার সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাকে কেশববাবু সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় সত্য কথাও প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবদাদেশ শ্রবণ করিলে লোকমুখপ্রেক্ষিতা এমনই ভাবেই তিরোহিত হয়।

কেশববাবুর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদকল্পে গোস্বামী-প্রভু বাগ্‌আঁচড়া হইতে তাঁহার কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগের নিকটে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"পূর্ব্বে মনে করিতাম, ব্রাহ্মসমাজ চিরশান্তিস্থান, এখানে কোনও প্রকার গোলযোগ প্রবেশাধিকার করিতে পারিবে না। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। এক একবার মনে করি, ব্রাহ্মসমাজ যাহা হইবার হউক, আর কোন প্রকার আন্দোলন করিব না। কিন্তু সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি এবং স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারি না। অন্যায়, অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ, সুতরাং উদাসীন থাকিতে পারি না। আমি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

"কেশববাবুর সঙ্গে আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই, কেবল ব্রাহ্ম-সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। আমাকে লোকে অস্থির

চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতেই অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অনুসরণ করাকে কপটতা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।"

"কেশববাবু, ব্রাহ্মবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে ব্রহ্মমন্দির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের বিধি, তাঁহার আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় কন্যার বিবাহে কেশববাবু সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া এক নূতন আদেশ প্রচার করিলেন, যাহাতে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত হইবে।"

"পাপ-কার্য্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও প্রকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, তিনি কি নিজের দোষ উপাস্য-দেবতার উপর স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না।"

"ঈশ্বরের আদেশ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা তাঁহার কোন কালে অস্বীকার করিতে পারেন না। যথার্থ ঈশ্বরের আদেশকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি। ঈশ্বর সত্য, পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়, তাঁহার আদেশও সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং পরিবর্ত্তনীয় বলিলে আমরা ঘৃণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব।"

"হিন্দুসমাজে অতি আদরে ও সম্ভ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম; কিন্তু সত্যস্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়কে যতই সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ততই আমি হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, ব্রাহ্মসমাজ শান্তিনিকেতন, সেখানে অসত্য অশান্তি নাই। বাস্তবিক, ব্রাহ্ম-সমাজকে শান্তিনিকেতনই দেখিয়াছিলাম। তখন ব্রাহ্ম নাম শুনিবামাত্রই আনন্দ হইত। এখন বোধ হয় সে সকল স্বপ্ন। মনে হয়, দয়াময় ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ছবি একবার প্রকাশ করিয়া আমাদের দোষে তাহা কাড়িয়া লইয়াছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই, সত্যেরও সমাদর নাই। অশান্তি ও অসত্যের প্রশ্রয়স্থানকে আর ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে হইলে, পূর্ব্বের আদর্শের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে।"

"ব্রাহ্মসমাজের দুর্গতি হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের সম্মান অপেক্ষা মনুষ্যের সম্মান ও মনুষ্যের প্রতি ভালবাসা অধিক হইয়াছে বলিয়াই ঈশ্বরের সত্য ব্রাহ্মদিগের নিকট হতগৌরব হইয়াছে।"

"ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমক্ষে আর কাহাকেও পূজা করিও না। কতক-

গুলি ব্রাহ্ম সে আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া কেশববাবুকে অবতার মনে করিয়া পূজা করিলেন। ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, কেশববাবু অবতার নহেন এইরূপ প্রতিবাদ দেখিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব হইয়া গেলেন।"

"পৃথিবীর সমস্ত সাধুভক্তদিগের নিকট মস্তক অবনত করিব, কিন্তু ঈশ্বরের সিংহাসনে কাহাকেও বসিতে দিব না।"

"সত্যের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা প্রভৃতি পাপ যেন ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কলঙ্কিত না করে।"

"বন্ধুগণ, প্রাণসম ব্রাহ্মসমাজের আর দুর্গতি দেখিতে পারিব না। প্রাণ ফাটিয়া যায়, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে ; এখন ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হউক্। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি সদ্ভাব বিস্তৃত হউক্।"*

যাহা হউক, নানাপ্রকার বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কেশববাবু ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। রাজপরিবারবর্গের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতেই বিবাহ দিতে হইয়াছিল। এই আন্দোলন উপলক্ষে দুই দলের মধ্যে যে মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফল অতিশয় বিষময় হইয়াছিল। দলীয়ভাবের কি ভীষণ পরিণাম! বিদ্বেষের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দুই দিবস পূর্ব্বে যাঁহারা গোস্বামী-প্রভুকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, গুরুবৎ মান্য ও শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন প্রধান শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোস্বামী-প্রভুর প্রাণনাশের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিল। সংসারে অর্থ-সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নহে, শুধু মতভেদই বিবাদের মূল। এক মতভেদে এতদূর হইতে পারে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। মতভেদের মধ্যে স্বার্থপরতা না থাকিলে বোধ হয় এত অমঙ্গল হইত না।

প্রাগুক্ত আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া গোস্বামী-প্রভুর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশব-বাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথাপি ভবিষ্য ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণী-কৃত হইয়াছে যে, তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়াই এরূপ করিয়াছিলেন ; কোন স্বার্থসাধন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন। সাংসারিকতা বা আত্মোন্নতি তাঁহার কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।"*

* "পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের বিগত আন্দোলন" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

* বীরপূজা, নব্যভারত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, গুরুকরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি, সৎগুরুর অন্বেষণে নানা তীর্থাদি ভ্রমণ

কেশববাবুর কন্যার বিবাহের পর অধিকাংশ ব্রাহ্মগণ কেশববাবুকে ত্যাগ করিলেন। এদিকে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺আনন্দমোহন বসু, ৺দুর্গামোহন দাস প্রমুখ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার সংকল্প করিলেন। ইঁহাদিগের সংকল্প অবগত হইয়া ইংলণ্ডের মিস্ কলেট নামক জনৈক ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ বিদুষী মহিলা গোস্বামী-প্রভুকে অগ্রণী করিয়া নতুন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। এই পত্র পাইয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনাকাঙ্ক্ষিগণ, গোস্বামী-প্রভুকে কলিকাতায় আগমন করিবার জন্য বাগআঁচড়ায় পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া তিনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক্ ব্রাহ্ম-সাধারণের মত অবগত হইলেন। অতঃপর ইঁহাদের উদ্যোগে ১২৮৫ সানের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা 'টাউন হলে' একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভাতে গোস্বামী-প্রভুর প্রস্তাবে, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে এবং অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মন্তব্য গৃহীত হইল। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু এই বিষয়ে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনিই নূতন সমাজের 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামকরণ করেন।

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু এই সমাজের আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাহার উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। "জ্বলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎ-কৃপা সহায় করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ প্রচার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ষার খরতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরিতরঙ্গিনী যেমন প্রবলবেগে উভয় কুল ভাসাইয়া লইয়া যায় মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিত-প্রাণ বিজয়কৃষ্ণ সেইরূপ দেশ দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন।" "তাঁহার তৃষিত ব্যাকুল আত্মা, তাঁহার ভক্তি-বিনয়-মিশ্রিত মধুর চরিত্র তাঁহার দেবদুর্লভ উন্নত জীবন সকলেরই ধর্ম্ম জীবনের আদর্শ ও সহায় হইয়া উঠিল। তাঁহার বাসভবন শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, সৎপ্রসঙ্গ, সাধু-সমাগম ও কীর্ত্তনানন্দে প্রকৃত আশ্রম-পদে পরিণত হইয়া উঠিল।"*

পরম পুণ্যাত্মা ৺অঘোরনাথ গুপ্ত মহোদয়ও অনুগত অনুজের ন্যায় সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মেই পূর্ব্বাপর আচার্য্য গোস্বামী-প্রভুর সহায়-স্বরূপ সহচর

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৩০৬।

ছিলেন। এক্ষণে তিনি আরও অধিকতর উৎসাহে ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভুর সহাধ্যায়ী বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"সাধু বিজয় ও অঘোর (অঘোরনাথ গুপ্ত) উভয়েই এই মহারণের পর (কোচবিহার আন্দোলনের পর) প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলেন, উভয়ের মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল। দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দুইদিকে ছুটিয়া বাহির হইলেন। একটী প্রাচ্যে ও একটী প্রতীচ্যে। দরিদ্রের কুটীরে, রোগীর রুগ্ন-শয্যার পার্শ্বে পাপী ও তাপীর শূন্য ও হতাশ হৃদয়মন্দিরে ব্রহ্মজ্যোতিরূপে তাহারা আবির্ভূত হইয়া, দরিদ্রের দারিদ্র্যজনিত দুঃখ, রোগীর রোগের যাতনা, পাপীর অনুতাপজনিত তাপ এবং শোকতাপ-দগ্ধ ব্যক্তির অন্তর্দাহ বিমোচন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন জগতের দুঃখভার বিমোচন করিবার জন্য জগজ্জননী দুইটী জ্যোতি-গোলক ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে জ্যোতির্ম্ময় গোলক, মানবহিতের জন্য মানবরূপ ধারণ করিয়া ভারতের—এই দগ্ধ ভারতের—প্রতিগৃহে গিয়া সন্তাপ হরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। আপনাদের তাপহীন বিমল জ্যোতিতে ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতেছেন।" *

কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর, গোস্বামী-প্রভু পুনরায় ঢাকায় আগমন করিলেন, এবং সেখানেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মমন্দিরে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার কতকগুলি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপদেশগুলি গভীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ এবং অবিচলিত বিশ্বাস ও অদম্য তেজস্বিতার পরিচায়ক। তাহাতে লোকের মন এতদূর আকৃষ্ট হইত যে, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সাতিশয় আগ্রহ সহকারে তাঁহার সেই সকল উপাসনায় যোগদান করিতে ব্রাহ্মসমাজে সমবেত হইত। অনেক সময়ে সমাজগৃহে স্থানের সঙ্কুলন হইত না। তথায় তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে 'সমালোচক' পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা—"পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা নগরীতে আগমনাবধি তত্রত্য ব্রাহ্মগণের উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি ও নূতন জীবন লাভ হইল। পূর্ব্বে মন্দিরের আসনগুলি শূন্যপ্রায় থাকিত। বিজয়বাবুর ধর্ম্মানুরাগ, সরল ব্যবহার ও সদুপদেশে এত লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল যে, ব্রাহ্মমন্দিরে আর লোকের স্থান হইত না। পূর্ব্ব বাঙ্গালা বিজয়বাবুর নিকট অশেষ ঋণী এবং অনেকদিন হইতেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। ছয় সাত বৎসর পরে তাঁহাকে লাভ করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আন্তরিক আগ্রহ ও যত্নপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখানে সর্ব্বদা বিজয়বাবুর

* তত্ত্বকৌমুদী।

ন্যায় একজন সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধমতাবলম্বী, আদর্শ আচার্য্য থাকেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

এইরূপে ১২৮৫ সনের আষাঢ় মাস হইতে প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ গোস্বামী প্রভু পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, বিক্রমপুরের অন্তর্গত তাজপুর, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে উৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠাদি উপলক্ষে গমন করিয়া,—জীবন্ত উপাসনা, প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবনের মহৎ আদর্শ দ্বারা নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন, তাঁহার জীবনের অসাধারণ প্রতিভা-গুণে আকৃষ্ট হইয়া, মধুলুব্ধ মক্ষিকাদলের ন্যায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ রমণী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই, সংসারের বিবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে,—তাঁহার মুখনিঃসৃত দুইটী কথা শ্রবণ করিতে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইত।

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন,—আচার্য্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে 'নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হইয়াছে। গোস্বামী-প্রভুর নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায়, তিনি বাধ্য হইয়া ইহারও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই-ভাবে কিয়দ্দিন কলিকাতায় অবস্থান করিবার পর, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও আচার্য্যরূপে হাজারিবাগ, গয়া, বাঁকিপুর, মজঃফরপুর প্রভৃতি বেহার অঞ্চলের বহুস্থানে গমন করিয়া, তত্তৎস্থানে কিছুদিন পর্য্যন্ত অবস্থানপূর্ব্বক উপাসনা, কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনাদি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কয়েকমাস অতীত হইলে, তদীয় প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সন্তোষিণীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কন্যাটী অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, গোস্বামী-প্রভু শোকসন্তপ্তহৃদয়ে 'শোকোপহার' নামক একখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। শোকসন্তপ্ত নরনারীর শোকাপনোদনের উপযোগী বহু প্রাণস্পর্শী উপদেশ ইহাতে স্থান পাইয়াছিল।

এই সময়ে একদিন মেছুয়াবাজার রোড দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে একজন পশ্চিমদেশীয় সাধুপুরুষের সাক্ষাৎ হয়। সাধুর প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া গোস্বামী-প্রভু তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, সাধুও তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখনও সাধু সন্ন্যাসীর উপর গোস্বামী প্রভুর তাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে নাই। কিন্তু অদ্য এই সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রাণে এমন এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহা তিনি জীবনে আর কখনও উপভোগ করেন নাই।

এই মহাপুরুষের সহিত গোস্বামী-প্রভু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে বঙ্গদেশে পুনরায় ধর্ম্মান্দোলনের কথা অবগত হইয়া, সাধুটী অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোস্বামী-প্রভু সাধুকে অবসরমত একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া তথাকার কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদিবস গোস্বামী-প্রভু সন্ধ্যার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত সাধুটী সমাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক, এক কোণে উপবেশন করিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে, তিনি বেদী হইতে অবতরণপূর্ব্বক্ মন্দিরের বাহিরে আগমন করিতে-ছেন, এমন সময়ে সাধুটী পশ্চাৎ দিক্ হইতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। গোস্বামী-প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন--"উপাসনা কেমন হইল?" উত্তরে সাধু বলিলেন—"বড়ী আচ্ছা! সবতো বেদকা বাণী হায়।" অর্থাৎ—"বড়ই উত্তম, তুমিত সমস্তই বেদের কথা বলিলে।" বস্তুতঃ, গোসাইজী কখনও শাস্ত্রবাক্য অতিক্রম করিয়া কথা বলিতেন না। অধিকাংশ ব্রাহ্মপ্রচারকগণ সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার অনুসরণ করিয়াই ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; কিন্তু গোস্বামী-প্রভু বিবেক ও শাস্ত্রবাক্য উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তৎকৃত "ব্রহ্মপূজা" নামক গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই গ্রন্থে তিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত পরব্রহ্মের মানসিক পূজার অংশ যথাযথই বিবৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, সাধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, উপদেশগুলি ভাল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণের অবস্থা উপদেশানুরূপ নহে; এই জন্য তিনি ইহার প্রতিকারের কোনরূপ উপায় না দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাধু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমু গুরু কিয়া?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"না মহারাজ! আমরা গুরুবাদ মানি না।" সাধু কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ওঃ এইছিওয়াস্তে সব্ বিগড় গিয়া!"—অর্থাৎ এই জন্যই সমস্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে, সমস্ত সাধন-ভজন পণ্ড হইয়া যাইতেছে। সহসা কথাটী গোস্বামী-প্রভুর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি সাধুর বাক্য চিন্তা করিতে করিতে গুরুবাদের বিরুদ্ধে এযাবৎ যত প্রকার মত পোষণ করিতেছিলেন, তাহা শিথিল হইয়া পড়িল' এবং গুরুলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখনই এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন—"নেহি। তোমৃহারা গুরু দোসূরা হায়, বখৎ হোনেসে মিল্ যায়গা। ঘাবড়াওমৎ!"—অর্থাৎ,

তোমার গুরু আমি নহি, অপর একজন, সময় হইলেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে, বিচলিত হইও না।" এই কথা বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন।*

এই সময় হইতেই গোস্বামী-প্রভু দেশ-বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সৎগুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এজন্য তিনি অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎগুরুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক্ তাঁহাদের দলপতি ৺জগচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকটে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত এবং প্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্ম, কর্ত্তাভজা গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য ও সভাপতি, সিটি-কলেজের অধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রবীণ জ্ঞানীব্রাহ্ম ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয়ও গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণায়ামই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনের প্রধান অঙ্গ। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তাঁহাদের প্রাণায়ামলব্ধ সাময়িক উচ্ছ্বাসেই তৃপ্ত থাকিতেন। কিন্তু, প্রাণায়াম প্রকৃত সাধন নহে। ইহা সাধনের একটী বহিরঙ্গ মাত্র। যোগশাস্ত্রে অনেক প্রকার প্রাণায়ামের প্রণালী লিখিত আছে। তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, মনের স্থৈর্য্যসম্পাদন ও শারীরিক-ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কোন কোন প্রাণায়াম সাধন করিলে, সাময়িক এক প্রকার শারীরিক আনন্দ অনুভূত হয়। অনেক নিম্নস্তরের সাধক এই আনন্দকেই শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভুল করেন। কিন্তু ইহা আদৌ ব্রহ্মানন্দ নহে, ব্রহ্মানন্দ স্বতন্ত্র পদার্থ,—উহা সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-কৃপা সাপেক্ষ। কোন প্রকার প্রক্রিয়া বা প্রণালী দ্বারাই উহা লাভ করা যায় না। গোস্বামী-প্রভু অল্প কালের মধ্যেই কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রাণায়াম লব্ধ অবস্থার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এই সম্প্রদায়ের দলপতি কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা এই সাধনা দ্বারা যে পরমানন্দ উপভোগ করেন, শ্রীচৈতন্য উহার ছিটা-ফোঁটা পাইয়াই তদ্দ্বারা বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন। এই মতের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইয়াই গোস্বামী-প্রভু কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।**

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু ধর্ম্মলাভের জন্য অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া অশেষবিধ

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

** ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।

যোবৈ ভূমা তদমৃত মথযদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। ছান্দোগ্য শ্রুতি।

ভূমা অর্থাৎ অনন্ত বস্তুতেই পরিপূর্ণানন্দ, পরিমিত বস্তুতে সুখ নাই। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, (যে সুখের প্রকাশ নিত্য নবায়মান অনন্ত বিকাশময়, তৃপ্তি যাহার অনুরক্ত তাহাই অমৃত পদবাচ্য) আর যাহা সীমাযুক্ত তাহা প্রাকৃত।

বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে, হিংস্র জন্তুসমাকুল বহু নিবিড় অরণ্য, অগণ্য গিরিকন্দর পরিভ্রমণপূর্ব্বক, অঘোরী, কাপালিক, বাউল, বামাত, দরবেশ, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকটে একে-একে গমন করিয়া তাঁহাদিগের উপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সাধন করিয়া, যে স্থানে যৎসামান্য ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। চাতকপক্ষী যেমন শুদ্ধ স্ফটিক জল ব্যতীত অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, এবং তৎপ্রাপ্তির আশায়, অনন্যমনে ঊর্দ্ধে আকাশপানে তাকাইয়া থাকে, গোস্বামী-প্রভুও সেই প্রকার পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের সামান্য ফলকে তুচ্ছ বোধ করিয়া, সেই অনন্ত লীলারসময়ের প্রেমসুধারস আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে, সৎগুরুরূপী ভগবানের কৃপার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গম স্থানসমূহ অতিক্রমকালে গোস্বামী-প্রভুকে সময়ে সময়ে যেরূপ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। এক সময়ে তিনি বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে কোন একজন মহাপুরুষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সাধুর আশ্রমেরও কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর একটী পুরাতন অট্টালিকা প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলেন। গভীর রাত্রিশে ৮।১০ জন সশস্ত্র দস্যু উপস্থিত হইয়া, গোস্বামী-প্রভুকে সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে বলিল। তিনি অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে অট্টালিকাটি ঐ দস্যুদলের আড্ডা। দস্যুরা তাহাদের পাপলব্ধ দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া নিদ্রা যাইবার সময়ে মনে করিল যে, এই ব্যক্তি আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, সুতরাং নিশ্চয়ই পুলিশে সংবাদ দিবে ; অতএব, উহাকে কাটিয়া ফেলা উচিত। কিন্তু তাহাদের দলপতি বলিল—"ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াই মনে হইল যে উনি একজন সাধুপুরুষ। উঁহার দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্ট হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব, তোমরা এই সাধু-হত্যারূপ মহাপাপ হইতে ক্ষান্ত হও।" কিন্তু, অপরাপর দস্যুরা তাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে না পারায়, অবশেষে আগন্তুককে মারিয়া ফেলাই স্থির হইল। যমদূতের ন্যায় দুই জন দস্যু তরবারি হস্তে অগ্রসর হইতেই, গোস্বামী-প্রভুর অনতিদূরে একটী প্রকান্ড ব্যাঘ্র দেখিতে পাইল। অতঃপর তাহারা অন্য এক পথ দিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিল। কিন্তু সেস্থানে গিয়াও দেখে, ঐরূপ আর একটী ব্যাঘ্র বসিয়া আছে। সুতরাং তাহারা তাঁহার বধ-বিষয়ে নিরাশ হইয়া, স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিল। দলপতি

ইহা শুনিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইল। ইহার পর হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইয়া পুরাতন অট্টালিকার ছাদ ধসিয়া পড়িল। দলপতি কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইল বটে; কিন্তু, দলস্থ অপরাপর দস্যুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গোস্বামী-প্রভু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতে তিনি ৺বিন্ধ্যবাসিনীর বাড়ীতে আগমন করিয়া তথায় অতিথি হইলেন। এমন সময়ে দস্যুদিগের দলপতিও সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং গোস্বামী-প্রভুকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, দস্যুপতি পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল।

২। অপর এক সময়ে ঐরূপ ব্যাঘ্র-ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ একটী নির্জ্জন অরণ্যে, গোস্বামী-প্রভু একাকী একটী বৃক্ষমূলে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। রাত্রি অধিক হইলে, অকস্মাৎ কোথা হইতে দীর্ঘ যষ্টিহস্তে একটী পাগলপ্রায় লোক তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল; কিন্তু, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে তৎসম্বন্ধে কিছুতেই কোন উত্তর প্রদান করিল না। অতি প্রত্যুষে গোস্বামী-প্রভু জাগরিত হইয়া, প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত সেই অদ্ভুত ব্যক্তিকে পুনরায় আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

৩। এক সময়ে তিব্বতের পথে কোন বরফময় জনশূন্য প্রদেশে গোস্বামী-প্রভু ধ্যানাবস্থায় বরফে আচ্ছন্ন হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে একজন সাধু তথায় উপস্থিত হইয়া, অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। পূর্ব্বোক্ত সাধুটী একবার ঢাকায় উপস্থিত হইলে, গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে অতিশয় পরিচিতের ন্যায় বিশেষভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া, গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে তাঁহার কোথায় প্রথম পরিচয় হয়,—এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি 'বরফান' (বরফআবৃত) প্রদেশে গোস্বামী-প্রভুর উক্ত বিপদের কথা সকলকে জ্ঞাপন করেন। এতদঞ্চলের অপর একটি বিপদের কথা গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা:—'গুরু নির্দ্দিষ্ট র'য়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃ পুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হ'য়ে পাগলের মত ছুটোছুটি ক'রতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদিগের মঠে মঠে ঘুরুতে লাগ্‌লাম। কয়েকটী বৌদ্ধ-যোগীর মুখে শুন্‌তে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর, একটী গোফার সন্নিকটে এই পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে, একটী বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিষ্যেরা নিকটবর্ত্তী গোফা হ'তে বের হ'য়ে এসে, তাঁকে চৈতন্য করান। মহাপুরুষের খবর পেয়ে তাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়লাম। হিমালয়ের উপরে নিবিড়

অরণ্যের ভিতর দিয়ে অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশে চল্‌তে লাগলাম। দুই দিন দুই রাত্র আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন হ'ল যে, একটী বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া, একটী উলঙ্গ দীর্ঘাকৃতি পর্ব্বতবাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ কর্‌লেন। পরে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন,—'বাচ্চা, এহি দানা পায় লেও, ভুখ পিয়াস ছুট যায়েগা। পর্ব্বতপর যেতনা রোজ রহোগে, দো এক নানা পায় লিও, ভুখ পিয়াস কাভ নেহি হোগা।' এই বলিয়া তিনি আমাকে কতকগুলি সরষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি দুই একটী দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একেবারে দূর হ'য়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে ছিল। পাহাড়ে আমি যতকাল ছিলাম, ঐ বীজ দুই একটী প্রয়োজন মত খেতাম।" *

৪। কোন এক সময়ে জনৈক প্রসিদ্ধ বাউলের আশ্রমে থাকিয়া, গোস্বামী-প্রভু কিয়ৎকাল তাঁহাদের প্রণালীমত সাধন করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ভিতরের অকথ্য ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া বাউলদিগের সঙ্গ ও আশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে, অপরাপর আশ্রমবাসিগণ তাঁহাদের গুপ্ত-কথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কায়, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরিশেষে, বিশেষভাবে গোস্বামী-প্রভুর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং তাহাদের গুপ্ত-সাধন ব্যক্ত না করিতে সবিনয়ে ও নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পরম সম্ভ্রম ও সম্মানের সহিত বিদায় দিল।

৫। অপর এক সময়ে ৺চন্দ্রনাথতীর্থের কোন একটী জঙ্গলের মধ্যে গোস্বামী-প্রভু দাবানলে পতিত হইয়া আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ঘটনাটী গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—"আমি ও বারদির ব্রহ্মচারী মহাশয় এক সময়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিছুকাল একত্র সাধন ভজন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে একদিন হঠাৎ চারিদিকে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। উত্তাপ আর সহ্য করা যায় না। আমাদের কুটীরের প্রায় ২০০ হাত নীচে সমতল ভূমি ছিল। প্রথমে দেখি, একটী প্রকাণ্ড পাহাড়ীয়া সর্প লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। পরে একটী ব্যাঘ্রও ঐরূপ করিল। তৎপর ব্রহ্মচারী মহাশয় "বম্‌ বম্‌" শব্দ উচ্চারণকরতঃ আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া ২০০ হাত নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। আমরা একটুও আঘাত পাইলাম না। মহাপুরুষদিগের কি আশ্চর্য শক্তি! ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত প্রথম দেখা হইলে, তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—'আমাকে চিনিতে পারিস্‌? তোর সঙ্গে আমার চন্দ্রনাথ

* 'সৎগুরুসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত।

পাহাড়ে দেখা হইয়াছিল। দাবানলে তোকে কে রক্ষা করিয়াছিল?' তখন আমার সব মনে পড়িল।"

এই প্রকারে গোস্বামী-প্রভু কত সময়ে যে কত প্রাণান্তকর বিপদ হইতে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার সমস্ত বিবরণ জানিবার উপায় নাই। কারণ, গোস্বামী-প্রভুর আত্মগোপনের স্বভাব ও শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। প্রয়োজন না হইলে কখনও নিজের কথা নিজমুখে প্রকাশ করিতেন না। ঘটনাক্রমে দৈবাৎ পূর্ব্ব-পরিচিত সাধু মহাত্মাদিগের সমাগমে অথবা প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের আন্তরিক আগ্রহে কখনও কোন কথা প্রকাশিত হইলে, অপরে তাহা জানিতে পারিত।

---

* নরোত্তমপুর নিবাসী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(উত্তরার্দ্ধ)

গয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, তিনটি অদ্ভুত স্বপ্ন, পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি-জাগরণ, বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্যসূচক অদ্ভুত ঘটনা, আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে যোগদীক্ষ-গ্রহণ, কাশীধামে সন্ন্যাস-গ্রহণ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের দীক্ষা পুরশ্চর্য্যার আবশ্যকতা কোথায় ? পরাধর্ম্মের জন্য অপরাধর্ম্ম ত্যাগ দূষণীয় নহে

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে গোস্বামী-প্রভু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-কল্পে গয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমে তাঁহারা মধুপুরে উপনীত হন। এই স্থানে গোঁসাইজীর প্রাণস্পর্শী উপাসনা, আলোচনা ও মধুর কীর্ত্তনে উপাসকমণ্ডলী বিমুগ্ধ হইতেন। কীর্ত্তন ও উপাসনার সময় ব্যতীত তিনি অধিকাংশ সময়ে মধুপুরের নির্জ্জন জঙ্গলে গিয়া ধ্যান করিতেন। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয় থাকা সত্ত্বেও দিবাসানেও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না। মধুপুর হইতে তাঁহারা গিরিডি হইয়া পচম্বা আগমনপূর্ব্বক্ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। এই স্থানে প্রতিদিন অপরাহ্নে গোস্বামী-প্রভুর মুখে তুলসীদাসের রামায়ণ প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ দীর্ঘকাল তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া থাকিতেন, কার্য্যান্তরে যাইতে কাহারও ইচ্ছা হইত না। অতঃপর তাঁহারা গয়াধামে আগমণ করেন। তথাকার প্রসিদ্ধ উকিল গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ইঁহাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানে প্রতিদিন স্থানীয় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের সহিত গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইত। তাঁহার এই সময়ের কার্য্যকলাপাদি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শশীবাবু যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে; যথা—"এই স্থানে প্রত্যহ সায়ংকালে গোঁসাইজী গৃহের ছাদের উপরে বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। অধিকক্ষণ কথা বলিতে পারিতেন না। এইভাবে প্রায় ২।৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া যাইত। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের ইহা ভাল বোধ হইত না। তাঁহারা গোঁসাইজীর দ্বারা আর অধিকদিন প্রচারের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন। শ্রদ্ধেয় গোবিন্দবাবু গোঁসাইজীর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন যে, ওকালতি ব্যবসায় ছাড়িয়া সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে পড়িয়া থাকিতেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের রঘুবর দাস বাবাজীর অশেষ গুণগ্রামের কথা ব্যক্ত করিলে, গোঁসাইজী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে গোবিন্দবাবু, আমাদের চাকর নতিনীর সহিত কিছু চাউল, ডাইল ইত্যাদি দিয়া আমাদিগকে বাবাজীর আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সময়ে আমরা আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। বাবাজী মহাশয় তখন দাঁড়াইয়াছিলেন। গোঁসাইজী তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'বাবাজী মহাশয়, কি ক'রে উদ্ধার হ'ব?' তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'এইছে সাধু হাম কভি নেহি দেখা। দয়াল রামজী তোমকো আলবৎ কৃপা করেগা, দৈন্য ছোড়—ইত্যাদি।' অতঃপর তিনি আমাদিগকে সাদরে উপবেশন করাইয়া রন্ধন করিতে গেলেন। রন্ধন শেষ হইলে অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে খাওয়াইলেন। আহারান্তে বাবাজীর সঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথা-বার্ত্তা হইল। অপরাহ্নে আমরা তাঁহার পরামর্শে 'ব্রহ্মযোনি' পাহাড়ে সাধুদর্শন করিতে গমন করিলাম। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সাধু দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া গোস্বামী-প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আনন্দে রহ, আনন্দে রহ'। ইঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। প্রদোষে আমরা নামিয়া আসিলাম। আসিতে আসিতে পথে গোস্বামী-প্রভু একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন—'এই স্থানে মহা-প্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবোদয় হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া 'কৃষ্ণরে, বাপ্‌রে, কোথা গেলিরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 'সাধুচরিত্রমালায়' পাঠ করিয়াছিলাম ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইতে হয়; আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। মনে হইল ইনি প্রকৃতই ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। আর একদিন বলিলেন—'শশী, আজ আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভজন করিব, তুমি আমার পার্শ্বে ঘুমাইয়া থাক'। এই বলিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র দ্বারা আমাকে উপাধান করিয়া দিলেন। শিশু যেমন মাতৃপার্শ্বে নির্ভয়ে নিশিযাপন করে, আমিও সেইভাবে তাঁহার পার্শ্বে নিশিযাপন করিলাম। আর এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল সেই ভীষণ অরণ্যের পার্শ্বে, সমগ্র রজনী অটলভাবে ভয়-উদ্বেগ-বিহীন হইয়া ব্রহ্মধ্যানে অতিবাহিত করিলেন; দেখিয়া বোধ হইল, যেন শীত, বাত এবং হিংস্র জন্তুর কোন প্রকার ভয়ও তাঁহাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুনরায় আমাকে উঠাইলেন। আমরা দুইজনে নির্ঝরবারিতে স্নান করিয়া নির্জ্জন গুহাপ্রান্তে বসিয়া ব্রহ্মোপসনা করিলাম। তিনি করতাল বাজাইয়া অতীব সুমধুর স্বরে গান করিলেন,—

ভৈরবী—যৎ

প্রভু হৃদিরঞ্জন মনোমোহনকারী।
ভগবজ্জন প্রাণ-প্রাণ হৃদয়বিহারী॥
(তুমি) প্রাণ-রমণ হৃদি-ভূষণ পাপহরণকারী।
(আমার) সাধ সতত হয় যে মনে, ও রূপ নেহারি।
দরশন করি মোহ আঁধার নিবারি॥
(সে দিন কবে বা হবে)

এই গান করিতে করিতে তিনি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সময়ের প্রাণস্পর্শী উপাসনার স্মৃতি এখনও জাগরূক হইয়া আমার মনপ্রাণ আকুলিত করিয়া তোলে। এইদিন উপাসনার সময়ে খুব বড় একটী সাপ তাঁহার উরুদেশে উঠিয়াছিল; কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই, আপনা হইতেই নামিয়া গিয়াছিল, আর তাঁহাতেও কোনরূপ ভীতির চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। গোঁসাইজীর ভক্তি অনুরাগে যেন হিংস্র জীবজন্তুও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাদের হিংসাবৃত্তি ক্ষণকালের জন্যও বিলয় প্রাপ্ত হইত।

"ইহার পর আমাকে বলিলেন—'শশি, আমি আর কলিকাতায় যাব না। তুমি ফিরে যাও।" এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। গয়ার পথে যুবক নিমাই-এর পরিবর্ত্তন হইলে বাষ্প-রুদ্ধ-কণ্ঠে সঙ্গিগণকে বলিয়াছিলেন—'তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাব না। আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবনে চলিলাম।' ইনিও যেন তেমনি গয়ার পাহাড়ের নির্জ্জনতার মধ্যে ডুবিয়া একান্তমনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত হওয়ার আশায় তথায় চির বাসস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—'আমি আর কলিকাতায় যাব না।'

"একদিন আমরা বুদ্ধ-গয়ায় গিয়াছিলাম। বুদ্ধের সাধন-ক্ষেত্র, নিরঞ্জনা-নদী ইত্যাদি দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু আমার নিকটে শাক্যসিংহের গুণ-কীর্ত্তন করিলেন; এবং অবশেষে নিরঞ্জনার তীরে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলেন। আমরা মধ্যাহ্নে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু ধ্যানভঙ্গ না হওয়ায় তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিলেন না।

'ইহার পর তিনি একাকী আকাশগঙ্গায় যাইতেন এবং আর কলিকাতায় ফিরিবেন না স্থির করিলে, আমি শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয়ের (শিবনাথবাবুর) অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতায় চলিয়া আসি। অবশেষে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনেন। এত সাধনশীলতার মধ্যেও তাঁহার অপরিসীম স্নেহ সর্ব্বদা আমাকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, আমি মনে করিতাম যেন মাতৃসন্নিধানে থাকিয়া মাতৃস্নেহ ভোগ করিতেছি। শাস্ত্রী-

মহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'বিজয়বাবুর আঙ্গুল চুষিলেও ভক্তি হয়, এবং তিনি ধর্ম্মার্থে দ্বিতল ছাদ হইতেও লাফাইয়া পড়িতে পারেন।' ৺গয়াতে কিছুদিন একত্র বাস করিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম্মের জন্য ইহার অসাধ্য কিছুই ছিল না। এইরূপ লোকের জন্ম-ধারণে বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়।"

৺গয়ার 'ব্রহ্মযোনী' পাহাড়ের নিম্নে 'গোড়-ধোয়া' নামক একটী স্থান আছে। কথিত আছে যে দ্বাপর যুগে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানের একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ে পাদধৌত করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানের নাম গোড়ধোয়া (অর্থাৎ পদধোয়া) হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত জলাশয়টী অন্তর্হিত হইলেও স্থানটীর নাম পূর্ব্ববৎ গোড়ধোয়াই রহিয়া গিয়াছে। এখানে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ প্রতিবৎসর উৎসব করিতেন। একবার উৎসবের সময়ে গোস্বামী-প্রভু আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ৺রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। উৎসবের দিন ব্রাহ্মগণ গোস্বামী-প্রভুকে উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি যথাসময়ে উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। দুই চারটা কথা বলিতেই, তাঁহার বাক্য গদগদ হইয়া যাইতে লাগিল, কথা যেন আর বলিতে পারেন না। কিয়ৎকাল পরে তিনি কথঞ্চিৎ ভাব সংবরণ করিয়া, উপাসকমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আপনারা কেহ উপাসনা করুন; আমি আর কথা বলিতে পারিতেছি না।" এই কথা শুনিয়া, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় হরসুন্দরবাবু উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন—"হে প্রভো! আজ তোমার ভক্তের মুখে তোমার কথা শুনিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা আর ভাগ্যে ঘটিল না। তোমার ভক্তগণকে নিভৃতে তোমার অমৃত-নিকেতন লইয়া এমত প্রেমসুধা প্রদান কর, যাহা আমাদের চর্ম্ম-চক্ষে ও কর্ণে দেখিবার কি শুনিবার ক্ষমতা নাই।" এইরূপে অপরাপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণও গোস্বামী-প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা দর্শন করিয়া, মুগ্ধকণ্ঠে তাঁহার যে সকল গুণানুবাদ করিতেন, বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

এইস্থানে অবস্থান কালে গোস্বামী-প্রভু তিনটী অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য দুইটী স্বপ্নবৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। কোন বিশেষ কারণে তৃতীয়টী প্রকাশ করা গেল না। গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে স্বপ্নগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

১ম স্বপ্ন। গয়া সাহেবগঞ্জ, ২৮শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক, সোমবার, অপরাহ্ণ।

"আমি একটী প্রকাণ্ড নদীর তীরে বসিয়া আছি, লক্ষ লক্ষ লোক সহস্র সহস্র নৌকায় পার হইতেছে; আমাকে কেহই ডাকিতেছে না। একজন আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পারে উপস্থিত হইলে, কতিপয় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমাকে একটি বাগানে লইয়া

গেলেন। বাগানে সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ আছে। তথাকার প্রাচীরের লতায় এক অপূর্ব্ব পুষ্প দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইলাম; তখন ঐ পুষ্পসকল পরমা সুন্দরী স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বলিল—“হে ভদ্র, তোমার হৃদয়নাথকে অন্বেষণ কর।” আমি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে একটি কুকুর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল—‘আতিথ্যস্বরূপ এই ফল ভক্ষণ কর।’ আমি ফলটি ভক্ষণ করিবামাত্র কুকুরটি চলিয়া গেল। এমন সময়ে একটী জটাধারী মহর্ষি আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন—“বৎস! আমার হস্ত ধারণ কর।” আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র উভয়ে আকাশ পথে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ অতিক্রম করিয়া, এক জ্যোতির্ম্ময় ধামে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানের জ্যোতি এত অধিক যে, আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। আর সকল বস্তু যেন অন্ধকারে ঢাকা। ক্রমে যাইতে যাইতে একটী সুন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কয়েকজন মহর্ষি উজ্জ্বল তারকার ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। আমার পথপ্রদর্শক মহর্ষি আমার হস্তত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ঐ সাধুমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কস্ত্বং’?—অর্থাৎ কে তুমি? আমি উত্তর করিলাম—‘অস্তি পৃথিব্যাং ভাগীরথী-তীরে শান্তিপুরনামা কশ্চিৎ জনপদঃ। তস্মিনপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যনামা প্রসিদ্ধঃ সিদ্ধপুরুষোহভুৎ। তস্য কুলে জাতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-নামা অকিঞ্চনোহহং। ভবতাম্ সমীপে সমাগতঃ। ভগবদ্দর্শন লালসকাতরতয়া মনঃপ্রাণাণি বিদীর্য্যন্তে। হে সত্তমাঃ, মাং কৃপাং কুরুত।’—অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাগীরথীতীরে শান্তিপুরনামে একটি জনপদ আছে। তথায় শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য নামে একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামক এই অকিঞ্চন তাঁহারই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভগবদ্দর্শনলালসাজনিত কাতরতায় মনপ্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। সম্প্রতি আপনাদের সমীপে উপনীত হইয়াছি, আমাকে কৃপা করুণ।’ আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই কৃপালু সাধু বলিলেন—‘বৎস’ তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, উপবিশ।’—অর্থাৎ হে বৎস, থাক, থাক,—এখানে উপবেশন কর।’ আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম। সাধুগণ সমস্বরে—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্ব-লোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি-প্রদায়
নমঃ ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।—ইত্যাদি

এই স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবানের প্রকাশ হইল। সে শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিয়া

আমি অচেতন হইলাম। সচেতন হইয়া দেখি, আমি পৃথিবীর সেই উদ্যানে রহিয়াছি। তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক্ দৌড়িতে লাগিলাম। হায়! কেন আমি প্রভুকে দেখিয়া অচেতন হইলাম? হে প্রাণ, তুমি কেন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলে? তখন কে যেন আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'বৎস, স্থির হও, প্রভুর চরণ ধ্যান কর, আশা পূর্ণ হইবে। প্রভু তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২য় স্বপ্ন। ১৮০৩ শক, ২রা আষাঢ়, রবিবার, গয়া, সাহেবগঞ্জ।

'মধ্যাহ্নে আহারান্তে গ্রীষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত শরীর কিছু কাতর হইল। শয়ন করিলাম, অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। চারিটার পর হঠাৎ নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম, কোথাকার একটী ব্রাহ্মসমাজে সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন হইতেছে। একজন বলিল, সাধারণ সমাজকে নিমন্ত্রণ না করিলে, পরে নিন্দাভাজন হইতে হইবে। একথা শুনিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। পথের মধ্যে কতকগুলি ভদ্রলোক দণ্ডায়মান্ আছেন, তাঁহার মধ্যে একজন বীরবেশী পণ্ডিত আমার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ বিচার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময়ে একজন বলিলেন, ইঁনি ব্রহ্মজ্ঞানী। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত ক্রোধপূর্ব্বক্ আমার একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম। সম্মুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পার্শ্বের প্রশস্ত পথে গমন করিয়া দেখি, পথে অসংখ্য বানর। প্রথমে অনেক বানর দেখিয়া মনে কিছু ভয় হইল, তথাপি সেই পথে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'জয়রাম শ্রীরাম' বলিতে বলিতে যাইতেছেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ 'ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ' উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। আমাকে পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া, সেই বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমাকে চেন?' আমি কোন উত্তর না দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ চলিলাম। ক্রমে আমরা উভয়ে একটি ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে উদ্যান, সরোবর এবং মধ্যে চারি পাঁচটী মন্দির। ঠাকুরঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাকে চেন?' আমি বলিলাম—'আজ্ঞা না।' তিনি বলিলেন—'আমি বীর হনুমান।' এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—'কি জন্য আসিয়াছ?' আমি বলিলাম—'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী।' তিনি বলিলেন—'আমি কি ব্রহ্মজ্ঞানী নহি? আমি রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রকে পূজা করি না। সেই আত্মারাম পরমব্রহ্মকেই পূজা করিয়া থাকি। রমতি ইতি রামঃ। আত্মারাম, প্রাণারাম,—এই দেখ!' ইহা বলিয়া বক্ষঃস্থল চিরিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, তাঁহার প্রত্যেক অস্থি, মাংস ও পেশীর মধ্যে, 'ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ' এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে

প্রণাম করিয়া বলিলাম,—'আমায় কিছু উপদেশ প্রদান করুন।' তিনি বলিলেন—'তোমাকে যোগ-দীক্ষা দিব, চল যাই।' ইহা বলিয়া হস্তে একখানি কোদালী লইয়া আমার পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর গিয়া সরোবরের তীরে একটী বৃক্ষতলে ছোট একটী কুটীর দেখাইয়া বলিলেন—'এই কুটীরে তোমার তপস্যা হইবে। কেমন, হবে না?' আমি বলিলাম—'আজ্ঞা হবে।' তিনি বলিলেন—'দেখ, আমি মনে করিলে এক মুহূর্ত্তে অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিতে পারি; যদি প্রয়োজন থাকে বল।' আমি বলিলাম—'আজ্ঞা ইহাতেই যথেষ্ট হইবে, আর প্রস্তুত করিতে হইবে না।' তিনি বলিলেন—'ভাল, তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। 'ওঁ তৎসৎ ওঁ রামঃ' এই নামের ভাব ধ্যান কর, এবং জপ কর। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্ম, তিনি প্রাণারাম, হৃদয়রমণ, তিনিই সত্য, ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ। এই মন্ত্রার্থ সাধন কর।' এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে অনেক দিন অতীত হইল। একদিন বীর হনুমান আসিয়া বলিলেন—'তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার শরীরের লোমকূপ দিয়া আনন্দস্রোতঃ যাইতেছে। আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ অবিশ্রান্ত হইতেছে, কেমন আত্মা পূর্ণ হইয়াছে ত?' আমি বলিলাম—'সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে।' তিনি বলিলেন—'তবে অন্য সাধনের উপদেশ গ্রহণ কর।' আমি বলিলাম—'অন্য সাধন কি?' তিনি বলিলেন—'ব্রহ্মে প্রবেশ, ইহাকেই সন্ন্যাস বলে।' আমি বলিলাম—'ব্রাহ্মধর্ম্মে সংসার-ত্যাগ নিষেধ। বিশেষতঃ আমাকে (ধর্ম্ম) প্রচার করিতে হইবে। দেশেও ধর্ম্মের অভাব।' তিনি বলিলেন—'ভাল, কিছুদিন আনন্দ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সর্ব্বদেশে ব্রহ্মানন্দ বিস্তার কর। পরে ব্রহ্মে প্রবেশ করিও। এস এখন আমরা সংকীর্ত্তন করি।' ইহা বলিয়া প্রকাণ্ড বানরদেহ ধারণ করিলেন। মস্তক লেজ আকাশে উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটী যেন চন্দ্র-সূর্য্য, দেখিলে ভয় হয়। তাহার লোমে ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ, মস্তকে চক্ষুতে, হস্তে কর্ণে সর্ব্বশরীরে ওঁ রামঃ ওঁ রামঃ। এত উজ্জ্বল যেন ছোট ছোট ফুকো শিশির আলোর মত বোধ হইতে লাগিল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'আমার বানরদেহের মুখখানি কি জান?' আমি বলিলাম—'না'। তিনি বলিলেন—'আমার মুখখানি ওঁ। এই ওঁ পুরুষ, আমার লেজ প্রকৃতি। এই জন্য লেজের দ্বারা রাবণের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার শরীরটা পুরুষ প্রকৃতি। সাধন করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করিলে, তুমিও বানর দেহ লাভ করিবে।' আমি বলিলাম—'আমার কি লেজও হইবে?' তিনি বলিলেন—'অবশ্য। পুরুষ প্রকৃতি এক না হইলে ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার অধিকার হয় না। এখন কীর্ত্তন করি,' ইহা বলিয়া দুই বাহু উর্দ্ধে বিস্তার করিয়া 'ওঁ রাম, ওঁ তৎসৎ' এই নাম গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গণেশ খোল ও করতাল চারিহাতে বাজাইতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে

শিবের জটা খসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী জটা ধরিয়া ধরিয়া নাচিতে লাগিলেন। নারদ ও সরস্বতী বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ইহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রকাশিত হইল। সকলেই করযোড়ে ব্রহ্মের স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ব্রহ্মের জ্যোতির মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি করিতেছ ?' আমি বলিলাম—'আমি মাখিয়া লইতেছি।' তিনি বলিলেন—'খুব মাখ, খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও।' আমি বলিলাম—'নিরাকারকে কি রকমে বাঁধিব ?' তিনি বলিলেন—'সে কাপড় জড় নহে। হৃদয় কাপড়।' ক্ষণকাল পরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া ভক্ত হনুমানকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। হনুমান আমাকে বলিলেন—'এইখানে প্রতিদিন এইরূপ হয়। এতদিন তপস্যায় ছিলে, কিছু জানিতে পার নাই।' আমি বলিলাম—'আমার নিতান্ত অভিলাষ, আমি এখানে বাস করি। কিন্তু কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের বড়ই অনিষ্ট করিতেছেন। তাহা নিবারণের জন্য যাইতে হইবে।' হনুমান বলিলেন—'কেশববাবু ছিলেন ভাল। এখন তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। নিজে অন্ধ হইয়া অনেককে অন্ধকূপে ফেলিতেছেন। আমি যদি ব্রহ্মে প্রবেশ না করিতাম, কেশববাবুকে সংশোধন করিয়া আসিতাম। মহাভারত পড়িয়াছ ত ? ভীমের অহঙ্কার কেমন নির্ব্বিবাদে নষ্ট করিয়াছিলাম।' আমি বলিলাম—'আমি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব ?' তিনি বলেলেন—'অসত্য নষ্ট কর, আর প্রেম কর। প্রেম, প্রেম, প্রেম।' ইহার পরই নিদ্রা ভঙ্গ হইল।"

গোস্বামী-প্রভু কর্তৃক সময়ান্তরে দৃষ্ট আর একটী অদ্ভুত স্বপ্ন প্রসঙ্গতঃ এই স্থানেই উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"একদিন স্বপ্নে দেখিলাম আমি অকস্মাৎ শূন্যমার্গে উঠিতেছি। নিম্নে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি কত নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, সাগর, অরণ্য গ্রাম, নগর আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, ইত্যাদি পার হইয়া অবশেষে গোলোকে গিয়া উপনীত হইলাম। তথায় এক অপূর্ব্ব শোভা সৌন্দর্য্য-সমন্বিত গৃহে স্বর্ণ-সিংহাসনের উপরে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিলাম। যেরূপ ঝাঁপি দর্শন হয়, সেইরূপ দর্শন হইতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ এক একবার মিশিয়া এক হইতেছেন, আবার পৃথক হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুই হইতেছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলাম, 'প্রভো, জগতের জীবের বড়ই দুর্দ্দশা, কৃপা করিয়া তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন কর।' এমন সময়ে দিব্য মহাপ্রসাদসহ একখানি স্বর্ণ থালা আমার সম্মুখে আনীত হইল। রাধাকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—'যাও, এই মহাপ্রসাদ লইয়া জগজ্জনকে বিতরণ কর। ইহা হইতেই তাহাদের সর্ব্বপ্রকারের দুঃখ বিমোচন হইবে।' আমি সেই

মহাপ্রসাদ লইয়া মনের আনন্দে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। লোক-লোকান্তর হইতে দেবতারা আসিয়া আমার নিকটে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া দ্রুতবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে লাগিলাম। নামিবার কালীন পৃথিবীর সেই শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অবশেষে দিল্লীর নিকটে একটী স্থানে অবতরণ করিলাম। অবতরণ করিয়াই গৃহাভিমুখে ছুটীতে লাগিলাম, এবং প্রসাদ লইবার জন্য কত লোককে ডাকিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেহই প্রসাদ চায় না। আমি গোলোক হইতে আসিয়াছি শুনিয়া তাহারা নানারূপ কাম্য বস্তু আমার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকটে একটী মাত্র লোক আমার নিকট হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিল ; ইহার পর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

সাধন পন্থায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সাধকের জাতিস্মরত্ব নামে একটী অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগরিত হয়, এবং অপরের পূর্ব্ব জন্মের কথাও অবগত হইবার ক্ষমতা জন্মে। গয়াধামে অবস্থানকালে একদা রামগয়ার পাহাড়ে গোস্বামী-প্রভুর হঠাৎ পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি জাগরিত হয়। ঘটনাটী জনৈক দর্শকের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ঃ—"গয়ার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে যাইবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। এই স্থানটী জঙ্গলময়। গয়া হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। নাম রামগয়া। সন্ন্যাসীরা তথায় অনেক সময়ে আসিয়া থাকেন। নিকটে লোকেরও বসবাস আছে। গোঁসাই একটী লোক সঙ্গে ঐ স্থানে যান। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নহি, অন্য কোন ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন—'বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি মনের ঐ বিচিত্র ভাব দমন করিতে পারিলাম না। সেই স্থানে পঁহুছিবার পর ঐ ভাব মনে আরও প্রবল হইল। নিকটে একটী বৃক্ষতলে একজন অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে যে দুইটী সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহারা কোথায় গেলেন ? ব্রাহ্মণ বলিলেন—'কিস্‌কে বাৎ পুছাতা হায় ? অর্থাৎ, কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? পরে বলিলেন—'সো লোগ্‌তো বহুৎ পহিলে মর্‌ গিয়া।' অর্থাৎ সেই লোক ত বহুদিন পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে।' গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'হায়, মিলে গা।' গোঁসাই নৃসিংহদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি ও আর দুইটী সন্ন্যাসী এই মন্দিরে বাস করিতেন। যে ঘরে বাস, যে ঘরে শয়ন, যে ঘরে পাঠ, যে ঘরে আহার ইত্যাদি করিতেন, সমুদয় মনে উদয় হইল। তত্রস্থ সমুদয় ঘরগুলি পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন। তৎপরে মনে পড়িল, নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীর তীরে তাঁহারা তিনজনে স্নান করিতেন ; তিনি সেই পুকুর

দেখিলেন, আর মনে পড়িল একটী বৃক্ষের গায়ে তিনি কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৃক্ষটী পাইলেন। বৃক্ষটী বটবৃক্ষ। যখন ছোট ছিল, তাহার ছাল কাটিয়া 'ওঁ রামঃ' এই কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন। অক্ষরগুলি এখন বাঁকা টেরা হইয়া গিয়াছে, তথাপি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।" * শ্রীমন্মহাপ্রভুও গয়াতে অবস্থানকালে এই রামগয়াতে বসবাস করিতেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

এই সময়ে গয়াধামের ৺বিষ্ণুপাদপদ্মের' অশেষ মহিমা-ব্যঞ্জক একটী ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলাম, তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি। কোন এক বিলাতফেরত ব্যক্তি গয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার পরলোকগত পিতা তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—'বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, তবে আমাকে একটী পিণ্ড দিয়ে যাও।' কিন্তু তিনি ওসব বিশ্বাস করেন না, তাই উহাতে আস্থা দিলেন না। আরও একদিন স্বপ্নে ঐরূপ দেখিলেন। আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম—'আপনার পিণ্ড দেওয়াই উচিত।' তিনি কহিলেন—'আপনি আমাকে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে ব'লছেন?' আমি বলিলাম—'আপনি ত আর আপনার বিশ্বাসমত দিবেন না, তাঁহার বিশ্বাসমত দিবেন।' তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে একদিন দিনে শুয়ে আছেন, একটু তন্দ্রার মত হ'য়েছে, তখন দেখিলেন তাঁহার পিতা যোড়হাত করিয়া বলিলেন—'বাপু, আমাকে একটী পিণ্ড দিয়ে যাও।' পুনরায় ঐ ঘটনা আমাকে বলায়, আমি বলিলাম—'যদি অগত্যা আপনি নিজে না দেন, তবে আপনার প্রতিনিধি ক'রে একজন দ্বারা পিণ্ড দিন'। একজন পাণ্ডাকে প্রতিনিধি করিয়া দেওয়া হইল। বাবুটীকে ল'য়ে পিণ্ডদান দেখিতে আমি বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, তখন আপনি কাঁদিলেন কেন?' তিনি বলিলেন—'যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, আমি দেখিলাম আমার পিতা অঞ্জলি ক'রে পিণ্ডগ্রহণ করিলেন। পিণ্ডগ্রহণ মাত্র তাঁহার পূর্ব্বশরীর বদলাইয়া গেল, এবং একটী অভিনব উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ জানিলে আমি নিজেই দিতাম; আমার বড় দুর্ভাগ্য যে আমি নিজ হাতে পিণ্ড দিতে পারিলাম না। ইহা বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।" **

---

* কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র লিখিত বিবরণ। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

** ফরিদপুর, সদরদীনিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল রায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত ও গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখ হইতে শ্রুত।

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু সৎগুরুর অন্বেষণে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একদিন কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে একজন সন্ন্যাসী মুদ্রিত নয়নে, যেন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই উপবিষ্ট আছেন। সন্ন্যাসীর দেহের অপূর্ব্ব জ্যোতি, তাঁহার প্রশান্ত মুখকমল দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু মুগ্ধ হইলেন ; এবং তাঁহাদ নিকটে অনেক মনের কথা, প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিয়া বলাতে, তিনি গোঁসাইজীকে সান্ত্বনা দিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত সৎগুরুর দর্শন না পান, ততদিন তাঁহাকে সঙ্গে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মানুষ যতদিন আপনাকে বড় মনে করে, ততদিন সে প্রকৃত ধর্ম্মপথে চলিতে পারে না। ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই চিত্তের অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, এবং সেই নিরহঙ্কার চিত্তেই ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ অবস্থা যাহার হয়, সে ধর্ম্মের জন্য চণ্ডালের পদেও মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা গোপিকাগণ পশুপক্ষী ও তরুলতার নিকটেও সানুনয়ে ও সকাতরে তাঁহাদের প্রিয়তমের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুও তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতার বিরহে ব্যাকুল হইয়া যেখানে ধর্ম্মকথা শুনিতেন, যে সজ্জনগণের প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে মনে করিতেন, কাঙ্গালের বেশে, বিনীতহৃদয়ে সেই স্থানেই গমনপূর্ব্বক্ তাঁহাদের ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অতি কঠোর সাধন করিতেন। এই প্রকারে গোস্বামী-প্রভু বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যত প্রকার সাধনপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই একে একে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, ঐসকল সাধনলব্ধ অবস্থা স্বায়ত্ত করিয়া দেখিলেন যে, উহার কোনটিতেই চরম বা পূর্ণধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। দুই আনা, চারি আনা পরিমাণ যেখানে যাহা আছে, তাহাও পরোক্ষ ধর্ম্ম মাত্র, তাহাতে আত্মার পিপাসা সম্যক্ বিদূরিত হয় না। তিনি এমন এক অমানুষিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে যেসকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে সামর্থ্যবান সাধকদিগকেও অন্ততঃ দশ পনের বৎসর সময়ের আবশ্যক হয়, তাহাতে তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই কৃতকার্য্য হইতেন। এই কারণে পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক তাঁহাদের সাধনপন্থার যে কোন গূঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিতেন, তিনি তাহারই আবশ্যকমত উপযুক্ত উত্তরটী প্রাপ্ত হইয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন ; এবং এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে অতি অকুণ্ঠ কণ্ঠেই অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

সে যাহা হউক, অতঃপর পূর্ব্বোক্ত দয়ালু সন্ন্যাসী, গোস্বামী-প্রভুকে সঙ্গে লইয়া, মুঙ্গের হইতে গয়াধামে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ৺রঘুবরদাস বাবাজীর আশ্রমে

উপনীত হইলেন। বাবাজী মহাশয় অতিশয় আদরের সহিত এই অতিথিদ্বয়ের সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই আকাশগঙ্গা পাহাড়েরই উপরি-ভাগে একটী নির্জ্জন স্থানে গোস্বামী-প্রভু যোগদীক্ষা লাভ করেন।

তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন,—"আমি যখন বাগআঁচড়ায় ছিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যেন আমি ঘোরতর অন্ধকার ও হিংস্র জন্তুগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ একটী অরণ্যে একটী বাস করিতেছি। আমার সাথের সাথী কেহই নাই। সেই অরণ্য হইতে বাহির হইবারও কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যতই বাহির হইবার চেষ্টা করি, পথ হারাইয়া ততই অরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া মরি, এবং কণ্টাকাঘাতে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। হিংস্র জন্তুগণ যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি নিরাশ্রয় হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছি। এমন সময়ে উপরে একটা আলো দেখিতে পাইলাম। রাস্তার বা দোকানের সাইনবোর্ডে যেমন একখানা হাত আঁকা থাকে, সেই আলোকের মধ্যে সেইরূপ একখানা হাত চিত্রিত রহিয়াছে দেখিলাম। তর্জ্জনী অঙ্গুলী আমাকে একটা দিক্ দেখাইয়া দিতেছে। আমি সেই সঙ্কেত অনুসারে, অঙ্গুলী যে দিক্ দেখাইতেছিল সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। হাতখানি আমার মাথার কিছু উপর দিয়া আগে আগে চলিল। এইরূপে আমি অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে সেই ভীষণ অরণ্য পার হইয়া গেলাম। তখন আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড তরঙ্গসমাকুল একটী নদী পড়িল। আমি সভয়ে নদীর তীরে দাঁড়াইলাম। তথায় একটী সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"বিশ্বাস।র পারের ঘাট"। আমার পথপ্রদর্শক সেই হাতখানি নদীর উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি সাহসের সহিত নদীতে অবগাহন করিলাম। অগাধ জল, প্রবল স্রোত ও প্রলয় তরঙ্গসমন্বিত সেই প্রকাণ্ড নদী, আমার রক্ষাকর্ত্তা সেই হাতের পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিয়াই পার হইলাম। অবশেষে একটি পাহাড়ের উপরিস্থিত একটী আশ্রম দেখাইয়া দিয়া হাতখানি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন। আমি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের মধ্যে মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি। এই মহাবীর আমাকে হাত ইসারা করিয়া পর্ব্বতের উপরে একটী স্থান দেখাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

"এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে যখন আমি সদ্‌গুরু লাভের আশায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে নানা পাহাড় পর্ব্বত, সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত গয়া আকাশগঙ্গা পর্ব্বতে রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, তখন সেই পূর্ব্ব স্বপ্ন-দৃষ্ট স্থান দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ঠিক সেই পাহাড়, সেই মন্দির, সেই মহাবীরজীর প্রতিমূর্ত্তি!

স্বপ্নাবস্থায় মহাবীরজী হাত ইসারা করিয়া পর্ব্বতের উপরিস্থিত যে একটী নির্জ্জন স্থান দেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একদিন পূজনীয় রঘুবরদাস বাবাজী ও আমার ব্রহ্মচারী বন্ধুর সহিত ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে আশ্রমে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে কয়েকটী রাখাল বালক আসিয়া সংবাদ দিল যে পর্ব্বতের উপরে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমরা তাড়াতাড়ি পর্ব্বতের উপরে গিয়া সত্যই একজন দিব্য রূপ-লাবণ্যবিশিষ্ট তেজস্বান মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম। দুই একটী কথার পরই তিনি আমাদিগকে স্বস্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপুরুষের আদেশ লঙ্ঘন করিতে নাই, তাই আমরা সেইদিন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পর দিবস রঘুবরদাস ও ব্রহ্মচারী মহাশয় স্ব স্ব কার্য্যে স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি সুযোগ বুঝিয়া, এবং সাধুরা সাধারণতঃ গাঁজা সেবন করেন জানিয়া, কিছু গাঁজা সঙ্গে লইয়া মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম তাঁহার দেহ হইতে এক প্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। চিত্রপটস্থিত দেবতাদির মস্তকের চতুর্দ্দিকে যেমন এক প্রকার জ্যোতির্গোলক অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই মহাত্মার মস্তকের চতুর্দ্দিকেও সেইরূপ একটী জ্যোতির্গোলকের প্রকাশ দেখিয়া আমি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিকটে বসিতেই, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি বলিলেন,—'ওঃ ব্রাহ্মধরম্! ব্রাহ্মধরম্ হাম জান্তা হ্যায়। কলকাত্তামে ব্রাহ্মসমাজ হ্যায়। রাজা রামমোহন একঠো বড়া আদমি থা। আগাড়ী ওহি ব্রাহ্ম-ধরম্ স্থাপন কিয়া। ওলোগ্ বেলায়েত গিয়া। কেশববাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকো হাম পছান্তা।' এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল পশ্চিম দেশীয় এই মহাপুরুষের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, আমি একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তিনি যতই ঐ সকল কথা বলিতে লাগিলেন, ততই আমার শরীর অবশ হইতে লাগিল; অবশেষে আমার নড়িবার চড়িবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য রহিল না। আমি জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞাতসারে রোদন করিতে লাগিলাম। তখন পিতা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, মহাপুরুষও সেইরূপ আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক্ শক্তি সঞ্চার করিয়া দীক্ষামন্ত্র ও সাধন প্রণালী শিক্ষা দিলেন। (১২৯০ সন, আষাঢ় মাস)। এইরূপ অযাচিত দয়া লাভ করিয়া আমি ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়াই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাইয়া আমার ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলাম। তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত

হইয়া বলিলেন,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি যোগেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়াছ। এখন তুমি যে স্থানেই গমন কর না কেন, মহাপুরুষেরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। তোমার গুরুদেবের জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রয়োজন হইলেই তাঁহার দর্শন পাইবে।'

"এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রামশীলার পাহাড়ে অকস্মাৎ আমার সহিত গুরুদেবের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অসীম স্নেহের সহিত সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক্ বলিলেন—'ঘাবড়াও মৎ! ভজন কর, বখৎমে সব্ মিল্ যায়গা!' অর্থাৎ ভজন কর, বিচলিত হইও না, সময়ে সকলই মিলিবে।" *

গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা-প্রাপ্তির পরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রকার মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার নিকটে দীক্ষা-প্রাপ্তির পরে গোস্বামী-প্রভুর হৃদয়েও সেই প্রকার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। দুগ্ধ যেমন প্রথম উত্তপ্ত হইবার সময় এতদূর উদ্বেলিত হইয়া উঠে যে, পাকপাত্র উপ্‌ছাইয়া পড়িয়া যাইতে চায়, কিন্তু ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া আসিলে আর পড়ে না, পাত্রের মধ্যেই জমাট বাঁধিতে থাকে; তদ্রূপ নবানুরাগীর প্রথম প্রথম ভাবের উচ্ছ্বাস এত প্রবল হয় যে, তিনি উহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হন না; ভাব তাঁহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তোলে। কিন্তু ভাব গাঢ় হইতে আরম্ভ হইলে আর তাদৃশ অবস্থা হয় না। সাধক তখন নিজের ভিতরেই সমস্ত চাপিয়া রাখিয়া, উহার অপূর্ব্ব আস্বাদগ্রহণে সমর্থ হন। দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্রেই গোস্বামী-প্রভুর হৃদয়ে যে মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনিও তাহার আবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ভাবের আবেগ এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি প্রায় ১৪।১৫ দিন পর্য্যন্ত একেবারে বিহ্বলাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিহ্বলতা সময়ে সময়ে এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তিনি স্নানাহারাদি শারীরিক ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া দিবানিশি নামরসেই বিভোর থাকিতেন। এই সময়ে পূজনীয় রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয় দুগ্ধে বিল্বপত্র সিক্ত করিয়া কোন প্রকারে তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইতেন। অন্যান্য বহু বিস্ময়কর অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে এই অবস্থায় একদিন একটী বৃহদাকার পার্ব্বতীয় সর্প গোস্বামী-প্রভুর গায়ে উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্প কোনরূপ অনিষ্ট করে নাই। গোস্বামী-প্রভুর ভাব ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিলে, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া আকাশগঙ্গা আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক্ কিয়ৎকাল কঠোর সাধন করেন। পাহাড়ের একটী গোফার মধ্যে তিনি অধিকাংশ সময়ে একাকী থাকিয়া সাধন করিতেন; এবং গুরুদত্ত নামসুধারসে নিমগ্ন হইয়া কখনও ক্রন্দন

* "আশাবতীর উপাখ্যান" ও শিষ্যদিগের নিকটে কথিত বিবরণ অবলম্বনে লিখিত।

করিতেন, কখনও এমন অট্ট অট্ট হাস্য করিতেন, যাহাতে সমগ্র পর্ব্বতটী প্রতিধ্বনিত হইত, এবং ৺রঘুবরদাস বাবাজী প্রভৃতি অপরাপর আশ্রমবাসীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

"গুরু-কৃপালাভের অব্যবহিত পরে একবার গোস্বামী-প্রভু একাদিক্রমে একাদশ দিন সমাধিস্থ হইয়া একাসনে বসিয়াছিলেন। সমাধিভঙ্গের পর বাহ্যজ্ঞান হইলে, উপস্থিত লোকেরা ঐ বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন—"আমি ইহার কিছুই জানি না। যখন সাধন করিতে বসি, দেখিলাম মা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী আসিয়াছেন এবং আমাকে বলিতেছেন—'মায়ার অপর পারে যাইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে'। আমি বলিলাম—'আমি পরীক্ষার উপযুক্ত নহি, আমায় দয়া কর মা।' মা, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার কথাই বলিতে লাগিলেন। আমি কাতর প্রাণে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলাম। তখন মা প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আকাশপথে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিব্যলোকে উপস্থিত হইলাম। এই লোকের বৃক্ষ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। আপনারা যে সময়ের কথা বলিতেছেন, তখন আমি ঐ লোকেই ছিলাম।" শাস্ত্রেও আছে যে, জগজ্জননীর বিশেষ কৃপা ব্যতীত কেহই মায়া সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উত্থানপতনেই দিন কাটিয়া যায়।*

গোস্বামী-প্রভু এই প্রকারে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর সাধনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একদিন তদীয় গুরুদেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমাকে সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। ৺কাশীধামে হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন। তুমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার ব্রাহ্মসমাজে গমন, উপবীত ত্যাগ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিও। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি তোমার পক্ষে যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিবেন, অবিচলিতচিত্তে তাহা পালন করিও।"

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গোস্বামী-প্রভু কাশীধামে আগমন-পূর্ব্বক পূজ্যপাদ হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শনপুরঃসর, স্বীয় গুরুদেবের আদেশ ও নিজের জীবনের কার্য্যকলাপ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া স্বামীজি বলিলেন—"তুমি পরমহংসদিগেরও দুর্ল্লভ অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছ! তোমার সম্বন্ধে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্বিধানে তোমার দ্বারা শাস্ত্র ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত হইবে; তুমি নিজে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, অপর লোকে তাহা রক্ষা করিতে শিখিবে না। সুতরাং তোমাকে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত পুনরায় প্রণালীমত উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে তুমি সম্মত হইলে তোমাকে

* রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার প্রদত্ত বিবরণ।

সানন্দে সন্ন্যাস আশ্রম প্রদান করিব।" গোস্বামী-প্রভু সম্মত হইলে, স্বামীজি প্রথমতঃ তাঁহাকে দ্বাদশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপরূপ নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, উপবীত-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন। এবং দিনত্রয় পরে, যথাশাস্ত্র বিরজা-হোমে শিখাসূত্রে আহুতি দান করাইয়া, বৈদিক সন্ন্যাস-আশ্রম অর্পণপূর্ব্বক স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী নাম প্রদান করিলেন।+ কিন্তু গোস্বামী-প্রভু প্রতিষ্ঠাকে এতই হেয়-জ্ঞান করিতেন যে, ঐ মহা মর্য্যাদাসূচক নাম কখনও ব্যবহার করেন নাই। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কিয়দ্দিন পূর্ব্বে জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বক্তা স্বীয় স্বার্থ-সাধনমানসে গোস্বামী-প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যাপারটি উড়াইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কূট তর্কের দ্বারা সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করা বৃথা। যাহা হউক, গোস্বামী-প্রভু বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যাপারটী গোপনেই রাখিয়াছিলেন। পরে তদীয় মাতৃদেবীর পরলোক প্রাপ্তির পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্যের সময়ে, তিনি বাধ্য হইয়া ঘটনাটি প্রকাশ করেন। কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, শাস্ত্রানুসারে, তখন তিনি শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং ঐ কার্য্য তখন প্রভুপাদের পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী দ্বারা সম্পন্ন করান হইয়াছিল। তারপর কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে তাঁহাকে সন্ন্যাসীর নাম, বেশ, উপাধি ইত্যাদি গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহাও নহে। কেননা সন্ন্যাস কোন প্রকার বেশ, অথবা স্বামী, গিরি প্রভৃতি উপাধি নহে, উহা আত্মার একটী অবস্থা। সর্ব্বপ্রকার কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌রূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করার নামই সন্ন্যাস।* তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত শ্রীপাদ দামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সন্ন্যাসপ্রদত্ত নাম ও বেশ গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য তাঁহাকে স্বরূপ দামোদর (অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থিত দামোদর) বলা হইত।

কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ, হিমালয় পরিভ্রমণ করিতে গিয়া, তথায় যোগী ঋষিদিগের কঠোর তপস্যা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"আহা! ইঁহারা ভগবানের জন্য কত কঠোরতা করিতেছেন, আর আমি খাই-দাই, বীণা বাজাইয়া আনন্দ করিয়া বেড়াই, আমাকে ধিক্।" এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে কঠোর সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নারদের অনুপস্থিতিতে বৈকুণ্ঠে 'হাহাকার' রব উঠিল। নারদ নাই, কে আর বীণা-সংযোগে সুমধুর গান শুনাইয়া সপার্ষদ ভগবানের আনন্দ-বর্দ্ধন করিবে? অন্তর্য্যামী ভগবান্, দেবর্ষির মনোগত ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নারদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে

+ গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

* "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।"—গীতা

ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"নারদ! বসিয়া কি ভাবিতেছ? তোমার অভাবে যে বৈকুণ্ঠের সমস্ত আনন্দ তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।" নারদ বলিলেন—"হিমালয়-স্থিত ঋষি-মুনিদিগের তপস্যাসন্দর্শন করিয়া আমার মনে এইরূপ ধিক্কার উপস্থিত হইল যে, আমি ত ভগবানের জন্য কোনই তপস্যা করিলাম না। তাই কিছুদিন নিৰ্জ্জনে থাকিয়া তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।" ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—"নারদ, তপস্যার প্রয়োজনীয়তা কি?" নারদ উত্তর করিলেন—"ভগবান্‌কে লাভ করা।" তখন ভগবান্ বলিলেন—"তবে এখন বৈকুণ্ঠে চল, আর তপস্যায় কাজ নাই, তুমি কি ভগবান্‌কে লাভ কর নাই?"

আমরাও যে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—যিনি বাল্যকাল হইতে স্বীয় কুলদেবতা ৺শ্যামসুন্দরের প্রিয়পাত্র হইয়া, তাঁহার সহিত কথোপথন করিতেন, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে যিনি সৰ্ব্বদা ভগবান্‌কে চক্ষে-চক্ষে দর্শন করিতে পারিতেন,-দেবদূতগণ যাঁহাকে একাধিকবার প্রাণসঙ্কট বিপদ হইত আশ্চর্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ হইতে উক্ত সমাজ পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত, সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই যাঁহাকে ভগবান্ হাত ধরিয়া চালিত করিয়াছেন, তাঁহার আবার দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা, সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের আবশ্যকতা কি? এই সমস্যার মীমাংসা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধদেব, গুরু নানক প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে সহজেই ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন পুরুষোত্তম হইয়াও সন্দিপনী মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণ ভগবান্ হইয়াও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা ও কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। এ দীক্ষা, এ সন্ন্যাস-গ্রহণ কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতাতে বলিয়াছেন—

"যৎযদাচরিত শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণাৎ কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ—মহৎ ব্যক্তি যে সকল আচরণ করেন, ইতর জনগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে; এবং তিনি যাহা কৰ্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, অপরাপর লোক তাহারই অনুবৰ্ত্তন করিয়া থাকে।

"যদি হ্যহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতুকৰ্ম্মন্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পাৰ্থ সৰ্ব্বশঃ।"

অর্থাৎ—হে পার্থ, যদি আমি কদাচিৎ অলস হইয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয় মনুষ্যগণ আমার প্রদর্শিত পথ সৰ্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে।

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।"

অর্থাৎ—আমি কর্ম্ম না করিলে এই লোকসকল ধর্ম্মলোপ হেতু বিনষ্ট হইবে।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ—যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, তখনই আমি আমাকে সৃজন করিয়া থাকি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিশালীদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

উপরিউক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিত্য-সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের ত কথাই নাই, কোন কোন সময়ে স্বয়ং ভগবানকেও তাঁহার নরলীলার পরিপুষ্টির জন্য, মানুষের আকার ধারণপূর্ব্বক, গুটিপোকার ন্যায় আপনার মায়াজালে আপনিই বিজড়িত হইয়া, আদর্শ মানবরূপে মানুষের মধ্যে জন্মিয়া মানুষের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। নচেৎ মানবমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিবেন কিরূপে? এবং মায়াধীন মনুষ্যেরাই বা তাঁহাকে বুঝিতে সমর্থ হইবে কি প্রকারে? উটপক্ষী শিকারীরা যেমন মৃত উটপক্ষীর পালকাদি পরিধান পূর্ব্বক, উটপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের দলে প্রবিষ্ট হয়, এবং সময় বুঝিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণকরতঃ কৌশলে তাহাদিগকে ধৃত করে; জড়াতীত নিরাকার সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ ভগবানও সেই প্রকার মানুষের রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, উপযুক্ত সময়ে নিজের অলোকসামান্য গুণগ্রাম প্রকাশিত করিয়া সুকৌশলে তাহাদিগকে আত্মসাৎ করেন। এই প্রকার আদর্শ-পুরুষকে 'মহাজন' বলা হয়। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' এবং সাধারণ মানবগণ তাঁহারই আচরণ অনুকরণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে —আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।' বস্তুতঃ, আচার ও প্রচার একাধার হইতে উৎপন্ন না হইলে তাহা সম্যক্ ফলদায়ী হইতে পারে না; এবং বিনা সাধনেও সাধ্য বস্তু কেহ পায় না।

"সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই সাধন বস্তুটি কি, তাহা কোন সামর্থ্যবান্ পুরুষ নিজের জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইলে, অপর সাধারণের পক্ষে তাহার অনুসরণ করা একান্ত অসম্ভব। যদি কোন সময়ে একটী লোকও সাধন করিয়া তাহার ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন, ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত নিদর্শন দেখাইতে সমর্থ হন, তবে সহস্র লোকের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়; এবং সেই আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা তদনুষ্ঠিত পন্থার অনুসরণ করিবার

জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্য লক্ষ লক্ষ লোক কলিযুগপাবনাবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনুষ্ঠিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কত কঠোর সাধনাই না করিতেছেন! মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রভুও তাঁহার নিজের জীবনে স্বীয় অনুষ্ঠিত সাধনপ্রণালীর অনন্ত শান্তিময় ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই, সহস্র সহস্র উচ্চশিক্ষিত লোক, ধন, জন, যশোমান, কুল, শীল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের লৌকিক সুখশান্তিকর বিষয়ের আশায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহার উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, ও অপর লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহার উপদেশামৃত পান করিবার নিমিত্ত অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা। তিনিও যে কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোস্বামী-প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কারণও তদনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের জ্বলন্ত ঈশ্বরানুরাগ, অপার্থিব প্রেম, অলোকসামান্য ভাব-কদম্ব ইত্যাদি সন্দর্শন করিয়া শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, বিভিন্ন দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া, অকুল ভবসাগরের কুল পাইবার আশায় তাঁহাকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! তাঁহার অধিকাংশ স্বদেশবাসিগণ, এমন কি, তাঁহার সহপাঠিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া, নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী প্রবলপরাক্রান্ত কাজীর হস্তে সমর্পণ করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। অগত্যা শ্রীমমহাপ্রভু, সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার নিন্দকগণ অন্ততঃ সন্ন্যাসী-বুদ্ধিতেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে; এবং এই প্রকারে অপরাধ ক্ষালন হইলে, তাহাদের পরিত্রাণের পথ সুগম হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। শ্রীমমহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগী হইবার পর, নিতান্ত বিরুদ্ধ-বাদিগণও তাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। গোস্বামী-প্রভুর জীবন আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ, উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্যের জন্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তৎপ্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া যে গুরুতর অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা ক্ষালনের সুযোগ উপস্থিত করিবার জন্যই শ্রীমমহাপ্রভুর দৃষ্টান্তানুরূপ, ভগবদ্বিধানে ও স্বীয় গুরুদেবের আদেশে কঠোর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও তাহার ফল তদ্রূপই হইয়াছিল। গোস্বামী-প্রভু সন্ন্যাসব্রত গ্রহণানন্তর দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, তারকব্রহ্ম হরিনামের জয়-পতকা ধারণ করিয়া শান্তিপুর প্রবিষ্ট হইলে, শান্তিপুরনিবাসিগণ অনুতাপদগ্ধহৃদয়ে সাশ্রুনয়নে এই নবীন সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

এই স্থলে গোস্বামী-প্রভুর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও উপবীতত্যাগজনিত যে দুইটী কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার স্বদেশবাসী এবং সমগ্র হিন্দুসমাজ, তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজে গমনের কথা বলিব। শাস্ত্রে আছে ঃ—

"বদন্তিতৎতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত ॥

অর্থাৎ—তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করেন। এই একই অদ্বয়-তত্ত্ব আবার জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনভেদে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধভাবে সাধকের নিকটে অভিব্যক্ত হন।" সাধকও ভগবানের এই ত্রিবিধ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সম্যক সফলকাম হইতে পারেন না। গোস্বামী-প্রভুও এই ব্রহ্মভাব লাভ করিবার নিমিত্ত, এবং অদ্বয়-নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যে সগুণ সাকার লীলায় প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে না, এই তত্ত্বটী শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে, ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, তাহা প্রকৃত পন্থা কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। গোস্বামী-প্রভু যখন উক্ত প্রণালীর মধ্যে ভুল দেখিতে পাইলেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, গোস্বামী-প্রভু কোন অযথা কার্য্য করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ—উপবীত ত্যাগের কথা। এই ব্রহ্মণ্যপ্রধান বঙ্গদেশে শান্তিপুর-বাসী গোস্বামী-সন্তানের পক্ষে, ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন উপবীত ত্যাগ ব্যাপার আপাততঃ অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই উপবীত ত্যাগের মূলে যে কি মহদ্ভাব লুক্কায়িত ছিল, তাহা অতি অল্প লোকই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। ধর্ম্ম দুই প্রকার—পরাধর্ম্ম ও অপরাধর্ম্ম। তন্মধ্যে পরাধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এই পরাধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য অপরাধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারা যায়। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার সময়ে প্রত্যেক সাধককে বিরজার হোমে শিখাসূত্র আহুতি প্রদান করিতে হয়, তাহা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। তারপর যে ধর্ম্মের জন্য জাতি, কুল, শীল, যশ, মান প্রভৃতি বিসর্জ্জন করা না যায়, সে ধর্ম্মের আবার গৌরব কি? গোপিকাকুল পরাধর্ম্মের জন্য পতিপুত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মের গৌরবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীমান্ মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্ত হইয়া দুইবার স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যথা ঃ—

"এ ভব সংসার কাল কেমনে ছাড়িব।
সে নন্দনন্দন পদ কোথা গেলে পাব।
ইহা বলি ছিঁড়িল গলার উপবীত।
কৃষ্ণের বিরহ-দুঃখ ভেল বিপরীত॥"

অন্যত্র ঃ—

"ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে।
যথা গেলে পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া॥"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড।

গোস্বামী-প্রভুও প্রকৃত পরাধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া নিজের জাত্যভিমান, প্রতিষ্ঠা, সম্মান ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া, সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে জাতিচিহ্ন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং পরবর্ত্তীকালে তাহাতেও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া, কাশীধামে সন্ন্যাসী-শিরোমণি হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকটে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণার্থ উপস্থিত হইলে, তিনি যখন লোকশিক্ষার নিমিত্ত, শিখাসূত্র বর্জ্জনপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন গোস্বামী-প্রভু তাহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

১৩০০ সনের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিতে গোস্বামী-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞলোকেরা তাঁহাকে উপবীত-ত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উপহাস করিয়া জন্ম-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ না করিয়া, এবং অন্যবিধ উপায়ে অবমানিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল। এমন সময়ে নবদ্বীপের 'হরিসভা' স্থাপয়িতা, পরমভাগবত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, প্রবীণ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় এই বিষয় অবগত হইয়া, স্মৃতিশাস্ত্র হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষকে অকাট্যরূপে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের জন্য, স্বকার্য্য উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত, শাস্ত্রের সাধারণ-বিধি-বহির্ভূত কোন কার্য্য করিলে, তাহা তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মের বাধক হয় না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "যে ইঁনি যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা অতীব দেবদুর্ল্লভ। ইঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সহিত শাস্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে।" বলা বাহুল্য যে, পদরত্ন মহাশয়ের এই মীমাংসায় অপর পক্ষ আপনাপন ভুল বুঝিতে পারিয়া, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক, তাঁহাকে সশিষ্যে মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া মর্য্যাদাসহকারে সেবা করিয়াছিলেন।

উপবীতের এক নাম 'উপনয়ন'। প্রকৃত প্রস্তাবে তৃতীয় চক্ষু অর্থাৎ বিজ্ঞান চক্ষুকেই 'উপনয়ন' বলে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিৎ মহাত্মারা ত্রিনয়ন বলিয়া উক্ত হয়েন। এই 'উপনয়ন' লাভ করিবার জন্যেই নিত্যযজ্ঞেব্রতী ব্রাহ্মণ ব্রতচিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। যদ্দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়, সেই 'উপনয়ন' লাভার্থই গোস্বামী-প্রভুর যাবতীয় উদ্যম চেষ্টা ও কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহার পূর্ব্বাপর জীবন দ্বারাইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং মূলতঃ ব্রহ্মণ্য হইতে একটী কেশপরিমাণও তাঁহার বিচ্যুতি দৃষ্ট হইতেছে না। বিশ্বরূপ ঋষি উপনয়ন মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। যদি উপবীত ভিন্ন ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্মণ্য বিরূপ বা বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে বলিতে হইবে বিশ্বরূপ ঋষির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গোস্বামী-প্রভুর উপবীত ত্যাগ ব্যাপার লইয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত-মর্ম্ম গ্রহণে অক্ষম, সাধকজীবনের তীব্র ব্যাকুলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ অজ্ঞ লোকেরা এতদিন তাঁহার প্রতি যে অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিয়াছিল তাহা বস্তুতঃই নিতান্ত ভিত্তিহীন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে নির্জ্জন সাধন। নামাগ্নি ও পঞ্চতপা। জ্বালামুখী গমন ও সরস অবস্থা লাভ। গয়ার পাহাড়ে যোগৈশ্বর্য্য দর্শন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের সহিত কথোপকথন। ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বারদীর ব্রহ্মচারীর সহিত মিলন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর গোস্বামী-প্রভু সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনধামের অন্তর্গত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে সাধনভজন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য, স্বীয় গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে পরমহংসজী বলিলেন—"সে কি! ভগবান্ তোমার দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। তুমি নির্জ্জনে বাস করিলে চলিবে কেন?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"এ বিষয়ে আমি নিজেকে একান্ত অনুপযুক্ত মনে করি। এ কার্য্য আপনারই শোভা পায়, আপনি দয়া ক'রে সম্পন্ন করুন।" পরমহংসজী বলিলেন—''আমি অজ্ঞাতকুলশীল। আমাকে কেহ চিনে না, জানে না। তুমি শান্তিপুরে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া বহু লোকের নিকটে সুপরিচিত হইয়াছ। তোমার সত্যনিষ্ঠায়, ন্যায়পরতায়, তীব্র ধর্ম্মানুরাগবিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। তোমার একটী কথায় যেরূপ কার্য্য হইবে, আমার সহস্র উপদেশেও তাদৃশ ফল হইবে না। আর ভগবান্ তোমাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং, ভগবানের বিধান জানিয়া তুমি এই কার্য্যে মনোনিবেশ কর।" তিনি আরও বলিলেন—"তুমি পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক সাধন করিতে পার, তাহাতে তোমার ধর্ম্মসাধনের বিঘ্ন হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ হইতেও বিচ্ছিন্ন হইও না, যেমন ছিলে, তেমনি থাক। এখন ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিবার সময় হয় নাই। সময় হইলে উহা সর্পের খোলসের ন্যায় আপনা হইতেই খসিয়া যাইবে।"* এই বলিয়া তিনি গোস্বামী-প্রভুকে কিয়ৎকাল বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে থাকিয়া সাধন করিতে আদেশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনিও গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গিয়া নির্জ্জন সাধনে

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল সাধনের পর তিনি সাধনমার্গের একটী ভয়ানক বিপজ্জনক সন্ধি-স্থলে উপনীত হইলেন। সাধন-ভজন করিতে করিতে গুরু শক্তিবলে তাঁহার অন্তরে নামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। ইহাকেই প্রকৃত পঞ্চতপা বলে। এতদ্ভিন্ন অনেক সাধক বাহিরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া পঞ্চতপা করেন, তাহাতে আভ্যন্তরিক কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। উহাকে বাহ্যিক পঞ্চতপা বলে। সাধন পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, প্রত্যেক সাধকের ভিতরে নামাগ্নি জ্বলিতে থাকে, তাহাতে তাহার সর্ব্বপ্রকার বিষয় বাসনা দগ্ধীভূত হইয়া আত্মা নির্ম্মল হয়; কারণ, বিষয়-রস একটুকুও থাকিতে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করা যায় না। এই সময়ে সাধককে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করে। সংসারের যাবতীয় সুখের বস্তুই আর সুখ দিতে পারে না— সমস্তই বিষবৎ বোধ হয়। জীবন ধারণ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়। সাধক-জীবনে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা আর নাই। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে, কোন কোন সাধক আত্মহত্যা করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ উন্মাদ হইয়া যান এবং অধিকাংশই সাধন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সামর্থ্যবান্ গুরু যাঁহাদের পিছনে থাকেন, তাঁহারাই কেবল উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া উচ্চাবস্থা লাভ করেন। ধৈর্য্য ধরিয়া গুরুদত্ত নাম গ্রহণ করাই এই অবস্থা অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়। এতদ্ভিন্ন, যাহাকে নিজ হইতে নিকৃষ্ট মনে হইবে, এমন কোন লোকের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে পারিলেও এই যন্ত্রণার সাময়িক নিবারণ হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই অবস্থায় নিপতিত হইয়া জগন্নাথদেবের রথচক্রের তলে পড়িয়া দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলে অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাঁহাকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহোদয়ও এই অবস্থায় নিপতিত ইইয়া, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু এই অবস্থায় নিপতিত হইয়া দিবানিশি নামাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা তিনি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন; যথা:—"আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইত। কিছুতেই সুখ পাইতাম না। আহার বিহার বিষবৎ বোধ হইত। অত্যন্ত গাত্রদাহ হইত, যেন ভয়ানক জর হইয়াছে। এক এক সময়ে অসহ্য বোধ হইত। আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। এই প্রকার যাতনা ভোগ করিয়াও সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে যন্ত্রণা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তখন সাধন ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলাম, এমন সময়ে গুরুদেব আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়া উপদেশ দিলেন—'অধীর হইও না, আমার অনুরোধে তুমি আরও কিছুদিন নাম কর। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা চিরকালের তরে দূর হইয়া যাইবে।'

পরে বলিলেন—'তুমি কিছুদিন যদি জ্বালামুখী গিয়া সাধন করিতে পার, তবে তোমার এই অবস্থা সত্বর দূরীভূত হইবে।' তদনুসারে আমি জ্বালামুখী গমন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম।, কিছুদিন সাধন করিবার পর আমার যন্ত্রণার অবসান হইল, এবং প্রাণে এক অপূর্ব্ব সরস অবস্থা আগমন করিল।"*

বিন্ধ্যাচল হইতে গোস্বামী-প্রভু জ্বালামুখী গমন করেন। তথা হইতে সরস অবস্থা লাভ করিয়া গয়ায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক্ আকাশগঙ্গার আশ্রমে থাকিয়া সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরমহংসজী সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া সাধন বিষয়ে উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিতেন। একদিন তিনি গোস্বামী-প্রভুকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির† সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। পরমহংসজী কখনও বায়ু অপেক্ষা লঘু হইয়া শূন্যে পরিভ্রমণ, কখনও বা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া পর্ব্বত ভেদ করিয়া অপরপার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি পর-শরীরে প্রবেশের ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করাইলেন। পাহাড়ের নীচে, নীচজাতীয় কয়েকটি লোক একটী মৃতদেহ সৎকারের জন্য আনিয়াছিল। কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য লোকগুলি মৃতদেহটী রাখিয়া স্থানান্তরে গেলে, পরমহংসজী স্বীয় স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ঐ দেহে প্রবিষ্ট হইলে, উহা সজীব হইয়া উঠিয়া বসিল আর তাহার নিজের দেহ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। স্বীয় গুরুদেবের এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু বিস্মিত হইলেন।

অপর একদিন পরমহংসজী গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যবসায়ী গুরুগণের অসদাচরণে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি সাধারণের ভয়ানক অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে কয়েকটী সিদ্ধ তান্ত্রিকের সাধন-প্রক্রিয়া দর্শন করাইব ; তাহাতে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, যথাশাস্ত্র তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে কি প্রকার আশু ফলপ্রদান করে।" এই

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

† অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব। অণিমা—অণু, পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইবার শক্তি। লঘিমা—বায়ুর ন্যায় লঘু হইবার সামর্থ্য। গরিমা—পর্ব্বত প্রভৃতির ন্যায় বৃহৎ হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—ইচ্ছা মাত্র দূরবর্ত্তী পদার্থ নিকটে প্রাপ্ত হইবার শক্তি। প্রাকাম্য—ইচ্ছা শক্তির অব্যাঘাত, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করা যাইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। বশিত্ব—যে শক্তি দ্বারা সমস্ত পদার্থ বশীভূত করা যায়। ঈশিত্ব—ঈশ্বরের ন্যায় সমস্ত পদার্থের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা। যত্রকামাবসায়িত্ব—সত্য-সঙ্কল্পতা ; এই শক্তির প্রভাবে বিষয়কে অমৃত, মৃতকে জীবিত ইত্যাদি অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত করিতে পারা যায়।

বলিয়া গোস্বামী-প্রভুকে সঙ্গে লইয়া "বরাবর" পাহাড়ে* উপনীত হইলেন। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছে। তথায় উপনীত হইয়াই দেখিলেন, আশ্রমের দ্বারে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে একজন প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছেন। পরমহংসজীর সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল। তিনি দ্বার ছাড়িয়া দিলে, গোস্বামী-প্রভু গুরুদেবের সহিত ভিতরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দশ পনেরজন সাধক যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোকও ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে চক্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। চক্রেশ্বর কিছু জল মন্ত্রপূত করিয়া উপস্থিত সকলের গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্রই সকলের মনে বালকের ভাব উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারা সকলেই উক্ত স্ত্রীলোকটীকে মাতৃভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুর ভিতরে বালকভাব এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি "মা! মা!" বলিতে বলিতে হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন! তখন স্ত্রীলোকটী গোস্বামী-প্রভুর পীঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—'আজ অবধি তুমি জিতেন্দ্রিয় হইলে'।" অতঃপর স্ত্রীলোকটী ছিন্নমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া দেখাইলেন। তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা নিজের মস্তক ছেদন করিয়া, বামকরে ধারণ করিলেন; এবং সেই ছিন্নমস্তক মুখব্যাদান করিয়া, গলদেশ-নির্গত রক্ত পান করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ং চক্রেশ্বর মহাদেব তথায় প্রকাশিত হইলেন। তখন পূর্ব্বোক্ত সাধকদিগের মধ্যে কেহ স্তবপাঠ, কেহ বা পত্রপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর, ছিন্নমস্তক যথাস্থানে স্থাপিত হইবামাত্র দেহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল। সকলে 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে দেবাদিদেব মহাদেব উপস্থিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন।**

অতঃপর, গোস্বামী-প্রভু গয়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া পরিবারবর্গের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন বলিয়া আত্মীয়গণের যে আশঙ্কা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূরীভূত হইল। এই চময়ে এক দিবস তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় চুঁচুড়াস্থ বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি, গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিয়াই বলিলেন—"তোমাকে যে নূতন মানুষ দেখিতেছি।

* এই পাহাড় গয়া হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে এবং বাঁকিপুর-গয়া রেলপথের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এই পাহাড়ে নির্জ্জন তপস্যার উপযোগী অনেক গুহা বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে অনেক মহাপুরুষ বাস করিতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখন সেই সকল গুহা দস্যুর আড্ডায় পরিণত হইয়াছে।

** গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

তুমি নিশ্চয় কিছু নূতন বস্তু লাভ করিয়াছ। এই দেবদুর্লভ বস্তু কি প্রকারে কোথায় লাভ করিলে?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে মানস্ সরোবরবাসী পরমহংসজীর নিকটে তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পুনরায় বলিলেন—"যে অমূল্য বস্তু লাভ করিয়াছ, ইহা দ্বারা তুমি ধন্য হইয়া যাইবে, উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই দেবদুর্লভ বস্তু কদাচ পরিত্যাগ করিও না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তোমার স্থান হইবে না, তুমি তথায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে হয় করিবে, তথাপি এ বস্তু কখনও ছাড়িও না।"* অনন্তর মহর্ষির সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথোপকথন হইবার পর, গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক্ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বহুমূত্ররোগে কাতর হইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইলে, উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।—"কেশববাবুর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে, শরীর মৃতদেহের ন্যায় প্রভাহীন হইয়াছে। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন—'গোঁসাই, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। পথহারা হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিয়া আশা হইতেছিল, এমন সময়ে এই পীড়া।' আমাকে বলিলেন—'তুমি না কি নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছ?' আমি বলিলাম—'নূতন পুরাতন কিছু বুঝি না। ভগবান্‌কে লাভ করিব বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি। এখন কত পরিবার ব্রাহ্মসমাজে, তখন কিছুই ছিল না। সুতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া গোল করিতে আসি নাই। ভগবান্‌কে পাইলাম ইহা প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে কিছুতেই ফিরিব না। যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় করিব। বাহিরের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কৃতার্থ, আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে, প্রভু তুমিই সত্য, ইহা বলিয়া মরিব, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।' কেশববাবু বলিলেন—'এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে, যদি আরোগ্যলাভ করি, তোমাকে ডাকাইব।' দুঃখের বিষয় তাঁহার লীলা সংবরণ হইল।"**

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু এক দিবস কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ১৮৮৪ খৃঃ অঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সপ্তমীপূজার দিবস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত গোস্বামী প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দর্শনমাত্রেই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় পরস্পর

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

** শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেন মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

পরস্পরকে চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরমহংসদেব ইতঃপূর্ব্বেই লোকপরম্পরায় গোস্বামী-প্রভুর অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ, অলোকসামান্য সত্যনিষ্ঠা—ইত্যাদি অশেষ গুণের কথা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কোন এক সময়ে পরমহংসদেবের একখানা হাত ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্ম বলিলেন—"আপনি জীবন্মুক্ত, এই যন্ত্রণাটুকু ভুলিতে পারিতেছেন না?" তিনি উত্তর করিলেন,—"তোদের সঙ্গে কথা ব'লে ভুলবো? তোদের বিজয়কে আন। তাঁকে দেখ্‌লে আমি আপনাকে ভু'লে যাই।"†

আজ বহুদিন পরে গোস্বামী-প্রভু পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু গোঁসাইজী আর সে মানুষ নাই, তাঁহার সে বেশ নাই, সম্পূর্ণ এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, শ্রীঅঙ্গ গৈরিকবসনে সুশোভিত, করদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু বিরাজ করিতেছে, যেন কাঞ্চননগর হইতে নদীয়ার চাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্দীপ্ত, দৃষ্টি স্থির, নিশ্চল, নিষ্পন্দ, নয়ন-কোণে জীববৎসলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বাণী অমৃত-শীতল-স্নিগ্ধতা-মৃক্ষিত, উপবেশন পদ্মাসনযুত, হস্তাঙ্গুলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অনামিকা-মূলে ধৃত হইয়াই অবস্থান করিতেছে। স্নেহময়ী জননী যেমন বারিতাপ-ক্লিষ্ট, ক্রীড়ারত সন্তানদিগকে কখনো কখনো মনোমুগ্ধকর ছবি দেখাইয়া স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করেন; অনন্ত স্নেহের আধারস্বরূপা বিশ্বজননীও যেন সেই প্রকারে তাঁহার সংসার-মোহ-নিমজ্জিত, ত্রিতাপক্লিষ্ট সন্তানদিগকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিবার জন্য, এই শান্তিময়, স্নিগ্ধ-মোহন, শ্যাম-সুন্দর মূর্ত্তিটী আদর্শস্বরূপে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া ৺গয়াধাম হইতে রাজধানী কলিকাতা সহরে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, গোস্বামী-প্রভুকে এইরূপ অভিনবভাবে নূতন বেশে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বসিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং কিয়ৎকাল তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সাতিশয় হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন—"বিজয়, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ? দেখ, দুইজন সাধু ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সহরে এ'সে প'ড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখছিল, এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী ব'ল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে, তল্পী-তল্পা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ? (মাষ্টারের প্রতি) দেখ, বিজয়ের এত দিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"*

† রামকৃষ্ণ কথামৃত

* রামকৃষ্ণ কথামৃত।

অপর এক দিবস গোস্বামী-প্রভু স্বীয় মাতৃদেবী, শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী, সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলে, তিনি সঙ্গীয় লোকদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। গোস্বামী-প্রভু একে একে সকলের পরিচয় প্রদান করিলে, পরমহংসদেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"বটে! তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও ধর্ম্মের এতদূর উচ্চাবস্থা লাভ ক'রেছ? তুমি তাহা হইলে জনকঋষির ধর্ম্ম যাজন করিতেছ, বল! আমার ত ধারণা ছিল যে, তুমি সংসারে উদাসীন হইয়া কেশবাবুর সহিত ভ্রমণ করিতেছ যে, তুমিই ধন্য! তুমি যে আদর্শ দেখাইলে, জগতে তাহা দুর্ল্লভ।"* অতঃপর গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'তুহি ইঁহাকে কতদিন হইল দীক্ষা দিয়াছ? ইঁহার মধ্যে যে অতীব আশ্চর্য্য শক্তি দেখিতেছি! সাক্ষাৎ মহাশক্তির নিকটে আগমন করিলে আমার যেরূপ অবস্থা হয়, ইঁহাকে দর্শন করিয়াও আমার যে সেই প্রকার ভাব উপস্থিত হইতেছে!'† ঈদৃশ কথোপকথনের পর, গোস্বামী-প্রভু আশ্রমের শোভা দর্শনার্থ অন্যত্র গমন করিলে, পরমহংসদেব, গোস্বামী-প্রভুর শ্বশ্রূমাতা স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবীকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি নীতিপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হ'য়ে এই ন্যাংটো পুরুষের নিকটে কি জন্য আগমন করিয়াছ?" স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী উত্তর করিলেন—"আপনার আবার ন্যাংটা কাপড় পরা কি?" পরমহংসদেব বলিলেন—"বটে! তুমি তা বুঝেছ? তবে নিকটে ব'স।" পরে বলিলেন—"দেখ, ব্রাহ্মসমাজের শুক্‌নো বাঁশের মুড়ো (শুষ্ক জ্ঞান) আর কতদিন চিবাইবে? এখন ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। (গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া) যাঁহাকে তুমি জামাতা ভাবিতেছ, তিনি ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁহার নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হও।"† ইহার কিছুকাল পরে স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী গোস্বামী-প্রভুর নিকট যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।

ভক্তিভাজন পরমহংসদেব ও (ঢাকা) বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় উভয়েই গোস্বামী-প্রভুকে অত্যধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি ও স্নেহ সমাদর করিতেন; এবং কেহ তাঁহাদের নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে গোস্বামী-প্রভুর নিকটেই প্রেরণ করিতেন। একসময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম

---

* স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবীর প্রমুখাৎ শ্রুত।

† ঢাকা, গেণ্ডারিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী প্রদত্ত বিবরণ। ইনি গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

† স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবীর প্রমুখাৎ শ্রুত।

শিষ্য শ্রদ্ধেয় নবকুমার বাক্‌চি ও অপর এক সময়ে ফরিদপুরের অন্তর্গত সদরদিনবাসী ৺শ্রীধর ঘোষ মহাশয় দীক্ষার্থী হইয়া পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারেই তাঁহারা গোস্বামী-প্রভুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট ঢাকা নিবাসী ৺শ্যামাচরণ বক্সী ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয়েরা (ইঁহারা উভয়েই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম) দীক্ষা-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারাও গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম জীবনী-লেখক, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় তদীয় গ্রন্থে যে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "ব্রাহ্ম শিষ্যের উক্তি।—আমি মধ্যে মধ্যে বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকটে যাইতাম। প্রত্যেকবার অনেক চিন্তা ও ভাব লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র আমার অন্তরের গোপনীয় প্রশ্ন সকল, যাহা অন্তরর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানেন না, তিনি একে একে সকলগুলির উত্তর দিতেন। প্রশ্ন আমার প্রাণে, উত্তর আমার কাণে। আমি অবাক হইয়া থাকিতাম। একদিন ভাবিলাম, যদি ব্রহ্মচারী আমাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। গিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিলেন—'না, না, তা হ'তে পারে না। তোমার গুরু অপেক্ষা ক'রে আছেন। তিনি তোমাকে ঘর হ'তে ডেকে নেবেন।' তারপর আমি ঢাকায় গিয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিলেন—'আপনি সাধন পাবেন।' আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হইল। পরদিন স্নান করিয়া ক্ষেত্রের ঘরে উপাসনার জন্য বসিয়া আছি, আমার মন উদ্বেগপূর্ণ, আমার ইচ্ছা, আমার দীক্ষার সময়ে আমার বাল্যগুরু নগেন্দ্রবাবু (তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন) উপস্থিত থাকেন, কিন্তু বলিতে পারিলাম না। গোঁসাইজী হঠাৎ বলিলেন—'ক্ষেত্র, নগেন্দ্রবাবুকে ডাক।' নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইলেন। আমার দীক্ষা হইল। আমি যে কারণে চঞ্চল হইয়াছিলাম, গোস্বামী-প্রভু তাহা দূর করিলেন। দেখিয়া মনে হইল আত্মদর্শী মহাপুরুষেরা অন্যের মন স্পষ্ট দেখিতে পান। আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।"

ব্রহ্মচারী মহাশয় একদিন গোস্বামী-প্রভুকে দেখাইয়া জনৈক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আখ্‌ড়ার সেবককে বলিয়াছিলেন—"তোদের গৌরাঙ্গ নিমকাষ্ঠেরও অচল, আর ঐ দেখ, আমার গৌরাঙ্গ সচল।" তিনি গোস্বামী-প্রভুকে, 'জীবন-কৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে অতিশয় সমাদর ও স্নেহ

করিতেন।* স্থানাভাববশতঃ নিম্নে অতি সংক্ষেপে পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব এই মহাত্মার পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, এবং এক সময়ে গোস্বামী-প্রভুর প্রপিতামহের সহোদর বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় উপবীত গ্রহণ করিবার পরে প্রগাঢ় বৈরাগ্য-বশতঃ ব্রহ্মচারীর বেশেই স্বীয় আচার্য্য গুরু ৺ভগবান গাঙ্গুলী ও সতীর্থ বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। উপনয়ন গ্রহণের পর, ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রায় ৮০ বৎসর কাল স্বীয় গুরুদেবের সহিত নানা বনে, পর্ব্বতে ও তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক্ কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আচার্য্য গুরু ৺ভগবান্ গাঙ্গুলী মহাশয় একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি ৺কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে আসীন হইয়া দেহত্যাগ করেন। অন্তর্দ্ধানের সময়ে তিনি হিতলাল নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর উপর শিষ্যদ্বয়ের ভার অর্পণ করিয়া যান। হিতলাল, সুমেরু পর্ব্বত দর্শনমানসে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে সঙ্গে হইয়া প্রথমতঃ বদরিকাশ্রমে উপনীত হন। পরে পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পথ অবলম্বন করিয়া, বহু সহস্র মাইল উত্তরে গমন করিতে করিতে চন্দ্রসূর্য্য-বিহীন এক নিবিড় অন্ধকারময় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহারা একহস্ত পরিমিত মনুষ্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও সুমেরু পর্ব্বতের সন্ধান না পাইয়া, হিতলাল তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক উদায়চল দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। আর হিতলালের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিতেন যে, হিতলালই কাশীর প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গস্বামী।

অতঃপর ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বেণীমাধব গাঙ্গুলী মহাশয়, অনুমন ১২৭০ সনে, বরফাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী পর্ব্বতে অবতরণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বরফাবৃত প্রদেশে অবস্থান করায়, তাঁহাদের সর্ব্বশরীরে একপ্রকার শ্বেতবর্ণের পুরু চর্ম্ম জন্মিয়াছিল। সেই চর্ম্মের প্রভাবে অনাবৃত শরীরে তাঁহাদের শীতজনিত কষ্টবোধ হইত না। এই দুইটী অসাধারণ মহাপুরুষ চন্দ্রনাথ পর্ব্বত পর্য্যন্ত একত্র আসিয়া, কোন অজ্ঞাত কারণে ব্রহ্মচারী মহাশয় বারদী আসিয়া অবস্থান করিলেন, অপর জন কামাখ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় বহুদিন পর্য্যন্ত গুপ্তাবস্থায় অবস্থিত করিতে-

* ঢাকা, গেণ্ডারিয়া নিবাসী ৺শশীমোহন বসু মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত।

ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামের কথা কেহই অবগত ছিলেন না। প্রকৃত গুণগ্রাহী, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন গোস্বামী-প্রভু ইঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিতে সর্ব্বদা ইঁহার আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। দুইজন একত্র হইলে, উভয়ের মধ্যে এমনই এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাব ও আনন্দের স্রোতঃ প্রবাহিত হইত, যাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, শুনিয়াছি তখন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের বয়স পৌণে দুইশত বৎসর হইয়াছিল। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইঁহার ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া বহু লোকের বিবিধ প্রকার উৎকট ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। বিশাল হিন্দুসমাজের লোক গোস্বামী-প্রভুকে এতদিন পর্য্যন্ত ভ্রান্ত উপবীত-ত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু এখন হিন্দুসমাজভুক্ত, প্রায় দুইশত বর্ষ বয়স্ক মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার অসাধারণ শক্তি অপরিমেয় মহত্ত্বের বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করাতে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজের লোকের চমক ভাঙ্গিল, এবং তদবধি তাঁহারা তাঁহাকে মর্য্যাদা ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। মুক্তাত্মা জাতিস্মর ব্রহ্মচারী মহাশয় এই কার্য্যের জন্যই যেন এ যাবৎ জীবনধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ; এবং কার্য্যটী সমাপ্ত হইলে অচিরকালের মধ্যে যোগবলে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রশান্তমনে, হাসিতে হাসিতে, নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবিষ্ট হইলেন (১২৯৭ সন, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ)। ভারতের একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।*

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব গোস্বামী-প্রভু সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চমত পোষণ করিতেন, অতি সংক্ষেপে তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার অনুরক্ত সেবকদিগকে ভবিষ্যতে গোস্বামী-প্রভুরই অনুগত হইয়া চলিতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তিরোভাবের পরেও তদীয় কৃপাপাত্র, ঢাকা নারায়ণগঞ্জবাসী স্বর্গীয় দুর্গাচরণ নাগ এল, এম, এস, ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দের নিকটে ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় নাগ মহাশয়, পরমহংসদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। এই সময়ে তাঁহার ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ গোস্বামী-প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে কিছু প্রসাদ প্রার্থনা করেন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজকে যেন কতই কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সদালাপের পর বিদায়গ্রহণকালে, তিনি পুনরায় গোস্বামী-প্রভু ও তদীয় ভক্ত-বৃন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং গোস্বামী-প্রভুর দিকে

* ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জীবনী অবলম্বনে লিখিত

দৃষ্টি রাখিয়া, পিছনে হাটিতে হাটিতে ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। তদবধি তিনি প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন।

ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর, দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক গূঢ় কথাবার্ত্তা হইত, যাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য পরমহংসদেবের জীবনী-লেখকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহিত গোস্বামী-প্রভুর সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মবিষয়ের কোন কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া, অযথা কল্পনা ও অশোভন উক্তির প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভু পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার ও পরমহংসদেবের মধ্যে সময়ে সময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক যে সকল গূঢ় কথোপকথন হইত, তাহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই অধিকার ছিল না। উঁহারা (জীবনী লেখকেরা) তাহা কি প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইবেন?* সে যাহা হউক, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব-দুষ্ট বঙ্গীয় নরনারীর সমক্ষে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব যে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্রদেশ তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। স্থানাভাব-বশতঃ নিম্নে তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

হুগলি জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কামারপুকুর নামক গ্রামে ১২৪০ সালের ১০ই ফাল্গুন (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। ৺চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। তিনি যজন-যাজন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা দ্বারা অতিশয় কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; সুতরাং বালক রামকৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের তাদৃশ সুযোগ ঘটে নাই। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রাম-বাটী নিবাসী ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া সারদামণি দেবীর সহিত রামকৃষ্ণদেবের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে মাড়বারদেশীয় রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ৺কালীকাদেবীর (আনন্দময়ীর) পূজকরূপে নিযুক্ত হইয়া, তথায় বাস করিতেছিলেন। পরমহংসদেব, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার ভাবী-লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে থাকেন। ইহার ২।৩ বৎসর পরে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক-গমন করেন; এবং পরমহংসদেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতেই মহাশক্তির কৃপায় রামকৃষ্ণদেবের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যধিক আগ্রহসহকারে জনৈকা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে

* গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।

শক্তিপূজার মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া, নবীন-উৎসাহে অকপট-হৃদয়ে জগজ্জননীর পূজায় ব্রতী হইলেন। সাধারণ পূজারীদিগের ন্যায় তিনি কেবল ফুলচন্দনাদি দ্বারা মহাশক্তির পূজা করিয়াই তৃপ্ত থাকিতেন না; পরন্তু আত্মোৎকর্ষ লাভের জন্য গভীর সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন। এই জন্য তিনি প্রাগুক্ত কালীকা-দেবীর মন্দির-সংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যানের উত্তরপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং উহারই সন্নিকটে বহুবিস্তৃত একটী পুরাতন বটবৃক্ষতলে আসন প্রস্তুত করিয়া, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। সূর্য্যরশ্মি-সমবায়ক কাচখণ্ড দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যের কিরণসমূহ একীভূত করিতে পারিলে যেমন সহজেই অগ্নিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ পরমহংসজীও কঠোর সাধনবলে ও ভগবৎকৃপায় তাঁহার নানাদিকে বিক্ষিপ্ত স্বাভাবিক আকর্ষণ একত্র করিয়া সাধনার লক্ষ্যে অর্পণ করাতে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

পরমহংসদেবের কুলগুরুসংস্কার আদৌ ছিল না; সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মলাভার্থে সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য যে কোন সম্প্রদায়ের লোককে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন, তিনি তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করিয়া, অবনত মস্তকে তদুপদিষ্ট সাধনপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত কঠোর সাধনা করিতেন; এই জন্য তিনি একাধিক গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও মহাত্মা তোতাপুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার বিবিধ সাধন-প্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি যে সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা অতিশয় উদার ও মহৎ। তিনি বলিতেন—"ভগবান্ একই বস্তু, কেবল নামে মাত্র তফাৎ। তাঁকে কেউ বল্‌ছে আল্লা, কেউ ব'লছে গড্ (God), কেউ ব'ল্‌ছে ব্রহ্ম, কেউ ব'ল্‌ছে কালী, কেউ কেউ ব'ল্‌ছে রাম, হরি, শিব—নামমাত্র ভেদ। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান্। আবার নানা মত, নানা পথ। সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল পন্থাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।"*

দুর্ব্বল অন্নগতপ্রাণ কলিজীবের পক্ষে তিনি নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নাম-সাধন প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই যে এই যুগের অবতার তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ, যথা—"কলিযুগে নারদীয় ভক্তি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা। অন্যান্য যুগে নানারকমের কঠোর-সাধনার নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন। একে জীবের অল্প পরমায়ু,

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত রামকৃষ্ণ উপদেশ।

তাতে মালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) রোগে কাবু ক'রে ফেলে, কঠোর তপস্যা কেমন ক'রে ক'র্‌বে ?"

"হাতে তালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তা হ'লে সব পাপ তাপ চ'লে যাবে ।"

"ভগবানের নাম, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হ'ক নিলে, তার ফল হবেই হবে ।"*

বর্ত্তমান সময়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকের ধারণা এই যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, ভগবৎতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা পরমহংসদেবের জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে। তদানীন্তন টোলের সামান্য শিক্ষাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অথচ ভগবৎ কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে যে সবল গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্বসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, উচ্চশিক্ষাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞ বহু পণ্ডিত-লোকেরও তাহা ধারণার অতীত। ভগবৎতত্ত্ব যাহাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, অপর কোন তত্ত্বই তাঁহাদের জানিতে বাকি থাকে না ; কারণ জগতের যাবতীয় তত্ত্বই উহার অন্তর্গত। এই ভগবৎতত্ত্ব যাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, অপর কোন তত্ত্বই তাঁহাদের জানিতে বাকি থাকে না ; কারণ জগতের যাবতীয় তত্ত্বই উহার অন্তর্গত। এই ভগবৎতত্ত্ব বিদ্যাবুদ্ধির আয়ত্ত নহে, উহা সম্পূর্ণ ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। উপনিষদে আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥"

অর্থাৎ এই আত্মাকে (পরমেশ্বরকে) বেদাধ্যয়ন, তীক্ষ্মমেধা অথবা শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারা লাভ করা যায় না। সদ্‌গুরুরূপে তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই কেবল তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকটে তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন ।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ, পরমহংসদেবের নিকটেই সর্ব্বপ্রথম সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত আলোক প্রাপ্ত হন। পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণদেব ও পূর্ব্ববঙ্গে বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় বিরাজমান থাকিয়া, এক সময়ে সমগ্র দেশের ধর্ম্মের জমিন প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের উভয়েরই জীবনের সঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর গভীর আধ্যাত্মিক যোগ বিদ্যমান ছিল। ইহারা উভয়েই গোস্বামী-প্রভুকে আদর্শ সদ্‌গুরুরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। কোন দীক্ষার্থী উপস্থিত হইলে, ইহারা তাহাকে গোস্বামী-প্রভুর নিকটেই প্রেরণ করিতেন।

পরমহংসজী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দ্বারা ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষে, এইরূপ সুবিমল সার্ব্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একটী আদর্শ স্থাপন করিয়া, ১২৯৩

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত রামকৃষ্ণ উপদেশ।

সনের ৩১ শ্রাবণ, ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যধামে গমন করিয়াছেন। তদীয় অনুগত, সেবক ও ভক্তমণ্ডলী, চিরপবিত্র জাহ্নবীতটে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এবং তদীয় ভস্মাস্থি সংগ্রহপূর্ব্বক্ কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিস্থ করিয়া, তাঁহার পরলোকগত পবিত্রাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তদীয় প্রিয়ভক্ত আমেরিকা প্রত্যাগত, শ্রদ্ধাভাজন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার পবিত্র নামে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলুড়ে, মাদ্রাজ সহরে ও কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত মায়াবতীতে তিনটী মঠ স্থাপন করিয়া, তথায় দেশের নানাবিধ লোকহিতকর সদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর অনুচরবর্গ এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র "রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম" নামে বহু সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া দেশের নানাবিধ কল্যাণ সাধনে তৎপর রহিয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মার্থীদিগকে দীক্ষাদান। ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংঘর্ষ এবং প্রচারক পদত্যাগ

গোস্বামী-প্রভু যোগসাধন গ্রহণানন্তর ভগবৎকৃপায় যোগমার্গের প্রবর্ত্তক, সাধক ও মুক্তনিসিদ্ধ—এই তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ মুক্তসিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইলে, তদীয় গুরুদেব মানস্ সরোবরবাসী পরমহংসজীর আদেশে সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের প্রার্থনায় যোগ-দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সাধন প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র এবং উহার কোন কোন অঙ্গ নির্জ্জনে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই কারণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গোস্বামী-প্রভুর নূতন সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে গোপনে অল্পাধিক পরিমাণে আলোচনা হইতে লাগিল। পরে ফরিদপুরের অন্তর্গত মাণিকদহ অবস্থানকালে, গোস্বামী-প্রভুর অতুল্য ভক্তি ও অনুরাগ দর্শনে মোহিত হইয়া স্থানীয় জমিদার ৺বিপিনবিহারী রায় মহাশয় সস্ত্রীক ও অপরাপর কতিপয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। কলিকাতা এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনার্থে গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার যোগসাধন-প্রণালী সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় করিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করিলে, ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে অন্যূন ত্রিশটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি একে একে তাঁহাদের সমুদয় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলে, তাঁহারা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আন্দোলন কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইল। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্নোত্তরগুলি সংগ্রহ করিয়া 'যোগ-সাধন' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উহা হইতে অনেকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য এবং সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে, মহিলাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় স্বীয় জীবনকাহিনী অবলম্বনে, যোগতত্ত্ববিষয়ক বহু সারগর্ভ উপদেশাবলী, 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উহা হইতে অনেকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া

তত্রস্থ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মনে ভয়ানক আশঙ্কার উদয় হইল,—পাছে কালক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মগণই ব্রাহ্মসমাজের সাধন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া যোগ-সাধন গ্রহণ করেন। তাঁহারা গোস্বামী-প্রভুর আচরণের মধ্যে অনেক দোষ দর্শন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু গোপনে সাধন প্রদান করেন, তাঁহার নিকটে রাধা-কৃষ্ণ ও শ্যামাবিষয়ক গান হয়, তিনি দেবপ্রতিমার নিকটে প্রণাম করেন, তাঁহার বাসভবনে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি রাখা হয়,—এই সকল কার্য্য অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়াতে, তাঁহারা উহার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট, আচার্য্য ও প্রচারক পদের ত্যাগপত্র প্রেরণ করেন; কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুরোধে ঐ পত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাতে আন্দোলন প্রশমিত হইল না। অধিকন্তু ৺পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার ও গগণচন্দ্র হোম নামক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুইজন সভ্য, গোস্বামী-প্রভুর কার্য্যের অতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, দুইখানি পত্র কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় দাখিল করেন। পত্র দুইখানির মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

৺পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের পত্র।

"গোস্বামী-মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। গোস্বামী-মহাশয়কে প্রচারক পদ হইতে বিচ্যুত করা হউক্। তিনি ভিন্ন কি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিবে না? তিনি ব্রাহ্মসমাজে থাকেন কেন? যোগ-সাধন করিবার ইচ্ছা হুইয়া থাকে, সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া করুন।"

শ্রীযুত গগনবাবুর পত্র।

"ব্রাহ্মসমাজের বাড়ীতে পৌত্তলিক গান হয়। গোস্বামী-মহাশয়ের গৃহে অশ্লীল ছবি, যেমন নরনারী কুঞ্জর, অষ্টসখীঘোড়া ইত্যাদি রাখা হয়। ইহা অতিশয় অন্যায় ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

"গোস্বামী-মহাশয় গোপনে সাধন প্রদান করেন। সাধন গোপনে দেওয়া হয় কেন? তাঁহার প্রদত্ত সাধন-প্রণালী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে তাহা প্রচার করা হউক্। লোকে বিচারপূর্ব্বক্ গ্রহণ করিবে। যাঁহারা কিছুদিন গোস্বামী-মহাশয়ের প্রদত্ত সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনভজন করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্যগণের বিশ্বাস যে, তাঁহার চরণে মস্তক রাখিলে তাহাদের উপকার হয়। একি ভয়ানক কথা! ইহাদ্বারা মানুষ ভগবানের আসনে অভিষিক্ত হইতেছে কি না? সত্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক।"

উক্ত পত্র পাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী সব্‌কমিটী গঠন করিয়া তাহার

উপর গোস্বামী-প্রভুর মত ও সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ভার অর্পণ করেন। ৺আনন্দমোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সব্‌কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হন। কমিটীর সভ্যগণ (১৮০৯ শকের ৩০শে বৈশাখ) সিটী কলেজে একটী সভা আহ্বানপূর্ব্বক, গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উত্তর প্রদান করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। গোস্বামী প্রভু তদুত্তরে সভ্যগণকে জানাইলেন যে, ঐরূপ ভাবে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন; তবে, যদি বন্ধু-ভাবে কেহ তাঁহার বাটীতে আসিয়া ঐ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। সভ্যগণ গোস্বামী-প্রভুর বাসভবনে আগমন করিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। অতঃপর, তাঁহারা একটি দীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট প্রেরণ করিলেন। মন্তব্যের স্থূল বিষয়গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

সব্‌কমিটীর মন্তব্যের সারমর্ম্ম।

"আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছি যে, গোস্বামী-মহাশয় এক নূতন সাধনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিতেছেন। তাহাতে তিনটী বিষয় আছে; নামজপ, প্রাণায়াম ও শক্তিসঞ্চার। তাঁহারা তাঁহাদের সাধন-প্রণালীর কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না এবং অপরের নিকট সাধন করেন না। তিনি এই সাধন অপগণ্ড বালক ও কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিককে দিয়া থাকেন। ইহা যদি মানবাত্মার মুক্তির পথ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর সকল সত্য যেমন প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা হয়, ইহাও সেই ভাবে প্রচার হওয়া উচিত। যাহার ইহাতে বিশ্বাস হইবে, সে গ্রহণ করিবে; যাহার বিশ্বাস হইবে না, সে গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মসমাজের একদল লোক যদি এই সাধন গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত থাকিয়া একটী গুপ্ত দল সৃষ্টি করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা ভ্রাতৃভাবের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইবে। এই সাধনাবলম্বিগণ আপনাদিগের সাধন প্রণালীকে উৎকৃষ্ট প্রণালী মনে করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ করিবেন না। ইহাতে দুই দলে বিরোধ উপস্থিত হইবে।

"গোস্বামী-মহাশয়ের সাধন-প্রণালী বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইলে ব্রাহ্ম-সমাজের অবলম্বিত আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি তিষ্ঠিতে পারিবে না।

"এই গুপ্তদলের মনে অহঙ্কার জন্মিবে। এই সাধন বালক ও পৌত্তলিকদিগকে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, সাধন করিতে করিতে কালে সত্য প্রকাশিত হইবে। এ মত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। ইহাতে লোকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইবে না। গোস্বামী-মহাশয়ের সাধনে কেবল ভাবুকতার বিকাশই

দেখা যায়। এই সাধনাবলম্বিগণ ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞান ও কার্য্যকে তুচ্ছ মনে করিবেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইবেন। এই সাধনে লোককে স্বাধীনচিন্তাশূন্য ও গুরুমুখাপেক্ষী করিয়া ফেলিবে। এই সাধনাবলম্বিগণ অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন না। তাঁহারা বলেন, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে অপরের অনেক পীড়া নিজের হইতে পারে। ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে, অপরের ব্যবহার করা কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে, ও অন্যের শয্যায় শয়ন করিলেও ত রোগ হইতে পারে; গোস্বামী-মহাশয় বলেন যে, মহাত্মারা বলেন, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও বিঘ্ন হয়। উচ্ছিষ্ট ভোজনের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বরং ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিবারই কথা। ইহা দ্বারা ভ্রাতৃভাববৃদ্ধির সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই সাধনাবলম্বিগণ মৎস্য আহার করেন, কিন্তু মাংসভোজন অতিশয় নিষিদ্ধ মনে করেন। ধর্ম্মবুদ্ধির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মাংসভোজনও যেরূপ মৎস্যভোজনও সেইরূপ। মৎস্য খাইলে আমার ধর্ম্মের হানি হইবে না, মাংস খাইলে আমার ধর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে, এ এক অপূর্ব্ব যুক্তি। গোস্বামী-মহাশয় বলেন, মানবগুরু নাই। গুরু একমাত্র পরমেশ্বর। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের মধ্যে গুরুবাদ প্রচার হইতেছে। তাঁহার "আশাবতীর উপাখ্যানে" ব্যাস ও ব্রাহ্মণ-সংবাদ গুরুবাদের সমর্থন করিতেছে। গোস্বামী-মহাশয় তাঁহার শিষ্যদিগকে যে সাধন প্রদান করেন, তাহা তাঁহারা অভ্রান্ত মনে করেন। এ অতি মারাত্মক কথা। গোস্বামী মহাশয়কে প্রণাম করিলে, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে এবং তাঁহার পায়ে মস্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলে আধ্যাত্মিক উপকার হয়, গোস্বামী-মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহা বিশ্বাস করেন। এই মত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। ইহা একপ্রকার নরপূজা। গোস্বামী-মহাশয়ের নিকট রাধাকৃষ্ণের ছবি থাকে। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহা দ্বারা বৈষ্ণবসমাজের মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সুতরাং তাহা একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। গোস্বামী-মহাশয় বলেন, ভগবান্‌কে কালী, দুর্গা, আল্লা সকল নামেই ডাকা যায়। এ মত ব্রাহ্মগণ মারাত্মক মনে করেন। কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামের সহিত দেশপ্রচলিত পৌত্তলিকতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐ নাম উচ্চারণ করিলে সেই সকল প্রতিমাকে মনে পড়ে। সুতরাং ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মনামের পরিবর্ত্তে কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম ব্যবহার করিতে পারেন না।

"আমরা এই সকল কারণে গোস্বামী-মহাশয়ের বর্ত্তমান মত ও সাধনপ্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের অনিষ্টকারী মনে করি। ইহার কোন প্রকার প্রতিকার না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে।"

সব্ কমিটির এই মন্তব্য প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই গোস্বামী-প্রভু পুনর্ব্বার

প্রচারকের পদত্যাগ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এবং তৎপরে "ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন" নামে একখানি পৃথক্ পত্র মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। পত্র দুইখানি যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল।

১। পদত্যাগ পত্র

সত্যস্বরূপ জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যায় এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তাঁহাকে নিয়ত দেখা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এককথায় তাঁহাকে লাভ করিয়া নিয়তই তাঁহার সত্ত্বাসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া সমস্ত কর্ম্ম করা ও জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ।

(১) এইরূপ ব্রহ্ম লাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধন ভজন করিলে যথাসময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয়। এই জন্য তাঁহার চরণেই আমার ধর্ম্ম জীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রদর্শিত যোগসাধন পথ অবলম্বনে গত কয়েক বৎসর চলিয়া আসিতেছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশানুসারে যোগপিপাসু ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধন-পথ তাহাদিগকে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। (২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংস্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে কিছুদিনের জন্য ভূতশুদ্ধি করণোদ্দেশে অনেককে প্রাণায়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা আমাদের সাধন নহে। (৩) এইজন্য সাধকমণ্ডলীর বহির্ভূত লোকদিগের সম্মুখে আমরা সাধন করি না। তাঁহারা ইহার ভিতরের তত্ত্বকথা কিছুই বুঝিবে না, কেবল বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (৪) কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপাচার, পাপ চিন্তা, পাপ কল্পনা পর্য্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের ব্যাঘাত জন্মে। আমরা কোন সম্প্রদায়বিশেষ মানি না। হিন্দু, পৌত্তলিক, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃষ্টান, মুসলমান এবং ব্রাহ্মসমাজের যে কেহ আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থী হন, তিনিই সাধন পাইতে পারেন ; এবং সাধন করিতে থাকিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রম, অজ্ঞানতা, পাপ, নীচতা ও কুসংস্কার ব্রহ্ম কৃপায় দূর হইয়া তিনি পবিত্র হইবেন। (৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশ মাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার গুরু, আর সকলেই ইহার উপদেষ্টা ও তন্নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শক্ মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ, উপগ্রহ ও পর্ব্বত উপায় দ্বারা নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ মনুষ্যরূপ উপায় দ্বারাও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য আমরা সমস্ত পদার্থকে ও মনুষ্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। প্রত্যেক

মনুষ্যের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য একজন জাগ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক; এবং তদ্ভিন্নও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে ও অন্যান্য অবস্থা ঠিক্ অনুকূল হইলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের শক্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতি বিরল। সুতরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। যেমন চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি ভগবান্ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কুটী পড়ে, তাহা অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না। (৬) পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করা ধর্ম্মসঙ্গত। পদধূলি লওয়ার সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য অন্যের উপকার হইতেছে দেখিলে আমরা পদধূলি লইতে বাধা দেই না। আমিও সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্য—এই অর্থে 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' উচ্চারণ করিয়া থাকি। একটী প্রণামও স্বয়ং গ্রহণ করি না। (৭) আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে নানা শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক অবনতিও হয়, একথা সাধু-মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন, এবং তাহা পরীক্ষিতও হইয়াছে। তবে পিতামাতা গুরুজন যখন আদর করিয়া কিছু দেন তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা আহার করিলে হানি নাই। বরং উপকারই হইয়া থাকে। এজন্য সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া থাকি। (৮) দেবতার মন্দিরে কালী, দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, তবে সেখানেই আমি আত্মহারা হইয়া যাই এবং আমার ইষ্ট-দেবতাকে প্রণাম করিয়াও হয়ত সেখানেই গড়াগড়ি দিয়া চরিতার্থ হই। আমার ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং আমি যেখানেই তাঁহার দর্শন পাই, সেখানেই মুগ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে না। (৯) কালী, দুর্গা প্রভৃতি সকল নামে ভক্ত ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন। তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম হয়, তখন তাই বলিয়াই ডাকিয়া থাকি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে কোথাও এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না। (১০) রাধাকৃষ্ণের ভাবের মত ধর্ম্ম ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব নাই মনে করি। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা পরমেশ্বর; এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আমি ঐ ভাব সাধনের চেষ্টা করি। এবং যাঁহারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার পান, তাঁহাদিগকে লইয়া একত্র রাধাকৃষ্ণের গান করিয়া থাকি। তবে

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ে কখনও ঐ নাম গ্রহণ করি নাই। এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ করা উচিতও মনে করি না।

এই আমাদের যোগ-সাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। যাহা সত্য বুঝিব তাহাই অবনত মস্তকে অনুসরণ করিব। এই জন্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা করেন বলিয়া, আমি উক্ত সমাজের সহিত সমস্ত বাহ্যিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। কেবল প্রচারকপদ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধর্ম্ম প্রচারের সমস্ত কার্য্য আমার নিজের দায়িত্বে করিতে থাকিব। আমার একটী কথাও এখন অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিয়া পরিগণিত না হউক।

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, এবং সমস্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বিশ্বাস করি। পরমেশ্বর এক, তাঁহার ধর্ম্মও এক। মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদ ও রুচি অনুসারে নানা প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মে দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্য-সমাজের দাসানুদাস, কিন্তু কোন দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন, এই সার্ব্ব-ভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন প্রচার করিতে পারি।

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
প্রচারাশ্রম।
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

২। ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ইহাতে দলাদলি নাই। এজন্য আমি যেখানে সত্য পাই এবং সত্য বুঝি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে, আমার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষতি হইবে। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু-দিগকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহ্যিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ খৃষ্টীয় সমাজ, আমি সকল সমাজের দাসানুদাস। আমার কোন সম্প্রদায় নাই,

অথচ সকল সম্প্রদায়ই আমার ; যেখানে যতটুকু সত্য, সেইখানে আমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। এখন হইতে এই সার সত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব।

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, আনন্দশক্তি মঙ্গলস্বরূপ, অজর, অমর, নিত্য একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র-স্বরূপ। তিনি নিরাকার অর্থাৎ তাঁহার কোন জড়ীয় রূপ নাই। তিনি সকলের স্রষ্টা, কোন বস্তুর মত তিনি নহেন। তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই। তিন জনও নাই অথবা অনেক ঈশ্বর নাই। যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে তাঁহাকে ডাকে, সে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে। আর দ্বিতীয় যখন নাই, তখন অন্য ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে ?

পরমেশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। নানা দেশের লোক আপন আপন ভাষায় এক একটী নাম করিয়া ডাকিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্ম বল, খোদা বল, আল্লা বল, হরি বল, রাম বল, কৃষ্ণ বল, দুর্গা বল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেহ বলেন, লোকের মনে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে, এ কথা ঠিক নহে। কারণ, হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর এবং পাপ-হরণকারী পরমেশ্বর—এই সমস্তগুলি বুঝাইয়া থাকে। কেহ যদি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া গদগদভাবে ডাকিতে ডাকিতে অশ্রুপাত করে, তখন এমন কোন লোক নাই যে বলিবে এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশুগুলাকে ডাকিয়া কাঁদিতেছে। বিশেষতঃ মানুষের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি ? আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা মনুষ্য নহেন। আমার দেবতা অন্তর্য্যামী ; তিনি জানিলেই হইবে। তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাঁহাকে নিরাকার বলি। কিন্তু তাঁহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে, যাহা জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ণ আছে, জ্ঞাননাসিকা, জ্ঞানরসনা আছে, যাহাতে শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন অনুভব হয়। জ্ঞানচক্ষে ইহলোক পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইতে পারে ; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদত্ত মানবীয় ধর্ম্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্যধর্ম্মে দল নাই, সম্প্রদায় নাই। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদে দলাদলি সৃষ্ট হয়। প্রকৃত ধর্ম্মে দল নাই।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, তাঁহার উপাসনা। তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়। আমি

যদি তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসি, তাহা হইলে যে কেহ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয় বন্ধু; এজন্য যেখানে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হয়, সেই স্থানেই গমন করি। যেখানে তাঁহার নামকীর্ত্তন হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করি। আমার প্রভুকে পূজা করিতেছে, কত আনন্দ! আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি কত বৃক্ষতলে, কত পর্ব্বতে, নদীগর্ভে দেবমন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায়, আমার প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদের রাধাকৃষ্ণ একটি আধ্যাত্মিক রূপক। উপাসনা ও যোগের এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, পরমেশ্বর। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পাত্র। উপাসনা-কালে ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখা যায়।

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, অগ্নি, পর্ব্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলেরই মধ্য দিয়া সেই জগদ্‌গুরু শিক্ষা দিতেন। যখন যে বস্তুর মধ্যে শিক্ষা পাই, সেই বস্তুকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরু-জনকে ভক্তি করা প্রয়োজন। তাঁহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে ধর্ম্মলাভ হয়। কোন মনুষ্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কি তাঁহার অবতার কি মধ্যবর্ত্তী-রূপে প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে নরনারীমাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়।

অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জ্ঞান-প্রেম-ভক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মার সহিত পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেম-ভক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগসাধন করিলে মনুষ্যের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥"

কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
প্রচারনিবাস।
৩১শে বৈশাখ, শক ১৮০৮।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গোস্বামী-প্রভুর পদত্যাগপত্র ও সব্‌কমিটির মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা যে মীমাংসা করেন, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মীমাংসা

"স্থির হইল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি—

১। গুরুর আবশ্যকতা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিলাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এই মত।

২। ঈশ্বরে চিত্ত অর্পিত থাকিলেও দেব-মন্দিরে ও দেব-মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া।

৩। নিজের উপাসনাকালে অথবা অল্পাধিক পরিমাণে প্রকাশ্য উপাসনা-কালে কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির নাম গ্রহণ।

৪। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা সংক্রান্ত গীত সকল ধর্ম্মসাধন স্থলে গান করা এবং রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদিগের লীলা-বিহার সংক্রান্ত ছবি সকল উপাসনা স্থলে রক্ষা করা। (কোন প্রকারে ঐ সকল গানের ও ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ ঘটাইতে পারিলেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়।)

৫। যে প্রণালীতে ও যে যে নিয়মে গোস্বামী মহাশয় দীক্ষা দিতেছেন, সেই প্রণালী ও সেই সকল নিয়ম।

৬। কোন কোন মত বা আচরণ, কোন কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তিবিশেষের কথার উপর নির্ভর করিয়া, তাহাদের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার না করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, এই মত।

৭। কোন ব্যক্তিবিশেষের পদধূলির কিছু আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য আছে, এরূপ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করা, কি তাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হওয়া, কিংবা পদধূলি দ্বারা অপরের আধ্যাত্মিক কি শারীরিক যাতনা নিবারণের সাহায্য হইতে পারে, এই বিশ্বাসে অপরের অঙ্গে মাখাইয়া দেওয়া।

অতীব আপত্তিযোগ্য, এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল মত বা আচরণ গ্রহণ করিয়াছেন, কার্য্যনির্ব্বাহক্ সভা আগ্রহে ও সদ্ভাবের সহিত তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা একবার ঐ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। এবং তদ্দ্বারা কি অনর্থ ঘটিবে ও ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত মত সকলের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের কিরূপ উচ্ছেদ সাধন করিবে, তাহা অনুভব করিয়া এগুলিকে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য বাধা দিবার উপায় করুন।

(২)

তাঁহাদের (কার্য্যনির্ব্বাহক্ সভার) সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বিতীয় বার পদত্যাগ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক্ সভা গভীর দুঃখের সহিত গ্রহণ

করিতেছেন। তিনি অনেক পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে সেবা করিয়াছেন, সে সেবার মূল্য নাই। তাহার জন্য উক্ত সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, এবং আগ্রহ ও প্রীতির সহিত অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ। তাঁহার বর্ত্তমান মত ও কার্য্যের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহার কিরূপ ফল দর্শিবে। পূর্ব্বোক্ত যে প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহার সহিত মিলাইয়া ঐ সকল বিষয় চিন্তা করুন। সভ্যগণ ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাদের ভক্তিভাজন প্রচারক ভ্রাতা যেন ত্বরায় আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন; এবং যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যাবজ্জীবন নিযুক্ত আছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যেন পুনরায় আপনার অগ্নিময় উৎসাহ, বল ও চরিত্রের সাধুতা নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা আরও আশা করেন যে, তাঁহার সহিত প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, তাহা চিরদিন প্রবল থাকে।"

প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কখনই কোন সমাজবিশেষের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল লোক প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং এখনও যাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনের আদর্শ এক নহে। কেহ কেহ হিন্দুসমাজে কুসংস্কার ও দুর্নীতির প্রসার দেখিয়া ঐ সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ পাশ্চাত্য সভ্য-সমাজের অনুকরণে হিন্দুসমাজকে গঠন করিবার অভিপ্রায়ে, জাতিভেদ পরিত্যাগ, বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলন প্রভৃতি আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন; আবাব, কেহ কেহ সমাজে ও দেশে "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর এক দল ঈশ্বরোপাসনায় আত্মপ্রত্যয়ই (Intution) যথেষ্ট; এবং পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ও পৌরহিত্যপ্রথা সমাজের অকল্যাণকর,— এই ভাব লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর এক দল, পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষালাভার্থ ও বিষয়-কর্ম্মের অনুরোধে, বিদেশগমনে বাধ্য হইয়া, অন্যত্র আশ্রয়াভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না; কেহ কেহ ভগবান্ একজন পুরুষ (Personal God) এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না; কেহ কেহ স্বীকার করিয়াও উপাসনার আবশ্যকতা বোধ করেন না। আর এক দল মানবাত্মার অমরত্ব ও ক্রমোন্নতিতেই বিশ্বাস করেন না,—জন্মান্তর কি লোকান্তর ত দূরের কথা। এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠিত। সুতরাং, যাঁহারা ভগবান্‌কে পাইবার আশায় ব্যাকুলপ্রাণে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং অধিকাংশ সভ্যের মতে

আপনাকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যে উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। জড়জগতে দিনের পর দিন অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে; আর, আধ্যাত্মিক জগতে নূতন সত্য যে সাধকের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না, ইহা অতি অদ্ভুত কথা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে যোগ্যতা জন্মে,—এই বিশ্বাসেই সমস্ত নূতন সমাজে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার মস্তিষ্ক নহে, উহা হৃদয়। মস্তিষ্কে সংসার ও হৃদয়রাজ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ বিরাজ করে। ঐ তত্ত্বসমূহ লাভ করিবার জন্য প্রকৃত সাধক-হৃদয়ে নূতন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হয়। বাক্য-চাতুরী ও পূর্ব্বসংস্কার ঐ রাজ্যের সীমান্তেও পঁহুছিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের অবতার কি না ইহা নির্ণয়ার্থ তদানীন্তন কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি 'হাতচালা'রূপ ভৌতিক-ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে আমরাও, সাধকবিশেষ প্রকৃত সত্য লাভ করিতেছেন কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য অপরাবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। স্থির-চিত্ত, ধীর-বুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেই এইরূপ বিচারের অসারত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জন্মান্তরের সুকৃতি লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতা দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক-রাজ্যের বিধি মার্গ অবলম্বন না করিলে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না,—নূতন সত্য লাভ জীবনে আর ঘটে না। 'ব্যাঙ্কে, গচ্ছিত টাকা ব্যয় করার ন্যায়, পূর্ব্বার্জ্জিত সাধনসম্পত্তি খোয়াইয়া, ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। মনোমুখী উপাসনা মায়ায় এক চক্র হইতে অপর চক্রে উন্নীত করে;—মায়াজাল উত্তীর্ণ হইয়া শুদ্ধ-সত্য দর্শন করিতে দেয় না।

সে যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক গোস্বামী-প্রভুর পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া এই মর্ম্মে একখানি পত্র প্রকাশিত করেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গোস্বামী-প্রভুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা উচিত হয় নাই, এবং তাঁহার অবলম্বিত মত যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এ কথা সাধারণ ব্রাহ্মগণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র "তত্ত্ব-কৌমুদীতে" ঐ সময়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং প্রচারক-সংখ্যা যেরূপ অল্প, তাহাতে গোস্বামী-মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজ পদ হইতে অপসৃত হইতে দেওয়া কি সুখের ব্যাপার? যাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সেবা আর কেহ করেন নাই, তিনি ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, যিনি,

ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দিন অনাহারে ও পথশ্রমের পর মৃৎপিণ্ড মাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে কে ছাড়িয়া দিতে পারে? গোস্বামী-মহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার যে তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা দ্বারা বিশেষভাবে ধর্ম্ম ভাব প্রচারিত হইতেছে ও হইবে।"

"কিরূপে সত্যের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা যেমন তাঁহার (গোস্বামী-প্রভুর) নিকট পাইয়াছি, এমন অতি অল্প স্থানেই দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে? তিনিই ত সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন, তিনিই বর্দ্ধিতকীর্ত্তি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনে সহায়তা করেন। আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এই এক মাত্র দাওয়া নহে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির প্রতি 'সাধক' নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তিনি তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠা। মাঘোৎসব। দ্বারভাঙ্গা অবস্থান। কোন্নগর অবস্থান। বরিশাল, মাদারিপুর ও মাণিকদহ ভ্রমণ। কাকিনা অবস্থান। কামাখ্যা দর্শন। পদ্মানদী ভ্রমণকালে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব। চাঁচুরতলা কালী-বাড়ীতে আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ। কলিকাতার ন্যায় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন। প্রচারকনিবাস ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ

কলিকাতা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ গোস্বামী-প্রভুকে পরিত্যাগ করিলেও পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু লাহা, রজনীকান্ত ঘোষ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রধান প্রধান আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে ঢাকায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলে তিনি তথায় স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে পারিবেন মনে করিয়া—কারণ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, উহা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীন নহে—সপরিবার ঢাকায় আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বসম্মতিক্রমে আচার্য্যের পদে মনোনীত হইয়া, প্রচারনিবাসে অবস্থান পূর্ব্বক নিয়মিত উপাসনা, আলোচনা, নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু স্থান হইতে বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

একদিকে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কতিপয় অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারা, গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া গিয়াছেন ইত্যাদি মিথ্যা জনরব ক্রমাগত প্রচারিত হইতে থাকিলে, তিনি তৎকালিক স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া, "সাধারণের নিকট নিবেদন" নামক একখানি পত্র প্রকাশ করেন। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

"লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, নানা কারণে অনেকে মিথ্যারূপে

অন্যায় করিয়া মনে করিতেছেন যে, আমি পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া গিয়াছি এবং এই অসত্য কথা চারিদিকে প্রচার করিতেছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যই তাহার সহিত বাহিরের সম্বন্ধ মাত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এতকাল জীবনে অবলম্বন ও প্রচার করিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে একচুলও অপসৃত হই নাই। কখনও হইব না। যাহা কিছু সত্য তাহা যেখানেই থাকুক আমার পবিত্র পূজনীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ, খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ, আমি সকল সমাজেরই সেবক। আমার কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ সব সম্প্রদায়ই আমার। যেখানে যতটুকু সত্য, ততটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিন্তু কোন সম্প্রদায়েব মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে, তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া মনে করি এবং আমি তাহার বিরোধী। আমি একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলিয়া জানি। তিনি একমাত্র গুরু এবং বিশ্বসংসারের সকল পদার্থের মধ্য দিয়া যেমন ধর্ম্ম শিক্ষা করি, সেইরূপ মনুষ্যের নিকটও শিক্ষা করি। ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগকে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করা উচিত মনে করি। রাধাকৃষ্ণের বা কালী, দুর্গা নাম আমি কি সজনে কি নির্জ্জনে কখন জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি, কিন্তু উহার মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে, তাহার ভাব অতি উচ্চ বলিয়া মনে করি। সত্য দেবতা নিরাকার পরম ব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করিয়া যে কেহ যে নামে ডাকে, সেই নামেই সে পাইবে মনে করি। কেন না, নাম কিছুই নহে। তাঁহার কোন নামই নাই। কিন্তু যে স্থলে কোন নাম ব্যবহার করিলে ঈশ্বর ব্যতীত কোন দেবদেবী বা বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায়, সেখানে ঐ নাম ব্যবহার করা উচিত মনে করি না। সকল প্রকার অবতারবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তীবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয় বিশ্বাস করি।

ঢাকা ব্রাহ্মপ্রচারকনিবাস
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক
১২৯৩ সন।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

এই বৎসর মাঘোৎসবের সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ (হরিনাথ মজুমদার) তাঁহার কীর্ত্তনের দলসহ ঢাকায় আগমন করিয়া গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলে, যে প্রকার ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তপটে উহা

চিরতরেই অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। উৎসবের এক দিবসের বিবরণ (১২৯৩ সন, ১০ই মাঘ, ঢাকা) ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা জনৈক দর্শকের বিবৃত বিষয় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"আজ সকালবেলা সমাজে গেলাম। এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ কয়েকটী লোক সঙ্গে নিয়া ঢাকা আসিয়াছেন। আজকাল সমস্ত দেশ কাঙ্গাল ফিকিরের গানে মত্ত। প্রচারনিবাসে তাঁহারা গান করিতেছেন। দেখিলাম ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ। সকলে স্থির হ'য়ে চুপ করিয়া গান শুনিতেছেন, কেবলমাত্র গোস্বামী-প্রভু নিজ আসনের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। স্থির চোক্ দুটিতে পলকমাত্র নাই, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হইয়াছে। গণ্ডস্থল ভাসিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। বামহস্ত ব্রহ্মতালুর উপরে কর-ধরা রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, মাঝে মাঝে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতেছেন। এক একবার লাফ দিয়া উঠিতেছেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় সম্মুখে দণ্ডায়মান,—পাছে গোঁসাই ভাবাবেশে পড়িয়া যান। একটু পরে গোঁসাই খুব 'খল্ খল্' করিয়া হাসিতে লাগিলেন, এরূপ হাসি আর দেখি নাই। চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। ৩।৪ মিনিট খুব হাসিয়া ডান হাত সম্মুখের দিকে আনিয়া, কি যেন কি দেখাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ঐ দেখ, ঐ দেখ, তোমরা সকলে দেখিয়া লও,—ঐ যে পাগ্‌লা এসেছে, পাগ্‌লা দাঁড়িয়ে র'য়েছে! দেখ, পাগ্‌লা যেতে চায়।' দু'চার পা অগ্রসর হ'য়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'ধর্ ধর্ ধর্! না আবার ফিরেছে, তোমরা দেখ, পাগ্‌লা এদিকে আস্‌ছে। ঐ দেখ! ও বাব্বা! কত কত বড় গরু! কেমন দেখ! বাঃ! কপালের উপর একটা চোক্! সেটার জ্যোতি কত! উঃ, সূর্য্যের মত! সূর্য্যই কি? * * * উঃ, কত বড় দুটো শিং! হা হা হা, ঐ দেখ নন্দী ভৃঙ্গী! মনে করেছিলাম ও দুটো কিছু নয়। (খুব উচ্চৈঃস্বরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া) জয় মা! জয় মা! ঐ দেখ, তোমরা সকলে দেখ, মা এসেছেন! ধন্য মা! জয় মা!' এই বলিয়া লাফাইতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—'বল জয় মা জয় মা, ধন্য জননী!' এই বলিয়া ঝাঁ করিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন; তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—'অহো, হা-হা! কত যোগী, কত ঋষি মায়ের চারিদিকে নাচিতেছে। উঃ, কত লোক! ঐ দেখ, ব্যাস, বাল্মীকি, নারদ; আরো কত, নাম বলা যায় না। অহো, বাড়ীর সম্মুখটা ভরে গেল। তাঁহারা কত আনন্দ ক'চ্ছেন। ঐ সঙ্গে সকলেই আছেন; আমার পরিচিত লোকও আছেন। দেখ, তামাসা দেখ. মা সকলের সঙ্গে নাচ্‌ছেন, আর এদিকে আসছেন। মা যে আমাকে ডাকছেন! এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গ দিলেন, কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, আর ক্ষণে ক্ষণে উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

সমস্ত লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে, গোঁসাই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

"আহারান্তে ১॥ টার সময়ে আবার সমাজে গেলাম। আশ্চর্য্য দৃশ্য! সাধনের অনেক লোক, ব্রাহ্মগণ ও ফিকিরচাঁদ কয়েকটী লোক সহ আহার করিতেছেন। কুঞ্জবাবু (বারদীর বিখ্যাত অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ, এম্, এ,) গান ধরিলেন ও খোল বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান নাই। খোলে আজ কত অদ্ভুত রকম শব্দ বাহির হইতেছে, গানের ত কথাই নাই! যাঁহারা আহার করিতে বসিয়াছেন দু'চার গ্রাস খেতে না খেতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কারো অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহিতেছে, কারো শরীর কাঁপিতেছে, কারো ঘন-ঘন শ্বাস বহিতেছে, চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। উচ্ছিষ্ট থালা ও পাতার উপর কেহ কেহ গড়াইতে লাগিলেন। শুধু গোঁসাই দণ্ডায়মান্। কতক্ষণ পরে গোস্বামী-প্রভু বসিলেন, মাতালের মত এদিক ওদিক ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সবলেরই জ্ঞান হ'ল, গানও থামান হ'ল, চারিদিক্ নিস্তব্ধ! কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই বলিলেন—'অতলস্পর্শ মহাসাগরের এক গণ্ডূষ মাত্র জলে আজ গিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সাগরেব ভয়ানক ঢেউ, এক ধাক্কাতে আবাব তীরে আনিয়া ফেলিয়াছে। অহো! এই মহাসাগরে যাঁরা গিয়া পড়িয়াছেন, তরঙ্গের সঙ্গে তাঁহারা কতই আনন্দ লাভ করিতেছেন—ইত্যাদি।"

"সন্ধ্যা হইতে না হইতে ব্রহ্ম-মন্দির ও উহার চতুর্দ্দিকের বরান্দা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। গোস্বামী-মহাশয় যথাসময়ে প্রচারক-নিবাস হইতে, ভাবে বিভোর হইয়া ঢলিতে ঢলিতে ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর উপরে যাইয়া বসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু, হারমোনিয়াম বাজাইয়া সুমধুর স্বরে গান করিলেন। 'উদ্বোধন' আরম্ভ করিয়া ভাবাবেশে গোস্বামী-মহাশয়ের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ বাবু আবার গান ধরিলেন। প্রার্থনার সময়ে গোস্বামী-মহাশয় ভগবানকে অতি কাতরভাবে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে সমস্ত লোকগুলি যেন অসাড় হইয়া রহিল। মনে হইল যেন ভগবানের আবির্ভাব-জনিত জীবন্ত ভাবে সমগ্র ব্রহ্মমন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গোস্বামী-মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

"মা, এসেছ? আহা তোমার সঙ্গে কত লোক! ঐ যে কত মুনি, কত ঋষি, কত সাধু মহাত্মারা র'য়েছেন! মা, তোমার চারিদিকে কত আনন্দে এঁরা নৃত্য করছেন! ওখানে আমার পরিচিতও ত কত লোক দেখ্‌ছি! মা, আমাকে ডাকছ কেন? তুমি দয়া ক'রে আমার হাতে ধরে নেবে? আমার যে যাবার ক্ষমতা নাই। আর আমি যাবই বা কোথায়? ওখানে? না, তাও কি হয়? কেন মা, আমায় ফাঁকি দিচ্ছ? আমার কি সাধ্য ওখানে যেতে পারি, ঐ স্থানে বস্‌তে পারি? মা আমাকে ওখানে বস্‌তে দেবে, বার বারই বলছ

কেন ? আমি যে নিতান্ত পাপী। ঐ সব মুনি ঋষিদের সামনে আমি কি করে ব'সব মা ?'—এই প্রকার কতক্ষণ বলিয়া গোস্বামী-মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গানের পরে গান হইতে লাগিল, গোস্বামী-মহাশয়ের আর চৈতন্য হইল না। ক্রমে সমাজের কার্য্য বন্ধ হইল, একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। গোস্বামী-মহাশয় বেদীর উপরে একই ভাবে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। কত রাত্রি পর্য্যন্ত এ ভাবে থাকিলেন জানি না।"

উৎসবের আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দর্শক মহাশয়ের বিবরণ এইরূপ —"আজকাল গোস্বামী-মহাশয় যে কি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সাকার কি নিরাকার, কোন্ মতের যে পক্ষপাতী, ঠিক্ পরিষ্কার রূপে তাহার কিছুই বুঝিতেছি না। প্রকাশ্য সভাতে তিনি একবার দাঁড়াইয়া তাঁহার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিলে এ সম্বন্ধে সকলেরই মনের খট্‌কা চুকিয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে আমরা 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে গোস্বামী-মহাশয়কে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন বক্তৃতা করিতে রাজী হইলেন না। 'পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান' সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারিবেন না বলিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাবের কোন কথাই বলিতে তিনি রাজী নহেন। অবশেষে 'ব্রাহ্মোপাসনা' সম্বন্ধে তাঁহার মত বলিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে, তিনি 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমরাও অবিলম্বে সহরের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া দিলাম। অদ্যই সন্ধ্যার সময়ে বক্তৃতা হইবে।

"অপরাহ্ণে সমাজে যাইয়া দেখি মন্দিরে ও বারান্দায় স্থান নাই। চতুষ্পার্শ্বের বিস্তৃত ভূমিও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রোমান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জার সুবিখ্যাত পাদ্‌রী কর্ণড সাহেবও আসিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে গোস্বামী-মহাশয় বক্তৃতাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলকে করযোড়ে অভিবাদন করিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন,—

"পুরাকালে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক, সনক, সনাতনাদি ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি, যে ব্রহ্মের মহিমার কণামাত্র বলিতে গিয়া, পার না পাইয়া 'অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়' বলিয়া নির্ব্বাক্ হইয়াছেন,—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, অজ্ঞান আমি—আমার মুখে আজ আপনারা সেই মহান্ ব্রহ্মের কথা শুনিতে আসিয়াছেন!'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে বালকের মত 'হাউ হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, কথা বলিতে গিয়া কান্নার বেগ চাপিতে পারিলেন না, পরে বসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। এবারেও মহর্ষিগণের ধ্যানগম্য, পরাৎপর পরব্রহ্মের বিষয়ে দু'চার কথা বলিতেই কান্না আসিয়া পড়িল। এক একবার চেষ্টা করিয়া বলিতে গিয়া, থামিয়া থামিয়া

থাইতে লাগিলেন। পরে ভাবের অদম্য আবেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া, মুখে কাপড় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে, উপবিষ্ট অবস্থাতেই কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে সকলকে কহিতে লাগিলেন,—'আজ আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনারা সকলে দয়া ক'রে আমার মস্তকে পদাঘাত ক'রে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আমি ভয়ানক অভিমানী, তাঁর কথা ব'লব? আমি কি জানি? আমি ছাই! আমি ছাই! এই প্রকার বলিয়া সেই অনাদি, অনন্ত, একমাত্র অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষের স্তবের কয়েক শ্লোক পড়িয়াই ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। অস্ফুট ভাষায় ভাবামগ্নাবস্থায় শুধু 'ত্বংহি, ত্বংহি' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইলেন।

"জনতাপূর্ণ ব্রাহ্মসমাজ একেবারে নিস্তব্ধ। গোস্বামী-মহাশয়ের ঐ 'ত্বংহি ত্বংহি' বলার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা হইয়া গেল! সকলেই গোস্বামী-মহাশয়ের দিকে উল্লসিত প্রাণে তাকাইয়া কতক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। এই ভাবে ৫।৭ মিনিট অতীত হইল। পরে চন্দ্রনাথবাবু হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-মহাশয়ের চৈতন্য হইল না। ধীরে ধীরে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। দলে দলে লোক সমাজ পরিবেষ্টনীর স্থানে স্থানে একত্র হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন,—'বক্তৃতা শুনিয়া যে উপকার হইত, আজ গোস্বামী-মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আমরা অধিক উপকার লাভ করিলাম। ধন্য ব্রাহ্মসমাজ।"*

এই উৎসবের উপাসনা সম্বন্ধে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন —"বিজয়কৃষ্ণ বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে 'মা, মা' ধ্বনি করিতেছেন, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে 'মা, মা' ধ্বনি বিনিঃসৃত হইয়া উপাসনা-মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সেই দৃশ্য কখনও ভুলিব না! মর্ত্তে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিব না।' অপর এক দিবস বেদী হইতে উপাসনাকালে গোস্বামী-প্রভু মস্তকের উপর বাহু সঞ্চালন করত: 'এই যে আমার মা! এই যে আমার মা!" ইত্যাকার শব্দ এমন গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, তৎশ্রবণে উপাসক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মহাক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছিল। নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও সেদিন বিগলিত হইয়াছিল। ঐ দিন তাঁহার (গোস্বামী-প্রভুর) ভাবদর্শনে উপাসক ও উপাসিকার প্রাণে এমন প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের অনেক মহিলা তাঁহাকে নবজাত শিশুজ্ঞানে আহ্লাদ করিয়া দুধের টাকা দিয়াছিলেন।"**

এই উৎসবসম্বন্ধে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল,

* "সৎগুরু-সঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত।

** শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত গোস্বামী-প্রভুর জীবনী হইতে উদ্ধৃত

তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"গোঁসাইজী আজ বেদীতে বসিলেন, উদ্বোধন হইতেই আজ সকলের ভিতর আশ্চর্য্য এক শক্তি খেলিতে লাগিল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠিল, মহোৎসবে আজ সকলে মাতিল। সঙ্গীতের সময়ে সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিলেন, ভাবে মত্ত হইয় বহু বালক বৃদ্ধ আজ বেহুঁস হইয়া পড়িল। সকলের চীৎকারে, হুঙ্কারে ও উচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল। ডাক্তার রায় (P.K. Roy) এবং আরও ২।৩ জন লোক গোলমাল থামাইতে চেষ্টা করিলেন। গোঁসাইর উচ্ছ্বাসে গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গোঁসাইজী বেদী হইতে নামিয়া হস্তস্পর্শ দ্বারা সকলকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। গোঁসাইজীর হস্তস্পর্শ মাত্র সকলে স্থির হইলেন। যাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন, জ্ঞান লাভ করিলেন যাঁহারা নাচিতেছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। অদ্ভুত দৃশ্য! এ দৃশ্য আর ব্রহ্ম-মন্দিরে কখনও কেহ দেখেন নাই।"

ঢাকার উৎসবের পর গোস্বামী-প্রভু পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার অভিপ্রায়ে কলিকাতা আগমন করিলেন। তথায় এক দিবস বিশ্রাম করিয়া শ্যামনগর গমন করেন। শ্যামনগর হইতে নৌকাযোগে চুঁচুড়াতে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি অকস্মাৎ গোস্বাসী-প্রভুকে দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আহা! সকলে বলে গোঁসাই পাগল হ'য়েছেন, পৌত্তলিকের ন্যায় ব্যবহার করেন; কিন্তু কৈ? আমি ত এঁকে ধূপ ধূনার সুগন্ধ ধূমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গা প্রতিমার ন্যায় দেখ্‌ছি।" এমন সময় জনৈক ব্রাহ্ম মহর্ষিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া তদীয় অনুগত ভক্ত স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন,—"লিখে দাও, এখন হ'তে গোঁসাই যা বলেন, তা আমারই কথা।"*

চুঁচুড়া হইতে গোস্বামী-প্রভু বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ব্রাহ্ম-সমাজের সন্নিকটে সমাজের সেক্রেটারী মহাশয়ের আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক নিত্যই সঙ্কীর্ত্তনে মহা আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। এই স্থানে অবস্থান-কালে একদিবস গোস্বামী-প্রভু একটী পলাশ বৃক্ষের প্রতি পুষ্পে ভগবতীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। আর একদিবস মহারাজাধিরাজের গোলাপ-বাগে যাইয়া গোলাপফুলের শোভা দেখিতে দেখিতে একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈত্র মাসের মধ্যভাগে গোস্বামী-প্রভু বর্দ্ধমান হইতে দ্বারভাঙ্গা আগমনপূর্ব্বক, তথাকার ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিলেন। উৎসবান্তে তিনি কিয়ৎকাল স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থানে হঠাৎ তাঁহার কঠিন

---

* ১২৯৪ সনের ব্রহ্মচারীর ডায়েরী।

উদরী রোগ উপস্থিত হয়। রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শেষ সীমায় উপনীত হইল। আত্মীয়-স্বজন জীবনরক্ষাবিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন। চারিজন ডাক্তার একযোগে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, রোগীর অন্ত্রাদি পচিয়া গিয়াছে, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণবায়ু নির্গত হইবে। এই অভিমত প্রকাশ করিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। গোঁসাইজীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া, শ্রদ্ধেয় রাধাকৃষ্ণবাবু রোগীর শয্যাপার্শে উপবেশনপূর্ব্বক একতারা সংযোগে ধীরে ধীরে নাম-গান করিতে লাগিলেন। গান ক্রমশঃই জমাট্ বাঁধিয়া উঠিল। এমন সময়ে গোস্বামী-প্রভু ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন-পূর্ব্বক্ উঠিয়া বসিলেন, এবং কীর্ত্তনের তালে তালে মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন, অবশেষে দণ্ডায়মান্ হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী-প্রভু আসনে উপবেশন করিলে, একজন চিকিৎসক বলিলেন—"গোস্বামী-মহাশয়, আপনি আমাদের অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আপনার নিকট হার মানিয়াছে।"

এদিকে ঢাকাতে গোস্বামী-প্রভুর জীবনসংশয় রোগের সংবাদ উপস্থিত হইলে, তদীয় অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয়, যোগসিদ্ধ বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় গুরুদেবের প্রাণ ভিক্ষা করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার গুরুনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"তুমি তোমার গুরুর জন্য কি স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার ?" উত্তরে বক্সী মহাশয় বলিলেন যে, অনায়াসে তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সম্প্রতি তাঁহার জীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু দান করিলেন। তিনি ইহা দ্বারা তাঁহার গুরুদেবের জীবন রক্ষা করুন। ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহাশয়, বক্সী মহাশয়ের এবম্বিধ গুরুনিষ্ঠা দর্শনপূর্ব্বক্ কিয়ৎকাল সমাধিস্থ থাকিয়া, পরে অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তোমার গুরুদেব এখন দেহত্যাগ করিবেন না। তাঁহার জীবনের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে।" এদিকে দ্বারভাঙ্গায় গোস্বামী-প্রভুর কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী গোস্বামী-প্রভুর পার্শ্বে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বক্সী মহাশয় একজন অতি উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। অথচ ইঁহার মত বিনয়ী ও নিরভিমানী লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঢাকা, বিক্রম-পুরের অন্তর্গত গাঁওদিয়া গ্রামে ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বংশে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সকল শ্রেণীর ছোট বড় সকল লোককেই অতি সুন্দর স্বাভাবিকভাবে নমস্কার করিতেন। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে নমস্কার করিতে পারিত না। কোন পরিচিত লোক আগমন করিতেছেন দেখিলেই, বক্সী

মহাশয় দূরে হইতে, তিনি নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত এই লক্ষণগুলি ইঁহার অন্তরে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সচরাচর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। গুরুকৃপায় ইঁনি অচিরকালমধ্যেই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু প্রদত্ত সাধনপ্রণালীর অমৃতময় ফলের ইঁনি জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, দরিদ্রতাজনিত ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। অর্থাভাবপ্রযুক্ত প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সাধুমণ্ডলী দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া, একদিন তিনি বিষন্ন-মনে কাল কাটাইতেছেন, এমন সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল—ঢাকায় থাকিয়াই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রদ্ধাভাজন বক্সী মহাশয় যখন যেখানেই অবস্থান করিতেন,স্বীয় গুরুদেবের সঙ্গসুখ প্রতিদিন সম্ভোগ করিতেন। তাঁহার দীনতায় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইত। একদিন তিনি কোনও বৈষ্ণবপর্ব্ব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে, একস্থানে গমন করেন। তথায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য পৃথক্ আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সকলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন—"আমি অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছি, সুতরাং পতিত, আমি আপনাদের সহিত একাসনে বসিবার অযোগ্য।" এই বলিয়া এক কোণে গিয়া বসিলেন। তাঁহার দীনতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীর হৃদয় সিক্ত হইল। একদিন তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন—"বক্সী মহাশয়, আপনার ক্রোধ জন্মাইতে পারে বোধ হয় এমন লোক জগতে নাই।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"সে কি! আমি যে অত্যন্ত ক্রোধী, বোধ হয় জন্মান্তরে দুর্ব্বাসা ছিলাম।" এই সর্ব্বলক্ষণান্বিত গুরুগত-প্রাণ মহাপুরুষ গোস্বামী-প্রভুর তিরোধানের কিয়ৎকাল পরেই স্বীয় নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভু এক দিবস তাঁহার গুরুদেব পরমহংসজীর নিকট স্বীয় সাধনলব্ধ কতিপয় অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তখন তাঁহার সহিত প্রভুজীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—"গুরুদেব আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—তুমি হঠযোগ-প্রদীপ ও বিচার-সাগর আনিয়া পড়। এই পুস্তক কোথায় পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি একটী দোকানের নাম করিয়া বলিলেন, উহা সেস্থানে পাঁচ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে। উক্ত দোকানে যাইয়া দেখি তথায় মাত্র ঐ পুস্তক দুখানাই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, বিক্রেতা উহার মূল্য ৫৲ টাকাই চাহিয়াছিল। পুস্তকদ্বয় পড়িয়া দেখি আমার সকল অবস্থা উহাতে বর্ণিত আছে। পূর্ব্ব হইতে কোন বিষয় জানিয়া রাখিলে, তাহা লাভ হইলেও তত বিশ্বাস হয় না। পূর্ব্বে লাভ পরে শাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য দিলেই ঠিক বিশ্বাসটী হয়। আমাকে অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন বটে, কিন্তু আমি তাহার উত্তর দেওয়া ভাল বোধ করি না। এক 'নাম' শ্বাস প্রশ্বাসে করিতে পারিলেই, সকল অবস্থা লাভ হইবে, তখন শাস্ত্রও তাহার সাক্ষ্য দিবে। * * * লোকে শক্তি শক্তি করে, শক্তিলাভ অতি তুচ্ছ পদার্থ। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান এবং সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহাদের পাছে পাছে শক্তি সকল আসিতে থাকে ; কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা করিয়া তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিও করেন না।" অতঃপর গোস্বামী-প্রভু দ্বারভাঙ্গা হইতে বৈদ্যনাথ আগমন করিয়া স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিবস ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মালাপে উপস্থিত সকলের এতই আনন্দোচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেলেও, কাহারও ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে ছিল না।

বৈদ্যনাথ হইতে গোস্বামী-প্রভু হুগলি জেলার অন্তর্গত 'থৈপাড়া' গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া কোন্নগরের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য গমন করেন। এই সময়ে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকনিবাসে ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবার অবস্থান করিতেছিলেন। গোস্বামী-প্রভুর আগমনে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। এই স্থানে অবস্থান-কালে যে কয়েকটি আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী বলিয়াছেন,—(১) "আমরা যখন কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-নিবাসে ছিলাম, তখন গোস্বামী-মহাশয় এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীধর ঘোষ, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত, নবকুমারবাবু ও মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় ছিলেন (ইঁহারা সকলেই গোস্বামী-মহাশয়ের শিষ্য)। তিনি আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। একটী কুকুর, তার হাত পা দুখানা একেবারে ভাঙ্গা, ছেঁচুড় দিতে দিতে গোঁসাইকে পরিক্রমণ করিয়া, তাঁহার পায়ের নিকটে আসিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, পুনরায় কুকুরটা অতি ক্লেশে সমস্ত ঘর পরিক্রমণ করিয়া রাত্রিতে দেহ রাখিল। এই দেহ পরে গঙ্গায় দেওয়া হয়।"

২। "সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে আমার বালগোপাল রূপ দর্শন হইল। গোপালের সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, পায়ে নূপুর, আঙ্গিনায় দৌড়াইয়া বেড়াইতেছেন।

আমি ঐ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। পরে ধরিয়া ফেলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম। ঐ স্বপ্ন দেখিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, এই গোঁসাই-ই সেই গোপাল। আমি এইভাবে এত অস্থির হইলাম যে গোঁসাই পায়খানায় যাইতেছেন, আমি তাঁহাকে শৌচ করাইয়া দিতে চাহিলাম। ইহাতে তিনি করযোড়ে বলিলেন—'মা, মাপ কর! তুমি জন্মে জন্মে কতবার আমাকে এইরূপ করিয়াছ। আমি ঐ ভাবেই বিভোর। সকালে চা খাইবার সময়ে আমি নূতন কাজলপাতা কিনিয়া আনিয়া কাজল তৈয়ার করিলাম। স্বহস্তে যাইয়া গোপালের চক্ষে কাজল দিলাম এবং মাথায় চূড়া বান্ধিয়া দিলাম। তাহার পর ছোট ধামাতে মুড়ি-মুড়কি ও কিছু মিষ্ট দিলাম। তখন ভাবাবেশে গান আসিল,—

কীর্ত্তন—একতালা।

"দেখ সবে আসি, যত নদেবাসী
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
গোরা, প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া
'ননী দে মা' বলে কাঁদে।
(ননী কোথা বা পাব ?)
আমি নহি আহিরিণী, কোথা পাব ননী,
পড়িনু বিষম ফাঁদে॥"

এই গান গাহিতে গাহিতে জ্ঞানহারা হইয়া গোপালের (গোস্বামী-প্রভুর) মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম ও বুকে ধরিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। গোঁসাইকে অঞ্জন পরাইয়া দিবার সময়ে তিনি বলিলেন, "মা, আমাকে ভাল ক'রে জ্ঞানাঞ্জন পরাইয়া দাও,—যেন সর্ব্বত্র তোমার ভুবন-মোহিনী রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হ'তে পারি।"

৩। 'আমাদের বাসায় একটা ঝি ছিল। আমি ঐ ঝির দীক্ষার জন্য করযোড়ে গোঁসাইর নিকট বলিলাম—'গোঁসাই, তুমি ত কত পতিতকে উদ্ধার করিয়াছ, ইহাকে দয়া কর।' গোঁসাই সম্মত হইলেন, এবং উহাকে দীক্ষা দিলেন। যেই দীক্ষা হইল, অমনি ঝিটী অজ্ঞান হইয়া ভাবের তরঙ্গে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, লজ্জা সরম দূরে গেল,—ভাবে উম্মাদিনী! সে প্রায় মাসেক পর্য্যন্ত এইভাবে ছিল। ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হইত ও উম্মত্তের ন্যায় চলিত ফিরিত। ইহার দীক্ষার কালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, গোঁসাই দয়ার অবতার হইয়া পতিতকে উদ্ধার করিতেছেন। তখন আমি ভাবাবেশে গান ধরিলাম,—

কীর্ত্তন—একতালা।

"ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে।

ঐ দেখ নামতরি ল'য়ে, হরি নাবিক সেজেছে।
(পারের ভয় নাই, ভয় নাই !)
ঐ দেখ পতিতপাবন দয়াল হরি
কাণ্ডারী সেজেছে।"

—আমি ভাবে অধীর হইয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থায়ই শ্রীমতী কুসুম ও আমাকে পাক করিতে হইল। কুসুম আমার বাল্যসহচরী ও গোস্বামী-প্রভুর মন্ত্রশিষ্যা। কখন আমি পাক করিতেছি, কুসুম কীর্ত্তনে আবিষ্ট হইতেছে; আবার কখন আমি আবিষ্ট হইতেছি, কুসুম পাক করিতেছে। দাইল ভাজিয়া তখনই তৈয়ার করিয়া ভুলিয়া ভুঁষিসহ খিচুড়ী পাক করিলাম। খিচুড়ী আবার পোড়া লাগিয়াছে। ভোগের সময়ে আমি গোঁসাইকে বলিলাম—'পাকের সময়ে তুমি আমাকে বিহ্বল করিলে, আমি ভুঁষি সমেত খিঁচুড়ী পাক করিয়াছি, তাহাও আবার পোড়া লাগিয়াছে। এখন ভাল মন্দ আমি জানি না।' তখন গোঁসাই জড়ভরতের গল্প করিয়া বলিলেন—'এই খিচুড়ী স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মী রান্না ক'রেছেন। ইহা সুধা হইতেও সুমিষ্ট হ'য়েছে। আপনি বিহ্বল ছিলেন, তাতে আর কি হ'য়েছে?'

"গোঁসাইর কৃপাপ্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত ঝিকে দেখিয়া একদিন জগন্নাথঘাটের একজন সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণামকরতঃ বলিয়াছিলেন—'মা! এ জিনিষ তুই কোথায় পে'লি? এ যে দেখিতেছি, তোর প্রতি সদ্‌গুরুর কৃপা হ'য়েছে।" স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী বর্ণিত অপর এক সময়ের একটী ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানেই উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

"আর একবার গোঁসাই আমাদের কাঁসারিপাড়ার বাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি আসিবার কিছুক্ষণ পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে শিষ্যমণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইঁহারা যে কি করিয়া এত শীঘ্র টের পাইলেন, ভাবিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইলাম। গোঁসাই আসিবার দিন-দুই পরে আমার ইচ্ছা হইল, আমি কৃষ্ণ-গোপালের ভোগ দেই। আমি যোড়হাতে গোঁসাইর অনুমতি লইলাম। মণি ও বৃন্দাবনবাবু (গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যদ্বয়) ভোগের সমস্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। আমি রাত্রি চারিটার সময়ে উঠিয়া স্নান করিয়া ভোগ রসুই করিতে লাগিলাম। এই সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কলেতে চাউল ধুইতেছি, দেখি, ঐ সকল চাউল "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" ধ্বনি করিতেছে! ভাজা ভাজিতেছি, উহা হইতেও "হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" ধ্বনি উত্থিত হইতেছে! ভাত টক্‌বক্‌ করিয়া ফুটিতেছে, শুনিতেছি "হরিবোল" "হরিবোল"! এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া আমি আকুল হইলাম। উপরে যাইয়া আমি গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই যে সব হরিধ্বনি শুনিয়া আমি উম্মত্তবৎ হইয়াছি,—এ সব কি?' গোঁসাই বলিলেন—"আপনি কৃষ্ণ-গোপালের ভোগ দিবেন, তাই সমস্ত দেবতারা

আনন্দে হরিধ্বনি করিতেছেন। আপনার দিব্য-কর্ণ খুলিয়া গিয়াছে, তাই ঐ সব ধ্বনি শুনিতেছেন।" পরে ভোগ পারশ করিলাম। ভোগ বেশ করিয়া বাটীতে সাজাইয়া গোঁসাইকে জানাইলাম, এবং বলিলাম—"দেখুন, হরিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া আমি মাতোয়ারা হইয়া ভোগ রসুই করিয়াছি, এখন ভাল-মন্দ আমি কিছু জানি না।" গোঁসাই বলিলেন—"কৃষ্ণ-গোপাল খাইবেন বলিয়া উহা স্বয়ং গোলোকের লক্ষ্মী রসুই করিয়াছেন, উহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, উহার অপূর্ব্ব আস্বাদ হইয়াছে।" পরে ধূপ-ধুনা দিয়া গোঁসাইকে আহ্বান করিলাম। তিনি আসনে বসিয়া করযোড়ে চক্ষু মুদিলেন, কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর আমি কিছু প্রসাদ পাত্র হইতে লইয়া তাঁহার মুখে দিলাম। তিনি তখন ভাবে মাতোয়ারা হইয়াছেন, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐ স্বয়ং জগন্নাথদেব এই ভোগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন! ঐ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন! ঐ শচীনন্দন! ঐ শ্রীনিত্যানন্দ! ঐ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র! ঐ তেত্রিশকোটি দেবতা প্রসাদ পাইতে উপস্থিত হইয়াছেন! এই প্রসাদের তুলনা নাই, যে স্থানে এই প্রসাদ পড়িবে, সেই স্থানই ধন্য হইবে।" আমি ঐ সময় দেখিতে পাইলাম, সহস্র-সহস্র কোটি-কোটি কালো মাথা এই প্রসাদের চতুর্দ্দিকে জড় হইয়াছে। গৃহস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দ, গোঁসাইর নিকট আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন,—তিনিও সকলকে খাওয়াইতেছেন। এমন সময়ে আমি একখানা অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ হস্ত ঐ পাত্র হইতে ভোগ গ্রহণ করিতেছে দেখিলাম। দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম—"এ কাঁহার হস্ত ?" গোঁসাই চীৎকার করিয়া বলিলেন—"শচীনন্দন, শচীনন্দন!" আমি ঐ হস্ত জড়াইয়া ধরিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, অন্যের হস্ত ধরিয়া ফেলিলাম। ইহার পরই আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। পরে শুনিলাম, ঐ গৃহে খোল আসিল, করতাল আসিল। আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া অনেক কীর্ত্তন হইল, কিছুতেই আমার জ্ঞান হইল না। পরে, গোঁসাই আমার কর্ণে হরিনাম দিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া, পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া আমাকে চেতন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে আমি ঐ ঘটনা উল্লেখ করিয়া গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আপনি যথার্থই শচীনন্দনের হস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় পুণ্যবতী, তাই এ সকল দর্শন পাইয়াছেন।" *

ক্রমে গোস্বামী-প্রভু কোন্নগর হইতে কলিকাতা হইয়া শান্তিপুর গমন করিলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক্ খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট গমন করেন। এইস্থানে "মানুষের প্রাণ অনন্তকেই চায়"—এই বিষয়ে একটী

* শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত। তিনি ঘটনা কয়েকটী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

অতীব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া, পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক্ হরিনাম কীর্ত্তন ও তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। অতঃপর তিনি বাগেরহাট হইতে বরিশাল উপনীত হইলেন। এইস্থানে নববর্ষের উৎসবে (১২৯৩ সন, ১লা বৈশাখ) "ভারতে ধর্ম্মান্দোলন" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন ও আলোচনা হইয়াছিল। অপর এক দিবস ব্রজমোহন বিদ্যালয়গৃহে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী অতীব সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ দিবস যাঁহারা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে এতগুলি নূতন ও গূঢ় বিষয় তিনি জীবনে আর কখনও শ্রবণ করেন নাই, এবং উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলী ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর দেশপ্রসিদ্ধ অসাধারণ বক্তা স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, 'ভক্তি-যোগ, প্রণেতা দেশনায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত ও পরলোকগত প্রবীণ উকীল গোরাচাঁদ দাস মহাশয়েরা গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করেন।

বরিশাল হইতে গোস্বামী-প্রভু সপরিবার মাদারিপুর গমন করিয়া চারি পাঁচ দিন অবস্থান করেন। তথায় স্থানীয় ডেপুটী ৺দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের কুঠিতে উপাসনা, আলোচনা ও কীর্ত্তন হয়। গোস্বামী-প্রভুর অসাধারণ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া, ডেপুটীবাবু সপরিবার তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু মাদারীপুর হইতে মাণিকদহে গমনপূর্ব্বক্ স্থানীয় জমিদার ৺বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করেন। এই স্থানেও তিনিও কয়েকদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ নামকীর্ত্তন ও যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

অতঃপর ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে গোস্বামী-প্রভু, রংপুরের অন্তর্গত কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় মহাশয়ের আহ্বানে, তথায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন। গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে পণ্ডিত ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ, স্বর্গীয় নবকুমার বাক্‌চি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুগায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজবাবু প্রভৃতি ৮।৯ জন গমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রচারক ও কাঙ্গাল হরিনাথ (ফিকিরচাঁদ ফকির) প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন যখন গোস্বামী-প্রভু বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন, এবং নিম্নে নামকীর্ত্তন হইতেছিল, তখন তাঁহার নিকটে একটী অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দৃশ্যে মহম্মদ, গুরু নামক, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণ পরস্পরের হস্তাধারণপূর্ব্বক্, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বেষ্টনকরতঃ কীর্ত্তনের মধ্যে ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। এবংপ্রকারের একটী দৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে

আরও দুইবার গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হয়। "কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ" পত্রিকা হইতে তাহার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি—"১২৯১ সালের ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐরূপ দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন অনেকে মা! মা! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হস্ত ধরিয়া, নানক আবার অন্যান্য ভক্তজনের সঙ্গে গলাগলি হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" কীর্ত্তন করিয়া ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। পরলোকগত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পর বৎসর, ১২৯২ সালের ১২ই মাঘ, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপাসনাকালে ঐ প্রকারের একটী অধ্যাত্মিক দৃশ্য প্রকাশিত হয়।" এই আধ্যাত্মিক দৃশ্য ভারতের একটী ভাবী সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মমহোৎসবের পূর্ব্বসূচনা করিতেছে।

অতঃপর রাজাবাহাদুরের একটী বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির করা হইল। প্রায় ২৪।২৫ দলে বিভক্ত হইয়া কীর্ত্তনকারিগণ যখন ৮০টী মৃদঙ্গ ও ততোধিক করতাল সহযোগে গগনভেদীস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন সমগ্র কাকিনা সহরটী একেবারে তোলপাড় হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামী-প্রভু মহাভাবে বিভোর হইয়া সিংহবিক্রমে দোর্দ্দণ্ড নৃত্যে মেদিনী কম্পিত করিয়া অগ্রসর হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য লোক তীরবেগে কীর্ত্তনের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া, ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুজলে ধরা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। একদল বালক গোস্বামী-প্রভুকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছিল। তিনি ভাবাবেশে তাহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেমন একবার হাত তুলিতেছিলেন, আবার নামাইতেছিলেন, সেই সঙ্গে কীর্ত্তনের তালে তালে বালকের দলও কুহকাবিষ্ট পুত্তলিকার মত নাচিতে লাগিল; আর সহরবাসী মহানন্দে মাতিয়া পুষ্প-বর্ষণের ন্যায় তাঁহাদের উপরে 'হরির লুট' ছড়াইয়া উচ্চ হরিধ্বনিতে দশদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিল। এই মহাসংকীর্ত্তনে কাকিনাবাসী বহু নাস্তিকের আস্তিক্য-বুদ্ধি জাগরিত হইয়াছিল,—কাকিনা সহর ধন্য হইয়াছিল।

কাকিনা ছাত্রসমাজের উৎসবের দিন রাত্রে গোস্বামী-প্রভুর উপাসনা করিবার কথা ছিল। অপরাহ্নে স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এক সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য লইয়া গেল। তিনি সংকীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য হয় না। ছাত্রসমাজের লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া গেল। তখন ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ গোস্বামী-প্রভুকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই গোস্বামী-প্রভুর চৈতন্য হইলে, তিনি অতি দ্রুতপদে উপাসনাগৃহে উপস্থিত হইলেন; এবং উপাসনা আরম্ভ করিয়াই বলিতে লাগিলেন

'মা! একি দেখিতেছি! আমাকে যে লোকে গালি দিয়াছে, সেই সকল আঘাতের চিহ্ন তোমার শরীরে! এখন আমি তোমাকে পূজা করিব, কি কাঁদিব?" বলা বাহুল্য, যাহারা ইতঃপূর্ব্বে গোস্বামী-প্রভুর প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছিল, তাহারা ঐ শুনিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভুত হইয়াছিল।

এই উৎসবে গোস্বামী-প্রভু, শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ দ্বারা বক্তৃতা করাইয়াছিলেন। তিনি পীড়িতাবস্থায় ৫।৬ দিন শয্যাগত থাকিয়া, সেই মাত্র "পোড়ের" ভাত খাইয়াছেন। এতদবস্থায় সমাগত পঞ্চসহস্রাধিক লোকের সমক্ষে তাঁহাকে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ও ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিল। রাজাবাহাদুর বলিয়াছেন—"আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারি।" শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবু বলিয়াছেন—"আমার দাঁড়াইবার মতন পায়ে বল ছিল না, বক্তৃতা করিবার উপযুক্ত শক্তি কণ্ঠে ছিল না, কি বলিব, কিছুই স্থির ছিল না। হঠাৎ কোথা হইতে শক্তি আসিল। ভুতাবিষ্টের মত বলিয়াছিলাম,—উহাতে আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব ছিল না।" বস্তুতঃ এই উৎসবে গোঁসাইজীর কৃপায়, কাকিনাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণ মন খুলিয়া গিয়াছিল। বাদকের বাদ্যযন্ত্র, গায়কের কণ্ঠ, বক্তার বক্তৃতাশক্তি—সমস্তই যেন দৈববল প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কাকিনা হইতে গোস্বামী-প্রভু তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী ও কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে ৺কামাখ্যা পীঠ দর্শন করিবার জন্য ধুবড়ী হইয়া কামাখ্যায় উপস্থিত হইলেন।

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে, সতীপতি মহাদেব সতীর অপমানজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করেন; এবং দক্ষরাজকে সংহার করিয়া, সতীদেহ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক্ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রলয় তাণ্ডব করিতে থাকেন। তাহাতে ধরাতল রসাতলে যাইবার উপক্রম হইলে, তন্নিবারণকল্পে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতাদিগের প্রার্থনায় স্বয়ং বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করেন। সতীদেহের সেই সকল অংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা মহাতীর্থে পরিণত হইয়া পীঠস্থান আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কামাখ্যা পর্ব্বতে অংশবিশেষ নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে যোনীপীঠ বলে।*

---

* "যোনীপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা
যাত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্ত পাষাণরূপিণী।
যাত্রাস্তে মাধবসাক্ষাদুমানন্দোহথ ভৈরবঃ॥
সর্ব্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

তন্ত্র চূড়ামণি

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অম্বুবাচীর সময়ে ধরিত্রীদেবী রজস্বলা হন ; এবং এই সময়ে এই পীঠস্থানে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইজন্য প্রতি বৎসর অম্বুবাচীর সময়ে এই স্থানে বহু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি সমবেত হইয়া, পীঠস্থান দর্শনাদি করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন।

অম্বুবাচীর সময়ে একদিন রাত্রে গোস্বামী-প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া একাকী পীঠস্থান দর্শন করিবার জন্য তীরবেগে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে রাত্রে কাহাকেও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তৎকালে এই মন্দিরের দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকে। কিন্তু কি ভাবিয়া জানি না, গোস্বামী-প্রভু ভাবাবেশে হেলিয়া-দুলিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়াও কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না। তিনি অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক্ 'বম্ বম্' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পীঠস্থান পরিক্রমণ করিয়া যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনই অনুভব করিলেন, যেন পিচকারীর ধারার ন্যায় কোন তরল পদার্থ অজস্রভাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হইল। কিন্তু, মন্দিরাভ্যন্তরে তখন অন্ধকার থাকায়, ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। স্বীয় বাসভবনে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত বসনভূষণ যথার্থই দিব্য রক্তরাগে বিরঞ্জিত হইয়া আছে ! এই ঘটনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পুরাণ বর্ণিত অম্বুবাচীর সময়ে ধরিত্রীদেবীর রজস্বলা হওয়ার কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইল।*

ইহার পরে গোস্বামী-প্রভু এই স্থানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীমৎ নিত্যানন্দ স্বামী ও অচলানন্দ তীর্থাবধূতকে দর্শন করিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরম সাধুপুরুষ। ইঁহাদের সহিত গোস্বামী-প্রভু নানাপ্রকার ধর্ম্মালাপ করিয়া উমানন্দভৈরব দর্শন করিলেন। গৌহাটির নীচে ব্রহ্মপুত্র-নদের গর্ভে উমানন্দ-ভৈরবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতীব মনোহর, সাধনভজনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বহু লোক এই স্থানে সাধন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন।

কামাখ্যা পর্ব্বতের শিখরদেশে ৺ভুবনেশ্বরীর মন্দির বিরাজিত। এই স্থানে একদিবস ভুবনেশ্বরীর প্রকাশ দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

কামাখ্যা-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গৌহাটী নগরে গোস্বামী-প্রভু বাস করিতেন। এই নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বশিষ্ঠাশ্রম অবস্থিত। এই স্থানে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সিদ্ধিলাভ করেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে উপনীত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের নিকট দিয়া একটী পার্ব্বত্য জলস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে অর্দ্ধজলমগ্ন অনেক প্রস্তরখণ্ড বিদ্যমান আছে। উহাদের উপরে বসিয়া সমবেত ধর্ম্মপিপাসু

* শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ

ব্যক্তিগণ ভজন করেন। সাধনের এমন নির্জ্জন, প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক স্থান হিমালয়ের নীচে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এক-জাতীয় পোকা অবিশ্রান্ত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একপ্রকার বিচিত্র শব্দ করিতেছে। গোস্বামী-প্রভু অনেক সময়ে এই নির্জ্জন আশ্রমে আসিয়া সমস্ত দিন সাধন ভজনে অতিবাহিত করিতেন, এবং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই প্রকারে গোস্বামী-প্রভু কিয়ৎকাল কামাখ্যায় অবস্থান পূর্ব্বক তথাকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া, সপরিবার ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রচারক-নিবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইদানীং শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তারকব্রহ্ম হরিনামকীর্ত্তন ও তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করাই গোস্বামী-প্রভুর জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল। যে স্থানেই যাইতেন, বক্তৃতা ও উপদেশের সঙ্গে তিনি নাম-কীর্ত্তনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন, কোন কোন স্থলে নগরকীর্ত্তন বাহির করিতেন। গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রতি হিন্দু-সাধারণের যে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মিয়াছিল, তাহা এতদবধি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার কীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে গোস্বামী-প্রভুর শরীর ভগ্ন হইলে, তিনি চিকিৎসকগণের ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ জল বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল পদ্মাগর্ব্ভে নৌকাতে বাস করেন। এই স্থানে এক দিবস তিনি সত্যবাক্যের মহিমা ও ৺গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব বিষয়ক একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিলে, তদীয় অল্পবয়স্কা কন্যাদ্বয় শ্রীমতী শান্তিসুধা ও প্রেমসখী তাঁহার নিকটে আবদার করিয়া গঙ্গাদেবীর প্রকাশ দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। গোস্বামী-প্রভু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শান্তিসুধাকে একটী নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি আহ্লাদের সহিত একটী মেটে বাসনে করিয়া কিছু ভোজ্য বস্তু গোস্বামী-প্রভুর হস্তে প্রদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভু নৈবেদ্য হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল স্তব পাঠ করিবার পর, গোস্বামী-প্রভু যে স্থানে দৃষ্টি করিয়া স্তুতি করিতেছিলেন, সেই স্থানের জল উদ্বেলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিব্য-ভূষণে বিভূষিত একখানি পরম সুন্দর হস্ত পদ্মাগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। এবং গোস্বামী-প্রভু সেই হস্তে নৈবেদ্যটী অর্পণ করিবামাত্র নৈবেদ্য সহ হস্তখানি জলমগ্ন হইল। শ্রীমতী শান্তিসুধা প্রভৃতি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। *

এই সময়ে তিনি এক দিবস চাঁচুরতলা কালীবাড়ী দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে, যে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা

* শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর প্রমুখাৎ শ্রুত।

গোস্বামী-প্রভুর নিজের কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—"ঢাকায় অবস্থানকালে একবার চাঁচুরতলা কালীবাড়ী গিয়াছিলাম। সেখানে যাহা দেখিয়াছি, জীবনে সম্বল হইয়া রহিয়াছে। সেখানে যাইয়া আমরা অনেকেই প্রথমে জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কিন্তু পুরোহিত বলিলেন —'এখানে কোন বিগ্রহ নাই, ঘটস্থাপন মাত্র আছে।' পরে তাহাই দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে কীর্ত্তন হয় ?' পুরোহিত বলিলেন—'মহাশয়, আমরা জীবনে কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই।' তাঁহার বাড়ী দূরে, তাই চাউল কলা যাহা পাইয়াছিলেন তাহা লইয়া, একটু আলো দেখাইয়া বেলা থাকিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। তারপর রাত্রে একদল কীর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে 'ঢেপের খৈ'য়ের মত একরূপ ছোট ছোট ফুল অজস্র পড়িতে আরম্ভ করিল। সমস্ত স্থান ফুলে শাদা হইয়া গেল। তাহার অদ্ভুত সৌরভ। তথাকার লোকেরা বলিল, যে গাছটী হইতে ফুল পড়িল তাহা কেহ চিনে না এবং ঐ গাছে কেহ কখনও ফুল ফুটিতে দেখে নাই। ঐ সময়ে অতি সুমিষ্ট স্বরে একরূপ পাখীর গানও শ্রুত হইয়াছিল। কীর্ত্তনকারীরা বলিল—'আজ আমরা সকলে গান করিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ সকলের মনে হইল, মায়ের বাড়ী গিয়া গান করি। এই কথা এক সময়ে সকলের মনে হওয়াতে কাহারও আপত্তি হইল না। তাই এখানে আজ কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি।" *

আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণের কথা শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এই কলিযুগে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ৺শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ অপূর্ব্ব ফুলের কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, অনেকে তাহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর পদ্মার উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে গোস্বামী-প্রভুর শরীর সুস্থ হইলে, তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য বারদী গমন করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়াই, তাঁহার শরীরের প্রতি লোমকূপে দেবতার প্রকাশ দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। মহামতি বিদুরের কুটীরে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে তিনি যেমন আত্মহারা হইয়া যাইতেন, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আশ্রমে গোস্বামী-প্রভুর আগমনে তিনিও তদ্রূপ আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তিনি তাঁহার 'জীবন-কৃষ্ণকে' কি খাওয়াইবেন, কি দিবেন, ইহা ভাবিয়াই অস্থির হইয়া পড়িতেন। আজ বহুদিন পরে গোস্বামী-প্রভুকে পাইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া

* ঢাকা নারায়ণগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

গোস্বামী-প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরে নিভৃতে তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথোপকথন হইল। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু ঢাকায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রচারক-আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন গোস্বামী-প্রভু শৌচক্রিয়া সমাপনানন্তর গৃহের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, কে যেন ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার নিজের কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নিকটে কেহ ছিল না, তাঁহার ডাকের উত্তর দিবে কে? ইতিমধ্যে হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তথায় কেহ নাই! তবে দরজা খুলিল কে? অনুসন্ধান করিয়া গোস্বামী-প্রভু যখন জানিলেন যে, দরজা খোলা দূরে থাকুক, তাঁহাব ডাক পর্যন্ত কেহ শুনিতে পান নাই, তখন তিনি ভাবে গদগদ হইয়া, 'মা, এই বুঝি তোর রামপ্রসাদের বেড়া-বাঁধা ?"—এই কথা বলিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন!

গোস্বামী-প্রভু একবার উদ্ধারণ দত্তের পাটবাটী দর্শন করিতে সপ্তগ্রাম গিয়াছিলেন। সেখানে গিযা দেখিলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে। পূজারীকে দরজা খুলিয়া বিগ্রহ দর্শন করাইতে বলিলে তিনি অস্বীকার করিলেন। এমন সময়ে কবাট আপনা হইতে উন্মুক্ত হইল। পূজারী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, গোস্বামী-প্রভুর নিকট কাকুর্বাদ করিতে লাগিলেন।

অপর এক সমযে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের আগ্রহে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এড়িয়াদহে গৌরভক্ত গদাধর দাসের পাটবাটী দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। উভয়ে মন্দিরের নিকট গিয়া দেখেন দ্বার বন্ধ, নিকটে পূজারী নাই। গোস্বামী-প্রভু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ মন্দিরের দরজা আপনা হইতেই খুলিয়া গেল। এই অভুতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন কয়িয়া পরমহংস মহাশয় অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রয়াগে কোন দেবালয়েও একদিন ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল; গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গিগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু ইদানীং পূর্ব্বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবের বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আজকাল অনেক সময়ে হিন্দু শাস্ত্রাদির কথা বলিয়া থাকেন, পুরাণের এক একটী আখ্যায়িকা অবলম্বনপূর্ব্বক উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার এই সকল কার্য্যে অপর সাধারণ খুবই সন্তুষ্ট, কিন্তু ব্রাহ্মগণ উহাতে নিতান্তই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা গোস্বামী-প্রভু তাহাদের ভাব ও ইচ্ছামত উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদান করেন। এই সময়ে

গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে যে সকল বক্তৃতা ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন, উহার কতকগুলি স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পরবর্ত্তী সময়ে "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা হইতে চারিটী বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

আজকাল প্রচারকনিবাসের কার্য্যকলাপ নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে। গোস্বামী-প্রভু প্রত্যহ প্রাতে স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রাঙ্গণস্থ একটী শেফালিকা বৃক্ষের দিকে পলকবিহীন-নেত্রে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। পরে প্রায় ১১ ঘটীকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে অতিবাহিত করেন। মধ্যাহ্নে আহারের পর গেণ্ডারিয়াস্থিত একটী নির্জ্জন উদ্যানে (আনন্দ মাষ্টারের বাগানে) গিয়া একটী প্রাচীন আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করেন। অপরাহ্নে প্রচারকনিবাসে প্রত্যাগমন করেন। ৪ ঘটিকার পর এই স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু লোকের সমাগম হয়। তখন তাহাদের সহিত গোস্বামী-প্রভু বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন। সন্ধ্যার সময়ে এক ঘণ্টাকাল সংকীর্ত্তন হয়। পরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়। এই সময়ে কেবল মাত্র গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যগণই ভিতরে থাকিতে পারেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত প্রাণায়াম ইত্যাদি সাধন করেন। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রকার ভাবের উচ্ছাস হয়। গোস্বামী-প্রভু ভাবাবেশে নানা প্রকার কথা বলিতে থাকেন। কোন কোন সময়ে বিভিন্ন দেবদেবী, ঋষিমুনি ও মহাপুরুষদিগের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করেন। পরে শিষ্যগণ স্ব স্ব আলয়ে গমন করেন। কেহ কেহ বা প্রচারকনিবাসে রাত্রি যাপন করেন। গোস্বামী-প্রভু রাত্রিকালীন আহারান্তে স্বীয় আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক প্রায় ৩।৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধ্যান করেন। রাত্রি ৪ ঘটিকার পর কিয়ৎকাল শয়ন করেন।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু যোগরাজ্যের শেষসীমা সমাধির অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন। তাঁহার সমাধির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অথবা নিয়ম ছিল না। কোন কোন দিন আহার করিতে বসিয়া হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। ২।১ ঘণ্টা এই অবস্থায়ই অতিবাহিত হইত। লোকজনের সহিত কথা বলিতে বলিতেও তিনি অকস্মাৎ আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাইত না। ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িতেন, কিয়ৎকাল পরে একেবারে সমাধি- সাগরে নিমগ্ন হইতেন। সংকীর্ত্তনের সময়ে ভগবানের নাম শুনিলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। নৃত্য করিতে করিতে কখনও কখনও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। তখন কেহ বহুক্ষণ সম্মুখে বসিয়া নাম করিলে পুনরায় বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইত।

প্রচারক-নিবাসে এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আগমনপূর্ব্বক বিবিধ ভাবের আলাপ ও আলোচনাদি করিয়া থাকেন। গোস্বামী-প্রভু সকলের কথাতেই 'হুঁ' দিয়া যান এবং আপন ভাবেই মগ্ন থাকিয়া স্বীয় আসনে যোগ-তন্দ্রাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে থাকেন। তাঁহার মনটী সর্ব্বদা যেন কোন্ অজানা দেশের, কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখসিন্ধুর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আজকাল সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার নামেই তাঁহার ভাব উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই বিষয়ক গান হইলে, তিনি একেবারে ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়েন। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এইরূপ আলোচনা হইতে লাগিল যে, ভক্তিভাবের আধিক্য-হেতু গোঁসাইজী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমত ছাড়িয়া অনেকটা প্রাচীন ভ্রান্তমতে গিয়া পড়িয়াছেন, অতএব ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত—ইত্যাদি।

"এবার সাংবাৎসরিক উৎসবের দিন (১২৯৪ সন, ২২শে অগ্রহায়ণ) গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া প্রণালীমত উপাসনা করিতে পারেন নাই। তিনি উপাসনা করিতে বসিয়াই, নারদ, বাল্মীকি, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির প্রকাশ দেখিয়া তাঁহাদেরই স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। কথা বেশী না বলিলেও, গোঁসাইর ভাবেই সকলে অভিভূত হইলেন। সর্ব্বশেষে, গোঁসাই ভাবাবেশে এই কয়টী কথা বলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন। গোঁসাই বলিলেন,—'ঐ দেখ মা আসছেন। আজ মা থালা ভ'রে প্রসাদ নিয়ে আস্‌ছেন। দেখ, মা আমাকে একথা বল্‌তে নিষেধ করছেন। কেন মা, বলব না কেন! রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও, আজ তোমার সকল ছেলেকেই দিতে হবে। তুমিত সকলেরই মা। এদের কেন দেওনা! এঁরা যে উপবাসী থাকেন। মা, তোমার একি ব্যবহার? আজ মা, তোমার সব চালাকি সকলকে বলে দিব। বিক্রমপুরের সেই পাতক্ষিরের কথা বলে দিব। রামবাবুর কথা বলে দিব। শিকল খুলে দিয়েছিলে, সে কথাও বলে দিব, তোমার ঘরের সব কথাই বলে দিব। যে ভাবে চল্‌লে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, তা সব আজ বলে দিব। দেখুন আপনাদের বলে দিচ্ছি—আপনারা এই তিনটী নিয়ম রক্ষা করে চল্‌লে মায়ের প্রসাদ পাবেন। যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মাকে নিবেদন করে নেবেন; অনিবেদিত বস্তু কখনও গ্রহণ করবেন না। দেখুন মা আমার মুখ চেপে ধরছেন, আর বল্‌তে দিচ্ছেন না। মা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধর্‌ছেন। জয় মা! জয় মা! জয় মা!' অস্ফুটস্বরে এইসব কথা বলিতে বলিতে গোস্বামী-মহাশয়ের কণ্ঠরোধ হইয়া পড়িল। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। চারিদিকে হিন্দু, ব্রাহ্ম সকলেরই কান্না ও ভাবের ধুম পড়িয়া গেল। চন্দ্রনাথবাবু একটু পরে গান

ধরিলেন। আজ বেদীর কাজ গোস্বামী-মহাশয় আর করিতে পারিলেন না। ক্রমে সব নিস্তব্ধ হইলে, সকলে আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন।" *

উৎসবান্তে গোস্বামী-প্রভু ঢাকা হইতে সপরিবার শান্তিপুর আগমন করেন। এদিকে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতভেদ উপস্থিত হইলে যে তুমুল আন্দোলনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত প্রশমিত হয় নাই। ক্রমে ঢাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রচারকনিবাসে গোস্বামী-প্রভুর কার্য্যকলাপের মধ্যে ত্রুটী দর্শন করিতে লাগিলেন। ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মের প্রেরণায় পূর্ব্ববাঙ্গালা-ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রচারকনিবাসের জন্য গোস্বামী-প্রভুর প্রচারপ্রণালীর প্রতিষেধক নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার নিকট শান্তিপুর প্রেরণ করেন।

১। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চাদর্শ ও পবিত্রতা খর্ব্ব হয়, প্রচারকনিবাসে এমন কোনও কার্য্য হইতে পারিবে না।

২। মন্দিরে যখন বক্তৃতা বা উপাসনাদি হইবে তখন তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে, এমন কোনও কার্য্য প্রচারকনিবাসে বা প্রচার-কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না।

৩। যাহাতে পৌত্তলিক অথবা নাস্তিকভাবের উদ্রেক হইতে পারে, অথবা যাহা অন্যকোনও প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এরূপ কোনও কার্য্য, গান বা সংকীর্ত্তন এই প্রচার-কার্য্যালয়ে হইতে পারিবে না।

৪। প্রচার-কার্য্যালয়ে কোনও ধর্ম্মকে নিন্দা বা উপহাস করা হইবে না, কিন্তু সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে।

৫। রোগ প্রতীকার ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য (তামাক ও নস্য ভিন্ন) প্রচার-কার্য্যালয়ে গ্রহণ বা সেবন করা হইবে না।

৬। যাহাতে পৌত্তলিক বা অপবিত্র ভাব উদয় হইতে পারে, এমন কোনও-প্রকার চিত্র বা মূর্ত্তি প্রচার-কার্য্যালয়ে রাখা হইবে না।

৭। আমাদের দেশে যে প্রকার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিবার রীতি প্রচলিত আছে, প্রচার-কার্য্যালয়ে সেরূপ অভিবাদন চলিত পারিবে, কিন্তু এখানে কেহ কাহাকেও সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে বা কাহারও চরণ ধরিয়া থাকিতে পারিবেন না।

উক্ত নিয়মাবলী প্রাপ্ত হইয়া, গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন,—

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার পত্র এবং পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত প্রচারকনিবাস সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম। এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে চাহি না,

* „সৎগুরু-সঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত

তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমি যে নিয়মে প্রচারকনিবাসে চলিয়া থাকি, আমার বিশ্বাসমতে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে না। বরং এই প্রণালীতে সার্ব্বভৌমিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে।

আপনারা যদি আমার প্রচার-প্রণালী মনোনীত না করেন, আপনাদের বিশ্বাসমত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীর সম্মত হইয়া আমি প্রচারকনিবাসে বাস করিতে পারি না। সুতরাং আমাকে ভিন্ন বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। ভিন্ন বাসা করিলেই যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ থাকিবে না, তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার আমার জীবনের ব্রত। যেখানে থাকি, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াই জীবন শেষ করিব। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমার জীবনের ব্রত পালন করিয়া যাইতে পারি।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৮৮৯ শক
কলিকাতা।

নিবেদক—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

গোস্বামী-প্রভুর এই পত্র পাইয়াও তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মদিগের মনস্তুষ্টি জন্মিল না। তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গোস্বামী-প্রভুর নিকট তাঁহার প্রচারনিবাসের পূর্ব্ব-কার্য্যকলাপের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সকল গোলযোগের বিষয় অবগত হইয়া, গোস্বামী-প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। এমন সময়ে একদিবস শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুও স্বপ্নযোগে গোস্বামী-প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া, চিরকালের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন।—

"সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানে পালন করিয়া থাকি। আমার কার্য্য লইয়া কেহ প্রতিবাদ করিয়া আলোচনা করিলে উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ, পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যই তিনি। সুতরাং সত্য অজর, অমর। যাহা সত্য তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে। অসত্য বায়ুরাশিতে মিলিয়া যাইবে।

"যাঁহারা আমার কার্য্য লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, আমার ভ্রম বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" *

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সহিত গোস্বামী-প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন হইবার সময়ে স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুর মত হইতে ব্রাহ্মসমাজের

* পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বিবরণ।

মত স্বতন্ত্র, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মত সংগ্রহ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তদীয় অনুগত ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, "যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম 'ব্রাহ্মধর্ম্ম'' গ্রন্থে, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানে' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' পুস্তকে, তাহা তিনি সুব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকলের বিপরীত যিনি যাহাই বলুন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে।"

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্রের কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, —"কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাশয় দেওঘরে আইসেন। তাঁহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরল। যে একদিন এখানে ছিলেন, তাঁহার সহবাসে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময়ে কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সঙ্গে তিনি এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত নহে; এবং যাহা অবলম্বন জন্য ব্রাহ্মেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাঁহাকে রাখিতে পারেন না। আর তাঁহারও তাহাতে থাকা উচিত না। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া একটী নূতন হিন্দুসম্প্রদায় সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে উক্ত অসঙ্গতি দোষ দূর হয়; এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। আমি অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায়ের (ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে আমি হিন্দুসম্প্রদায় জ্ঞান করি) একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রম সত্ত্বেও যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তাঁহাকেও সেইরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি ধর্ম্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, সকল মনুষ্য একমতাবলম্বী হইবে।" *

অতঃপর এই বিষয় লইয়া গোস্বামী-প্রভুর সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে সকল পত্র বিনিময় হয়, তাহার কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র **

স্নেহাস্পদেষু,—

তোমার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য, তোমার প্রকৃতি তেমন ধীর, তোমার ঈশ্বর

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১লা পৌষ।

** তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক।

প্রেম তাহারই সদৃশ। তুমি একদিন শুভক্ষণে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে, এবং কত কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার সমধিক আশা ছিল; কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার সকল আশা ভরসা নিহিত। তম্মধ্যে তুমি ধার্ম্মিক প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া, এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় প্রাণ মন অর্পণ করিয়া খাটিতেছ।

"নামান্যদন্তস্য হতপত্রঃ পটন্ গৃহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরণ্ গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষণ নমদো বিমৎসরঃ।" তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া প্রচারকের আদর্শ দেখাইয়াছিলাম, তুমি সেই আদর্শকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে ব্রহ্মবীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কামভক্তি ও ঈশ্বরে প্রীতি তোমার আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত; যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্পদিনই আছি। যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, তখন ব্রাহ্মসমাজ কেবল তোমাদেরই জীবন হইতে আলোক পাইয়া উজ্জ্বল হইবে। এবং তোমাদেরই আত্মা হইতে জ্ঞানধর্ম্ম লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয় ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মাসের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে তোমার উপরে কতকগুলি ব্রহ্মধর্ম্ম-বিরোধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া, আমার জরাজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। "সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্মসাধনের উপায়; শক্তি সঞ্চারের দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম, বিশ্বাসী, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান করা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনা আপনি পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে; পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে-ধর্ম্ম সরলভাবে বিশ্বাস করে, সেই ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; সিদ্ধযোগীর সূক্ষ্মশরীরে আগমন ও আলাপাদি করা"—এই সকল কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কার যুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিরোধ করা হয়। একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব, এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন। এই চেষ্টা ও

যত্নের পরিণাম কি এই হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ের স্থানে কি এখন সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে, এবং অন্য কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয় যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভি ক্লৃপ্ত" অর্থাৎ হৃদ্‌গত সংশয়রহিত বুদ্ধির যোগে মনন্‌ করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষিবাক্য মিথ্যা হয়; এবং আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-বিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ধ্রুব সত্য। তাহা প্রথম যুগে যেমন, শেষ যুগেও তেমনি। দ্যুলোকেও যেমন, ভূলোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর হয় না। তাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর। তাহা মধুময়, প্রাণময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক্‌; তোমার প্রতি আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করি যে, তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া সাম্য বিরাজ করিতে থাকুক্‌। তোমরা সকলে একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া সত্য প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর। এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দে পদনিক্ষেপ কর। ইতি ১৭ই পৌষ, ১২৯৪ সন।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

গোস্বামী-প্রভুর উত্তর।*

প্রণতিপূর্ব্বক্‌ নিবেদনম্‌,

মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপ্যায়িত হইলাম। দুর্ব্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ দ্বারা আমার প্রতি আপনার অবিচলিত স্নেহেরই পরিচয় দিয়াছেন। প্রার্থনা করি যে, আপনাদের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদের উপযুক্ত থাকিয়া জীবনে সত্যস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি।

যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমার এইরূপ বিশ্বাস, এবং এই সত্য আমি চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছি। কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনও সমাজ বা ব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন, তদতিরিক্ত কোনও নূতন বা অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় কেহই মনে করিতে পারিবেন না।

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১৬ই ফাল্গুন

ব্রাহ্মসমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য অপ্রকাশিত রহিয়াছে, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসাধকের জীবনের মূল হইয়া দাঁড়াইবে। আর আমি যে পথে চলিতেছি, তাহা ঋষি-প্রবর্ত্তিত পথ; অতি পুরাকাল হইতে তদবলম্বনে অনেক মহাপুরুষ কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। আপনার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান' গ্রন্থেও তাহার অনেক আভাষ পাওয়া যায়। "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্ত" এই শ্লোক শিরোধার্য্য করিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং ধ্রুব সত্য বলিয়া জানি যে, নিঃসংশয় বুদ্ধিযোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশ ও লাভ হয়; কিন্তু বুদ্ধির অসংশয়তা লাভ অনায়াস-সাধ্য নয়। তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে ধর্ম্মপ্রচারের ও উপদেশের আবশ্যকতা থাকে না। মনের সেই উন্নত অবস্থা লাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে। যিনি যাহাতে ফল লাভ করেন, তিনি তাহা অবলম্বন করুন। আমি এমন কথা বলি না যে, আমার প্রণালী ভিন্ন অন্য প্রণালী নাই। কিন্তু যে উপায়ে আমার ব্রহ্ম-যোগ লাভের পক্ষে আমাকে সহায়তা করিয়াছে ও করিবে, তাহা আমার প্রাণের বস্তু, অতি আদরের ধন; সে ধনের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। ধর্ম্ম সাধনের উপায় সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থেই এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই;—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সদ্‌গুরু-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেই হইবে। পৌত্তলিক্ ধর্ম্ম বিশ্বাসী লোকদিগকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ লোকেরই আধিক্য, যাহারা ব্রাহ্মমতে ধর্ম্মচর্য্যা করেন, অথচ নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা সরলবিশ্বাসী সাকার উপাসকের অবস্থা আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি। আর প্রকৃত বস্তু লাভ করিলে যখন সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতি ও সাম্প্রদায়িকতা সর্পকঙ্কবৎ স্বতঃই স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে আচারগত পার্থক্য আছে বলিয়াই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না। এবং প্রাণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, সহসা তাহার গ্রহণ-শক্তির অতীত সত্য তাহার সম্বন্ধে প্রচার করিলে, তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা, এবং আমার এই বিশ্বাস যে, ঋষিগণও অধিকারি-ভেদে ধর্ম্মগ্রহণের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আমি অনন্ত জীবনে অনন্ত সত্য লাভ করিয়া সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, আপনার পদপ্রান্তে বিনীতভাবে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা।

'যোগ-সাধন' নামে একখানা পুস্তিকা প্রেরিত হইল। কাহারও দ্বারা উহা পড়াইয়া শ্রবণ করিলে আমার মতামত অমেক বিষয় আপনি জানিতে পারিবেন।

ঢাকা
১২৯৪ সন, ২০শে পৌষ।

প্রণতঃ—
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মহর্ষির দ্বিতীয় পত্র। *

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ২০শে পৌষ দিবসের পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি হইয়াছে, তাহা তুমি চিরদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, সকল যোগ অপেক্ষা অধ্যাত্মযোগে আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ তুমি ব্রাহ্মদিগকে এই যোগের শিক্ষা দেও, ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন কর।

যদি জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হয়, তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না। নিপুণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থে এই উপদেশ আছে,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ।" সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখনও ধর্ম্মসাধনের উপায় নহে। সদ্‌গুরুর নিকটে শিক্ষা লাভকরাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাঁহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর, কিন্তু একথা বলিও না যে "যাঁহার যাহা বিশ্বাস তিনি সরলভাবে তাহাই সাধন করুন, কালে সত্য লাভ করিবেন।" একথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদেশও আবশ্যক থাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চৈতন্য উদ্রেক করা দূরে থাকুক, বরং তদ্বিরুদ্ধে সাকার দেবদেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় যেরূপ মন প্রাণ দিয়া কর্ম্ম করিতেছ, সেইরূপ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন করিতে থাক। ইতি ২৬শে পৌষ।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* তত্ত্বকৌমুদী, ১৮০৯ শক, ১৬ই ফাল্গুন।

এই পত্রের উত্তরে গোস্বামী-প্রভু মহর্ষিকে কোন পত্র লিখিয়াছিলেন কি-না, ও লিখিয়া থাকিলেও তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ নাই। কিন্তু একথা সত্য যে তিনি মহর্ষির পূর্ব্ব অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই, তিনি আর ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন নাই। যাহা হউক, এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে গোস্বামী-প্রভু সম্বন্ধে মহর্ষির মতের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। গোস্বামী-প্রভুর অত্যুচ্চভাব ও সাধনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি নিজে ঐ অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাঁহাকে উহা প্রাপ্ত হইবার উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গোস্বামী-প্রভু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তদীয় গুরুদেব যে প্রকারে মহর্ষিকে অলক্ষিতভাবে শক্তিসঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন ; এবং এই ঘটনার পরে মহর্ষির প্রকৃত সাধনের অবস্থা খুলিয়া গেলে, তিনি একদিবস যে প্রকারে ভাবে গদগদ হইয়া—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

—এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে নমস্কার করিয়াছিলেন, এবং ঐ দিবস তাঁহার সহিত মহর্ষির যে সকল ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তাহা অবগত হইলে সহৃদয় পাঠকবর্গ মতভেদের কারণ এবং উহার মীমাংসার বিবরণী সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

যাহা হউক্, মৃত্যুশয্যায় শায়িতা দুর্ব্বলা জননী যেমন সরল সুস্থকায় তেজস্বী বালককে নিজের অঙ্কে স্থাপন করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ স্বকপোল-কল্পিত মত পোষণ, পরমত দলন, ব্রাহ্মেতর ধর্ম্ম নিন্দন ও ভক্তদ্রোহিতারূপ বিবিধ আত্মিক-রোগ-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু ব্রাহ্মসমাজও এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সত্যব্রত, উদার ধর্ম্মবীর মহাপুরুষকে আর অধিক দিন আপন ক্রোড়ে স্থান দান করিতে সমর্থ হইলেন না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে পালিতা মাতার ন্যায় হিন্দুসমাজের ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রদীপ্ত হুতাশন-সম অমানুষিক তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় তাঁহাকে আপন জননী হিন্দুসমাজের অঙ্কে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। বায়সের বাসায় প্রতিপালিত কোকিল বসন্তের আগমনে 'কুহু কুহু' রব করিয়া উঠিলে যেমন বায়সগণ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ চঞ্চুদ্বারা নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তদ্রূপ তদানীন্তন ব্রাহ্মগণও গোস্বামী প্রভুর শ্রবণ-মঙ্গল সুমধুর কৃষ্ণনামের তানের মধ্যে হিন্দুয়ানীর গন্ধ পাইয়া, অযথা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোন ঘটনাই অমঙ্গল প্রসব করে না। গোস্বামী-প্রভুর ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবত্যাগও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যই সংঘটিত

হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ও বলিতেন, "কাকের বাসায় কোকিল কতদিন থাকে ?"

এই প্রকারে গোস্বামী-প্রভুর সহিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ যোগই রহিল। তিনি বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু, ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থাৎ—ব্রহ্মবিদ্যা-পুনরুদ্ধার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না। এই ব্রহ্মবিদ্যা নিজে অনুশীলন করিয়া, অপরকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীর আদর্শ জনসমাজে প্রদর্শনার্থ, ভগবান্ গোস্বামী-প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার সেই কার্য্য পরিসমাপ্ত হইল, তিনিও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেন।

স্বীয় কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দর-দেব বাল্যকাল হইতে কিরূপে গোস্বামী-প্রভুকে বিবিধ উপায়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রচারকার্য্যে সাহায্য করিতেন, তাহার উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বে অনেকস্থলে করা হইয়াছে। একদিন তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্যামসুন্দর, তুমি এমন ? তবে কেন আমাকে শুষ্ক মরুভূমির ভিতর দিয়া আনিলে ?" উত্তর পাইলেন,—"ইহার গভীর উদ্দেশ্য আছে, সময়ে জানিতে পারিবে।" আমরা মুখে বলি জীবন বৃথা গেল ; কিন্তু হরিনামামৃতের স্বাদ যাঁহারা একবার পাইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক ও বাদানুবাদকেও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হন। নিদ্রায় অভিভূত করিলে তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলেন। সে অবস্থার কথা কে যথাযথ বর্ণন করিবে ? তথায় সংসারের অবস্থা সমূহের সমস্তই বিপরীত। জীবনের যে অংশ তর্ক ও বাদানুবাদে কাটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া, গোস্বামী-প্রভু অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নিদ্রার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন,—'পূর্ব্বে রাত্রি জাগিয়া সাধন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু, সময়ে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এখন শয়ন করিতে হইবে,—একথা ভাবিলেও কান্না পায়।" তিনি দিবানিশি ভগবৎ-প্রেমরসেই বিভোর থাকিতেন। ব্রাহ্ম-সাধারণ তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবেন, ইহা অসম্ভব।

তারপর আর এক কথা।—ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য নহে। ইহার পরেও উচ্চতর অবস্থা আছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকটে ভগবান্ সর্ব্বভূতে এক অখণ্ড সত্ত্বারূপে প্রতিভাত হন মাত্র। কিন্তু তাঁহার সচ্চিদানন্দরূপ, তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার বিষয় তিনি কিছুই অবগত হইতে পারেন না। যে সাধক সর্ব্বভূতে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া, তাঁহার সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাকে যোগমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। এই যোগ হঠযোগ নহে।—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ।

"সংযোগঃ যোগো ইত্যুক্তঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

অর্থাৎ—"জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগকে যোগ বলে।" এই

অবস্থায়ও তৃপ্ত না হইয়া, যিনি ভগবানের সহিত মাতা পিতা, ভাই-বন্ধু প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের অভিলাষী হন, তাঁহাকে ভগবদ্ভাবে, অর্থাৎ—লীলা-রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার পন্থা—ভক্তি। সাধন-পথের এই কয়েকটী স্তরও আবার ক্রম-অনুসারে লাভ করিতে হয়। ক্রম-অনুসারে না হইলে, ইহার সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে ঃ—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিনি সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

গোস্বামী-প্রভুও ব্রহ্মজ্ঞান লাভে তৃপ্ত না হইয়া প্রথমতঃ যোগমার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক্ কঠোর সাধন করিয়া, গুরুকৃপায় পরব্রহ্মকে আত্মার আত্মারূপে প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু, এ অবস্থায়ও তাঁহাকে অধিকদিন তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিল না। পরে, সেই পরমাত্মার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য, তিনি ব্যাকুল হইয়া, ভক্তিমার্গে চলিতে চলিতে ভক্তাধীন ভগবানকে সম্পূর্ণ রূপেই আয়ত্ত করিয়া, লীলারাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবংপ্রকার মহাপুরুষের স্থান আর অধিকদিন ব্রাহ্মসমাজে হইবে কিরূপে ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রিতত্ত্বের আলোচনা ও গোস্বামী-প্রভুর জীবনে তাহার অভিব্যক্তি। অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ সাকারলীলা।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত, (১।২।১১)।

অর্থাৎ—"তত্ত্ববিদ্‌গণ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই একই তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌, এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অন্যতম আচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তৎপ্রণীত "ষটসন্দর্ভ" নামক গ্রন্থের 'তত্ত্বসন্দর্ভে' অদ্বয়তত্ত্ব, 'পরমাত্মসন্দর্ভে' পরমাত্মতত্ত্ব ও 'ভগবৎসন্দর্ভে' ভগবত্তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, উহার পৃথক্‌ নির্দ্দেশের আবশ্যক বোধ করেন নাই। আমরা এই স্থলে শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রতিপাদিত উক্ত ত্রিতত্ত্ব, গোস্বামীপ্রভুর জীবনে কি প্রকার অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহার অনুশীলন-প্রসঙ্গে, ব্রহ্মতত্ত্বটীও সংক্ষেপে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কারণ, এই ত্রিতত্ত্বের উপরেই গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাঁহার বহু বিচিত্রতাময় ধর্ম্মজীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার আর অন্য উপায় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই ত্রিতত্ত্বকে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমদ্‌ কবিরাজ গোস্বামী সূর্য্যের সহিত উপমা দিয়াছেন। সূর্য্যের তেজের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের, প্রতিবিম্বের সহিত পরমাত্মতত্ত্বের ও সূর্য্যের বিগ্রহের সহিত ভগবত্তত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; এবং ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, পরমাত্মতত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা প্রতিবিম্ব এবং ভগবত্তত্ত্বকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্‌ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥
আত্মা অন্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহো গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

যেমন প্রকৃত সূর্য্য দেখিতে হইলে সূর্য্যের কিরণ ও প্রতিবিম্ব না দেখিয়া তাহাকে দেখা যায় না, কোন ব্যক্তির অঙ্গকান্তি এবং মুখচ্ছবি না দেখিয়া যেমন তাহাকে দেখা যাইতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে কাহারও অধিকার জন্মে না। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের এক অনতিক্রমণীয় নিয়ম। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—সেই এক অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্বেরই ক্রমবিকাশ মাত্র।

"প্রকাশ বিশেষে তেহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আব স্বয়ং ভগবান্॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই ত্রিবিধ তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়।

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥
জ্ঞান, যোগমার্গে তারে ভজে যেহ সব।
ব্রহ্ম, আত্মারূপে তারে করে অনুভব॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি পরস্পর পরস্পরাপেক্ষি ও ক্রমোৎকর্ষশীল। প্রথমটী দ্বিতীয়টীর অনুপূরক এবং তৃতীয়টী প্রথম ও দ্বিতীয়টীর পরিপূরক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর তত্ত্ব প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ জ্ঞান-পন্থা। ইহা প্রকৃতি-সিদ্ধ। অজ্ঞাতকে জানিবার জন্য, অচেনাকে চিনিবার জন্য যেমন স্বতঃই একটী প্রয়াস হয়, এই জ্ঞানপন্থাও সেইরূপ স্বাভাবিক। ইহাতে সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? পরমেশ্বরের স্বরূপ কি? তাঁহার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ—ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অন্তরে উপলব্ধি হয়। এই অবস্থায় জীব দেখিতে পায় যে, এক অব্যক্ত অখণ্ড চৈতন্য ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারই শক্তিতে আমার হস্ত পদ চলিতেছে, মুখ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতেছে—ইত্যাদি। আমি কিছুই নহি, এবং কিছুই আমার নয়। তিনিই সব, তাঁহারই সব। আমি দ্রষ্টা মাত্র। এইপ্রকার উপলব্ধিকে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি অথবা ব্রহ্মজ্ঞান বলে। ইহাই জ্ঞানযোগের চরমাবস্থা। এই ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ব্যতীত প্রকৃত ভগবদুপাসনার আরম্ভই হয় না।

ইহার পরে যোগের অবস্থা। এই যোগ হঠযোগ নহে। ইহা জীবাত্মাতে সাক্ষাৎ পরমাত্মার দর্শন। এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে মানুষ সাধারণতঃ নিতান্ত নশ্বর স্ব স্ব স্থূল দেহকেই 'আমি' বলিয়া বুঝিতেছে। এবং ইহারই পরিপোষণ ও পরিতোষণের নিমিত্ত, সত্যাসত্য, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, অহোরাত্র 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া' পরিশ্রম করিতেছে; কিন্তু দেহাতিরিক্ত যে আত্মা বর্ত্তমান, যাহা, দেহ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং যাহা অনন্তকাল স্থায়ী, তাহার পরিপোষণ ও পরিতোষণের জন্য জগতে অতি সামান্য আয়োজনই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভগবৎকৃপায় যখন জীবের নিকট তাহার স্থূল-দেহের অতিরিক্ত সূক্ষ্মদেহ প্রকাশ পায়, তখনই তাহার 'এই দেহই আমি কিনা,' এই ধাঁধা ঘোচে। ইহাই যোগের প্রথম স্তর। সূক্ষ্মদেহেরও অতিরিক্ত জীবের আর একটী দেহ আছে, তাহাকে কারণদেহ বলে। স্থূল দেহ চক্ষে দেখা যায়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ দেখা যায় না। গুটিপোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেইরূপ পঞ্চকোষে আবদ্ধ থাকে। (পঞ্চকোষ যথাঃ—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।) আত্মা যে পর্য্যন্ত পঞ্চকোষে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহাকে জীবাত্মা বলে। এই অবস্থায় কখনও সুখ, কখনও দুঃখ। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে তখন উহাকে আত্মা বলে। ইহার পরেও আত্মার বাসনা থাকে। কিন্তু উহা মায়িক নহে, উহা ভগবৎ-সম্ভোগ তৃষ্ণা। কারণদেহে জীবের আমিত্বের অভিমান হইলে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ উপাধানের খোলসের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমা, অর্থাৎ—মহামায়ার রাজ্য। ইহার পরে জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রকাশ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্রহ্মের স্বরূপকে জ্বলন্ত অগ্নির সহিত, ও জীবের স্বরূপকে উহার স্ফুলিঙ্গের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

"ব্রহ্মের স্বরূপ যৈছে জ্বলন্ত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

কারণদেহ ভেদ হইলে জীবাত্মা কারণসমুদ্রের অর্থাৎ—বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। এই আত্মার যিনি প্রাণরূপী আশ্রয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলে। জীব এই স্তরে আসিলেই ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। স্থূল-দেহীর যেমন দেহ ও প্রাণে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, একটীর অভাবে অন্যটী তিষ্ঠিতে পারে না, আত্মা ও পরমাত্মারও ঈদৃশ স্বাভাবিক সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। এই সম্বন্ধ বিস্মৃত হওয়াতেই জীবের এত দুর্গতি। পুনরায় সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় সেই পুরাতন স্মৃতি জাগ্রত হইলে তাহার নিস্তারের পথ পরিষ্কার হয়।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ।

যে প্রণালী অথবা উপায় দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার উক্ত নিত্য সম্বন্ধ অথবা সংযোগ পুনঃ সংঘটিত হয়, তাহাকেই প্রকৃত যোগসাধন বলে। অতএব জ্ঞান যোগের অনুপূরক। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে পরমাত্ম তত্ত্ব,—সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্মের অধিকতর নৈকট্য ও ঘনীভুত অবস্থা।

ইহার পর ভক্তির রাজ্য। একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব সত্তারূপে প্রাণরূপে উপলব্ধ হইলেও, যখন আত্মিক-ইন্দ্রিয়-বৃত্তিনিচয় সেই অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানকে অধিকতর গাঢ়রূপে সম্ভোগ করিবার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ক্ষোভিত হইয়া উঠে, তখন সগুণ ব্রহ্মের লীলা-নিকেতন পরব্যোমধাম প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় জীব সগুণ সাকারলীলা বুঝিতে সক্ষম হন, এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠ, কৈলাশ, দ্বারকা, মথুরাদি চিন্ময়ধাম সকলে, অনন্ত ঐশ্বর্য্য লীলারসানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে শুদ্ধ মাধুর্য্য-রস-পরিপূরিত অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন-ধামে উপনীত হন। ইহাই অবিমিশ্র প্রেমের রাজ্য—শ্রীশ্রীহ্লাদিনী মহাশক্তির অবিরল আনন্দ-রসমাধুরীর অফুরন্ত ক্রীড়াভূমি। মায়াবদ্ধ জীবের তথায় প্রবেশাধিকার নাই।

"সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
বৈকুণ্ঠের ভুমি বারি সকলি চিন্ময়।
মায়িক ভুতের তথি প্রবেশ না হয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—এই যে ত্রিতত্ত্বের বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল, ইহা সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বেরই ক্রমবিকাশ মাত্র।

"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
প্রকাশ বিশেষে তিঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই সাধন বস্তুটী সম্পূর্ণ ক্রম-সাপেক্ষ। ক্রম অনুসারে না হইলে এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি না করিয়া কেহ যোগ-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন না; এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ সাকারলীলা সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে না। এই সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন,—"ক, খ, অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম, পরে যে পুস্তক পড়ি, প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ, আছে দেখিতে পাই। ক, খ, ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না। ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। এক একটী প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে 'এই দেহই আমি' এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীরতত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়ম, ন্যাস, মুদ্রা ইত্যাদি করিতে হয়। যিনি তাহা না করেন, তিনি দেহ ও আত্মা যে কি পদার্থ, তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, আর সমস্ত কিছু নহে, ব্রহ্মই সব—এইরূপ বোধ হয়। ইহার পরে আমি এবং ব্রহ্ম এক, কি ভিন্ন, —ইহা জানিবার জন্য যোগ অভ্যাস করা আবশ্যক। এ যোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে,—আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন। যথার্থ যোগসাধন হইলে, ভগবান্ কিরূপে জগতে বিরাজ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এইরূপে ক্রম অনুসারে সাধনের অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে যেটুকু সাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে, পরের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। এখন সমস্ত বিশৃঙ্খল, কিছুই প্রকৃতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপন করিলে অঙ্কুর হয়, ইহা কৃষকের গুণ নহে। সাধন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।" *

আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাকার উপাসনা অতি নিকৃষ্ট, অজ্ঞ প্রবর্ত্তক সাধকদিগের জন্যই ইহার ব্যবস্থা এবং ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য, উহার উপরে আর উচ্চতর অবস্থা নাই। কিন্তু এই মত সর্ব্বাংশে শাস্ত্র-যুক্তির অনুকূল নহে। তবে, ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ব্যতিরেকে, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে, পার্থিব কামনামিশ্রিত

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী-প্রভুর স্বহস্তলিখিত উপদেশ।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই যে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানাপ্রকার সাকার দেব-দেবীর উপাসনায়, এবং ক্রমশঃ পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রম অনুসারে হইলে এমনটি ঘটিতে পারে না।

তীব্র ব্যাকুলতা দ্বারা সেই মায়া-মনুষ্যরূপী ভগবানের দর্শন কোন কোন ভক্তের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, শাস্ত্রে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত, সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মের পরাতত্ত্ব লাভ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দো সর্ব্বকারণকারণং॥" ব্রহ্মসংহিতা।

অর্থাৎ—"পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (সর্ব্বাকর্ষী), তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (যাঁহা হইতে 'বি' অর্থাৎ বিশেষরূপে, 'গ্রহ' অর্থাৎ গৃহীত হয়, সৎ (সত্তা) চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দ।) তিনি অনাদি, তাঁহার আদি কেহ নাই, তিনি গোবিন্দ (ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ামক ও পোষ্টা।) তিনি সর্ব্বকারণরূপিণী প্রকৃতিরও কারণ।" *

উক্তবিধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনে জীবের কি অবস্থা হয়, ঋষিরা তৎসম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" †

শ্রুতি।

অর্থাৎ—"সেই পরাবর-স্বরূপের দর্শনে, হৃদয়গ্রন্থি (চিত্তের সর্ব্ববিধ আসক্তি) ভেদ হয়, সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয় (সুতরাং সর্ব্বজ্ঞান লাভ হয়) এবং সর্ব্ববিধ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।"

স্বরূপতত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত শুধু ব্যক্তিরূপ অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্বতা হেতু সাধকের—একপ্রকার বিস্ময় ও আনন্দ জন্মে বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহের প্রকাশ দ্বারা যেরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হইয়া জীব পরমানন্দের অধিকারী হয়, ব্যক্তিরূপের প্রকাশের দ্বারা সেরূপ হয় না। অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি

* যিনি কার্য্যে ও কারণে বর্ত্তমান তিনি 'সর্বকারণ-কারণ' শব্দের বাচ্য। যেমন একটী আম্র বৃক্ষ, আম্রবীজই ঐ বৃক্ষের কারণ; ঐ বীজের কারণ যিনি তিনিই উক্ত বৃক্ষের পরম কারণ শব্দ বাচ্য হন। সেই প্রকার এই পরিদৃশ্যমান জগত-ব্রহ্মাণ্ডের কারণ প্রকৃতি; এই প্রকৃতির কারণ যিনি, তিনিই পরম-কারণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম।

† পর + অবর = পরাবর।
"পরং সূক্ষ্মং, অবরং স্থূলঞ্চ। (শ্রীধর)
অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যে যিনি বর্ত্তমান তাহাকে পরাবর বলে।

ব্যতিরেকে যাঁহারা কেবল ঐ ব্যক্তিরূপেরই (রাম—কৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তির) উপাসনা করেন, তাঁহাদের নিকট অবশ্য ঐ প্রকারের দর্শন একটা উচ্চ অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাকে পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা না বলিয়া দেবতা উপাসনা বলা হইয়াছে। সে উপাসনা দ্বারা পরাতত্ত্ব লাভ হইতে পারে না।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং॥"

গীতা ৭।২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ—"আমি অব্যক্ত, অবিবেকী মানবগণ আমার অব্যয় অত্যুত্তম পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া আমাকে ব্যক্তিরূপে (অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদিরূপে) পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করে।"

কিন্তু যাঁহারা অতুল ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তাঁহাদের নিকট এই 'ব্যক্তিরূপ' ভগবানের প্রকাশে এমন আনন্দাধিক্য হয় না, যাহার জন্য তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে আকৃষ্ট হইতে পারেন। পরন্তু, ব্রহ্মানন্দের সম্ভোগ ব্যতীত শুধু মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাদ্বারা শ্রীভগবানের 'ব্যক্তিরূপ' ভিন্ন সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহস্বরূপের দর্শনে জীব কখনও অধিকারী হইতে পারে না।

এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহকে প্রাকৃত মন, বুদ্ধি ও চিন্তাদ্বারা অবধারণ করা যায় না। প্রাকৃত চক্ষু তাঁহার রূপ দর্শনে, প্রাকৃত কর্ণ তাঁহার বাণী শ্রবণে কখনও সমর্থ হয় না।

"রূপীতি হেতো দৃশ্যতঃ যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মাস্মবিচার্য্যতাম্॥"

লঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থধৃত বাসুদেবাধ্যায়ে।

অর্থাৎ—"হে নারদ, প্রাকৃত ব্যক্তির রূপ যেমন নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ভগবানের রূপও প্রাকৃত চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তুমি এরূপ মনে করিও না।"

ভুত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি কতিপয় মায়াধীন জীবেরও প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাম-কৃষ্ণাদি (শাস্ত্রোক্ত বিশেষ চিহ্ন বিবর্জ্জিত) রূপ ধারণ করিবার শক্তি আছে। সুতরাং তাদৃশ রূপের প্রকাশ দ্বারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ সরলমতি সাধকগণের আত্মপ্রতারিত হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমান সময়েও ঈদৃশ ঘটনা বিরল নহে। শ্রীবৃন্দাবনে কোন সময়ে নারায়ণস্বামী নামক জনৈক প্রেতসিদ্ধ ব্যক্তি তদীয় বশীভূত প্রেত দ্বারা একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইয়া গোস্বামী-প্রভুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বলা বাহুল্য কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। স্বরূপতত্ত্বের প্রকাশ ব্যতীত শুধু রামকৃষ্ণাদি 'ব্যক্তিরূপ' শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশদ্বারা সরলমতি প্রবর্ত্তক সাধকদিগের অনেকস্থলে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অত্যধিক।

"মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যস্মাৎ পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তো নৈবত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥"
লঘুভাগবতামৃতধৃত শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মের ৪০৬ শ্লোক।

অর্থাৎ—"হে নারদ, সমস্ত ভূতের গুণযুক্ত অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি যুক্তরূপে আমাকে যে দেখিতেছ, ইহা আমার সৃষ্ট মায়া। আমাকে এই প্রকারে জানা তোমার উচিত নহে।"

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতং।
স্বপ্রভবং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ং॥"
উক্ত গ্রন্থধৃত বাসুদেবোপনিষৎ, ৩।৫।

অর্থাৎ—"আমার আদি, মধ্য ও অন্তশূন্য স্বপ্রকাশ ও সচ্চিদানন্দ, অব্যয় এবং অদ্বয়-ব্রহ্মের স্বরূপ (ভক্তেরা) ভক্তিদ্বারা জানিতে সমর্থ হয়।"

উক্ত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত, অনন্ত আনন্দের আধারস্বরূপ সগুণ সাকার লীলাতত্ত্বে প্রবেশ করা অসম্ভব। কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই জটিল বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সসৈন্য রথী মহারথী সকলেই দর্শন করিয়াছিলেন। যদি তজ্জাতীয় দর্শনের দ্বারা ভগবত্তার স্ফূর্ত্তি হইত, তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরই সম্ভাবনা হইতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, কুরু-সভায় বন্ধনোদ্যত দুর্য্যোধনকেও তাহাই দেখাইয়াছিলেন। সেই বিরাট-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমাগত ঋষি-মুনিগণ তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া কতই স্তবস্তুতি করিলেন, কিন্তু, কি দুর্দ্দৈব! দুর্য্যোধনের উহা 'ভেল্কি' বলিয়া ধারণা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহামতি পাণ্ডবেরাও তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে দর্শন করিতেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের যেরূপ শোক, মোহ-ভয়, ত্রাস ইত্যাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"—ইত্যাদি ঋষিকথিত লক্ষণের সহিত পাণ্ডব-দিগের চরিত্রের সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন আপনাকে জ্ঞাতিবধ-পাপযুক্ত মনে করিয়া তাহা ক্ষালন করিবার জন্য আকুল হইলেন, তখন মহাত্মা ভীষ্ম, পুরোহিত ধৌম্য, মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, যাঁহার নাম-স্মরণে মহাপাতকী উদ্ধার হয়, সেই ভগবান্ স্বয়ং তোমাদের কাণ্ডারী, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত হইয়াছে, ইহাতে তোমার আবার চিন্তা করিবার কি আছে—ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈদৃশ প্রবোধবাক্যে প্রবুদ্ধ হইলেন না। তিনি উক্ত

পাপাপনোদনমানসে ও অক্ষয় স্বর্গলাভাকাঙ্ক্ষায়, অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং তিনিও তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণরূপে ভগবত্তার উপলব্ধি হইলে, মহামতি যুধিষ্ঠিরের কি এবংপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইতে পারিত ?—কখনই না।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাধামের ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইয়া দেবর্ষি নারদের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকাশমূর্ত্তিতে গুরুবর্গ, পিতা, মাতা, সখা ইত্যাদি এবং ষোড়শ সহস্র মহিষীগৃহে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেন। দেবর্ষি এই সকল লীলা দর্শনমানসে দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দেবর্ষি যথাযোগ্য পূজিত হইয়া সুখে সমাসীন হইলে, শুদ্ধতত্ত্ব বসুদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"পুত্রদিগের নিকটে পিতার আগমনের ন্যায়, অল্প বুদ্ধি ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের নিকটে মহাত্মগণের আগমনের ন্যায়, আপনার আগমন সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে। দেবচরিত্র ভুতগণের পক্ষে দুঃখের এবং সুখের নিমিত্তও হয়, কিন্তু ভবাদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুগণের চরিত্র কেবল সুখের নিমিত্তই হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্, যাহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে মানবগণ সমস্ত ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে, আমি আপনাকে সেই ভগবদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি নিশ্চয়ই দেবমায়ায় মোহিত হইয়া সেই মুক্তিপ্রদ পুরাণপুরুষকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য পূজা করিয়াছিলাম, কিন্তু মোক্ষ লাভের জন্য নহে। হে সুব্রত, এখন আপনাদিগকে সহায় করিয়া বিবিধ ব্যসনস্থান ও সর্ব্বত্র ভয়সমন্বিত এই সংসার হইতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্তি পাইতে পারি, আমাকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করুন!"

এই প্রশ্নের স্থান, কাল ও পাত্র—এই তিনটী বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভুত হইতে হয়। স্থান দ্বারকাপুরী, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণৈশ্বর্য্য বিকাশ করিয়া বিরাজমান্। কাল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রকট লীলায় বর্ত্তমান এবং সুধর্ম্মা নামক সভাতে উদ্ধবাদি সহ নানা ধর্ম্মতত্ত্বাদি আলাচনা করিয়া থাকেন। পাত্র—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব, যিনি পুত্রের অপার ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া যমালয় হইতে মৃত পুত্রদিগকে আনয়ন করাইয়াছিলেন। আজ তিনিই কিনা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া মোক্ষ লাভের আশায় নারদের শরণাপন্ন হইলেন!—এই বিয়য়টী চিন্তা করিলে,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

এই ঋষিবাক্যের গভীরতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হইবে। বস্তুতঃ অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত সগুণ সাকারতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জীবের আদৌ জন্মিতে পারে না। যে সকল ঋষিরা পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন

তাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবনলীলাতে গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু" সেই শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্না সমুদ্ভুতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তো ভবার্ণবাৎ॥"—পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ—"পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে মধুর ভাবে ভজনা করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে তাঁহারা দ্বাপর যুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং প্রেমসেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এক দিবস স্বামি-পাদ মথুরায় কোন চৌবের গৃহে ভিক্ষার্থে উপনীত হইয়া দেখিলেন,—চৌবের গৃহিণী অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন একটী গোপাল বিগ্রহের সেবাপূজা করেন, কিন্তু সদাচারের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য রাখেন না। ইহাতে সনাতন গোস্বামী মনে মনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া, উক্ত ব্রজমাতাকে আচারনিষ্ঠার সহিত গোপালের সেবা করিতে উপদেশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অতঃপর একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, গোপালদেব তাঁহাকে প্রণয়-ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন,—"সনাতন, তোমার উপদিষ্ট সদাচার পালন করিতে গিয়া, আমার ভোগ দিতে মাতাজীর বিলম্ব ঘটিতেছে, তজ্জন্য আমি ক্ষুধায় ক্লেশ পাইতেছি।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিবা স্বামি-পাদ অতীব ভীত হইলেন। পরদিবস প্রাতে মথুরায় গিয়া ব্রজমাতার নিকট কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, এবং একান্তমনে মাতাজী কর্ত্তৃক গোপালের সেবাপূজা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। গোপালদেবের ভোগের সময় দেখিলেন—ব্রজমাতা স্বীয় সন্তানদিগকে হাতে করিয়া আহার করাইয়া দিতেছেন এবং সেই সঙ্গে গোপালও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মাতাজীর হাতে আহার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া সনাতন গোস্বামী প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং অবশেষে সেই অন্নের কিঞ্চিৎ অবশেষ মাতাজীর নিকট হইতে করযোড়ে ভিক্ষা করিয়া, স্বয়ং ভোজন করিয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলেন, গোপালদেব তাঁহাকে মথুরা হইতে আনয়ন পূর্ব্বক্ শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপন করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে স্বামি-পাদ তাঁহাকে মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া যথাসাধ্য সেবাপূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে গোপালদেব তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া নানাপ্রকার প্রণয়-আলাপাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন গোপালদেব কথায় কথায় বলিলেন,—"সনাতন,

বিনা নুনে রুটি খাইতে আমার বড় কষ্ট হয়।" উত্তরে সনাতন বলিলেন—"আমি এই জনশূন্য স্থানে নুন পাইব কোথায়? আজ তুমি নুন চাহিতেছ, কাল হয়ত ক্ষীর সর চাহিবে। আমি ভিখারী, এ সব কোথায় পাব?"

"ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ।
আমা হইতে নহিবে, চাহ করি লহ॥"

ভক্তমাল

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে যে গোপালজীকে দর্শন করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, দরিদ্রের মহানিধিপ্রাপ্তির ন্যায় যাঁহাকে বুকে করিয়া মথুরা হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন, স্বহস্তে তৃণগুল্মাদি সংগ্রহপূর্ব্বক কুটীর প্রস্তুত করিয়া পরম যত্নে যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এমন প্রাণের প্রাণ জীবনসর্ব্বস্ব কয়েকদিন পরে শুকা রুটি খাইতে একটু নুন চাহিলেন, তখন সনাতন নিষ্ঠুরের মত বলিলেন—"আমি এত 'বাহেনা' সহ্য করিতে পারিব না। তুমি অন্যত্র মাগিয়া লও।" মা যশোমতী কি তাঁহার নয়নের মণি যাদুবাছাধনকে এমন কথা বলিতে পারিয়াছিলেন? তারপর আবার সাক্ষাৎ যুগলকিশোর মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতে কোন্ কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য স্বামী-পদের এমন বিরহ সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্রতলে পড়িয়া দেহপাতের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন? শাস্ত্রে ইহাকে বৈষ্ণবী মায়া বলা হইয়াছে।

"মায়া হ্যেষা ময়াসৃষ্টো যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভুত গুণৈর্যুক্ত নৈবত্বং জ্ঞাতুমর্হসি॥
মদ্রূপ মদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যান্তবিবর্জ্জিত্বং।
স্বপ্রভবং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ং॥"*

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কলিপাবনাবতার, শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আদর্শ-শিক্ষাগুরু ভক্তশিরোমণি শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী-চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ধভাব কি প্রকারে সম্ভবে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত আচরণ দ্বারা মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ব্রজবিহারী দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, এবং অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত সগুণ সাকারলীলা সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে না, এই দুইটী তত্ত্বই সাধারণ মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

"যো মামেব মসংমূঢ়ঃ জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥"

গীতা। ১৫।১৯

---

* অনুবাদ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

"হে ভারত! যে অসংমূঢ় ব্যক্তি আমার (লীলা-) পুরুষোত্তম রূপ জানেন, তিনি সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) হইয়া সর্ব্বভাবে (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) আমাকে ভজনা করেন।"

জীব শ্রীভগবানের লীলা-পুরুষোত্তম রূপ দর্শন স্পর্শন করিয়া সর্ব্ববিৎ হইলে (নতুবা নহে) তাঁহাকে সর্ব্বভাবে সেবা করিতে সমর্থ হন, ইহা ভগবদ্বাক্য।

আমরাও যে মহাপুরুষের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর ঘটনা প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার সুবিশাল হিন্দুসমাজের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যও ঐরূপই ছিল। কারণ ব্রাহ্মসমাজের অপর সাধারণের ন্যায়, তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু ধরিবার ছুঁইবার না পাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার কুলাধিদেবতা ৺শ্যামসুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ), যাঁহার ভগবত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য কত মহা মহা যোগিগণ যুগযুগান্তর হইতে অরণ্যে, নির্জ্জনে. গিরিকন্দরে, কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, কত সংসারবিরাগী নিষ্কিঞ্চন মহাত্মাগণ, স্ব স্ব ধর্ম্মপন্থা অনুসারে মন্দিরে, মসজিদে, নির্জ্জনে, তীর্থপ্রান্তে আজন্ম প্রাণান্ত-পরিশ্রম করিয়াও, যাঁহার জাগ্রত জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না,—সেই রাধারমণ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অতি শিশুকাল হইতেই, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, গোস্বামী-প্রভুর সহিত কত ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছেন, কত ভয়ানক ভয়ানক বিপদাপদ হইতে অলৌকিকভাবে রক্ষা করিয়াছেন, জীবনের কত কঠোর পরীক্ষার সময়ে সৎ পরামর্শ দিয়া কতরূপেই না তাহা হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা এই গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে।

গোস্বামী-প্রভু যোগপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়া যখন ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব সম্ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিবস তিনি শান্তিপুরে আপন ঘরে বসিয়া আছেন, গৃহদেবতা শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর আসিয়া বলিলেন—'তুই আমার চূড়া গড়া'য়ে দে।' প্রভু বলিলেন—'যারা তোমার পূজা করে, তুমি তা'দের কেন বল না।' শ্যামসুন্দর বলিলেন—'কেন, আমি কি তোদের কেউ নই? তুই তোর খুড়ীমাকে বল দেখিনি।' প্রভু অমনি খুড়ীমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ খুড়ীমা, তোমাদের শ্যামসুন্দর চূড়া গড়া'য়ে দিতে বলছেন।' খুড়ীমা বল্লেন—'তুই বেটা ব্রহ্মজ্ঞানী, তোকে কেন বলবেন? আর আমি টাকাই বা কোথায় পাব?' শ্যামসুন্দর গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—'দেখ, ও'র ঝাঁপিতে ষাটটী টাকা আছে, তুই ব'লে দে'না।' প্রভুজী বলিলেন—'খুড়ীমা, শ্যামসুন্দর বলছেন—তোমার ঝাঁপিতে নাকি ষাটটী টাকা আছে, তা' দিয়ে ক'রে দাওনা।' এই কথা বলামাত্র তাঁহার

খুড়ীমা প্রেমাশ্রু মোচন করিতে করিতে উক্ত টাকা আনিয়া প্রভুর হাতে দিলেন। তিনিও শ্যামসুন্দরকে চুড়া দিবেন বলিয়াই উহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। পরে ঢাকা হইতে সুন্দর একটী চুড়া গড়াইয়া আনিয়া স্বীয় খুড়ীমার হাতে দিলেন, এবং তিনি উহা শ্যামসুন্দরকে পরাইয়া দিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। চুড়া পরিয়া শ্যামসুন্দর প্রভুজীকে ডাকিতে লাগিলেন,—'তুই চুড়া দিলি ত একবার এসে দেখে যা-না, চুড়া প'রে আমার কেমন শোভা হয়েছে।' শ্যামসুন্দরের সাগ্রহ আহ্বানে, প্রভুজী দেখিতে গেলেন, দেখামাত্র অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'শ্যামসুন্দর, তুমি যদি সে-ই হ'লে তবে আমায় এত ঘুরালে কেন?' উত্তরে শ্যামসুন্দর গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'আমিই তোকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়াছিলাম, আবার আমিই ফিরা'য়ে এনেছি। ভে'ঙ্গে না গড়ালে কোন জিনিষই সুন্দর হয় না। তোকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। সে উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হইয়াছে। তাই আবার ফিরা'য়ে আনিলাম।'

গোস্বামী-প্রভু কথিত—'তুমি যদি সে-ই হলে' এই বাক্যের 'সে-ই' শব্দটী এবং শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর কথিত—'বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল' এ দুটী বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই শ্যামসুন্দরের সঙ্গে প্রভুর শৈশব হইতেই সাক্ষাৎ ও ক্রীড়া কোন্দল এবং বাক্যালাপ কতই হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে কখনও রোদন, মূর্চ্ছা দূরের কথা, কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশের ভাবও দেখা যায় নাই। সচ্চিদানন্দ-রসমগ্ন-প্রভু শ্যামসুন্দরকে দেবলোকবাসী দেবতা বিশেষ বলিয়াই মনে করিতেন। আজ যখন তিনি পরম-কারণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীশ্রীলীলা-পুরুষোত্তম রূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা লীলারসবিগ্রহে আনন্দাধিক্য প্রযুক্ত আজ প্রভুজীতে মূর্চ্ছা ও রোদন-দশা প্রকটিত হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'তুমি যদি 'সেই' অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দের মূর্ত্তি'ই হইলে, তবে আমায় কেন ঘুরা'লে!'

"বিশেষ উদ্দেশ্য" আর কিছুই নহে,—সর্ব্বময় সর্ব্বেশ্বর সত্যং-শিবং-সুন্দরম্ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্কুর না হইলে আত্মন্তর্য্যামী পরমাত্মার অনুভূতি হইতে পারে না। পরমাত্মার ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ার সহিত, জীবাত্মার ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ার ঐক্য না হইলে, তৎপ্রিয় কার্য্যসাধনরূপ সেবায় (ভক্তিযোগে) জীবের অধিকার হয় না, তাই সর্ব্বাদৌ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর প্রভুজীকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতিরেকে সগুণ সাকার উপাসনা করিতে গিয়া, আমাদের দেশের ভগবদ্বিগ্রহাদি পূজা ক্রমশঃ সকাম দেবদেবীর উপাসনায়, এবং অবশেষে অধিকাংশ স্থানে একেবারে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। এমন সময়ে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছায়, কলিহত-

জীবের বহু সৌভাগ্যে, ব্রহ্মবিদ্যার পীঠস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে চারিশতাধিক বৎসর পরে আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। তৎকালিক প্রচারকগণের অদম্য উৎসাহে, গোস্বামী-প্রভুর সিংহ-হুঙ্কারে এবং জাগ্রৎ, জলন্ত জীবনাদর্শে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মনামের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল, এবং বহু স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ রোপিত হইল। প্রবীণ শিক্ষিত-সমাজ এবং নবীন বিদ্যার্থীবর্গের মধ্যে এই ব্রহ্মজ্ঞান অগ্নির ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রম কুসংস্কার বিদগ্ধ ও ভস্মীভূত করিতে লাগিল। গোস্বামী-প্রভুর সেই সিংহ-হুঙ্কার—"হে অমৃত সন্তানগণ, উত্তিষ্ঠ, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—এবংপ্রকার বাণী যাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; সেই প্রেম গদগদ অভয়-অমৃত-পরিপূরিত, জ্বলন্ত-জাগ্রত-বিশ্বাস-প্রদীপ্ত, গুরু-গম্ভীর আহ্বান ধ্বনি যাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইল, তাঁহারাই দুশ্ছেদ্য সমাজবন্ধন, দুস্ত্যজ্য আত্মীয়-স্বজনের মায়ামমতা এবং দুর্ল্লঙ্ঘ্য জাতি-কুল-মান তুচ্ছ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া, দলে-দলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়পতাকা-মূলে সমবেত হইতে লাগিলেন। মানব-সমাজ যুগযুগান্তের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিধিনিষেধের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে পরিমুক্ত হইয়া, এক অতৃপ্ত আশা ও অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কোন্ এক অমররাজ্যে প্রবেশ করিতে ধাবিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন বন্যাপ্রভাবে ভারতের দিক্‌দিগন্ত পরিপ্লাবিত হইল বটে; কিন্তু, প্রকৃতির নববর্ষাস্নাত বন্যাবারি যেমন নানাবিধ আবর্জ্জনারাশি কুড়াইয়া লইয়া প্রবাহিত হইলেও, স্থানে স্থানে উহার অংশবিশেষ পুঞ্জীকৃত হইয়া স্রোতের গতি অথবা দিক্ পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের তরুণ সাধনা-স্রোতেও সেই প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন মতবাদ, স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠা, সদলপ্রিয়তা প্রভৃতি সত্যের অবরোধকারী খুঁটিনাটী সংমিশ্রিত হওয়ায়, স্রোতের গতি মন্দীভূত ও দিক্-পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

জীব যে পর্য্যন্ত ভগবৎসত্তায় ডুবিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই আমিত্ব বা স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে না। জীবনের যে মুহূর্ত্তে যতটুকু সময়ের জন্য এই ভগবৎসত্তা প্রাণে অবতীর্ণ হয়, মধুপ্রাপ্ত মক্ষিকার ন্যায় জীব ততক্ষণ আপনাকে ভুলিয়া তাহাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া ডুবিয়া থাকে। এই ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ব্যতীত যথার্থ ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভই হয় না। উহার অভাবে ধর্ম্মার্থীর জীবনে বিবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-প্রিয়তাই লক্ষিত হয়, এবং ধর্ম্ম বাহ্য-অনুষ্ঠান-বহুলতায় পর্য্যবসিত হয়।

এই ব্রহ্মসত্তা যাঁহার জীবনে যত ঘনীভূতভাবে উপলব্ধিকৃত হয়, প্রকৃত নির্ভরশীলতা, ধ্যানপরায়ণতা, অন্তর্দ্দর্শিতা প্রভৃতি তাঁহারই ততোধিক লাভ হয়, এবং প্রচার অপেক্ষা আচার, বাক্য অপেক্ষা কার্য, তাঁহাতেই ততোধিক দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মসমাজের এই রজোগুণ-প্রধান যুগে ৺প্যারীলাল ঘোষ (মহাত্মা মৌনী বাবা) প্রমুখ সাধনশীল ব্রাহ্মগণ অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ লইয়া সমাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। সমাজের নেতৃবর্গ স্ব স্ব মস্তিষ্কোদ্ভাবিত, মন ও বুদ্ধি দ্বারা-স্থিরীকৃত. তত্ত্ব সকল ঋষি-প্রোক্ত তত্ত্বের ন্যায় বেতন-গ্রাহী প্রচারকদিগের দ্বারা প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ মনোমুখী পন্থা দ্বারা পরিকল্পিত ব্রহ্মদর্শন, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি তত্ত্বে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

গোস্বামী-প্রভু দেখিলেন যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, স্থানে স্থানে বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেছেন এবং জ্ঞানপন্থার দ্বারা উন্মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির পর-পারে সার-সত্যের ভুমিতে গিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে, এই দলাদলি, মতভেদ, অসত্যে সত্যজ্ঞান, মনঃ-কল্পিত প্রত্যাদেশ ইত্যাদি অনিবার্য্য। সেই সার-সত্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, জ্ঞান-নেত্রে তাঁহার সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল দর্শন করিলে, জ্ঞান-কর্ণে তাঁহার সর্ব্ব শুভঙ্কর অভয়বাণী শ্রবণ না করিলে, শুধু সত্তারূপে উপলব্ধি করিয়া কাহারও সম্পূর্ণ শান্ত, নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হইবার উপায় নাই। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্রবেষ্টন অতিক্রমপূর্ব্বক্ যুগযুগান্তরব্যাপী যোগী ঋষিদিগের পীঠস্থান পুণ্যভুমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকদিগের নিকটে গমন করতঃ, তাঁহাদের উপদিষ্ট সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার প্রভুত উপকার ও অনেক যোগৈশ্বর্য্যও লাভ হইল বটে, কিন্তু শুদ্ধ স্ফটিক-জলাভিলাষী চাতকপক্ষীর ন্যায় তাঁহার আকুল পিপাসা উহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। ঐ অতৃপ্ত আকুল পিপাসা লইয়া তিনি ভুস্বর্গ হিমালয়ের বহু নির্জ্জন কানন ও গিরিকন্দর পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে গয়াধামে 'আকাশ-গঙ্গা' পর্ব্বতে মানস্-সরোবরবাসী জনৈক সিদ্ধ পরমহংসজীর নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করিবার পর, তাঁহার সম্মুখে এক অনন্ত অপ্রাকৃত রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং তিনি এতদিন যাঁহাকে সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেছিলেন, এখন সেই অপ্রাকৃত সার-সত্য বস্তুকে প্রাণের প্রাণরূপে লাভ ও সম্ভোগ করিয়া তাঁহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইল। তখন তাঁহার সেই বহু-কষ্ট-লব্ধ বস্তু দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মহোল্লাসে পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন।

গোস্বামী-প্রভু গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর সে মানুষ নাই, তাঁহার সে বেশ নাই, তাঁহার মস্তক কেশ-কলাপ বিবর্জ্জিত, পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তদ্বয়ে দণ্ডকমণ্ডলু বিরাজ করিতেছে। তাঁহার বদনারবিন্দ ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, দৃষ্টি স্থির নিশ্চল, অভয়-আনন্দ-মুক্ষিত,

নয়ন-যুগল হইতে করুণা-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পাপী-তাপী নরনারীর প্রতি প্রধাবিত হইতেছে। তাঁহার আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, হাস্য পরিহাস সমস্তই যেন মধুক্ষরণ করিতেছে, তিনি অহর্নিশি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এই সময় হইতে তিনি যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, সেই স্থানেই যেন নৈমিষারণ্য বদরিকা আশ্রমবাসী ঋষিদিগের সম-দম-তিতিক্ষাদি তপ-কল্প-লতিকা সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিত। তাঁহার এই সময়ের অবস্থা উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার আর কি করিব? গোঁসাইজীকে একখানা আসনে বসাইয়া দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হব।"

গোস্বামী-প্রভু এই প্রকারে সত্তারূপে প্রাণরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ কিরূপে ক্রমশঃ আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, কি প্রকারে সেই পূর্ণপুরুষকে লাভ ও সম্ভোগ করিতে হয়, এবং এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের শারীরিক মানসিক কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জাগতিক জীবনিচয়কে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ যে এক অদ্বয়* জ্ঞান-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা ত্রিবিধরূপে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহা আপনি সাধন করিয়া অপর-সাধারণকে তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

> "ব্রাহ্ম সন্ ব্রহ্মতত্ত্বং কথিতমুপনিষৎ সঞ্চয়ৈর্জ্ঞানগম্যং
> যোগী সন্ আত্মতত্ত্বং যতিগণবিদিতং যোগগম্যঞ্চ শেষে।
> ভক্তঃ সন্ প্রেমতত্ত্বং পরমিহ ভগবত্তত্ত্বমেতৎ ত্রিতত্ত্বং
> ত্রিপ্রত্যবস্থা গতঃ সন্ স্ফুটমিহ বিজয়ঃ দর্শয়ামাস সম্ভঃ॥"

অর্থাৎ—"মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক্ উপনিষদোক্ত জ্ঞানগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব, পরে যোগপন্থা গ্রহণ করিয়া যতিগণবিদিত যোগলভ্য আত্মতত্ত্ব, এবং অবশেষে ভক্তিপন্থা আশ্রয় করিয়া ভগবত্তত্ত্ব নামক পরাতত্ত্ব (প্রেমতত্ত্ব)—এই তিনটী তত্ত্ব যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা লাভ করিয়া ধর্ম্মার্থী সাধুসজ্জনদিগকে পরিস্ফুটরূপে তাহার পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ কবিরাজ গোস্বামী উক্ত ত্রিতত্ত্ব লাভের ক্রম অতি সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন ঃ—

> "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

* যশোহর জেলার অন্তর্গত কাস্তিয়াগ্রামনিবাসী, গোস্বামী-প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত স্বর্গীয় পণ্ডিত আনন্দনাথ দাসগুপ্ত কবীন্দ্রশেখরকৃত শ্লোক।

মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবন কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প-বৃক্ষে করে আরোহণ॥"

"অর্থাৎ—জীব কর্ম্মবশতঃ বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের (সদ্গুরু অথবা ব্রহ্মগুরুর) প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ (সশক্তিক নাম অথবা মন্ত্র) প্রাপ্ত হয়। মালী যেমন বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরিত হইবার জন্য তাহাতে জলসেচন করে, সেইরূপ সেই ভাগ্যবান্ জীব গুরুপ্রদত্ত বীজ (সশক্তিক নাম) হৃদক্ষেত্রে ধারণ করিয়া, তাহাতে প্রতিনিয়ত ভগবন্নাম কীর্ত্তন ও লীলাশ্রবণরূপ বারি সেচন করিতে থাকেন।

এইরূপে ভক্তিলতিকা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া (ব্রহ্মাণ্ড ভেদ—পঞ্চকোষ ভেদ। অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না। প্রাণময় কোষ ভেদ হইলে শারীরিক উত্তেজনা থাকে না। মনোময় কোষ ভেদ হইলে সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না। বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলে সংশয় বুদ্ধি থাকে না। আনন্দময় কোষ ভেদ হইলে, পার্থিব কোন আনন্দে মুগ্ধ করিতে পারে না।) অতঃপর মায়ামুগ্ধ হইয়া বিরজাতে উপনীত হয়। (বিরজা—জীব ও জগতের মূল কারণ প্রকৃতি। ইহার অপর নাম কারণ-সমুদ্র। কৃষকের শষ্যাধারস্থিত শীষ্য-বীজ যেমন ভূমি সংযুক্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে জীব ও জগতের সনাতন অব্যয় বীজ, মায়া সহযোগে ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পায়, "কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে"—চরিতামৃত।) অতঃপর বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোকে (মায়াতীত আত্মারাম ঋষিবৃন্দ যে স্তরে বা ধামে অবস্থান করেন তথায়) গমন করে। এই ব্রহ্মলোক শান্তরসের ভূমি, অরূপ-অব্যক্তের রাজ্য ; তথায় সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও সুখস্বরূপ অপার ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া, পরব্যোম (অনন্ত ভাব-রস-বৈচিত্র্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ লীলার ভূমি বা স্তর ;—"বৈকুণ্ঠের ভূমি বারি সকলি চিন্ময়—চরিতামৃত।" তথায় চিন্ময় কৈলাস, অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা ইত্যাদি অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক বিরাজমান আছে। সেই) ধামে গমন করিয়া তত্তৎ লোকের ঐশ্বর্য্য লীলা-রসাদি সম্ভোগ করেন এবং উহার পরিতৃপ্তিতে শুদ্ধ মাধুর্য্য-রস-তৃষ্ণা উদ্দীপ্ত হইলে, "তবে যায় তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন"—তখন অখিল রসামৃত শ্রীগোবিন্দের লীলা-নিকেতন গোলোক-মণ্ডলস্থিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপদ-কল্পতরু প্রাপ্ত হইয়া তাহার সকল আশা চরিতার্থ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত উক্ত পদ কয়েকটীতে এক অসাম্প্রদায়িক পূর্ণ ধর্ম্মপন্থার প্রশস্ত ও নির্দ্দিষ্ট রাজপথ চিত্রিত রহিয়াছে। যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, সমস্ত ঋষিমুনিগণ এই পথে গমন করিয়া পরবর্ত্তী সাধকদিগের জন্য তাঁহাদের শ্রীচরণ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই পথের কথাই বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বসুদেব-নারদ সংবাদে শ্রীভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথনে, এই পথের কথাই বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ শাক্যসিংহ সিংহবিক্রমে এই পথের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। কলিপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া সারভুতরূপে এই শিক্ষাই শ্রীরূপ সনাতনকে দান করিয়াছিলেন; সদ্‌গুরুর অবতার শ্রীশ্রীগোস্বামী-প্রভুর তাঁহার ধর্ম্মজীবনে এই তত্ত্বের সাধন ক্রম-অনুসারে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র জীবন ও তত্ত্বোপদেশ সকল নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে এই কথা সুস্পষ্ট-রূপে প্রতিপন্ন হইবে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" সত্যের স্বরূপ কি? সত্যের ভিত্তি কোথায়? কিরূপে তাহা ক্রম-অনুসারে একটী একটী করিয়া লাভ করিতে হয়? এবং সত্য প্রকাশিত হইলে চরিত্রে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, গোস্বামী-প্রভুর সাধকজীবন তাহার একখানি সমুজ্জ্বল চিত্র। পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমমহারত্ন লাভের ক্রম সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু সাধারণতঃ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দিতেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক্ বোধ হইতেছে। শ্লোকটী এই ঃ—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততো সাধুসঙ্গঃ অথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

অর্থাৎ—"প্রথমে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ (সদ্‌গুরু) লাভ হয়। তারপর সদ্‌গুরু লাভ হইলে, ভজন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পরে গুরূপদেশমত সাধন ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসৎ ক্রিয়া কাপট্যাদি দূরীভুত হয়। তদনন্তর সাধ্য বিষয়ে নিষ্ঠা জন্মে। এই নিষ্ঠা হইতে রুচি অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণ ও লীলাদিতে আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়। রুচি হইতে ইষ্ট-বিষয়ে তীব্র আসক্তি জন্মে। এই আসক্তি হইতে চিত্তে ভাব অর্থাৎ রতির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অতঃপর এই রতি গাঢ় হইলে তাহাই প্রেম নামে অভিহিত হয়।"

পরিশেষে অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ সাকার লীলা সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভুর স্বমুখনিঃসৃত একটী উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা

যাইতেছে। উপদেশ যথা—"শ্রুতিতে ব'লেছেন—যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন যাতানি জীবন্তী, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" 'যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে',—ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু 'যাহা কর্ত্তৃক হইয়াছে', এইরূপ বলেন নাই, পঞ্চমীতে রে'খে গিয়েছেন। করণার্থ তৃতীয়া করেন নাই। 'যাহা হইতে' যেমন মৃত্তিকা হ'তে ঘট, স্বর্ণ হ'তে কুণ্ডল, সমুদ্র হ'তে তরঙ্গ ইত্যাদি। মৃত্তিকা ও ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই একপ্রকার পরিণাম ঘট ; স্বর্ণেরই একপ্রকার পরিণাম কুণ্ডল ; এবং সমুদ্রেরই এক প্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তাহ'লেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র ব'লতে হবে না, ঘটই বল্‌তে হবে, তরঙ্গই বল্‌তে হ'বে। সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বয়,—আর চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দি'য়ে বুঝায়েছেন। কুম্ভকার এবং ঘট, এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, আমার এই লাঠিখানি, মালাটী, এই অস্থি, মাংস, আমি সবই ব্রহ্ম। ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝতে পারে। নিগুর্ণ অদ্বয় তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হ'লে, সগুণ সাকার তত্ত্ব বুঝবার কি সাধ্য আছে ? সাকার কি এম্‌নি সোজা কথা ? শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন ঃ—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই নিগুর্ণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হ'য়ে লীলা কর্চ্ছেন। কাক ভুষণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। সেই নিগুর্ণ পরব্রহ্মই কি এই দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র ? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে ?' একদিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাচ্ছেন, কণিকা মাটিতে পড়্‌ছে, আবার তা' কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কাকভুষন্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধরবার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুষণ্ডী ভয়ে পালা'ল। কিন্তু হাত তার পেছনে পেছনে চল্‌ল। কাকভুষণ্ডী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন, শ্রীহস্ত তার পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পে'য়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনায় সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্‌লেন। তখন ভুষণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন। দেখ্‌লেন,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক্‌লোকান্তর, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতর বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত শত রাম লীলা কর্চ্ছেন, নিজকে পর্য্যন্ত ভুষণ্ডা ঐরূপ একস্থানে দেখ্‌লেন। এসকল দেখে ভুষণ্ডী তো অবাক্‌! শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাস্‌লেন, ভুষণ্ডী অম্‌নি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়্‌লেন। প্রত্যক্ষ এসমস্ত দেখ্‌লেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কৃপা ক'রলেন। অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাঁর

কাছে প্রকাশ হ'ল। তখন ভুষণ্ডী সমস্তই বুঝলেন। এই অদ্বয় নির্গুণ (অর্থাৎ গুণাতীত) ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি ব্যতীত কি সগুণ সাকার লীলা বুঝিবার সাধ্য আছে ?"*

* "সৎগুরু-সঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গোস্বামী-প্রভুর গুরুদেব পরমহংসজীর পরিচয়। গুরু-তত্ত্বের আলোচনা। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি দান করিবার অধিকারী নির্ণয়। পঞ্চম-পুরুষার্থ হৃদয়ে ধারণ ও সম্ভোগ করিবার ক্ষমতাশালী মহাত্মা জগতে দুর্ল্লভ

হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে "মুক্তিনাথ" নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। ত্রিগুণাতীত সিদ্ধ-মহাত্মগণ তথায় অবস্থান করেন। মায়াধীন জীবের সেই স্থানে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই। এই সকল মহাপুরুষগণ একত্র হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে একজনকে নায়করূপে মনোনীত করেন। তিনি ভগবানের আদেশে, অপর মহাপুরুষগণের সহায়তায় সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এই সকল মহাত্মগণ কখনও সশরীরে, কখনও সূক্ষ্ম শরীরে, কখনও বা কোন বিশুদ্ধাত্মা ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, পরিভ্রমণপূর্ব্বক্ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করেন। গোস্বামী-প্রভুর গুরুদেব ইঁহাদিগের নায়ক ছিলেন। মহাপুরুষদিগের সমাজে ইঁনি ব্রহ্মানন্দ পরমহংস বলিয়া পরিচিত। অধুনা অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত মানস্-সরোবরের তীরে ইঁহার সাধন স্থান ছিল। ইঁনি পূর্ব্বে নানকপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরমহংসাবস্থা লাভ করিবার পর ভগবান্ ইঁহারই উপরে তৎকালের ধর্ম্ম বিতরণের গুরুভার অর্পণ করেন।.

এই প্রপঞ্চ জগতের অসংখ্য কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্তই এক অচিন্ত্য অব্যক্ত নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মুহূর্ত্তকাল এই নিয়মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা পাইত না। বাহ্য জগতের কোনও কার্য্য যেমন নিয়ম ভিন্ন চলে না, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতের কার্য্যও নিয়ম ভিন্ন চলে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি পরব্রহ্মের দর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ এক অব্যর্থ নিয়ম। সমস্ত শাস্ত্রে এই সদ্‌গুরুতত্ত্বকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি অপরাপর তত্ত্বকে ইহারই অন্তর্গত বলা হইয়াছে।

"গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুর্নিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং॥" গুরুগীতা।

অর্থাৎ—"গুরুই দেবতা, গুরুই ধর্ম্ম, গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা, গুরুদেবের উপরে আর দেবতা নাই, গুরুতত্ত্বের উপরেও আর তত্ত্ব নাই।"

ভগবান্ যখন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহাকে গুরু ও অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা,—

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৯।৬ শ্লোক।

অর্থাৎ—"হে ভগবান্! আপনি বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে দেহধারীদিগের অনর্থ দূর করিয়া, স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এ-নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না। আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।"

এই সৎগুরুর কৃপা ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানেই কাহারও প্রকৃত নিষ্ঠা জন্মে না, এবং এই নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক, তাহার সংসার-বাসনাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। প্রমাণ যথা,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাৎ গৃহাৎ বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ র্বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকং॥"

অর্থাৎ—"ভরত, রহূগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রহূগণ! মহৎপাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন (অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রম-ধর্ম্ম দ্বারা, এবং তত্তৎ কর্ম্মের সেই সেই দেবতার উপাসনা, ও জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা কখনই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।"

"নৈসাংমতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৫ শ্লোক।

অর্থাৎ—"নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, ভগবানের পাদপদ্মে মতি জন্মে না, এবং ঐরূপ মতি না জন্মিলেও সংসার বন্ধন ছিন্ন হয় না।"

তাই, আশৈশব এত কঠোর সাধনা করিয়াও, সদ্‌গুরু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভুর প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা প্রস্ফুটিত হয় নাই; এবং সদ্‌গুরু লাভ

হইবার পরই, তাঁহার নিকটে এক অনন্ত রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যোগ-সাধন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"অতঃপর (ব্রাহ্ম-সমাজের প্রণালী অনুযায়ী সাধনে তৃপ্ত না হইয়া) আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী, সকলের নিকটেই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর-কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশ-গঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে আমার অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।"*

অদ্বিতীয় পরাৎপর পরব্রহ্ম লাভের পক্ষে যে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক, একথা শিব, শুক, নারদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্কই হইতে পারে না। এখন এই সদ্‌গুরু কে? তাঁহার লক্ষণ কি? কাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়? "এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে দুইটী ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক নিয়মে বেদান্তবেত্তা, আশ্রমী অর্থাৎ—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমে যিনি নিয়মিত আচার প্রতিপালন করেন,—এমন বেদজ্ঞ, ব্রহ্মবিৎ, সদাচারী, আশ্রমী ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরু-পদবাচ্য। বৈদিক গুরুর নিকটে কেবল ব্রাহ্মণ ওঁ-কার মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য জাতির অধিকার নাই। দ্বিতীয় তান্ত্রিক। কলিতে যে সকল দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ বৈদিক আশ্রম ও সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণ এবং বর্ণসঙ্কর মনুষ্যেরও অধিকার আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের তিনটী সোপান—পশু, বীর ও দিব্য। এই ত্রিবিধ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থের সহিত মন্ত্র চৈতন্য করিয়াছেন, তাঁহা মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। এই সিদ্ধ মন্ত্রের সহিত ওঁ-কার যুক্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ মন্ত্রে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সৎগুরু। এই সদ্‌গুরু মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ববর্ণকে ওঁ-কারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। তাহা সাধন করিলে নিতান্ত অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেন। ইহা শিববাক্য।"**

---

* যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ॥ উপনিষৎ।

** মৌনী অবস্থায় গোস্বামী-প্রভুর স্বহস্তলিখিত উপদেশ।

এই স্থলে "মুক্তি" শব্দে জীবের চরম লক্ষ্য প্রেম-ভক্তির কথাই সূচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুক্তি শব্দ জরা-মরণাদির কবল হইতে অব্যাহতি, বাসনা কামনা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ—ইত্যাদি বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তি পরিত্রাণ ও জীবের চরম লক্ষ্য এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধেও বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ আপন আপন শক্তি, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা অনুসারে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনকার কপিলদেবের মতে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক হেতু জীবের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং পুনরায় প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জাগ্রত হইলে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও তজ্জনিত এক প্রকার আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই আনন্দকেই কপিলদেব মোক্ষ বলিয়াছেন।[১] মহামতি পাতঞ্জল প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই মুক্তি ও মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[২]

বৈশেষিক মতের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কণাদ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ গুণবৃত্তির নাশরূপ আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তিকেই মুক্তি ও জীবের একমাত্র সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] নৈয়ায়িক মতাবলম্বী মহর্ষি গৌতম, শরীর, ষড়িন্দ্রিয়, ষড়্বিষয়, ষড়্বুদ্ধি এবং সুখ ও দুঃখ, এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের (দুঃখস্থানের) আত্যন্তিকী নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[৪] জৈমিনি মতে বেদোক্ত-শুভকর্ম্মের দ্বারা দুঃখহানি ও সুখলাভই জীবের সাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[৫]

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকার ভগবান্ বেদব্যাস উহার কোনটিকেই প্রকৃত মুক্তি অথবা জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কেননা, উঁহাদিগের কল্পিত আত্মগুণবৃত্তিধ্বংসরূপ মুক্তি প্রকৃত মুক্তি নহে, উহা অভাবাত্মক মাত্র।

---

১ প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্য ত্রিবিধ দুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ ত্রিবিধ দুঃখস্য প্রাধ্বংস স্যাৎ। সএবানন্দপ্রাপ্তিরিত্যুপচারিত ইতি কপিলঃ।

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত সিদ্ধান্তরত্ন। ১ম পাদ, ৫ সূত্র।

২ পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধাদেব ধর্ম্মমেঘশব্দবাচ্যাদসম্প্রজ্ঞাত সমাধেরস্যতাবিতি পাতঞ্জলিঃ। সিদ্ধান্তরত্ন, ৬ সূত্র।

৩ নবানাং বৈশেষিক গুণানাং প্রাগভাব সহবর্ত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দাবপ্তিরিতি কণাদঃ। সিদ্ধান্তরত্ন, ৭ সূত্র।

৪ একবিংশতিবিধস্য দুঃখস্য আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ সৈব সুখবাপ্তিরিতি গৌতমঃ। সিদ্ধান্তরত্ন, ৮ সূত্র।

৫ বেদোক্তৈঃ শুভকর্ম্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চেতি জৈমিনি।

সিদ্ধান্তরত্ন, ৯ সূত্র।

যেমন ভারবাহক পুরুষ ভারাপগমে আপনাকে সুখী বোধ করে, তদ্রূপ। কিন্তু ভারাপগমে দুঃখের নাশভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র সুখের উৎপত্তি হয় না, এবং যাহাতে পৃথক্ সুখাস্বাদ নাই, তাহা জীবাত্মার চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

তারপর প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বুদ্ধি—এই সপ্তেন্দ্রিয় দ্বারা যে সুখ অথবা দুঃখ উদ্ভূত হয়, উহার নিত্যতা নাই। কারণ, শরীর নাশের সঙ্গেই উহাদেরও নাশ হয়। সুতরাং ঐসকল ক্ষণবিধ্বংসি পদার্থ হইতে উৎপন্ন সুখ, অবিনশ্বর জীবাত্মার চরম লক্ষ্য ও উপভোগের বিষয় কি প্রকারে হইবে ?

ভগবান বাদরায়ণির মতে সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের সজ্ঞানপূর্ব্বক্ পরিজ্ঞান হইলেই, আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ও স্বতন্ত্র সুখপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা লাভের একমাত্র উপায় প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ, পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ। আত্মাকে জানিলেই পরমাত্মাকে জানা যায়, এবং পরমাত্মাকে জানিলেই সর্ব্বদুঃখের অবসানে নিত্যানন্দ লাভ হইয়া থাকে। যিনি সদ্গুরুর নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তাঁহার দেহ দৈহিক মমতাপাশের হানি এবং তন্নাশে তদুৎপন্ন ক্লেশ সকল সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতঃপর জন্ম-মৃত্যুরও অবসান হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গ-শরীরের বিনাশ হইলে, তৃতীয় শুদ্ধসত্ত্বময়-অপ্রাকৃত ভগবৎপদলাভে অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরমাত্ম-দর্শনের দীপস্বরূপ। তদ্দ্বারা পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইলে, জন্মাদি বিকারশূন্যত্ব, সর্ব্বতত্ত্ব-সম্পন্নত্ব ও বিশুদ্ধত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়।* বিজ্ঞানানন্দই শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ'—তিনি রসের স্বরূপ। এই রসস্বরূপে নিমগ্ন হওয়াই অমরাত্মার চরম লক্ষ্য, এবং অহৈতুকী ভক্তিই ইহার একমাত্র সাধন।

"জ্ঞানতঃ সুলভো মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সহস্রৈ র্হরিভক্তি সুদুর্লভঃ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ১১২ শ্লোক।

অর্থাৎ,—"জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হইতে মুক্তি ও যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম হইতে ভুক্তি

* কিন্তু সর্ব্বেশ্বরাভিখ্যস্য পুরুষোত্তমস্য স্বরূপতোগুণতশ্চ পরিজ্ঞানং সজ্ঞান-পূর্ব্বকং তস্মৈ কল্প্যতে। তথাহিজ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যু-প্রহাণিঃ। তস্যাভি ধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ। যৎ আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈ বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। ইত্যাদি শ্রবণাৎ। সিদ্ধান্তরত্ন, ১১ সূত্র।

(বাসনাকামনার বিষয়) সহজেই লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি বহু সাধন দ্বারাও দুর্লভ।"

বেদ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পদবাচ্য)। মুক্তির পরে পরাভক্তিলাভ করিয়া, যে নিত্য অপার আনন্দময় ভগবৎসম্বন্ধ ও লীলারস সম্ভোগ হয় তাহাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ কহে।

"ব্রহ্মভুতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভুতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

গীতা, ১৮।৫৪।

অর্থাৎ—"ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নত্মা ব্যক্তি (প্রিয় বস্তুর নাশে অথবা অপ্রিয় বস্তুর সংঘটনায় কখনও) শোক করেন না, এবং (নিরতিশয় তৃপ্তিকামতা প্রযুক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তুর) আকাঙ্ক্ষা করেন না। (সর্ব্বময়তা প্রযুক্ত) সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন ; এবং আমার পরাভক্তি (প্রেমভক্তি) লাভ করেন।"

ভক্তি মানবাত্মার নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি। দৈহিক ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন তত্তৎ বিষয় লাভে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভক্তিবৃত্তির বিষয়স্বরূপ শ্রীভগবানের লব লেশ সংস্পর্শে ভক্তির বিকাশও তদ্রূপ স্বাভাবিক।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতং জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥" গীতা, ১৮।৫৫।

অর্থাৎ—"(পরাভক্তি লব্ধ) ভক্ত, আমি যে ভাবে এই জগত-ব্যাপারে অবস্থিত, যে সকল আমার রূপ-গুণ-কর্ম্ম, তাহা অবগত হইয়া অতঃপর আমাকে (লীলাপুরুষোত্তমরূপী সর্ব্বানন্দ-বিগ্রহকে) জানে ; তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ নিত্য লীলাব্যূহে পার্শ্বদ-কোটীতে স্থান প্রাপ্ত হয়।"

মায়াতীত পরব্যোম ধাম (গোলোকধাম) ভগবৎ পার্শ্বদবৃন্দের লীলাব্যূহ, অর্থাৎ অনন্ত আনন্দময়ী লীলা-প্রবাহের অপার অম্বুধিস্বরূপ। উক্ত লীলাসিন্ধু হইতে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে যে সকল অফুরন্ত ভাবরস-প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে উদ্গত হয়, উহাই ভুশক্তিরূপা ব্রহ্মাণ্ডনিকরে, সূর্য্য-প্রতিবিম্ববৎ যোগমায়া সমাবৃত হইয়া, তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুকূলভাবে মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে।* পরব্যোমস্থিত লীলামণ্ডলে যেমন অসংখ্য চিন্ময় কৈলাস, অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরাদি নিত্যলীলার মণ্ডল সকল রহিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডনিকরেও তত্তৎ ধারার প্রতীকরূপে ব্রহ্মাণ্ডায়তন অসংখ্য ভু-কৈলাসাদি স্থান বর্ত্তমান আছে। পরমকারণ নিত্য-

---

* "গোলোকে গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥
অতএব গোলোক স্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার ॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উক্তি।

লোকের লীলাতরঙ্গ কারণস্তরে বীজভূত হইয়া, কার্য্যস্তর ভূলীলা প্রতীকরূপী স্থান সকলে (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত কৈলাস-অযোধ্যা-মথুরাদি লীলাপ্রতীকে) মূর্ত্ত হইয়া সমস্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে তত্তৎ ভাব ও রসের মহাকর্ষণময়ী পরমকল্যাণপ্রদ আধ্যাত্মিক প্রবাহের সঞ্চার করিয়া থাকে। সমগ্র জগতের নিখিল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক প্রবাহ, উক্তবিধ কোনও না কোনও স্থানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিনিয়ত তত্তৎ স্থান সকলের আধ্যাত্মিক প্রবাহে আকৃষ্ট হইয়া কত দুঃখযন্ত্রণা অনাহার ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়াও উক্তবিধ তীর্থস্থান সকল দর্শনে আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছে।

কালক্রমে যখন উক্তবিধ পরম কল্যাণাধার আধ্যাত্মিক প্রবাহ লক্ষ্যভ্রষ্ট ও মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া, ত্রিজগন্মনমোহন অভয়-পরমানন্দ রূপ, অতুল কারুণ্যম্রক্ষিত সর্ব্বচিত্তাকর্ষী শরণাগত-বাৎসল্যাদি গুণ, ভক্তবিনোদকারী, লোকোত্তর, পরমমাঙ্গলিক কর্ম্ম, এবং পাষাণ-বিদ্রাবী পাপী-উদ্ধারণাদি লীলা প্রকটনপূর্ব্বক্ পুনরায় ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। জীবের নিরতিশয় সৌভাগ্যোদয়ে শ্রীভগবানের উক্তবিধ রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও লীলা দর্শনের অধিকার জন্মে, এবং তৎফলে জীব-নিচয় স্ব স্ব ভাব ও রসে তুষ্ট, পুষ্ট, সমাকৃষ্ট ও সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, তত্তৎ আধ্যাত্মিক ভাবস্রোতে অগ্রসর হইতে হইতে ভগবৎকৃপায় নিত্য লীলামণ্ডলে প্রবেশ ও ভগবদ্পার্শ্বদত্ব লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন। উক্তরূপ মূর্ত্ত-লীলার সাক্ষাৎ সম্ভোগ ব্যতীত কখনও পরাভক্তি লাভ হয় না।

"যেমন চন্দ্রমার আকর্ষণে সমুদ্রের জলরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে, উক্ত জোয়ার-প্রবাহ, সমগ্র নদ-নদী-খাল-নালা-বিলাদি পরিপূর্ণ করতঃ কত বন্ধ জলাশয়ের রুদ্ধতীর অতিক্রমপূর্ব্বক্ প্রবাহমান হইয়া থাকে, আবার সমুদ্রের আকর্ষণে অর্থাৎ ভাটার টানে, উক্ত নদ-নদী-খাল-নালা-বিল ও বন্ধ জলাশয়স্থিত জলরাশিকে সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত করে; তদ্রূপ সর্ব্বাকর্ষী শ্রীশ্রীলীলাপুরুষোত্তমের প্রবলাকর্ষণে, লীলাব্যূহরূপ পরব্যোম সমুদ্রে, হ্লাদিনী মহাশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে আনন্দোচ্ছ্বাসতরঙ্গের অভ্যুদয় হয়, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডনিকরে সঞ্চারিত হইয়া জীবসৌভাগ্যবর্দ্ধন লীলামূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক্ পরমোৎকর্ষময়ী আধ্যাত্মিক প্রবাহে, জীবের মন-বুদ্ধি-চিত্তেন্দ্রিসকল সুখ-রসপূর্ণ ও স্নেহার্দ্র করিয়া দেয় এবং তৎসহ কত অগণিত সংশয়-শুষ্ক ও সংসার-রুদ্ধ জীব হৃদয় উক্ত মহাকর্ষণময় ধর্ম্মস্রোতে ভাসমান্ হইয়া ক্রমশঃ তত্তৎ ভাব-রস-ধারার কেন্দ্রস্থলী পরব্যোমস্থিত লীলামণ্ডলে প্রবেশ করেন। আবার লীলাময়ে নবনবায়মান্ আনন্দ-বেগে তাঁহারই সহিত জগতে আসেন, এবং কিয়ৎকাল আনন্দরঙ্গে আনন্দের খেলা খেলিয়া, জগতে আনন্দ বিস্তারপূর্ব্বক্ আনন্দের

আকর্ষণে, প্রাক্তন কর্ম্মশীল শত শত নবযাত্রী সঙ্গে লইয়া পুনরায় আনন্দধামে প্রবেশ করেন। ইহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মচক্র বা লীলাচক্র বলা হইয়া থাকে। ইহা নিত্যধাম হইতে জগতে, আবার জগত হইতে নিত্যধামে অবিরত আনন্দবেগে ঘূর্ণায়মান্ হইতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেনঃ—"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দে জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি॥" অর্থাৎ "আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ হইতে প্রাণী সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, আনন্দে জীবন ধারণ করিতেছে, পুনরায় আনন্দরূপে ব্রহ্মে প্রবেশ করিতেছে।"

এস্থলে "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামক গ্রন্থ হইতে গোস্বামী-প্রভুর একটী বাক্য উদ্ধৃত ত করিতেছি—"নদীর জল যেরূপ একবার সাগরে যাইতেছে, আবার তথা হইতে মেঘরূপে আসিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছে। আমরাও সেই প্রকার এই স্রোতবেগে একবার পরমেশ্বরে ডুবিব, আবার পৃথিবীর নরনারীকে হৃদয় ঢালিয়া দিব। আমি কেবল সাগরে যাইব না, সাগরে যাইব, আবার মেঘ হইয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পড়িব। প্রকৃত ব্রহ্মচক্র, যোগচক্র এইরূপে ঘুরিতেছে।"

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের মর্ত্তলীলা হইতে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মের সংস্থাপন, মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন, পরাভক্তি বিতরণ, নিত্যসম্বন্ধযুক্ত লীলারসাস্বাদন এবং অবশেষে মধুর হইতে সুমধুর উন্নতোজ্জ্বল প্রেমানন্দরস-নিমজ্জনরূপ অর্থাৎ নিত্যরাসলীলামণ্ডলে প্রবেশরূপ জীবসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকটিত হইয়া থাকে। "রসো বৈ সঃ। রসোহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতী।" (শ্রুতি) অর্থাৎ তিনি (পরমেশ্বর) রসস্বরূপ। জীব এই রসময়কে লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।"

এই পঞ্চমপুরুষার্থের সাধন-প্রণালী বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাই, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রকে পাইয়া, তাঁহার নিকটে এই অপার্থিব বস্তুলাভের প্রার্থনা জানাইলে, তিনি তাঁহাদিগকে দ্বাপরযুগের ভাবী অবতারের জন্য অপেক্ষা করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন; এবং তদনুসারে তাঁহারা গোপীরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া, লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেমভক্তি লাভপূর্ব্বক, তাঁহাকে মধুরভাবে ভজনা করিয়া মানবজীবন সফল করিরাছিলেন। প্রমাণ যথাঃ—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন সুবিগ্রহং॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভুতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তো ভবার্ণবাৎ॥"

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুধৃত—পদ্মপুরাণের শ্লোক।

অর্থাৎ—"পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে মধুরভাবে উপাসনা করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে তাঁহারা দ্বাপরযুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ; এবং প্রেম-সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'কাম' শব্দটী প্রেমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ-ধৃত বৃহৎ গোতমীয় তন্ত্রোক্ত প্রমাণ,—

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥"

অর্থাৎ—"গোপরমণীদিগের পবিত্র প্রেমই 'কাম' এই আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি মহাত্মারাও ঐ প্রেম বাঞ্ছা করেন।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী 'লঘুভাগবতামৃত' গ্রন্থে ভক্ত-কবি বিল্বমঙ্গলের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"সন্ত্ববতারাঃ বহবঃ সর্ব্বতোভদ্রা পঙ্কজনাভস্য।
কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥"

অর্থাৎ—"পদ্মনাভ ভগবানের সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বহু অবতার আছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন অপর কে লতাদিকেও প্রেমদান করিতে সমর্থ ?"

উপনিষদে আছে –

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥"

অর্থাৎ—"আত্মাকে (পরমেশ্বরকে) বেদাধ্যয়ন, তীক্ষ্ণ মেধা অথবা বহুশ্রুতি স্মৃতি দ্বারা লাভ করা যায় না। তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই কেবল তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে তিনি আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'বৃণুতে' শব্দটী দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রোক্ত পুরুষার্থশিরোমণি মধুর-ভাবের কথাই সূচিত হইতেছে। এইভাবে, বৃতব্যক্তি ও বরণকারীর মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয় বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না। এইজন্য মধুর ভাবকে ভক্তিশাস্ত্রে দাম্পত্য-প্রণয়ের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

বহু যুগযুগান্তরের পরে সেই লীলারসবিগ্রহ শ্রীভগবান্, অপার করুণা-পরবশ হইয়া, গত দ্বাপরের শেষে শ্রীবৃন্দাবনধামে একবার মাত্র তাঁহার সেই ত্রিজগন্মনসাকর্ষী-রসলীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, তখন কেবলমাত্র গোপীগণই তাহা সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই দেবদুর্ল্লভ মুনি-জন-বাঞ্ছিত উন্নতোজ্জ্বলরস, স্বকীয় রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদি আস্বাদনচ্ছলে কলিহত জীবকে দান ও তাহার সাধনপ্রণালী শিক্ষা প্রদান করাই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, যুগ-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন ও হরিনাম-প্রচারাদি গৌণ।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" বিদগ্ধমাধব।

অর্থাৎ—"যে উন্নতোজ্জ্বল-রসাস্বাদ হইতে জীব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, সেই পরম বস্তু প্রদানার্থ করুণাপরবশ হইয়া কলিতে অবতীর্ণ, দিব্যোজ্জ্বল সুবর্ণকান্তি শ্রীহরি শচীনন্দন তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।"

এই পরম বস্তু পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেমভক্তি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত লোকই জগতে অতীব দুর্লভ, এবং উহা হৃদয়ে ধারণ ও সম্ভোগ করিবার অধিকারীর সংখ্যার অল্পতার ত কথাই নাই। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন গয়া হইতে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে এই প্রেমসম্পদ্ সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সেই প্রেমমহাসাগরের বাহ্য-তরঙ্গস্বরূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি দর্শন করিয়া নবদ্বীপবাসীর মহাভ্রম জন্মিয়াছিল; এবং তাহারা ঐ সকল সাত্ত্বিক বিকারকে বায়ুরোগের ক্রিয়া মনে করিয়া, মহাপ্রভুর রোগ উপশমের জন্য ডাবের জল ও শিবাঘৃতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন!

"খাইবারে দেহ ডাব নারিকেলের জল।
যাবৎ উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল।
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে॥"
শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়।

নবদ্বীপবাসীর ঈদৃশ ব্যবহারে মহাপ্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করার কথা পর্য্যন্ত তৎকালে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এ বিষয়ে চৈতন্যভাগবতে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি,—

"কেহ বলে মহা মহাবায়ু, বাঁধিবার তরে।
পণ্ডিত, তোমার চিত্তে কি লয় আমারে॥
হাসি বলে শ্রীবাস পণ্ডিত 'ভাল বাই'।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি পাই॥
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈল বড় সুখে॥
সকলে বলয়ে বায়ু, আশ্বাসিলা তুমি।
ইথে বড় কৃতকৃত্য হইলাও আমি॥
তুমি যদি বায়ু হেন বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুই গঙ্গার ভিতরে॥"

অতঃপর শ্রীবাস পণ্ডিত বহু শাস্ত্রপ্রমাণাদি দ্বারা নবদ্বীপবাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের ঐ সকল বিকার পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম-ভক্তির বাহ্য লক্ষণ, উহা বায়ুর ক্রিয়া নহে। তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্যে নবদ্বীপ-বাসীর ভ্রম ঘুচিল, এবং তদবধি তাঁহারা মহাপ্রভুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তিনিও নিঃসঙ্কোচে স্বীয় শক্তি বিকশিত করিয়া, তাঁহাদের সহযোগে হরিনামের বন্যায় দেশদেশান্তর প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন। নাম-মদিরায় সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিল। নামযজ্ঞ-ভূমি শ্রীবাস-আঙ্গিনা হইতে যে নামতরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল, উহার প্রবল প্রবাহ নবদ্বীপ ভাসাইয়া, শান্তিপুর ডুবাইয়া, বঙ্গদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া, বর্ষাকালীন সাগরগামী বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় যেন নীলাচলচন্দ্রে বিলীন হইবার বাসনায়, উৎকল অভিমুখে ধাবিত হইল। এই স্রোতের সম্মুখে যে পড়িল সে ডুবিল, যে দেখিল সে মজিল, যাহারা ভয় পাইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে উহাতেই দেহ ভাসাইয়া দিল, এবং অপর সহস্র সহস্র পাপী-তাপী সেই স্রোতে অবগাহন করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেল।

সপার্ষদ নবদ্বীপচন্দ্র নীলাচলে উদিত হইলেন। তথায় আর এক নব যজ্ঞভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল। পার্ষদবৃন্দ মহোল্লাসে অনবরত যজ্ঞাগ্নিতে হরি-নামের আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। উহার সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তনিচয় অকুল ভবসাগরের কুল পাইবার আশায়, দলে দলে আসিয়া নামমূর্ত্তি ভগবান্ গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি, পাত্রমিত্রসহ মহাপ্রভুর শ্রীপদে জন্মের মত বিকাইয়া গেলেন।

মহাপ্রভু এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ মহত্ত্ব, লোকোত্তর তেজস্বিতা, অপার জীব-বৎসলতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে বড় আর কাহারও সন্দেহ নাই। প্রবল-প্রতিভাশালী বৃহস্পতিতুল্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য, জগদ্গুরু শঙ্করোপম সন্ন্যাসী শিরোমণি প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিরুদ্ধবাদিগণ মহাপ্রভুর শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যে এখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু হায়! কি দুর্দ্দৈব! এ হেন সময়েও আবার জগদানন্দাদি কতিপয়

পরম ভক্তের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের-বিকারের প্রতি দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। শ্রীরাধাভাবে-ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ যখন প্রেমের সাধন ও তাহার ক্রমাদি, আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ-বিরহজনিত দশ দশা* প্রকটন করিয়াছিলেন, তখন সেই পরম গম্ভীর গম্ভীরা-লীলার রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অধিকাংশ ভক্তেরা উঁহাকে কঠিন বায়ুরোগের ক্রিয়াবিশেষ বলিয়াই সন্দেহ করিয়াছিলেন। এই বায়ুরোগ উপশম করিবার অভিপ্রায়ে, প্রিয়-ভক্ত জগদানন্দ গৌড়দেশ হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক্ ঔষধমিশ্রিত তৈল আনিয়া মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দকে দিলে, তিনি উহা মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিয়া বলিলেন—

"তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শান্ত হইয়া যায়॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু মহাপ্রভু উহা নিতান্ত উপেক্ষার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—

"প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥"
ঐ, অন্ত্যলীলা, ১২ পরিচ্ছেদ।

ভক্তপ্রবর জগদানন্দ এই তৈল গৌড়দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। যাঁহারা ইহা সংগ্রহ অথবা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, উহা আনিবার সময়ে যাঁহাদের সহিত তৈলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, এবং যাঁহারা উহা মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে মহাপ্রভুর দশম দশার অবস্থার প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা, তাঁহাদের সন্দেহ না হইলে, তাঁহারাই জগদানন্দকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিয়া, মহাপ্রভুর বায়ুর প্রকোপ নিবারণ করিবার জন্য তৈলদানের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক্, ইহার কিয়দ্দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে জগদানন্দ পুনরায় গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে উপনীত হইলে, তিনি নিম্নোক্ত তরজা লিখিয়া মহাপ্রভুকে দিবার জন্য জগদানন্দের হস্তে অর্পণ করিলেন,—

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

* দশ দশার কথা "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর" পশ্চিম বিভাগে ৩য় লহরীতে উক্ত হইয়াছে। তাহা যথাক্রমে এই—তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বশূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি।

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ—কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ মহাপ্রভুকে কহিও, যে সমস্ত লোক "বাউল"—উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে আরও কহিও যে, হাটে আর চাউল বিকাইতেছে না, অর্থাৎ, তাঁহার ভাব কেহ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল অর্থাৎ—তাঁহাকে আরও বলিও যে, আর প্রেম গ্রহণের অধিকারী নাই, এখন লালা-সংবরণ কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে ভক্তবৃন্দ এই তরজার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে আচার্য্য তন্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবে করে আবাহন।
পূজা নির্ব্বাহিন হইলে পাছে করে বিসর্জ্জন॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কত কঠোর তপস্যা, কত অসাধ্য সাধনা করিয়া যে মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ করাইলেন, সেই প্রাণের প্রাণকে হাতে পাইয়াও আজ তিনি কি কারণে এত অল্পদিনের মধ্যেই বিদায় দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তৎপ্রেরিত তরজা হইতেই উপলব্ধ হইবে। বস্তুতঃই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুর তরজা প্রেরণের অল্পকাল পরেই আত্মসঙ্গোপন করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছিলাম যে, প্রেমসম্পদ্ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিবার পাত্র জগতে অতীব দুর্ল্লভ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে মাত্র ৩॥ জন (রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাহাতি ও তাঁহার ভগিনী মাধবী দাসী) এই শক্তি ধারণ ও সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

"অন্তরঙ্গ সহিত করেন কৃষ্ণ রসাস্বাদন।
বহিরঙ্গ সহিত করেন নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

এই পরম বস্তুর কিঞ্চিৎ আস্বাদ মহাপ্রভুর অপরাপর কতিপয় বিশিষ্ট ভক্ত সাময়িকভাবে প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ ভক্তই নামানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা নামানন্দের অধিক মাধুরী এবং নামানন্দ অপেক্ষা প্রেমানন্দের মাধুরী ততোধিক। এই প্রেম গাঢ় হইলে মান, প্রণয়, ইত্যাদি রূপে আস্বাদনীয় হয়, তখন উহাকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বলে। মধুর ভাবেই প্রেম-বস্তু প্রকৃতরূপে আস্বাদনীয় হয়। এই মধুর ভাব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবজীবনের চরিতার্থতা লাভ হয় না।

"প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরী শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় কেবল মধুরে।
মহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকানিকরে॥" ইত্যাদি।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৩ পরিচ্ছেদ।

জীব ভগবৎপ্রসাদে ও গুরুকৃপায় মুক্ত হইলে শান্ত অবস্থা লাভ করেন। তখন তাঁহার পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে। এই সময়ে যদি বহু সৌভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হয়, তবে তাঁহার কৃপায় সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ ক্রম অনুসারে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অবস্থা সম্ভোগপূর্ব্বক, পরিশেষে মধুরভাবে প্রবেশ করতঃ পরাপ্রেম লাভ করিয়া মানবজীবন সফল করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিতভাবে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের ব্যাখ্যা ও ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন।

"শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুর রসে সব ভাব সমাহার।
অতএবাস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥"

বস্তুতঃ মহাপ্রভু শেষজীবনে যে সকল অত্যদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবসমূহ প্রকটন করিতেন, সূক্ষ্মদর্শী ভক্তিশাস্ত্রবিৎ রসজ্ঞ সাধক ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবারই ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা ঐ সকলকে বায়ুর-ক্রিয়া মনে করিবে—আশ্চর্য্যের বিষয় কি? মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থায় শ্রীবাস পণ্ডিত, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের এবং তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীমদ্‌রূপ-সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ ভক্তিবিশারদদিগের, মহাপ্রভুর ভাব, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সাধন প্রণালী অপর সাধারণকে বুঝাইবার ও বিশ্বাস করাইবার জন্য বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছিল; এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে ঐ সকলের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। তাই, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাস প্রভৃতি যখন শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে উন্মত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত স্বামিপাদদিগের কৃত গ্রন্থাদি পাঠে ও তাঁহাদিগের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম অতি অল্পায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও যে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এত সহজে মহাপ্রভুর তত্ত্ব, ধর্ম্ম ও সাধন-প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছেন তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত গোস্বামীপাদগণের বহু শাস্ত্র-প্রমাণাদি-সম্বলিত গ্রন্থরাজী। ঐ সকল গ্রন্থ না থাকিলে বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত একমত হইয়া মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলিতেন—

"শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী-শিষ্য, লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার, ভাবকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র, মহা ইন্দ্রজালী।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের তিরোধানের পর শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের প্রতি গৌড়দেশে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পিত হইলে, তাঁহাদের দ্বারা উক্ত ব্রত অতি সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর, উপযুক্ত গুরু বা আচার্য্যের অভাবে, নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়িয়া, মহাপ্রভুর সুনির্ম্মল সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবধর্ম্ম দিন দিন কলঙ্কিত হইতে লাগিল, এবং এই সুযোগে অসংখ্য চতুর শাস্ত্রব্যবসায়ী, অগণ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার অধর্ম্মের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, কিশোরীসাধক প্রভৃতি উপধর্ম্মীদিগের অসংখ্য দলে দেশ ছাইয়া ফেলিল। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইল। এমন সময়ে ভগবদ্বিধানে, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদরজ-ধূসরিত পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে, সর্ব্বশুভঙ্কর, দুর্নীতি-কলুষ-নাশন ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত লুপ্তপ্রায় সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্মের উদ্ধারকল্পে, তাঁহার 'অনর্পিতচরীং উন্নতোজ্জ্বল রস' প্রাক্তন কর্ম্মশীল সাধকবৃন্দকে প্রদান করিবার জন্য, ভাবী সদ্গুরু শ্রীমদ্বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-প্রভু শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতবংশে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কালক্রমে সেই পরম বস্তু ধারণ ও সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক, পাত্র-বিশেষে সাধনপ্রদান এবং পুনর্ব্বার এই কলিহত জীবের ঘরে ঘরে তারকব্রহ্ম শ্রীহরি নাম বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"পূর্ব্বোক্ত সাধন ও তাহার অধিকার-নির্ণয়মূলক কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—"এই সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, ৮৪ লক্ষযোনী ভ্রমণপূর্ব্বক জীব মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া প্রথমে সাত জন্ম ভুত প্রেতাদি অপদেবতার উপাসনা করে। তৎপরে সূর্য্য-উপাসনা তিন জন্ম ; গণেশ উপাসনা তিন জন্ম ; পরে শক্তি-উপাসনা একশত জন্ম করিয়া তিন জন্ম শিব উপাসনা করিলে এই অধিকার লাভ হয়।* তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

"এই সাধন প্রথম নারায়ণ ব্রহ্মাকে, তৎপরে ব্রহ্মা নারদকে দেন। এই প্রকার গুরু-প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর এই শক্তি। মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে তিন জনকে এই শক্তি দিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সাধন পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর সময়ের লোক। সকলেই এই শক্তির প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দেন নাই। তাহার কারণ এই যে, এই শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলে সংসারের লোক প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কিন্তু মহাপ্রভুর তখন সাধারণ ধর্ম্ম-প্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য ছিল। সেই সময়ে তাঁহাদের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়াছেন।

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়, নারায়ণ-নারদ সংবাদে ৯৫—১১২ শ্লোক

অনেকজন্মপর্য্যন্তং দীক্ষাহীনো ভ্রমেন্নরঃ।
তদন্যদ্দেবমন্ত্রঞ্চ লভতে পুণ্যশেষতঃ॥
সপ্তজন্মোপদেবানাং কৃত্বা সেবাং স্বকর্ম্মতঃ।
লভতে চ রবের্মন্তং সাক্ষিণঃ সর্বকর্ম্মণাং॥

এইবার তিনিই তাঁহাদিগকে সেই শক্তি দিলেন। যাঁহারা সাধন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মোপাসকদিগের কোন বিরোধ নাই।"*

এই সাধন কি বস্তু, তাহা বাহিরের কাহাকেও প্রকৃতরূপে বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই। ইহা সম্পূর্ণ অনুভূতিসাপেক্ষ। সদ্‌গুরুর কৃপায় ও ভগবৎ-প্রসাদে যাঁহার অন্তরে এই সাধন খুলিয়া যায়, কেবলমাত্র তিনিই বুঝিতে পারেন, ইহা কি বস্তু; নতুবা সাধারণের পক্ষে ইহার বাহিরের প্রক্রিয়া ভিন্ন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। তবে প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যোগবলে, যাঁহাদের মধ্যে এই শক্তি ক্রিয়া করে, তাহা জানিতে পারেন; কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন ঐ শক্তি লাভ করিবার অধিকার আদৌ জন্মে না।

১৩০০ সনের প্রয়াগধামের কুম্ভমেলায় যোগসিদ্ধ মহাত্মা অর্জ্জুনদাস বা ক্ষ্যাপাচাঁদ, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে এই শক্তির প্রার্থী হইয়াছিলেন। কৈলাস-পর্ব্বতবাসী ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা ময়ূর-মুকুট বাবাজী মহাশয় এই বস্তু প্রাপ্তির আশায়, কৈলাসনাথের আদেশে সর্ব্ববিধ যোগৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া

জন্মত্রয়ং ভাস্করঞ্চ নিষেব্য মানবঃ শুচিঃ।
লভেৎ গণেশমন্ত্রঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরং॥
জন্মত্রয়ং তং নিষেব্য নির্ব্বিঘ্নশ্চ ভবেন্নরঃ।
বিঘ্নেশস্য প্রসাদেন দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ॥
তদা জ্ঞান-প্রদীপেন সমালোচ্য মহামতিঃ।
অজ্ঞানান্ধতমং হিত্বা মহামায়াং ভজেন্নরঃ॥
বিষ্ণুমায়াঞ্চ প্রকৃতিং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীং।
নানারূপাং তাং নিষেব্য জন্মনাং শতকং নরঃ॥
তৎপ্রসাদাৎ ভবেদ্‌জ্ঞানী জ্ঞানানন্দং সদা ভজেৎ
কৃষ্ণজ্ঞানাধিদেবঞ্চ মহাজ্ঞানং সনাতনং॥
শিবং শিবস্বরূপঞ্চ শিবদং শিবকারণং।
জন্মত্রয়ং সমারাধ্য চাশুতোষপ্রসাদতঃ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পশ্যতি।
দয়ানিধেঃ প্রসাদেন শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বরদস্য বরেণৈব হরিভক্তিং লভেৎ ধ্রুবং॥
তদা নিবৃত্তিমাপ্নোতি সারাৎসারাং পরাৎপরাং।
যত্রদেহে লভেন্মন্ত্রং তদ্দেহাবধি ভারতে॥
তৎপাঞ্চভৌতিকং ত্যক্ত্বা বিভর্ত্তি দিব্যরূপকং।
করোতি দাস্যং গোলোকে বৈকুণ্ঠে বা হরেঃ পদম্
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তৎ স্পর্শপূতস্তার্থোয়ঃ সদ্যপূতা বসুন্ধরা॥"

কৈলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোস্বামী-প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুর মধ্যে এই পরম বস্তুর প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনবাসী পরমভক্ত সিদ্ধ ৺গৌর শিরোমণি মহাশয় প্রভুপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"প্রভু! আপনি এ জিনিস পেলেন কোথায়? আমি সমগ্র গৌড়মণ্ডল ও ব্রজভূমি অনুসন্ধান করিয়াও ইহা কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। ক্বচিৎ কোন স্থানে দুই এক জনের নিকটে ইহার ছিটাফোঁটা যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা আবার তাঁহারা কৃপণের ন্যায় কাহাকেও দান করেন না। অতএব প্রভু! আপনি উহা আমাকে প্রদান করুন। আমাকে আর প্রতারণা করিবেন না। এই বিশেষ শক্তি ভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলীলা সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মে না।"* বারদীর যোগসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় এক সময়ে গোস্বামী-প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"গোঁসাই, তুমি এ কি করিতেছ? ঋষি-মুনিদিগের কলিজাব (হৃদয়ের) ধন তুমি যাকে তাকে দান করিতেছ!" উত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"কি করিব? যাঁর শক্তি তাঁরই আদেশে দান করিতেছি, আমি নিমিত্ত মাত্র।"†

পূর্ব্বকথিত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম-ভক্তি যিনি প্রদান করিবার শক্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম-গুরু অথবা গুরু-ব্রহ্ম বলে। ভগবানের অবতার-গ্রহণ-সম্বন্ধে যে নিয়ম,—অর্থাৎ এক সময়ে এক ভিন্ন অবতার হন না,—ব্রহ্ম-গুরুও তদ্রূপ এক সময়ে একজন ভিন্ন দুইজন আবির্ভূত হন না। "সিদ্ধ বা মহাপুরুষ হইলেই ব্রহ্ম-গুরু হয় না। তাঁহারা জীবকোটী, ভগবানের আবেশ, তাঁহাদের দেহ ভিন্ন। আর ব্রহ্ম-গুরু ব্রহ্মকোটী, স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দেহ ও তিনি এক।"*

এই ব্রহ্ম-গুরু অথবা সদ্‌গুরুর অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

"দুর্ল্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্ ॥
গ্রামে বা যদি বাঽরণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাৎ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপ-ক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তেতু সদ্‌গুরৌ ॥"

দ্বিতীয় বিলাস, ১৫—১৬।

* গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।
† গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।
* গোস্বামী-প্রভুর উক্তি।

অর্থাৎ—"সদ্‌গুরুর সঙ্গ অতিশয় দুর্ল্লভ। একবার তাঁহার সঙ্গ উপস্থিত হইলে, তিনি যখন আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তাহাই দীক্ষার প্রশস্তকাল জানিবে। গ্রামে, বনে কিম্বা ক্ষেত্রে, দিবসে কিম্বা রজনীতে, যখনই দৈববশে গুরুদেব আগমনপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তখনই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। সদ্‌গুরুর ইচ্ছা হইলে তীর্থ, ব্রত, স্নান, হোম, জপক্রিয়া প্রভৃতি আর দীক্ষার কারণ হইবে না, অর্থাৎ সদগুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ।"

সদ্‌গুরুর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীসদাশিবের উক্তি,—

"বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধ্বা জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥
চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে।
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠিতঃ॥
যস্য কর্ণপথোপান্ত প্রাপ্তো মন্ত্রমহামণিঃ।
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে॥
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টো মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ॥
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ॥
দানৈঃ কিং জপৈ হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
বয়ং অক্ষয় তৃপ্তাঃ স্মঃ মৎপুত্রস্যাস্যসাধনাৎ॥"

তৃতীয় উল্লাস, ১৫-২১ শ্লোক।

অর্থাৎ—"বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি জীব সদ্‌গুরু লাভ করেন, তবে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে তৎক্ষণাৎ জন্ম সফল হয়। সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ হস্তগত করিয়া, ইহলোক এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন। সদ্‌গুরুর মুখ হইতে ব্রহ্মমন্ত্র মহামণি যাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থস্নাত। সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত। হে শিবে! যিনি সদ্‌গুরু হইতে ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা ধন্য, পিতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র। তাঁহার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করেন, এবং তাঁহারা পুলকিত শরীরে এই গাথা গান করেন—'আমাদের কুলে উৎপন্ন পুত্র সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছেন, আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদানে আর

আবশ্যক কি? হোমেই বা প্রয়োজন কি? অন্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি? আমাদের কুলপাবন পুত্র সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণরূপ যে সাধনা করিল, তাহাতেই আমারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

সদ্‌গুরু-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে গুরুগীতায় উল্লিখিত হইয়াছে,—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শ্রীসদাশিব কহিলেন,—"হে দেবি! বিশ্বধামে শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরুর সংখ্যা নাই, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ দূর করিতে পারেন, ঈদৃশ গুরু অতি দুর্ল্লভ।"

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমমলং সর্ব্বদা সাক্ষীভুতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥" গুরুগীতা।

যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ আনন্দময়, পরমসুখপ্রদাতা, জ্ঞানমূর্ত্তি, সুখদুঃখ পাপপুণ্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত, আকাশবৎ নিৰ্ম্মল, যিনি "তত্ত্বমসি" এই বেদ-বাক্যের প্রতিপাদ্য দেবতা; যিনি অদ্বিতীয়, নিত্য, বিমল, অমল, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ, ভাবাতীত ও ত্রিগুণাতীত, সেই সদ্‌গুরুকে নমস্কার করি।"

এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আমরা সচরাচর যে সকল সাধু মহাত্মা ও কুল-গুরু মহাশয়দিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা কি কোন কার্য্য হয় না? এমন কথা কখনই হইতে পারে না। এই সকল মহাত্মারা ব্রহ্ম-গুরুরূপী ভগবানের কার্য্যেরই সহায়তা করিয়া থাকেন। যেমন কোন বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকগণ, তাঁহাদের অধীনস্থ ছাত্রগণকে তত্তৎ শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষকগণের হস্তে অর্পণ করেন, এইরূপে ক্রমে উক্ত বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, প্রধান শিক্ষক তাহাদিগকে তদপেক্ষাও উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য কোন উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন; তদ্রূপ এই সকল গুরুরূপী নারায়ণগণও আপন আপন সামর্থ্যানুসারে শিষ্যগণকে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিয়া, অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বিশ্বপ্রেমরাজ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য, সদ্‌গুরুরূপী বিশ্বেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত সাধু মহাপুরুষগণই ধৰ্ম্মরাজ্যে প্রবেশের পথপ্রদর্শক। ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কেহই ধৰ্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঢাকা একরামপুরে 'ধুলট' উৎসব। গেণ্ডারিয়া আশ্রম স্থাপন। শ্রীমৎ যোগজীবন ও শ্রীমতী শান্তিসুধার বিবাহ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত গোস্বামী-প্রভুর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন।

গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী পুত্রকন্যাদিসহ এযাবৎ ঢাকায় প্রচারক-নিবাসেই বাস করিতেছিলেন। এদিকে গোস্বামী-প্রভু কলিকাতা হইতে স্বীয় গুরুদেবের আদেশে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে উক্ত সমাজের সংস্রব-পরিত্যাগসূচক এক পত্র লিখিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে পৃথক্ পত্র দ্বারা প্রচারক-নিবাস পরিত্যগ করিতে উপদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি সে স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পাতলাখাঁর গলিস্থিত একটী বাটীতে গমন করেন, এবং তথায় ২/৪ দিন থাকিয়া একরামপুরের ২৪নং বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুও কলিকাতা হইতে ঢাকায় আগমনপূর্ব্বক, আর প্রচারক-নিবাসে পদার্পণ না করিয়া, একরামপুরের বাসাতেই উপস্থিত হইলেন; এবং এই স্থানে অবস্থান করিয়া শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃসঙ্কোচে স্বীয় অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মযাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের লোক সর্ব্বদাই গোস্বামী-প্রভুর নিকট যাতায়াত করিতেন। উৎসবাদির সময়ে মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ ঢাকায় আসিয়া, সমাজের উপাসনার পরে দলে দলে গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক, তাঁহার সুমধুর প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মকথা শুনিয়া প্রাণ মন জুড়াইয়া যাইতেন।

একরামপুরে গোস্বামী-প্রভুর বাসভবনের নিকটে একটী কদম্ব বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে যে, কোন সময়ে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র প্রভুপাদ বীরভদ্র গোস্বামী এই বৃক্ষমূলেই একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানটী 'বীরভদ্রের আসন' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গোস্বামী-প্রভু অনেক সময়ে এই বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন।

এই বৎসর মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে গোস্বামী-প্রভু একরামপুরস্থ স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন। এই

উৎসবকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'ধুলট' উৎসব বলিয়া থাকেন। উৎসবের শেষদিন বৈষ্ণবগণ নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হইয়া, পরস্পরের গাত্রে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক আনন্দ করিয়া থাকেন। এই ধূলি-বর্ষণ হইতেই 'ধুলট' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরম দয়াল শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে ও পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ঐ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাঘী-পূর্ণিমাতে কাঞ্চননগরে (কাটোয়ায়) শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই পরম পবিত্র দিনত্রয়ের স্মরণার্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'ধুলট' উৎসব করিয়া থাকেন। অদ্বৈত-প্রভুর জন্মোপলক্ষে শান্তিপুরে, নিতাইচাঁদের জন্মোপলক্ষে শ্রীপাট অম্বিকা-কালনায এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে ও কাটোয়ায় প্রতি বৎসর 'ধুলট' হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া এইবার প্রথম গোস্বামী-প্রভু ঢাকা সহরে 'ধুলট'-উৎসব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একরামপুরের ভগবদ্ভক্ত ৺বঙ্কুবিহারী দাস ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মালাকর মহাশয়েরা অতীব আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে উৎসবের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দিন প্রাতে অনুমান ৮ ঘটিকার সময়ে এক বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির করা হইয়াছিল। কীর্ত্তনে নিম্নলিখিত গানটী গীত হইয়াছিল—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

"হরি ব'ল্‌ব মুখে, যা'ব সুখে ব্রজধাম।
কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম॥
এ নাম শিব জপেছেন পঞ্চমুখে,
নারদ করেন বীণায় গান।
এবার গুরুনামে দিয়ে ডঙ্কা,—
রাধানামে দাও বাদাম॥"
(কলিতে তারকব্রহ্ম হরিনাম।)

মৃদঙ্গ-করতালের সুমধুর ধ্বনি সহ এই গান করিতে করিতে নামরসে উন্মত্ত ভক্তমণ্ডলী যখন মহাভাবে মাতোয়ারা গোস্বামী-প্রভুকে বেষ্টনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কদমতলাতে উপস্থিত হইলেন, এবং চতুর্দ্দিক হইতে হরিনামের জয়ধ্বনি উচ্চনাদে সমুচ্চারিত হইতে লাগিল, তখন উপস্থিত অনেকের মনে হইতে লাগিল,—চারিশতবর্ষ পরে আবার বুঝি শচী মায়ের অঞ্চলের নিধি নিমাইচাঁদ সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া কলিকলুষনাশন সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোস্বামী-প্রভু প্রথমে রাজপথে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়াই দুই হস্তে ধূলি লইয়া 'জয় সীতানাথ' 'জয় সীতানাথ' বলিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ ধূলির সংস্পর্শে উপস্থিত সকলের মধ্যেই এক অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহারা উন্মত্তবৎ হুঙ্কার গর্জ্জন ও ধূলি উৎক্ষেপনপূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু প্রতি পদবিক্ষেপেই সমাধিস্থ হইয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বহু সংকীর্ত্তনের দল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে যোগদান করিল। প্রাণ-উন্মাদকারী খোল করতালের উচ্চধ্বনিতে ও তারকব্রহ্ম হরিনামের সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত ও ঢাকা সহর টল্‌মল্ করিতে লাগিল। গোস্বামী-প্রভু ভাবাবেশে দুই বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক প্রেমদাতা নিতাইচাঁদের ন্যায় হেলিয়া-দুলিয়া, নাচিতে নাচিতে উপস্থিত নরনারীকে নামামৃত বিলাইতে লাগিলেন। তিনি যখন যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন সেই দিকের লোকসমূহ ভাবতরঙ্গে মাতিয়া উঠিতে লাগিল! এই দিন ঢাকা সহরের উপর দিয়া হরিনামের এমন এক প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছিল, যাহাতে হাবুডুবু খাইয়া বহু লোক দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। এমন কি, যে পথ দিয়া কীর্ত্তন গিয়াছিল, উহার উভয়পার্শ্বস্থ বাটীসমূহের স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত ভাবে উন্মাদিনী হইয়া, চীৎকার করিতে করিতে, কেহ জানালা দরজা ভগ্ন করিয়া, কেহ বা ছাদের উপর হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক কীর্ত্তনের মধ্যে আগমন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন! তখন তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনগণ অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই মহাসংকীর্ত্তন সূত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙ্গালা বাজার, পাটুয়াটুলী, শাঁখারি বাজার এবং লক্ষ্মীবাজার ঘুরিয়া অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় সময়ে এক্‌রামপুরে উপস্থিত হইল। এই সময়ে শ্রীহট্টবাসী জনৈক অন্ধ বাবাজী (কীর্ত্তনীয়া) গান ধরিলেন—'নগর ভ্রমণ ক'রে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে।' এই বিচিত্র ভাবোন্মাদকারী নগর-কীর্ত্তনে স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার মিত্র নামক জনৈক চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক (ইঁনি পরে গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন) হরিনামের তীব্র মদিরায় উন্মাদ হইয়া, কিছুদিন পর্য্যন্ত পথে-পথে হরিধ্বনি করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই অবস্থায় ইঁনি উন্মাদের ন্যায়, 'কৃষ্ণ কৈ ? হা কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ! কৃষ্ণকে এনে দিলি না ?—ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক কখনও ক্রন্দন, কখনও বা অসহ্য যন্ত্রণাসূচক ভাব প্রকাশ করিতেন। আবার, কোন কোন সময়ে একটী প্রাচীন মন্দিরের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক আপন মনে গান করিতেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে পুরাতন মন্দিরের চুড়া আশ্রয় করিয়া যে সকল শুক (টিয়া) পক্ষী বাস করিত, তাহারাও ভয়-উদ্বেগ-বিবর্জ্জিত হইয়া,

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমারের সুমধুর গানে আকৃষ্ট হইয়া, নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বসিয়া গান শুনিত! গোস্বামী-প্রভু তাঁহার এই সকল অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—"এ'র অবস্থা খু'লে গেছে! এখানে বৈষ্ণব-মণ্ডলী থাকিলে একে কত আদর-যত্ন করিতেন—ইত্যাদি।" অপর একটী অল্প-বয়স্ক বালক কীর্ত্তনের ভাবাবেশে ১০।১২ ঘণ্টা কাল সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় থাকায়, তাহার মাতা পিতা ভীত হইয়া গোস্বামী-প্রভুকে সংবাদ দিল। তখন তিনি তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্পর্শমাত্র ছেলেটির চৈতন্য সম্পাদন করিয়া আসিলেন। এই দিবসের কীর্ত্তন সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "আজ যখন আমরা কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হই, তখন দেখিলাম, দলে-দলে দেববৃন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক আমাদের কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। ইহার পরের কীর্ত্তনের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি।"* এই মহা-সংকীর্ত্তন-উৎসবে ঢাকাবাসী ব্রাহ্ম ও হিন্দুগণ গোস্বামী-প্রভুর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ঢাকা সহরে একটী আকস্মিক দৈব উৎপাত উপস্থিত হইয়া সহর বিধ্বস্ত ও সহরবাসীকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন (১২৯৪ সন, ২৬শে চৈত্র, শনিবার) অপরাহ্নে নবাব সাহেবের প্রাসাদের সম্মুখে অকস্মাৎ একটি প্রবল ঘূর্ণীবায়ু (Tornado) উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ বুড়ীগঙ্গার জলরাশি আলোড়িত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ হইতে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় একটী জলস্তম্ভ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া আকাশের কোলে মেঘের সহিত মিলিত হইল, এবং উহা হইতে অসংখ্য অগ্নিগোলা ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়কাণ্ড করিয়া তুলিল। ২০।২৫ খানা রেলগাড়ী এক সময়ে চলিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেই প্রকার ভীষণ শব্দে সহরটিকে কাঁপাইয়া তুলিল। গোস্বামী-প্রভু ঐ শব্দ শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত গৃহের বহির্ভাগে আগমন করিলেন, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক, করযোড়ে নমস্কার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে—"জয় মা কালী! দয়া কর দয়াময়ি! প্রসন্ন হও; জয় মহাবীর! জয় মহাবীর! ঐ সব অগ্নিগোলা আমার বুকে নিক্ষেপ কর, আর সকলকে রক্ষা কর"—ইত্যাদি প্রকার মহাকালী ও মহাবীরের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্তব করিবার পরই ঘূর্ণীবায়ু আকাশে মিলিয়া গেল, উপদ্রবেরও শান্তি হইল। এই ঘূর্ণীবায়ুতে বহু গৃহ অট্টালিকা ভগ্ন, অনেক লোকের প্রাণনাশ, এবং নদীবক্ষে বিস্তর নৌকা জলমগ্ন হইয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। আবার বহু শিশু বালক, গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ এই ঘূর্ণীবায়ুর মধ্যে পড়িয়াও আশ্চর্য্য-রূপে রক্ষা পাইয়াছিল। নবাব সাহেবের প্রাসাদের উপরই যেন ইহার প্রকোপ

* রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। প্রাসাদের অন্তর্গত রঙ্গমহলটীকে একেবারে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছিল। জড় শক্তিতে ভগবদিচ্ছায় চিৎশক্তির আবির্ভাব হইলে, তদ্দ্বারা যে নিতান্ত অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, এইঘটনাটি তাহার একটী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ঝড় থামিয়া গেলে গোস্বামী-প্রভু এইরূপ বলিলেন যে, তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, মহাকালী ও মহাবীর ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া গভীর গর্জ্জনে দিগন্ত কাঁপাইয়া অসংখ্য অগ্নিগোলা নিক্ষেপপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এবং ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি কালিকা দেবীর সঙ্গিণীগণ সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন, তাহাই লণ্ডভণ্ড করিয়া ভীম গতিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। আজ তিনি ঐ ভাবে স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত না করিলে আর রক্ষা ছিল না। কোন কোন পাপের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহারা আজ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর, গোস্বামী-প্রভু তদীয় ঢাকাবাসী শিষ্যমণ্ডলীর একান্ত অনুরোধে, গেন্ডারিয়ার নির্জ্জন প্রান্তে একটি আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক, ১২৯৫ সনের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে তথায় প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আশ্রমস্থ একটি প্রাচীন আম্রবৃক্ষতলে গোস্বামী-প্রভুর নির্জ্জন সাধনের জন্য দুইটি প্রকোষ্ঠযুক্ত মৃত্তিকা-প্রাচীর-বেষ্টিত একখানি ভজন-কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও প্রস্থে ৮ হাত মাত্র এবং দক্ষিণদ্বারী। উহার এক প্রকোষ্ঠ গোস্বামী-প্রভুর নির্জ্জন সাধন ও অপর প্রকোষ্ঠ শাস্ত্রপাঠ, কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ভিন্ন আশ্রমবাসীদিগের বাসের জন্য দুইখানি গৃহ, একটী পাকা কোঠা, একখানি ভাণ্ডার ঘর ও একখানি পাকের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে তদীয় সাধন-কুটীরের উত্তর দেয়ালের বহির্ভাগে একটি নিশান চিত্রিত করিয়া তদুপরে 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ' এই নাম, এবং কুটীরের অভ্যন্তরে ঐ দেয়ালের গাত্রে নিম্নলিখিত উপদেশ কয়েকটি চা-খড়ি দ্বারা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

১। এইছা দিন নেহি রহে গা।

২। আত্মপ্রশংসা করিও না।

৩। পরনিন্দা করিও না।

৪। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনদিগের আচরণের সহিত যাহা মিলিবে না, তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

গোস্বামী-প্রভুর স্মৃতি-চিহ্ন লইয়া যত স্থান ধন্য হইয়াছে, তন্মধ্যে গেণ্ডারিয়া আশ্রম লীলা-গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। এই স্থানে নিখিল জগতের যাবতীয় সাধন-সমুদ্র-মন্থিত, অপূর্ব্ব স্থির-গাম্ভীর্য্য-বিজড়িত, অথচ উদ্দাম-রসোল্লাসস্ফুরিত বিচিত্র লীলারাজী প্রকটিত হইয়াছিল। এইস্থানে যাহা হইয়া গিয়াছে, কি অতীত কি বর্ত্তমান কোন যুগেই তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদিকে প্রভুজীর ভক্তমণ্ডলীযুক্ত গৃহস্থালী, অন্যদিকে সেই সহকার-তরুমূলে যোগেশ্বরাসন; একদিকে সংসারের হাস-বিলাস, আনন্দ-কৌতুক, অপর দিকে নির্ব্বাত দীপশিখাবৎ স্থির নিশ্চল যোগ-সমাধি! এমন যোগ ও ভোগের, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের, আনন্দ ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রিত ভাব-বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব অবিসংবাদিত সম্মিলন এ জগতে আর কোথাও কোন যুগে কেহ দেখিয়াছেন কি? কাহার সহিত ইহার তুলনা করিব? শ্রীহর-গৌরী-বিলসিত কৈলাসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না; যেহেতু কৈলাস দুরধিগম্য, সাধারণ লোক-চক্ষুর অগোচর, বিশেষতঃ পার্ষদ-গৌরবেই লীলার বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়া থাকে। কৈলাসের অধিবাসী সকল ভূতপ্রেত এবং পার্ষদমন্ডলী ঋষি ও সন্ন্যাসীবৃন্দ; সুতরাং উহা আমাদের মত ক্ষীণপুণ্য ও হীনমতি জীবের এবং বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা ও রুচির অনুরূপ আদর্শ নহে। জনকপুরী মিথিলার সহিতও ইহার তুলনা হইতে পারে না, যেহেতু সে রাজপুরী, আর এ যে কপর্দ্দকশূন্য পর্ণকুটীর। তবে কি চিত্রকূট? না, তাহাও নহে। তথায় মৌলীমুকুটধারী সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী ব্রহ্মচারী, পার্ষদ ভীল, কোল প্রভৃতি বন্য জাতি; আর এই গেন্ডারিয়া আশ্রমে প্রভুজী একাধারে ভোগ-পুরন্দর, তবুও যোগীরাজেশ্বর; প্রভুজীর গৃহস্থাশ্রমে স্থিতি, কিন্তু আকাশ-বৃত্তিতে গতি। এইস্থানে একদিকে তাঁহার স্নেহপ্রীতির পুত্তলী পুত্র কন্যা পরিবার ও শিষ্যমণ্ডলী, কাহারও প্রতি তিনি উদাসীন নহেন, সকলেই তাঁহার ব্যবহার-পুষ্ট স্নেহে ভরপুর হইয়া মনে করিতেছেন, প্রভুজী আমাকে যেমন ভালবাসেন, এমন কেহ বাসেনা, বাসিতেও পারে না—এই যে সমবাৎসল্যান্বিত আচরণ, ইহা তাঁহার সর্ব্বত্র ও সদাকালোচিত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—অন্যদিকে নিত্য নিয়মিত পাঠ-প্রসঙ্গ, কীর্ত্তন-নর্ত্তন, ভাব-দশা, ধ্যানসমাধি। সহৃদয় পাঠক! একবার কল্পনার চক্ষে স্থিরচিত্তে এই দুইটি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ভাব-রসের একত্র সমাবেশ চিন্তা করিয়া দেখুন। ইহার সেবক বা পার্ষদমণ্ডলী কাহারা? বর্ত্তমান যুগের চিহ্নিত উচ্চশিক্ষিত তেজস্বী ভদ্র সন্তান সকল। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি, আভিজাত্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বিষয়-ব্যবহার-নিপুণ গৃহী, উকিল-মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার, রাজ-কর্ম্মচারী, জমিদার ইত্যাদি। সহরের উপকণ্ঠে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সপক্ষ বিপক্ষ নিত্য সহস্র চক্ষু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রভুজীর প্রতিকার্য্য বিচার-দৃষ্টিতে দর্শন

করিতেছে। সুতরাং এই আশ্রমের ভাব ও রসপ্রবাহের সহিত কি অতীত, কি বর্ত্তমান, কোন যুগেরই উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের অতুলন প্রভুর তুলনা প্রভুই বটেন।

এই গেণ্ডারিয়া আশ্রমের প্রতিবেশী ভক্তমণ্ডলী যেমন এক পরিবারের মত স্বাভাবিকভাবে প্রভুসহ বাস করিয়াছিলেন—ইহাঁদের ঘরকন্না ক্রীড়াকোন্দল সমস্তই প্রভুকে লইয়া—এইরূপ সৌভাগ্য অন্যত্র অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল। গেণ্ডারিয়ার নর-নারী প্রভুজীর সোহাগ-গৌরবে তৎকালীন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে স্ফীত-বক্ষে বিচরণ করিতেন। জানিনা ইহা প্রভুজীর গুণে, কি উঁহাদেরই গুণে। সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া গেণ্ডারিয়াবাসীর চক্ষু অদ্যাপি অশ্রু-সিক্ত হইয়া থাকে।

/এই আশ্রমে শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, গোস্বামী-প্রভু দিবানিশি সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিবর্গ দলে দলে এই স্থানে আগমন করিয়া, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সাধন ও উপদেশাদি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, বহু স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-ভক্ত-গণও সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে উপস্থিত হইতেন।

আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় ছিল না। সাধারণ গুরুর ন্যায় গোস্বামী-প্রভু দীক্ষার বিনিময়ে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এইরূপ ;—"গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে কোন দান প্রতিদান নাই। উহা অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে বা অন্য অভিভাবক জ্ঞানে, কিংবা পথের অন্ধকে দানের ন্যায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হন।" তাঁহার এই নিয়ম না জানিয়া একবার একটী শিষ্য দীক্ষান্তে গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ কয়েকটী টাকা প্রদান করাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি সামান্য জীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব। আমার কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকে যে, আমি যাঞা কচ্ছি, তাহ'লে আমার ত্রুটী হ'য়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে যিনি টাকা দেন ও যিনি গ্রহণ করেন উভয়েই নরকগ্রস্ত হন।"

অযাচিত দান দ্বারাই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। অতিথি অভ্যাগত, দর্শক-উপাসক প্রভৃতি যখনই যাঁহারা উপস্থিত হইতেন, সকলেই আশ্রমে আহারাদি করিতেন। গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী, তাঁহার শ্বাশুড়ী ও শিষ্যগণ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইতেন। অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা অত্যধিক হইলেও আশ্রমের কখনও অন্নাভাব হয় নাই। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,——

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং ॥"

অর্থাৎ—"যাঁহারা অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই চিন্তা করেন, সর্ব্বদা আমার উপাসনাতেই নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগের যোগ (আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির) ও ক্ষেমের (তাহা পরিরক্ষণের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার) ভার আমিই বহন করিয়া থাকি।" গোস্বামী-প্রভুর জীবনে উক্ত শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক সাধুর জীবনেই তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধেও গোস্বামী-প্রভু যেরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে আর কোন মহাত্মা দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। গোস্বামী-প্রভু শৌচাদিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, সাধন, ভজন, আহার—ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই নিয়মিতরূপে—'ঘড়ি ধরিয়া' সম্পন্ন করিতেন।

তাঁহার আশ্রমে নিত্য পঞ্চ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। এ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ এইরূপ :—"গৃহস্থদিগের প্রত্যহ পঞ্চ-যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়। ইহা ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। ইহা যে না করে তাহার ধর্ম্ম হয় না। যে গৃহে ইহা না থাকে সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। পঞ্চ-যজ্ঞ—যথা দেব-যজ্ঞ (উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদি), ঋষিযজ্ঞ (শাস্ত্রাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ), পিতৃযজ্ঞ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধতর্পণাদি অথবা তাঁহাদের নামে কিছু কিছু দান), প্রাণীযজ্ঞ (পশুপক্ষী-দিগকে তাহাদের উপযোগী কিছু কিছু আহার ও বৃক্ষলতাদিকে জল দান) ও আত্মযজ্ঞ অথবা মনুষ্যযজ্ঞ (মনুষ্যমাত্রকেই যথাসাধ্য দান)।"

গোস্বামী-প্রভু অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক আশ্রমস্থ পক্ষীদিগকে স্বহস্তে চাউল ইত্যাদি আহার্য্য বস্তু প্রদান করিতেন। পরে স্বীয় সাধন-কুটীরে গিয়া ভজন করিতেন। কিয়ৎকাল সাধন করিয়া চা-পান করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকল্পে যশোহর, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বহু অস্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করাতে দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া, চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি প্রত্যহ প্রাতে একবারে করিয়া চা-পান করিতেন। চা-পান শেষ হইলে, গেণ্ডারিয়াবাসী শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় (ঢাকা, কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক) কুটীরে তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা পাঠ করিতেন। গোস্বামী-প্রভু পাঠ শুনিতে শুনিতে দুই হস্তে করধারণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে স্বীয় গুরুদত্ত নাম সাধন করিতেন। এই সময়ে তাঁহার বদনারবিন্দ ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, দৃষ্টি স্থির নিশ্চল হইয়া যাইত, এবং অধরকোণে অপূর্ব্ব মাধুরীময় হাসি ফুটিয়া উঠিত। এই অবস্থায় তিনি অনেক সময়ে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। যখন সমাধি-সাগরের অবিরাম অন্তর্ম্মুখীন

স্রোতবেগে তদীয় কমল-নয়ন-যুগল ধীরে ধীরে অস্তোম্মুখ রবির ন্যায় নিমীলিত হইয়া যাইত, তখন মস্তকটী মৃত-মনুষ্যের ন্যায়, কখনও বক্ষোপরে বিলম্বিত, কখনও বা স্কন্ধোপরে, দক্ষিণে বামে হেলিয়া পড়িত। এই সমাধি-সাগর-নিমজ্জিত, নীরব-নিস্পন্দ স্থির-ধীর সৌম্য-শান্ত মূর্ত্তি যখন যে স্থানে বিরাজ করিত, তখন সেই স্থানটী এক অপার্থিব গভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত,—তথায় বস্তুতঃই তৎকালে সংসারের কোলাহল প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না, ঋষি-শক্তির এক অপূর্ব্ব স্পন্দনে সমাগত সরল-তৃষিত-চিত্ত 'নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার' ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া পড়িত। শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবুর পাঠ শেষ হইলে, গোস্বামী-প্রভু স্বয়ং গুরু নানকজীর গ্রন্থসাহেব, মহাত্মা তুলসীদাসের হিন্দি রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্র অপূর্ব্ব সুর করিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার সেই মহা আকর্ষণময় অমৃত-শীতল-স্নিগ্ধতাপূর্ণ শাস্ত্রপাঠ যিনি শ্রবণ করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এমন কি, বনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত ভয়োদ্বেগ-বিবর্জ্জিত হইয়া নিকটে বসিয়া নিবিষ্টমনে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিত।* একাদশ ঘটিকার সময়ে পাঠ শেষ করিয়া স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। অতঃপর উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগত ও শিষ্যাদিগের সহিত (তৎকালে) এক পংক্তিতেই হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে মুখবাস গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেন। সুস্থ শরীরে দিবসে তিনি কখনও নিদ্রা যাইতেন না। বিশ্রামান্তে তিনি স্বীয় সাধনকুটীরের সমীপবর্ত্তী আম্রবৃক্ষের নিম্নে যোগাসনে উপবেশন করিয়া সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হইতেন, কখনও বা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। অপরাহ্ণে এই স্থানে তাঁহার নিকটে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি সমবেত হইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রাদি পাঠে অতিবাহিত করেন কেন, এই কথা এক দিন তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাহিরের সহিত যোগ রাখিবার জন্যই তাঁহাকে এত অধিক সময়ে পাঠাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, নচেৎ আভ্যন্তরিক আকর্ষণে আত্মস্থ করিয়া তাঁহার বাহিরের কার্য্যকলাপাদি বন্ধ করিয়া দেয়।

ভগবৎ নাম-শক্তিজনিত এই আভ্যন্তরিক আকর্ষণ সম্বন্ধে তিনি একদিন

---

* শ্রীবৃন্দাবনে ও পুরীধামে কয়েকটী বানরকে গোস্বামী-প্রভুর পাঠের সময়ে প্রত্যহই তাঁহার আসনের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থানপূর্ব্বক পাঠ শ্রবণ করিতে তাঁহার শিষ্যরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গেণ্ডারিয়া আশ্রমের যে আম্রবৃক্ষের তলাতে গোস্বামী-প্রভু পাঠপ্রসঙ্গ করিতেন, উহার শাখায় বসিয়া সময়ে সময়ে কয়েকটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পক্ষীকে ও নিম্নে একটী কুকুরকে তাঁহার পাঠের সময়ে উপস্থিত হইয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে কাণ পাতিয়া পাঠ শ্রবণ করিতে গেণ্ডারিয়াবাসী শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

বলিয়াছিলেন—"নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে হ'লে, যখন ঐ নাম প্রতি শিরায় শিরায় চল্‌তে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ, চোক্, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিতরের দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার প্রারম্ভেই সতর্ক না হ'লে, আর নাম এ সময়ে একেবারে ছেড়ে দিলে বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়। ঐ অবস্থায় হাত পা সমস্ত একেবারে পেটের ভিতরে চ'লেও যেতে পারে; আবার অন্য প্রকারও হয়। নামটী, অস্থি, মজ্জা, মাংসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যখন হ'তে থাকে, তখন হাত, পা, জানু প্রভৃতি শরীরের সন্ধিস্থলের গ্রন্থিসকল খ'সে যায়, একেবারে আল্‌গা হ'য়ে পড়ে, হাত পা লম্বা হ'য়ে যায়। তেমন মত হ'লে হাত, পা, এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত শরীর হ'তে ছুটে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে ঠিক্ ঠিক্ স্থানে এ'সে লে'গে জুড়ে যায়। এসব শুধু কথা নয়, নিজে দেখেছি।"* কুর্ম্মের ন্যায় হস্ত-পদাদি শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যাওয়া, এবং উহাদের সন্ধিস্থল স্খলিত হইয়া দীর্ঘাকার ধারণ করা—এই দুইটী নাম-শক্তির ক্রিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহে বিকশিত হইত বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, কিন্তু শরীর হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় সংযুক্ত হইবার কথা বিগত চারি যুগের মধ্যেও দৃষ্ট অথবা শ্রুত হওয়া যায় নাই। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু কোথায় কাহার দেহে ঐ অত্যদ্ভুত ভাবের বিকার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, গোস্বামী-প্রভুর নিজের দেহেই পূর্ব্বোক্ত অবস্থাসকল তাঁহার নির্জ্জন-সাধনের সময়ে একটি একটি করিয়া প্রকটিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি লোক-সমাজে ঐ সকল ভাব কখনও প্রদর্শন করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, উহা কেহই ধারণা অথবা সহ্য করিতে পারিবে না। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি অপর একদিন বলিয়াছিলেন যে, "ভাবনিধি মহাপ্রভুর শরীর যে ঐ সকল অপূর্ব্ব অবস্থা বিকশিত হইতে পারিত না, তাহা নহে, তবে তিনি ঐ সমস্ত সংবরণ করিয়া রাখিতেন। কারণ, তাঁহার শেষ জীবনে যাহা কিছু দেখাইতেন, তাহাতেই ভক্তগণের বুক ফাটিয়া যাইত।"

সন্ধ্যার পর গোস্বামী-প্রভু কুটীরে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। এই সময়ে কীর্ত্তনে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটি গান ক্রমান্বয়ে গীত হইত। এই সকল সঙ্গীত তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ং করতাল-সংযোগে গান করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে উহা যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তপটে তাহা চিরকাল অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

১। ললিত—ঠুংরি।

হরিসে লাগি রহ রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥

* সৎ-গুরু সঙ্গ হইতে উদ্ধৃত।

ওঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুধন কসাই,
শুয়া পড়ায়েকে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চড়াই,
এক বাত্‌মে ঠাণ্ডা লাগে, খোঁজ খবর নাহি পাই ॥
এইসা ভক্তি, কর ঘট-ভিতর, ছোড় কপট-চতুরাই,
সেবা-বন্দন, আউর দীনতা, সহজে মিলয়ে রঘুরাই ॥

২। খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর, এইসা হি নাম তুঁহার।
প্রভুজী, এইসা হি নাম তুঁহার ॥
পতিত-অপবিত্র লিয়ে কর আপনার,
সকল করত নমস্কার।
জাত-বরণকো, পুছত নাহি,
যাচত চরণার বার।
সাধুসঙ্গ, নানক বুধ পাই,
হরিকীর্ত্তন জীউ-আধার।

৩। খাম্বাজ—একতালা।

(মন রে) সদায় হরিবোল, (মধুর) হরিনামের নাই তুলনা।
যদি বিষয়েতে সুখ হ'ত রে, তবে লালাজী ফকির হ'ত না।
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে, তারে যমদূতে ছুঁতে পেল না।
(মধুর হরিনামে রে)
নামে জগাই-মাধাই ত'রে গেলরে! ভবে অপার নামের মহিমা।
(হরিনামের গুণে রে)
নামে রূপ-সনাতন ফকির হল রে! (ভবে) কি দিব নামের তুলনা ॥

কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার বাসগৃহে (আশ্রমের পূর্ব্বভিটার গৃহে) আগমন করিয়া, শিষ্যদিগের সাধনে সাহায্য করিতেন। অনন্তর ৯ ঘটিকার সময় তাঁহাদিগের সহিত একত্রে (তখন পর্য্যন্ত) রুটি, ডাইল, তরকারী ইত্যাদি ভোজন করিতেন। রাত্রের আহারের পর গোস্বামী-প্রভু কুটীরে গিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভজন করিতেন; এবং অধিকাংশ সময়ে ভগবানে যুক্ত হইয়া, উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধিসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু প্রভৃতি ২।১ জন শিষ্য তাঁহার সেবার জন্য কুটীরে উপস্থিত থাকিতেন। রাত্রি ৩ ঘটিকার পরে তিনি অল্প সময়ের জন্য একটু নিদ্রা যাইতেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তাঁহার নিদ্রা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন সমস্ত রাত্রিই সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন।

এইরূপে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়মিতরূপে দিবানিশি 'ঘড়ি ধরিয়া' সম্পন্ন করিতেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত না। এই প্রকারে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে একটি আনন্দের হাট বসাইয়া, গোস্বামী-প্রভু সশিষ্য তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের এই নিত্য আনন্দ-উৎসবের একটী বিবরণ শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "সৎগুরু-সঙ্গ" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—"আজকাল সাধু সন্ন্যাসী, বাউল, উদাসীন এবং মুসলমান ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতেছেন, যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুভ্রাতারা আপন আপন রুচি অনুযায়ী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বসিয়া, কোথাও স্থিরভাবে নাম প্রাণায়াম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, কোথাও বা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের সেবার কার্য্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রতিযোগিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে। সকলেই একই ভাবে মত্ত; উদয়াস্ত যে কি ভাবে যাইতেছে, কাহারও লক্ষ্য নাই; কেমন যেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া যাইতেছে। প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সকলে একত্র মিলিত হইয়া, ঠাকুরের নিকট কখনও আশ্রমের পূবের ঘরে, কখনও বা আম-তলায়, খুব উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সংকীর্ত্তন এক মহা ব্যাপার। বরিশাল, বানরীপাড়া, ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা একত্র হইয়া, খোল করতাল লইয়া যখন উচ্চকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে। ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকেন, পুনঃ পুনঃ চাপিতে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠেন; উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া "হরিবোল, হরিবোল" ধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরের হুঙ্কারে, হরিবোল ধ্বনিতে, চারিদিকে স্ত্রীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে দেখিতে দুই চারি মিনিটের মধ্যেই মহা হুলুস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হয়, সকলে যেন কেমন এক প্রকার হইয়া যান। কেহ কেহ "জয় রাধে, জয় রাধে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, কেহ কেহ "হরিবোল, হরিবোল" ভীষণ রব ছাড়িয়া নির্ণিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহির্শ্বাস উড়াইয়া ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা "নিতাই, নিতাই" বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুরের সম্মুখীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎকাল নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়া, ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোন ভাবে মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দিশাহারা! খোলের ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তনের রব, গুরুভ্রাতাদের হুঙ্কার ও গর্জ্জনে মিলিত হইয়া অদ্ভুত তাড়িৎ-প্রবাহে

দর্শকমণ্ডলীকেও কাঁপাইয়া তোলে। এই সময়ে, কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পর্দ্দার আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞান-শূন্যাবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও, গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছটফট করিতে থাকেন। আমরা কয়েকটী গুরুভাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুরকে বাঁচাইয়া রাখিতে, ঠাকুরের চারিদিক ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; এবং ভাবাবেশে উন্মত্ত, মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, স্ত্রীলোকদিগকে অবস্থা বুঝিয়া সরাইয়া দেই। আশ্রমে আজকাল প্রত্যহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎসব!"

এই বৎসর ফাল্গুন মাসে গোস্বামী-প্রভুর একমাত্র পুত্র প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী ও কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীর উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রূকুণী-গ্রামবাসী মৈত্র বংশোদ্ভূত শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু মৈত্রের সহিত শ্রীমতী শান্তিসুধার, এবং তদীয় ভগ্নী স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবীর সহিত স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহ উপলক্ষে, গয়া-'আকাশগঙ্গা'-পর্ব্বতবাসী, মহাত্মা রঘুবর দাস বাবাজী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই হইতে অন্ধ সাধক, ভক্তপ্রধান পরশুরাম উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং ব্রাহ্মসমাজের বহুলোকও সানন্দে উৎসবকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিবাহের পরদিবস সকালবেলা শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনে মহাভাবের এক অপূর্ব্ব শক্তি বিকশিত হইয়া উপস্থিত নর-নারীবৃন্দকে অভিভূত করিয়াছিল। গোস্বামী-প্রভু নাম-মদিরায় মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য ও তারকব্রহ্ম হরিনামের উচ্চনিনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী, না জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া, সঙ্কোচ পরিত্যাগপূর্ব্বক, সমবেত ভক্তবৃন্দের কপালে 'রুলি' দিতে দিতে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলে, গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় ভাবে মগ্ন হইয়া, "জয় রাধারাণী জয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন"—বলিয়া গভীর নিনাদ করিয়া উঠিলেন। এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র জননী যোগমায়া কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় গোস্বামী-প্রভুর বামপার্শ্বে সহসা আসিয়া অবসাঙ্গে দণ্ডায়মানা রহিলেন, এবং গোস্বামী-প্রভুও সমাধিস্থ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন! এমন সময়ে ঢাকা-নিবাসী স্বর্গীয় চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শুকশারীর গান ধরিয়া দিলেন।

কীর্ত্তনের সুর।

শুক বলে, 'আমার কৃষ্ণ মদনমোহন'।

শারী বলে, 'আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন' ॥
শুক বলে, 'আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল'।
শারী বলে, 'আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন' ॥
শুক বলে, 'আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপাখা'।
শারী বলে, 'আমার রাধার নামটি তাহে লেখা,
নইলে পাখীর পাখা' ॥ ইত্যাদি।

তাঁহার গান শেষ হইতে না হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী রাধা-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, একটী কলসী 'কাঁকে' করতঃ, গোপীভাবে অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে দুইজনের শ্রীচরণ ধৌত করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত গান করিতে লাগিলেন—

খাম্বাজ—একতালা।

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর গোপীপায় হব নূপুর,
(আমি) রাঙ্গা পায়ে রুণুঝুণু বাজিব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী আমায় কর এই আশিষি
(আমি) নিতুই নিতুই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো।

ইঁহাদিগের গানের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিল। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সকলেই নীরব নিস্পন্দ! কেহ যেন আর মরজগতে নাই, কোথায় কোন এক অনৈসর্গিক রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না! এই সময়ে অন্ধভক্ত পরশুরাম প্রেমনেত্রে গোস্বামী-প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল; এবং 'এই ত কৃষ্ণ,' 'এই ত মাধব', 'কেমন চূড়া!' 'কেমন বনমালা!' 'গোঁসাই, তুমি আমাকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছ?' 'ধন্য ধন্য!'—ইত্যাদি অদ্ভুত বাক্য এমন সতেজে, এমন গদগদভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, দর্শকমণ্ডলী উহা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অনেকে প্রেমবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে অন্ন-মহোৎসব আরম্ভ হইল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। আপনা ভুলিয়া সকলেই যেন অপরকে সুখী করিবার জন্যই ব্যস্ত। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বিচার নাই, স্থানাস্থান বিচার নাই,—যাঁহার যে স্থানে সুবিধা হইতেছে, তিনি সেই স্থানেই আহার করিতে বসিলেন। আশ্রমবাসীরা সানন্দ-

চিত্তে তাঁহাদিগকে আহার্য্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সমস্ত দিবসই মহোৎসব চলিল। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক আহার করিতে বসিলেন। এই সময়ে দধি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, নগেন্দ্রবাবু বায়না ধরিলেন যে তিনি দধি না খাইয়া উঠিবেন না এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"গোঁসাই, দই না খেয়ে উঠ্‌ব না, যে স্থান হ'তে পার দই এ'নে দিতে হ'বে।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু শ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে দধির ভাণ্ড আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—"একটি হাঁড়ীর তলাতে যৎসামান্য দধি আছে, এত লোকের মধ্যে তাহা আনিয়া কি হইবে?" তথাপি গোস্বামী-প্রভু পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, তিনি ভাণ্ডটী আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। গোস্বামী-প্রভু স্বীয় গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া দধি পরিবেশন করিতে করিতে বলিলেন—"যে যত পার খাও!" কিন্তু দধি আর ফুরায় না। ইহা দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অবাক্ হইয়া রহিলেন; এবং কিয়ৎকাল পরে ভাবে বিহ্বল হইয়া সর্ব্বাঙ্গে সেই দধি লেপন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে একটী আনন্দের রোল উত্থিত হইল। আহারান্তে নগেন্দ্রবাবুর প্রশ্নোত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আপনারা যোগের ঐশ্বর্য্যের কথা বিশ্বাস করেন না, তাই গুরুজী দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ দেখাইলেন, কিন্তু এ সমস্ত যোগের অতি সামান্য ফল।"

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য, শান্তিপুর নিবাসী ৺লালবিহারী বসু (লালজী) গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন অনুমান ১৩।১৪ বৎসর হইবে। ইঁহার পিতৃদেবের নাম ৺রামগোপাল বসু। গুরুকৃপায় সাধন গ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই লালজী অতি উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুত-ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি যাহার সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন, তাহা ঠিক্ ঠিক্ মিলিয়া যাইত। মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া লালজী যখন গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে সংকীর্ত্তনে মল্লবেশে নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাদের পরস্পরের মধে যে অপূর্ব্ব শোভা হইত, তাহা বর্ণণাতীত; তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। গোস্বামী-প্রভুর মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব তিনিই সর্ব্ব-প্রথম অপরাপর শিষ্যমণ্ডলীর গোচরে আনয়ন করেন। একবার শান্তিপুর অবস্থানকালে, কি প্রকারে তিনি সমস্ত দেবতা ও অবতারগণকে ক্রমান্বয়ে তিন দিন পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভুর দেহ হইতে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই লয় হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে তাঁহার দেহ হইতে বাহির করতঃ সত্যলোক, তপোলোক প্রভৃতি স্থান দর্শন করাইয়া পুনরায় স্ব-দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা লালজী কোন কোন সময়ে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন।

এই অল্পবয়স্ক বালক এতদূর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসকলের এমন সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেন যে, বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পাইত যেন, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্বই তিনি 'করতলন্যস্ত আমলকবৎ' প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন।

যখন তাঁহাব বয়ঃক্রম ১৪ কি ১৫ বৎসব হইবে, তখন তিনি একবার নোয়াখালী জিলাস্থিত লক্ষ্মীপুব মহকুমায় গিয়াছিলেন। তথায় একদিন কোন মস্‌জিদেব সম্মুখস্থ চত্বরে বসিয়া কয়েকটি সতীর্থ সহ ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মস্‌জিদের ইমাম্‌ অতি বিনয়ের সহিত তথায় ঐরূপ হিন্দুয়ানী আলাপ করিতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলে, লালজী প্রথমতঃ উর্দ্দুতে বলিলেন—

"পরমেশ্বরের কথা তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে বলিতে কোন দোষ নাই।" ইমাম্‌ বলিলেন—"আমাদের কোরাণে নিষেধ আছে।" তখন লালজী আরবী ভাষায় কোরাণের আয়ৎ অতি বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া পুনঃ উর্দ্দু ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "কোরাণে ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নাস্তিককেই কাফের বলা হইয়াছে।" ইমাম্‌ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মৌলভি সাহেবকে ডাকিলেন। তিনি আসিলে লালজী তাঁহাকে আরবি ভাষায় কোরাণের আয়ৎ সকল উচ্চারণ করিয়া তাহার পার্শি টিকা ও উর্দ্দু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন যে নাস্তিকেরাই কাফের পদবাচ্য। মৌলভি সাহেব একটি হিন্দু বালকের কোরাণের এরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলেন এবং পীর জ্ঞানে তাঁহাকে সেলাম করতঃ বহু আদর যত্ন করিলেন।

অপর এক সময়ে বরিশালে একটি পাদরীর সহিত তিনি হিব্রু ভাষায় বাইবেলের আলোচনা করিয়াছিলেন। যাঁহার নিকট শব্দব্রহ্ম প্রকাশিত হন, (শব্দের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া) অনধিত সমস্ত ভাষাই তাঁহার নিকট স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলের ভাষাই তিনি বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু পরব্রহ্ম-তত্ত্ব ইহার অনেক উপরে। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ লালজী তাঁহার তপো-লব্ধ শক্তির অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা অবগত হইয়া গোস্বামী-প্রভু একদিন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "স্পর্শমণি যার ঘরে, ক্ষুদ্র কাঁচখণ্ডের জন্য তার লোভ? ইহাতে ধর্ম্ম হয় না, বরং মহা অনিষ্ট উৎপাদন করে।" প্রভুজীর এরূপ উপদেশ সত্ত্বেও পুনরায় কোন ঘটনা উপলক্ষে শক্তির অপব্যবহার করায়, প্রভুজী তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত হতপ্রভ হইয়া কিয়ৎকাল নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলে, লালজী তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি কখনও কখনও উন্মাদের মত

চলিতেন ফিরিতেন। এতদবস্থায় তিনি ২।৩ বার মনের দুঃখে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপ ভগ্নহৃদয় লইয়াই তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নশ্বরদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া অমর-ধামে গমন করেন।

পুত্র কন্যার বিবাহান্তে গোস্বামী-প্রভু কিয়দ্দিনের জন্য রামপুরহাটে গমন করেন। পরে স্বীয় মাতৃদেবীকে দর্শন করিবার জন্য সেই স্থান হইতে শান্তিপুরে আগমন করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। তাঁহার শান্তিপুর আগমনের সংবাদ পাইয়া তদীয় পরিবারবর্গ ঢাকা হইতে তথায় আগমন করেন।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সশিষ্য গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া প্রাণায়াম সাধন করিয়া পরে স্নান করিতেন। অপরাহ্ণেও তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে কয়েকমাস শান্তিপুরে বাস করিয়া গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক সুকিয়া ষ্ট্রীটে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া কিয়ৎকাল তথায় বাস করেন।

এই সময়ে একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য, গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পার্ক ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার আলয়ে গমন করেন। তিনি সশিষ্য মহর্ষিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলে, মহর্ষিও তাঁহাদিগকে অতীব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"আজ তোমাকে দেখিয়া আমার পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের কথা মনে হইতেছে। তাঁহারা যেমন সশিষ্য কোথাও গমন করিতেন, তুমিও অদ্য সেইরূপ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিয়াছ। তুমি যে জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। তুমি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছ। ইহারাও (শিষ্যগণ) তোমার প্রসাদে ভগবানকে লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। তুমি অতি সুপাত্র ও উচ্চ অধিকারী। ধর্ম্মের জন্য সৎকুলে জন্মগ্রহণ, সৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ ও সৎসাধন,—এই চারিটি বিশেষ প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা। এই সকল তোমার সমস্তই হইয়াছে। তুমি উৎকৃষ্ট অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছ, সৎসঙ্গ ও সৎসাধন যথেষ্ট করিয়াছ। তুমি ত ব্রহ্মদর্শন করিবেই। তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য!"—ইত্যাদি।

বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যগণ মহর্ষিকে নমস্কার করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তোমরা ধর্ম্মার্থী হইয়া ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। কখনও ইঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমরা মনে করিও না যে, ইঁহার সহিত তোমাদের কেবলমাত্র ইহকালের সম্বন্ধ। ইঁনি অনন্তকাল তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবেন। তোমরা ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনন্তকাল ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইবে।"*

* শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

এইস্থানে অবস্থানকালে একদিন গোস্বামী-প্রভু স্বীয় স্নেহশীলা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শান্তি, আজ আমি তোকে একটি বর দিব। তুই রাজরাণী হ'তে চাস, না আমাদের ফকিরী খাতায় নাম লেখাবি? ঠিক ক'রে বল। ঐশ্বর্য্য চাহিলে আমি তোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে তোর ধর্ম্মলাভের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হ'বে।" ধর্ম্মপ্রাণা শান্তিসুধা ঐশ্বর্য্যের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি সহাস্যে উত্তর করিলেন, "না, বাবা, আমার ঐশ্বর্য্যে কাজ নাই, তুমি তোমাদের ফকিরী খাতাতেই আমার নাম লেখাও।" তখন গোস্বামী-প্রভু বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হউক, আজ হইতে তোমার নাম ফকিরী তালিকাভুক্ত হইল, কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলে।" শান্তিসুধা বিবাহ করিয়া সবেমাত্র সংসার-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহাকে এইরূপ 'সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতে' দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে একজন নানক-পন্থী সাধু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সময়ে সময়ে আগমন করিতেন। ইনি করকোষ্ঠী দেখিতে জানিতেন। ইনি একদিন শ্রীমতী শান্তিসুধার করকোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কয়েকটী পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইবে। সাধুর বাক্যে শান্তিসুধা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া বলিলেন,—"আমি সন্তান চাহি না, উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"মা শান্তি, ও কথা বলিলে চলিবে কেন? এবারে দৌহিত্র দ্বারাই যে আমার বংশ-রক্ষা হবে।" বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। তখন কে জানিত যে, গোস্বামী-প্রভুর একমাত্র পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিবেন এবং যোগজীবনও আর দার-পরিগ্রহ করিবেন না?

একদিবস প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে শ্রীচৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শন করিবার জন্য, গোস্বামী-প্রভুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট প্রেরণ-করেন। গোস্বামী-প্রভু পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ানুসারে কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। অভিনয়ের সময়ে রঙ্গমঞ্চে কীর্ত্তন আরম্ভ হইতে না হইতেই, তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অভিনেতাগণের ও দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে গোস্বামী-প্রভুর সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা নাম-মদিরায় মাতোয়ারা হইয়া হরিনামের উচ্চনিনাদে রঙ্গভূমি কাঁপাইয়া তুলিলেন। গোস্বামী-প্রভুর হরিনামের সিংহ-হুঙ্কারে ও উদ্দণ্ড নৃত্যে, অভিনেতাগণের উচ্চকীর্ত্তনে রঙ্গমঞ্চ যেন টলমল করিতে লাগিল—রঙ্গভূমি দেবভূমিতে পরিণত হইল। অভিনয় শেষ হইলে, ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয়

গোস্বামী-প্রভুকে অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন,—"প্রভো, গোস্বামী-দিগের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রবল তরঙ্গে ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই অপূর্ব্ব লীলা অদ্য আপনার প্রসাদে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। আমাদের রঙ্গভূমি আজ পবিত্র হইল।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

৺কাশীবাস। অযোধ্যা দর্শন। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান। ভক্তি-ভাজন গৌর শিরোমণি মহাশয়ের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ। গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের দুর্ব্যবহার। বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের দর্শনলাভ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ। জনৈক প্রেতসিদ্ধ সাধুর বিবরণ। পূর্ণ পুরুষের লক্ষণ। বন পরিক্রমণ। শ্রীবৃন্দাবনের কুম্ভমেলা দর্শন।

১২৯৬ সনের কার্ত্তিক মাসে গোস্বামী-প্রভু রাসযাত্রা দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে সপরিবার শান্তিপুরে আগমনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে সাংসারিকতার বাহুল্য লক্ষ্য করিয়া তিনি নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক একাকী ৺কাশীধামে যাত্রা করেন। কাশীধামে আগমন করিযা প্রথমে কাকিনার-মহারাজার সত্রে উঠিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিবার পর, প্রসিদ্ধা মানিকতলার মাতাজীর অনুরোধ ও আগ্রহে, অগস্ত্যকুণ্ডের সন্নিকটস্থ তাঁহার ভাড়াটীয়া বাটীতে আগমনপূর্ব্বক প্রায় মাসাবধি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুর কাশীধামে আগমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী স্বীয় পুত্র যোগজীবন গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক স্বামীসহ মিলিত হইলেন।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া সহরের ইংরাজী শিক্ষিত উকিল, অধ্যাপকাদি বাঙ্গালী বাবুরা নানাপ্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। এক দিবস প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়, তাঁহাদের ধর্ম্মসভার আধিবেশনে গোস্বামী-প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, সকলে তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর পুরোভাগে বসাইলেন। দেখিতে দেখিতে বহু গণ্যমান্য লোকের দ্বারা সভা-মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎকাল পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামী-প্রভুর শরীর অসুস্থ ছিল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। পরে ভাবের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, হরিনামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া সকলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তাহারাও নৃত্য করিতে লাগিল। গোস্বামী-প্রভু ভাবাবেশে ধরাশায়ী হইয়া একেবারে সমাধিস্থ

হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর সহিত, বিরুদ্ধভাবাপন্ন অনেক বাঙ্গালী বাবুরাও, তাঁহার চরণ-ধূলি লইয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাশীবাসী বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বাঙ্গালিগণ, গোস্বামী-প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে গোস্বামী-প্রভু স্বীয় বাসভবনে আগমন করিলেন।

এক দিবস গোস্বামী-প্রভু ৺বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে আরতি আরম্ভ হইল। তিনি মন্দিরের প্রাঙ্গণে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘন-ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ভাবের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে 'বোম্ ভোলা' 'বোম ভোলা' বলিয়া আরতির তালে তালে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নৃত্য করিতে করিতে এক একবার ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, পুনরায় পশ্চাৎদিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। পাণ্ডা প্রহরিগণ অবাধ গতিতে তাঁহার নৃত্য করিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। গোস্বামী প্রভুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া পূজারিগণ অধিকতর উৎসাহ-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে গোস্বামী-প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশেষে তিনি ভাবাধিক্যহেতু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিবার জন্য জনতার মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অধিক রাত্রে তিনি স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন।

আর এক দিবস গোস্বামী-প্রভু আরতি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক এক কোণে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছিলেন। আরতি দর্শন করিতে করিতে, তিনি ভাবে অধীর হইয়া বালকের মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আশ্চর্য্যপ্রকারে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে পিচ্‌কারীর ধারার ন্যায় অশ্রু-রাশি নির্গত হইয়া সবেগে বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পাণ্ডা, পূজারী, দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে গোস্বামী-প্রভুর দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। সংকীর্ত্তনের শিরোমণি শ্রীমন্ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে পার্ষদবৃন্দকে এবম্প্রকার অশ্রু-বারিদ্বারা পরিসিক্ত করিতেন বলিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহার অপ্রকটের পর এইরূপ ব্যাপার আর কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আমারা অবগত নহি। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিতে লাগিল। কোন্ দিন তিনি বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাইবেন, বাঙ্গালীটোলা-বাসীরা নিত্য আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইত।

এক দিবস গোস্বামী-প্রভু মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য কতিপয় শিষ্যসহ ৺দুর্গাবাড়ীতে উপস্থিত হইলে, জনৈক সেবক তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট যাইতে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওদিকে যাবেন না। তিনি ধ্যানস্থ আছেন, এখন দেখা হইবে না।" গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে কিছু না বলিয়া একটী বৃক্ষতলে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজী সহাস্য মুখে, "আনন্দ হায়, আনন্দ হায়" বলিতে বলিতে গোস্বামী-প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী-প্রভু প্রণাম করিবার উপক্রম করা মাত্রই স্বামীজী তাঁহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয় উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। উভয়ের বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি স্বামীজীর সহিত কিয়ৎকাল ধর্ম্মালাপ করিয়া অগস্ত্যকুণ্ডে স্বীয় আবাসে আগমন করিলেন।

অতঃপর মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, পূর্ণানন্দ স্বামী ও আরও কয়েকটী সন্ন্যাসী এবং পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোস্বামী-প্রভু, জননী যোগমায়া ও অপরাপর শিষ্যবৃন্দসহ অযোধ্যা আগমনপূর্ব্বক গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাবাটীতে উপনীত হইলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার দ্রষ্টব্য স্থানসকল দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অযোধ্যায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় কিয়ৎকাল বাস করিবার পর জননী যোগমায়া দেবী, স্বামীর আদেশে তদীয় পুত্র প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন, এবং গোস্বামী-প্রভু, সাধু শ্রীধর প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রতিপ্রাণা সতী জননী যোগমায়া বেশীদিন পতিবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তৎসমীপে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন।

গোস্বামী-প্রভু স্বীয় গুরুদেবের আদেশে একবৎসরকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করেন। তৎকালে সেখানে তিনি গোপীনাথের বাগ ৺দাউজীর কুঞ্জে বাস করিতেন। এই সময়ে ৺গৌরকিশোর দাস নামক একজন ভগবদ্ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম গৌরচন্দ্র শিরোমণি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া অঞ্চলে ইঁহার নিবাসস্থল ছিল। ইনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দারণ্যে বাস ও সাধন ভজন করিয়া, রাধারাণীর কৃপায় অতীব উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি বিশ্বাস করিতেন; এবং সাধনতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক কোন কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, সকলে ইঁহারই নিকট হইতে তাহার মীমাংসা করাইয়া লইতেন। এই মহাপুরুষের সঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর পরিচয় হইলে, উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল এবং

পরস্পরের গুণে পরস্পর অতিশয় আকৃষ্টও হইলেন। এই প্রকারে এই দুই প্রেমিক মহাপুরুষ নানাবিধ ধর্ম্মালোচনাপ্রসঙ্গে মনের আনন্দে শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবন ভয়ানক গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের আবাসস্থান ছিল। তাহারা আপনাদিগের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরের লোকদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করিত না, বরং তাহাদিগকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেই চেষ্টা পাইত। গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন, এখন গৈরিক বসন পরিধান করেন, জটা রাখিয়াছেন, তুলসী ও রুদ্রাক্ষ উভয় মালাই ধারণ করেন, এবং তাহাদের মত 'ভেক' গ্রহণ করেন নাই,—এই সকল কারণে, তাহারা গোস্বামী-প্রভুর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। অপেক্ষাকৃত শিষ্ট বৈষ্ণবগণ গোস্বামী প্রভুকে 'ভেক' গ্রহণ করিয়া জটা ও গৈরিক বসন পরিত্যাগ করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া দিলেন যে, তুলসী ও রুদ্রাক্ষ-মালা একত্র ধারণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, অধিকন্তু জপের জন্য রুদ্রাক্ষ-মালা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,* এবং ভেকধারণ প্রথা শাস্ত্রে নাই, অবস্থা বিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণই শাস্ত্রসম্মত। তারপর গৈরিক বসন ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ যদি বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উহা কখনও ধারণ করিতেন না, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে মহাপ্রভুরই পন্থা অনুসরণ করিয়া

* যে কণ্ঠলগ্ন তুলসী নলিনাক্ষমালা,
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূলে পরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রা
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥
হরিভক্তি-বিলাস-ধৃত নারদসংহিতার শ্লোক। চতুর্থ বিলাস—১২৩ শ্লোক।
পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈর্ব্বিদ্রুমৈর্ম্মণিমৌক্তিকৈঃ।
পুত্রবীজময়ী মালা সা শস্তা জপকর্ম্মণি॥
ঐ গ্রন্থ, ১৭ বিলাস, ৩৬ শ্লোক।

এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রুদ্রাক্ষ মালা ধারণের কথা উল্লিখিত আছে, যথা :—

কণ্ঠে শোভাকরে বহুবিধ দিব্য হার।
মণিমুক্তা প্রবালাদি যত সর্ব্বসার॥
রুদ্রাক্ষ বিডাক্ষ দুই সুবর্ণরজতে।
বাঁধিয়া পরিলা গলে মহেশের প্রীতে॥
অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

চলিতেছেন—ইত্যাদি। গোস্বামী-প্রভুর এইরূপ সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধবাদীগণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবায়েত গোস্বামী-দিগের সহায়তায় তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য সঙ্কল্প করিল। কিন্তু মানুষ যাহা ইচ্ছা করে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। মানুষের ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তির উপরেও আর একটী মহাশক্তি কার্য্য করিতেছে; সেই শক্তিকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। এই সকল ষড়যন্ত্রকারীদিগের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদিগের নেতা গোবিন্দ জীউর সেবায়েত সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি ভীমকায় বরাহ তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—"কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, তাঁকে (গোস্বামী-প্রভুকে) তোরা অপমান করিবি? জানিস্ সে কে? যে গোবিন্দজীকে তোরা পূজা করিস্, সেই গোবিন্দজী ও তিনি অভিন্ন। যদি মঙ্গল চা'স, তবে একখনই তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।" এই বলিয়া বরাহ মূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দলপতি মহাশয় তাঁহার সমস্ত বক্ষে দন্তাঘাতের চিহ্ন দর্শন করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শিরোমণি মহাশয় করুণাপরবশ হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক, গোস্বামী-প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ করিলেন। পরদিন গোস্বামী-প্রভু গোবিন্দ জীউ দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, দলপতি স্বয়ং গোবিন্দ জীউর প্রসাদী মালা তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিয়া পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।*

এদিকে ভেকধারী পণ্ডিতম্মন্য বাবাজী মহাশয়গণ গোস্বামী-প্রভুকে তাহাদের মতানুযায়ী চালাইবার চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইল না। তাহারা তাঁহাকে নানাপ্রকারে ভেক্ ধারণ করাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। এই কথা অবগত হইয়া এক দিবস গৌর শিরোমণি-মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে নিভৃতে বলিলেন—"প্রভু, আপনি যাহা বলিবেন, যেরূপ আচরণ করিবেন, কালে তাহাই শাস্ত্র সদাচার বলিয়া গৃহীত হইবে। অতএব আপনি কখনও এই সকল অজ্ঞ লোক-দিগের কথানুযায়ী কার্য্য করিবেন না। উহারা শাস্ত্র মানে না, সদাচারও জানে না, কেবল আপনাদের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া, তাহাই লোকসমাজে শাস্ত্র সদাচার বলিয়া প্রচার করে।"†

একদিবস নগরকীর্ত্তন হইতেছিল। গোস্বামী-প্রভু শৌচাগার হইতে

* গোস্বামী-প্রভুর জামাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

† গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইলেন, এবং জলশৌচ না করিয়াই কীর্ত্তনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। তিনি প্রসাদ পাইলেন। পরে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে পথিমধ্যে মনে হইল যে, তিনি শৌচ না করিয়াই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই কথা মনে হইলে, তিনি নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় গৌর শিরোমণি-মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"প্রভো! ঠিক হইয়াছে! আপনি যে ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন তাহার কার্য্য নিষ্ফল হয় নাই; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানী না হইলে ভক্তির অধিকার হয় না। এই জন্য মহাপ্রভু আপনাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিলেন। যে কার্য্য সত্যভাবে করা হয় তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না।"*

এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে তিলক ধারণের প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাটী গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা ঃ—"ধর্ম্মের জন্য 'ভেক' ধারণ প্রথার কোন প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, শিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিলেন—'ভেকের কোন দরকার নাই। ইহা কোন শাস্ত্রীয় ব্যাপার নহে, তবে অনেকে অনুরাগে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।' শিরোমণি মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন আমি এক অদ্ভুত রকমের তিলক করিলাম। লাল, সাদা, কালো প্রভৃতি নানা রংএ কপাল চিত্রিত করিয়া তাঁহার নিকটে গেলাম। শিরোমণি-মহাশয় আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—'প্রভো! অন্য কেহ হইলে আমি বলিতাম না, কিন্তু আপনি আচার্য্য-সন্তান, তাই বলিতেছি—আপনি ঐরূপ তিলক কখনও করিবেন না, উহাতে বড়ই কষ্ট পাই।' আমি হাসিয়া বলিলাম—'তবে কিরূপ তিলক করিব?' শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? সীতানাথ অদ্বৈত-প্রভুকে ভাবুন, তিনিই বলিয়া দিবেন।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সেই রাত্রে আমি দামোদর পূজারীর কুঞ্জে বসিয়া আছি। গভীর রাত্রে বাস্তবিকই অদ্বৈত-প্রভু ও আরও কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে বলিলেন—'তোমার এ সমস্তের (তিলক ধারণের) কিছুই দরকার নাই, তবে যদি একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দেখ আমি যেরূপ তিলক করিয়াছি, ঠিক এইরূপ তিলক করিও।' আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলাম—'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আগে তিলক করিয়া লই'—এই বলিয়া ধুনির ভস্ম লইয়া কমণ্ডলুর জল দ্বারা (অদ্বৈত-প্রভুর তিলকের অনুরূপ) তিলক করিলাম। অদ্বৈত-প্রভু তিলক দেখিয়া বলিলেন—'ঠিক হইয়াছে।' এই

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন। তৎপর দিবস আমি সেই তিলক লইয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট গেলাম। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'প্রভো! আপনি এই তিলক কোথায় পাইলেন?' আমি পূর্ব্ব রাত্রের ঐ ঘটনা আদ্যন্ত বলিলাম। তাহা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন—'প্রভো! অতি উত্তম হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত বংশধরগণ এইরূপ তিলকই ধারণ করিয়া থাকেন।'"*

অপর এক দিবস গোস্বামী-প্রভু শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে মহাসমাদরের সহিত বসিবার আসন প্রদান করিয়া বলিলেন - "প্রভো! আজ একটী বিশেষ কথা আছে। সেদিন দয়া ক'রে কয়েকজন বৈষ্ণব এখানে এসেছিলেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অমুকস্থানে শ্যামা পূজা হবে, তাহাতে তাঁহারা যোগদান করিতে পারেন কি না?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন "আপনি কি বল্লেন?"

শিরোমণি—বল্লাম, আপনারা কাঁহার ভজনা করেন? তাঁহারা বল্লেন—কেন? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভজনা করি।

গোস্বামী-প্রভু—তারপর আপনি কি বল্লেন?

শিরোমণি—বল্লাম, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কি? তাঁরা বল্লেন,—"গোপীর অনুগত হ'য়ে ভজন ক'রতে হবে।' আমি বল্লাম—'গোপীর অনুগতি! তা' বেশ। কিন্তু গোপীরা কি ক'রে কৃষ্ণ পেয়েছিলেন? বনে গি'য়ে কাত্যায়ণীর পূজা করে'ত? যদি তা'ই হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য বৈষ্ণবের শ্যামা পূজায় বাধা কি?"

গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—আপনি ঠিক বলেছেন।

একদিন শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে পাঠ হইতেছিল। তাঁহার ছেলেদের মধ্যে একজন পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে গোস্বামী-প্রভু তথায় উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিয়া বলিলেন—"প্রভো! আজ আর একটী কথা আছে।"

গোস্বামী-প্রভু—কি কথা?

শিরোমণি—আজ এদের (ছেলেদের দেখাইয়া) গর্ভধারিণী এসেছেন। তিনি এখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৈষ্ণবেরা ইহাতে বিশেষ আপত্তি কচ্ছেন, কারণ আমি ভেকাশ্রিত, তাতে প্রকৃতি রাখা।

গোস্বামী-প্রভু—তাতে আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন?

শিরোমণি—আমার এখানে দয়া ক'রে অনেকেই আসেন। কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক আসেন, থাকেন। তাহাতে ওকে যদি নিষেধ করি, তবে পূর্ব্বের

---

* শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামী-প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

সম্বন্ধইত র'য়ে গেল। আমি যখন ভেকাশ্রয় ক'রেছি, এ আশ্রমে সকলেরই সমান অধিকার। তাই নিষেধ করি কেমন ক'রে ?

গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—ইহা পূর্ণ সত্য।

অপর এক দিবস গোস্বামী-প্রভু, ভক্তিভাজন গৌর শিরোমণি, প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী, রাজর্ষি বনমালী রায়, নিত্যানন্দ দাস বাবাজী (৺রাধিকানাথ প্রভুর শিষ্য) প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে 'হাড়াবাড়ীর' নিকটে একটী বৃক্ষের অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া সকলেই যারপর-নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, আর বৃক্ষের শাখাগুলিও সেই তালে তালে দুলিতেছিল। প্রথমতঃ অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, বানরাদি কোন জীব বুঝি বৃক্ষে উপবেশন করিয়া ডাল দোলাইতেছে। কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, বৃক্ষে কোন প্রকার প্রাণীই নাই; আপনাআপনি বৃক্ষের শাখাগুলি একবার ঊর্দ্ধগামী, একবার অধোগামী হইয়া গোস্বামী-প্রভুর নৃত্যের তালে তালে অতি আশ্চর্য্য নৃত্য করিতেছে !* শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন শ্রীক্ষেত্র হইতে ঝারিখণ্ডের পথে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখনও একবার তাঁহার উচ্চ-সংকীর্ত্তনে সেই স্থানের স্থাবর জঙ্গম ঐরূপ নৃত্য করিয়াছিল, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঃ—

"সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥
যৈছে কৈল ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।"

শ্রীবৃন্দাবনে 'রাধাবাগ' নামে একটী নির্জ্জন উদ্যান আছে। তথায় গোস্বামী-প্রভু অনেক সময়ে একাকী বসিয়া সাধন করিতেন। এইস্থানে একদিন তিনি একটী বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের দর্শন পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তখন তাঁহাদের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ঃ—

"একদিন শ্রীবৃন্দাবনে শিরোমণি মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো, আপনি শ্রীবৃন্দাবনে অনেক দিন যাবত অবস্থান করিতেছেন। ইহার মধ্যে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছেন কি ?' আমি বলিলাম—'যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন তবে বলিতে পারি। গতকল্য আমি রাধাবাগে বসিয়াছিলাম, আমার সম্মুখে একটী বৃক্ষ ছিল। কিছুকাল পরে দেখিলাম উহা বৃক্ষ নহে, জটাজুটধারী একজন মহাপুরুষ ! তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে

* ৺রামকুণ্ডবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত ইনি কীর্ত্তনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'যথার্থই যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, তাহা তোমার দর্শন হইবে, কিন্তু এ কথা কাহারও নিকট বলিও না।' আমার কথা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেখানে ললিতা দাস নামক একজন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটী বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণবী আমার কথা শুনিয়া বলিল—'এ বলে কি?' ললিতা দাস বলিলেন 'এ সব বায়ুর কাজ।' এই সকল কথা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। পর দিবস আমি আবার বাধাবাগে গেলাম। আবার সেই বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন বাবাজী (ললিতা দাস) বুঝি বলিয়াছে এ সব বায়ুর কাজ?' আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনি এ সব কি করিয়া জানিলেন?' মহাপুরুষ উত্তর করিলেন- 'আমি তোমার সঙ্গে শিরোমণি মহাশয়ের ওখানে গিয়াছিলাম। বাবাজী যেমন বলিয়াছে, তোমার ওসব বায়ুর কাজ, তেমনি উহার শাস্তি হইবে। তিনি দিনের মধ্যে শূল বেদনায় কষ্ট পাইয়া বাবাজীর মৃত্যু হইবে।' আমি এই কথা শুনিয়া অতি কাতরভাবে বাবাজীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলাম, অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, কিন্তু কিছুতেই মহাপুরুষের প্রাণ গলিল না। তিনি হাসিয়া বলিলেন -'উহা পূর্ব্বে ঠিক হইয়া রহিয়াছে, আর বাধা হইতে পারে না। "তৃণাদপি সুনীচেন" ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, সর্ব্বদা মাটিতে মিশিয়া থাকিবে। নিজ-নিন্দা কিংবা নিজের সম্বন্ধে কিছু ঘটিলে "তৃণাদপি সুনীচেন"; কিন্তু যখন দেবনিন্দা, শাস্ত্রনিন্দা প্রভৃতি শুনিবে, তখন বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হইতে হইবে।' মহাপুরুষের বাক্য শুনিয়া আমি ললিতা দাস বাবাজীর জন্য ব্যথিত হইলাম। এদিকে ললিতা দাস স্বপ্নে দেখিলেন কে যেন তাঁকে বলিতেছে—'ওরে পাপিষ্ঠ! তুই সাধুবাক্য অবহেলা করিয়াছিস্, এই পাপ শূল-বেদনারূপে প্রকাশিত হইয়া তিন দিন মধ্যে তোকে বিনষ্ট করিবে।' স্বপ্ন দেখিয়া বাবাজী ভীত হইয়া শিরোমণি মহাশয়কে গিয়া সমস্ত বিষয় জানাইল। তিনি বলিলেন,—'যখন তিনি আসিবেন, তখন ক্ষমা চাহিও।' তৎপর দিবস আমি যাইয়া উপস্থিত হইতেই, বাবাজী অতি কাতরভাবে আমার নিকট ক্ষমা চাহিল। আমি বলিলাম—'বাবাজী, আপনি বলিবার পূর্ব্বেই আমি আপনার জন্য মহাপুরুষের নিকটে ক্ষমা চাহিয়াছি, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিলেন না,—আমি কি করিব?' অতঃপর সত্য সত্যই তিন দিনের মধ্যে দারুণ শূল-বেদনায় বাবাজীর মৃত্যু হইল। তাঁহার সঙ্গীয় বৈষ্ণবী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন জানিতে পারিলাম যে ললিতা দাস তাঁহার ভ্রাতা।"*

শাস্ত্রে আছে যে মহামতি উদ্ধবের ন্যায় ভাগবতগণ, এমন কি, ব্রহ্মাদি

* শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামী-প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

দেবতারাও তরু গুল্মলতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতে অভিলাষ করেন।† এই বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের ঘটনাটি হইতে এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

*একদিন গোস্বামী-প্রভু শ্রীযমুনার তীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে উজ্জ্বল গৌরবর্ণবিশিষ্ট দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষপ্রবর ভূমি হইতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উচ্চে শূন্যের উপর দিয়াই গমন করিতেছিলেন! তাঁহার পদযুগল একেবারেই ধরাতল স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া, গোস্বামী-প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহাপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনাকে নিমাই-পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় পাইয়া গোস্বামী-প্রভুর বাক্যস্ফুরণ হইল না, কেবল চরণতলে পড়িয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে আবেগ একটু শিথিল হইলে বলিলেন -"ঠাকুর, বড় ঘুরিয়াছি!" তিনি উত্তর করিলেন -"তোদের কুলেরই এই রীতি।" তখন গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আপনি দয়া করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হউন, কলির মলিন জীব উদ্ধার করুন।" শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উত্তর করিলেন - "প্রকাশ হইবার দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন প্রকাশ হইলে কেহ আমাকে বিশ্বাস করিবে না।" এই কথা উল্লেখ করিরা গোস্বামী-প্রভু পরবর্ত্তী সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার বোধ হয়, মহাপ্রভুকে তখন তেমন ভাবে দরদ করিবার কেহ ছিল না. থাকিলে তিনি আরও কিছুদিন থাকিতেন।" সে যাহা হউক, অতঃপর গোস্বামী প্রভু, মহাপ্রভুকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন -"আপনার ধর্ম্ম কি?" মহাপ্রভু গম্ভীরস্বরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন।—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"*

*এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের একটী বহু প্রাচীন সমাধি যমুনাগর্ভে নিপতিত

---

† আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতি-বিমৃগ্যাং॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোক, উদ্ধবস্তোত্র।

অপিচ—তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকং।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্ক, ১৪অ, ৩২ শ্লোক, ব্রহ্মস্তোত্র।

* গোস্বামী-প্রভুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত।

হইবার উপক্রম হইলে, কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব তাহা রক্ষা করিবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, সমাধির অর্দ্ধেক পরিমাণ স্থান ইতিমধ্যেই ধসিয়া পড়িয়াছে। সমাধি সম্পূর্ণ রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। অতঃপর তাঁহারা উহার অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়া একখণ্ড অস্থি প্রাপ্ত হইলেন। অস্থিখণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"— শ্লোকটী অতি সুস্পষ্টভাবে দেবনাগরী অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং কি প্রকারে ঈদৃশ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসার জন্য গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি অস্থিখণ্ড দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এই অস্থিখণ্ড যাঁহার, তিনি একজন অতিশয় উচ্চস্তরের মহাপুরুষ ছিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁহার গুরুদত্ত এই মহামন্ত্র অভ্যস্ত হইয়াছিল। সেই নাম শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া রক্তমাংস ভেদ করতঃ অস্থি স্পর্শ করিয়াছিল। তাহাতেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।" অতঃপর মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে অস্থিখণ্ডকে সমাধিস্থ করা হইল।+ পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী-প্রভুর দেহেও এইরূপ অনেকানেক লক্ষণ অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে তাঁহার অঙ্গে 'হরি,' 'কৃষ্ণ,' 'রাধা', প্রভৃতি নাম আপনাআপনিই প্রস্ফুটিত হইত এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইত। অঙ্গে সরু লৌহশলাকা অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিলে যেরূপ চিহ্নিত হয়, নামের অক্ষরগুলি সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইত। এই অবস্থা ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামী-প্রভুর পরিধেয় বস্ত্রে, উপবেশনের আসনে, এমন কি গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ যে আম্রবৃক্ষের তলে তিনি অনেক সময়ে সাধন ভজন করিতেন, সেই বৃক্ষে পর্য্যন্ত ভগবানের বিভিন্ন নাম এবং সময়ে সময়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্যরূপেই প্রকাশিত হইত।* পরিধেয় বস্ত্রের ও আসনের চিত্রগুলি দেখিলে মনে হইত, যেন কোন সুকোমল হস্ত অপূর্ব্ব কৌশলে ও অতিশয় সন্তর্পণে বস্ত্রের অংশাবিশেষ কুঞ্চিত করিয়া নামের অক্ষর ও দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে! যখন ঐ সকল চিত্রগুলি একবার প্রকাশিত হইত, তখন হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহা কিছুতেই আর বিলুপ্ত করিতে পারা যাইত না। বস্ত্রখানি প্রসারিত করিয়া অথবা ঘসিয়া মাজিয়া ছাড়িয়া দিবামাত্রই পুনরায় চিত্রগুলি প্রকাশিত হইত। অনেক সময়ে গোস্বামী-প্রভুর বসিবার আসনের

+ গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

* গ্রন্থকর্ত্তা স্বচক্ষে এই সকল দর্শন করিয়াছেন।

উপর ছোট বড় নানাবিধ সুস্পষ্ট পদচিহ্নও পতিত হইত। কলিকাতায় হ্যারিসন রোডের ৪৫ নং ভবনে অবস্থানকালে শ্রীমান পান্নালাল ঘোষ নামক গোস্বামী-প্রভুর জনৈক শিষ্য, কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাঁহার নিকটে মহাভারত পাঠ করিতেন। এই সময়ে যে দিবস যে অধ্যায় পঠিত হইত, সেই দিনই বর্ণিত বিষয়ের অতি সুন্দর ও পরিষ্কার চিত্র গোস্বামী-প্রভুর বসিবার আসনে প্রকাশিত হইত। এই অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহারা সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন।+ গোস্বামী-প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামের পূর্ব্বোক্ত নামাঙ্কিত অস্থিখণ্ডের কথা উল্লেখপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"প্রকৃত শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম অভ্যস্ত হইলে এইরূপ অবস্থা হয়। তখন সাধকের দেহটী পর্য্যন্ত নাম-ব্রহ্মের মন্দির হইয়া যায়—রক্ত-মাংসের প্রত্যেক পরমাণুতে নাম উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতে থাকে। সেই নাম ক্রমশঃ শরীর ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত হয়। এইজন্য মহাত্মারা এই অবস্থা গোপন করিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন ও কেহ কেহ সর্ব্বদা গাত্রে আবরণ ব্যবহার করেন। ঈদৃশ মহাপুরুষেরা যে বৃক্ষতলে উপবেশন করেন তাহাতে পর্য্যন্ত নাম, নামের প্রতিপাদ্য দেবতার মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রকটিত হয়।" এই বলিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনের একটী কেলিকদম্ব বৃক্ষের কথা উল্লেখপূর্ব্বক বলিলেন যে, তাহাতে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাধা' 'রাম' প্রভৃতি অসংখ্য নাম বৃক্ষের ত্বকে স্বাভাবিক শিরার অক্ষরে প্রকটিত হইয়া আছে।* শ্রীবৃন্দাবনের কালীয় হ্রদের তীরে এই বৃক্ষটি এখনও বর্ত্তমান। কথিত আছে, ভগবান্ যশোদানন্দন কালীয় নাগ দমন করিবার সময়ে এই বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক জলাশয়ে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন।**

সংসারের অধিকাংশ কার্য্যের মধ্যেই কৃত্রিমতা দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যে কৃত্রিমতার মাত্রা যেরূপ অবাধ-বাণিজ্যের ন্যায় অত্যধিক পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে, এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে নারায়ণস্বামী নামক একজন 'নামজাদা, সাধু বাস করিতেন। ইনি প্রেতসিদ্ধ ছিলেন। প্রেতগণ ইচ্ছামত নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে।

+ গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত। ঘটনা অনেক দিন পর্য্যন্ত চাপা ছিল। পরে একদিন প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করেন।

* এতদ্দিন দুষ্ট লোকেরা যাত্রিদিগকে ভুলাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য কোন কোন বৃক্ষে ছুরিকা দ্বারা এক প্রকার নাম অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই সকল খোদিত অক্ষর হইতে পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ পৃথক—দৃষ্টি মাত্রেই পার্থক্য অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

** গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত। গ্রন্থকার নিজেও ঐ বৃক্ষ এবং নামাঙ্কিত অক্ষরগুলি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

স্বামীজী তাঁহার প্রেতের সাহায্যে নানাপ্রকার বুজরুকি দেখাইয়া অজ্ঞ সরল বিশ্বাসী লোকদিগের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু অধর্ম্ম, ভণ্ডামী চিরকাল গোপন থাকে না; একদিন না একদিন তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়েই; ইহা ভগবদ্বিধান। এই বিধান বিদ্যমান না থাকিলে এতদিন পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

একদিন নারায়ণস্বামী গোস্বামী-প্রভুর প্রভাবের বিষয় অবগত না হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি কি সাধন-ভজন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন? আমার শিষ্য হউন, একদিনের মধ্যেই ভগবান্ দর্শন করাইয়া দিব। আপনি 'অমুক' দিন 'অমুক' সময়ে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" গোস্বামী-প্রভু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বামীজীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে একখানি আসন প্রদানপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"কিয়ৎকালের জন্য ভগবানের নাম করিতে বিরত থাকিও।" ইতঃপূর্ব্বেই স্বামীজীর সততার প্রতি গোস্বামী-প্রভুর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এখন নাম করিতে নিষেধ করাতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল; তবু স্বামীজীর এই কার্য্যের রহস্য ভেদ করিবার জন্য, তাঁহার আদেশানুরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। কিন্তু নাম ত্যাগ করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কারণ, তৎপূর্ব্বে বহুদিন হইতেই তাঁহার গুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্বাসে চলিত। সে যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন—"দেখ, এই যে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়াছেন।" গোস্বামী-প্রভু চাহিয়া দেখিলেন,—সত্য সত্যই একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়াও তাঁহার মানসিক ভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, বরং মনে একপ্রকার অস্বাভাবিক জ্বালা উপস্থিত হইল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীজীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সতেজে বলিলেন—"একি! সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনে আমার যে প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয়, প্রাণে যেরূপ অপার্থিব শান্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহা হইতেছে না কেন? সুতরাং আমার মনে হয় এ সমস্ত ভৌতিক কাণ্ড! আপনি আমাকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।" এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী প্রেত সহসা নাকি-স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমাকে কাঁহার নিঁকটে উঁপস্থিত কঁরিয়াছিঁস্? এঁ যেঁ ভঁক্ত, আমি আর তিঁষ্ঠিতে পাঁরিতেছি না।" এই কথা বলিয়াই প্রেত অন্তর্দ্ধান করিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর ভণ্ডামীও প্রকাশিত হইয়া পড়িল।* অতঃপর স্বামীজী, গোস্বামী-প্রভুর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, এই ব্যাপার আর কাহারও কাছে

* যে রূপ দর্শনে স্ব স্ব ইষ্টনামের স্ফূর্তি না হয়, তাহা প্রকৃত ভগবদ্রূপ নহে, ভূতমায়া মাত্র।

প্রকাশ না করিতে অতি কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন স্বামীজী পুনরায় কাহাকেও এইরূপ আর প্রেত দ্বারা প্রতারণা করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।† শুনিয়াছি, স্বামীজী এই ঘটনার পর হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সত্য-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

পশ্চিমাঞ্চলের অনেক সাধুর এইরূপ প্রেতসিদ্ধি, 'কর্ণপিশাচ'সিদ্ধি এবং অনেক মুসলমান ফকিরের পৈরীসিদ্ধি থাকে। ইহারা এই সকল অপদেবতা দ্বারা নানা প্রকার বুজরুকী দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে। কেহ কেহ বা 'স্বরোদয়-সাধন' অভ্যাসপূর্ব্বক লোকের দুই চারিটা মনের কথা বলিয়া শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া, সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কর্ণপিশাচসিদ্ধ ব্যক্তিগণ একটী লোক দেখিয়া তাহার সাতপুরুষের নাম বলিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধির একটীও ধর্ম্মের সহায়তা করে না, বরং তাহা হইতে সর্ব্বথা বিচ্যুত করে। শাস্ত্রে আছে যে, যে সমস্ত তামসিক প্রকৃতির লোক এই সকল সিদ্ধি লইয়া থাকে, তাহাদিগের সাত জন্ম পর্য্যন্ত ভগবদ্ভজন হয় না।* এই সকল নরপিশাচগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, গোস্বামী-প্রভু প্রায়ই প্রকৃত সাধুর কয়েকটী লক্ষণের কথা উল্লেখ করিতেন। তাহা এই :—(১) "প্রকৃত সাধু কখনও আত্ম-প্রশংসা করেন না। (২) পরনিন্দা করেন না। (৩) কোন প্রকার বুজরুকী দেখান না। (৪) কাহারও বিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা বলেন না। (৫) কাহারও বুদ্ধি—ভেদ জন্মাইয়া আপনার মতে টানিতে চেষ্টা করেন না। (৬) তিনি সর্ব্বদা ভগবানে নির্ভর করিয়া থাকেন। (৭) অনাহারে প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট কিছু যাচঞা করেন না। এবং (৮) তিনি সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন। এই সকল লক্ষণগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধুসঙ্গ করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।"

গোস্বামী-প্রভু শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে অনেক সময়ে অনেক অপরিচিত সাধু মহাত্মা তাঁহার সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে আগমন করিতেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন সময়ে এমন গভীরভাবে কথোপকথন হইতে যে,

† গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

* যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ গীতা।
সপ্তজন্মোপদেবানাং কৃত্বা সেবাং সকর্ম্মতঃ।
লভতে চ রবের্মন্ত্রং সাক্ষিণঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ৩৬ অধ্যায়।

তন্মধ্যে সাধারণে প্রবেশ করিতে পারিত না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া এইরূপ অনেক সময়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন। একদিবস জনৈক অপরিচিত সাধু, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমনপূর্ব্বক কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"বহুকাল তপস্যা করিয়া আমি একটী অতীব আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়াছি। ইহা দ্বারা ইচ্ছামাত্র অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। আমি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে সেই শক্তি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। সমস্ত সংসার অন্বেষণ করিয়াও এই শক্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত লোক আর আমার চক্ষে পড়িল না।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করুন। যোগৈশ্বর্য্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও আবশ্যকতা নাই।" এই উত্তরে নিবস্ত না হইয়া সাধুটী গোস্বামী-প্রভুকে একটী মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বহু দিবস গত হইলে একদিন গোস্বামী-প্রভুর মনে হইল, 'সাধুর বাক্য সত্য কি না, ইহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?' মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গোবিন্দ জীউর মালাপ্রসাদ স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন বাবাজি দরজায় আঘাত করিয়া, "মহারাজ, মহারাজ" বলিয়া ডাকিতে লাগিল; এবং দরজা খুলিবামাত্র গোবিন্দ জীউর মালাপ্রসাদ গোস্বামী-প্রভুকে প্রদান করিল। গোস্বামী-প্রভু কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন এবং তখনই স্থির করিলেন, আর কখনও ঐ মন্ত্র ব্যবহার করিবেন না।* ঘটনাটী সামান্য বটে, কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর প্রতি সমসাময়িক সাধুসজ্জনের অটল গভীর শ্রদ্ধার ইহা একটী প্রমাণ।

এই সময়ে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ সূক্ষ্মদর্শী পরম ভাগবত প্রভুপাদ ৺নীলমণি গোস্বামী মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি তৎকালিক অপরাপর বাবাজী মহাশয়দিগের ন্যায় গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না, গোস্বামী-প্রভুর অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া ইনি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী মহোদয় এক দিবস নারায়ণগঞ্জস্থিত নিতাইগঞ্জের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের নিকট গোস্বামী-প্রভু সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা:—"প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে আসেন, এবং ভিন্ন আসনে বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি কিন্তু বিজয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম—'কি বিজয়, আমার নিকটও তোমার অনাত্মীয় পর-পর ভাব? তুমি যে আমাদের বংশের পরশমণি! আমি কি তাহা জানি না? এ মণির সংস্পর্শে জগতের জীব ধন্য হইবে, কৃতার্থ হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মে গিয়াছিলে বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমাকে চিনিতে পারে নাই, তুমি কি অপূর্ব্বরত্ন! অথবা

* ঢাকানিবাসী রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ

তাহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা এমন পরশমণির সংস্পর্শ করিয়া জীবন ধন্য করিতে সক্ষম হইল না! আমরা কিন্তু তোমাকে আমাদের বংশে পাইয়া যথার্থই ধন্য হইয়া গেলাম। তাঁহারা আরও ধন্য, যাঁহারা এ মণির সংস্পর্শ করিয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।' এই বলিয়াই আমি বিজয়ের হাত ধরিয়া আমার নিজের আসনে আনিয়া বসাইলাম। সে যে কি ভাব, যিনি চোখে দেখিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন। কিন্তু তখনকার সেই ভাব লিখিয়া বা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না, অসম্ভব! অসম্ভব! যেন সেই পুরাকালের ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি ধীরে-মধুর ভাষায় কত আলাপনই না করিলেন। আশ্চর্য্য, এই যে সাধারণ কথায়ও যেন ভক্তির প্রস্রবণ খুলিয়া পড়িতেছে! আজি কালিকার দিনে তেমন সুমধুর, সুললিত, তেমন অমিয়-পরিপূরিত ভাষা, যে ভাষা শুনিয়া ত্রিতাপে সন্তাপিত ও সংক্ষোভিত চিত্তেও শান্তি ও বিমলানন্দ প্রদান করিতে পারিয়াছে, আর ত সেই ভাষা শুনিতে পাওয়া যায় না! যাক্ সে কথা।

"ইহার পরে আমরা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করিতে চলিলাম। সঙ্গে সেই ভক্তির ভাণ্ডার বিজয়! মন্থর গতি। কি যেন কি ভাবে বিভোর, অথচ চলিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা শুনিতে পাইলাম—এক সুললিত সুমধুর অনির্ব্বচনীয় "হরি সংকীর্ত্তন।" তেমন পীযুষ-পরিপূরিত সুরতান-লয় সংযুক্ত সুমধুর "হরিনাম" আর কখনও শুনি নাই, জীবনে আর কখনও শুনিব বলিয়া আশাও নাই। বোধ হয়, বিজয়ের সঙ্গে পরিক্রমায় বহির্গত হওয়াতে এইরূপ অমৃতময় হরিনাম শ্রবণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। এদিকে যেমন হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ, অমনি বিজয় সেই দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন, আমরাও পিছু পিছু ছুটিলাম। কিন্তু বিজয় যেন মদমত্ত করীর ন্যায় ছুটিয়া আমাদিগের অপেক্ষা কিছু অগ্রগামী হইয়া পড়িলেন এবং কীর্ত্তনের একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব লোকললাম দিব্যকান্তি মহাপুরুষ ভাবে বিভোর হইয়া "হরিনাম" কীর্ত্তন করিতেছেন। যেই আমরা সকলে সম্মুখীন হইয়া পড়িলাম, অমনি মহাপুরুষটী অন্তর্হিত হইলেন। তখন বিজয় ও আমরা সকলে মহাপুরুষটী যে স্থানে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া দেখি এক অনতিউচ্চ শুষ্ক বৃক্ষের কাণ্ড। বিজয় উহা দেখিয়া তাঁহার নিজের হাতের যষ্টি দ্বারা ঐ বৃক্ষের চারিদিকে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বিজয় পুনরায় যাইয়া দেখিলেন, সেই বৃক্ষের চিহ্নমাত্রও নাই, কিন্তু যষ্টির গর্ত্তগুলি যেমন তেমনিই রহিয়াছে। বিজয় কিছুদিন পরে অনেকের অনুরোধে প্রকাশ করেন, যে একটী মহাপুরুষ ৺বৃন্দাবনধামে এইপ্রকার গুপ্তভাবে থাকিয়া সাধন-ভজন ও লীলা-গান করিয়া থাকেন।*

* ঢাকা, লোহজঙ্গনিবাসী, শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

এক দিবস গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় (জামালপুর হাই স্কুলের ভূতপূর্ব দ্বিতীয় শিক্ষক) রাত্রে স্বপ্ন-যোগে তদীয় পিতৃপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া, প্রাতে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিলেন,—"তোমার পিতৃপুরুষগণ তোমার হস্তের পিণ্ড কামনা করিতেছেন। অতএব তুমি যমুনাতীরে গিয়া যথাশাস্ত্র উহাদের নামে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর, তাহা হইলে উঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন।"

সতীশ—আমি ত বহুদিন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি। যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ত আমাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে হয়।

গোস্বামী-প্রভু—তাহা হইলে উপবীত গ্রহণ কর।

সতীশ—পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিব ত উপবীত পরিত্যাগ করিলাম কেন ?

গোস্বামী-প্রভু—কোন যথার্থ সৎ ব্রাহ্মণ উপবীত প্রদান করিলে তুমি কখনও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতে না।

সতীশ—সে কি! উপবীত পরিত্যাগ করা না করা ত আমার হাতে। সৎ ব্রাহ্মণ তাহার করিবেন কি ?

গোস্বামী-প্রভু—বটে! একটা উপবীত আনত, আমি পরাইয়া দেই, তুমি কেমন করিয়া ফেল দেখি ?

এই সময়ে জনৈক শিষ্য নূতন উপবীত গোস্বামী-প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি উহা মন্ত্রপূত করিয়া শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পরাইয়া দিলেন। গলদেশে উপবীত প্রদান করামাত্রই মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা ছিন্ন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু হঠাৎ আশ্চর্য্যভাবে হাতখানা বাঁকিয়ে যাওয়াতে উপবীত স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় উপবীত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় হাত বাঁকিয়ে গেল, এবারেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এইরূপ আরও কয়েকবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হইয়া, তিনি কাঁদিয়া গোস্বামী-প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন। এই ঘটনার পর শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবনে আর কখনও উপবীত ত্যাগ করিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই।

শ্রদ্ধেয় সতীশবাবু একদিন কথা-প্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গৈরিক বসন পরিধানের কোনরূপ নিয়ম আছে কি না ? তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"গৈরিক বস্ত্র পরিধান, ভস্মলেপন, দণ্ড-কমণ্ডলু ও চিমটা প্রভৃতি ধারণ—এই সকলেরই একটী বিশেষ অবস্থা আছে। সেই অবস্থা লাভ না হওয়ার পূর্ব্বে ঐ সকল ধারণ করিলে ঘোরতর অপরাধ হয়। শাস্ত্রে আছে,

ভগবতীর রজঃ হইতে গৈরিক হইয়াছে। গৈরিক বসনকে ভগবান্ বস্ত্র বলে। ভগবান নারায়ণের ঐ বসন। দেবদেবী, ঋষি-মুনি, যোগী মহাপুরুষদিগের উহা বড়ই আদরের বস্তু। উহা গ্রহণ করিয়া যথার্থরূপে উহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিলে ভয়ানক অপরাধ হয়। গৈরিক বসনে কাহারও কোনরূপে একবিন্দু বীর্য্যপাত হইলেই সমস্ত দেবদেবী, ঋষি-মুনিদিগের অভিশাপগ্রস্ত হইতে হয়। আজকাল এসব বিষয়ে একটা বিচার না থাকার ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে এসব বিষয়ে একটা শাসন ছিল, জিনিষেরও যথার্থ মর্য্যাদা ছিল। এখন বিদেশী রাজা, কে শাসন করিবে? তাই ফেরিওয়ালারাও গৈরিক বসন পরিধান করিতেছে।"

এই সময়ে একটী বৈষ্ণববেশ-ধারী প্রেত পঞ্চক্রোশী শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার পথে প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে অনেকের দৃষ্টি-পথে পতিত হইত। ঘটনাটী স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গোস্বামী-প্রভু একদিন যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া বাস্তবিকই দেখিতে পাইলেন, একটী বৈষ্ণব তাঁহার অগ্রে অগ্রে হরিনামের মালা করিতে করিতে গমন করিতেছে। গোস্বামী-প্রভু প্রথমে তাহাকে বৃন্দাবন-পরিক্রমণশীল জনৈক বৈষ্ণব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাহার অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি দ্রুতপদে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" বৈষ্ণববেশী—"আমি পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতাম, এখন কোন অপরাধের জন্য প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।"

গোস্বামী-প্রভু—আপনি এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য আপনার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে?

বৈষ্ণববেশী—আমি গোবিন্দ জীউর সেবক ছিলাম। সেবার বস্তু অপহরণ করাতে আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমি অত্যন্ত ক্লেশে আছি। সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় দিবারাত্রি তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছি।

গোস্বামী-প্রভু—আপনি যে হরিনাম জপ করিতেছেন, ইহাতে কোন ফল হইতেছে না?

বৈষ্ণববেশী—উহা পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃই হইতেছে, কিন্তু উহাতে কোন ফল দর্শিতেছে না।

গোস্বামী-প্রভু—তবে এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি?

বৈষ্ণববেশী—আমি যে পরিমাণে দেব সম্পত্তি অপচয় করিয়াছি, তাহা পূরণ করিয়া বিধিমত আমার শ্রাদ্ধ করা হইলে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। দেশে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আপনি যদি দয়া করিয়া আমার উত্তরাধিকারীকে জানাইয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে উদ্ধার পাইতে পারি।

এই বলিয়া বৈষ্ণব-বেশধারী প্রেত তাঁহার উত্তরাধিকারীর নাম-ধাম বলিয়া

দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল। বলাবাহুল্য, গোস্বামী-প্রভু তদনুসারে উক্ত মন্দিরের সেবায়েতের দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারীকে সমস্ত বিষয় জানাইয়া পত্র লিখাইয়াছিলেন। উত্তরাধিকারী মহাশয় সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া প্রেতের ইচ্ছানুরূপ সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

একদিবস কোথা হইতে তিন জন অপরিচিত মহাত্মা হঠাৎ আশ্রমে উপনীত হইলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া, যথাযোগ্য সম্মানসহকারে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইয়া, গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনিও তদনুসারে স্বীয় অঙ্গের 'আলখেল্লা' খুলিয়া রাখিলেন। অতঃপর সাধুত্রয় কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রকাশ্যে কোন প্রকার বাক্যালাপ না করিয়াই, ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এতদ্দর্শনে গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রেমিক ভক্ত ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একান্ত কৌতুহল-পরবশ হইয়া সাধুত্রয়কে অনুসরণ করিয়া রাস্তায় বহির্গত হইলেন, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছিলেন, এবং গোস্বামী-মহাশয়ের শরীরেই বা কি দেখিলেন, বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে কৃপাপূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হইক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন—"ভগবৎলক্ষণের সীমা ইঁহাতে দৃষ্ট হইল। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহার উপরেই সমস্ত ভার।"

এই স্থলে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে মহাপুরুষের লক্ষণ উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লক্ষণ যথা ঃ—

"পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথ গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্‌॥"

সামুদ্রকে তৃতীয় শ্লোক।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তির নাসিকা, হস্ত হনু (গণ্ডের উর্দ্ধভাগ), নয়ন ও জানু এই পঞ্চ দীর্ঘ; ত্বক, কেশ, অঙ্গুলীর পর্ব্ব, দন্ত ও রোম,—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম; নয়নের প্রান্তভাগ, চরণতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ—এই সপ্তস্থান রক্তিমাযুক্ত; বক্ষস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটিদেশ ও মুখ—এই ছয়টী স্থান সমুন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও লিঙ্গ,—এই তিনটি অঙ্গ খর্ব্ব; কটিদেশ, ললাট, ও বক্ষঃস্থল,—এই তিনটী বিশাল, এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটী গাম্ভীর্য্যযুক্ত,—এইরূপ অসাধারণ বত্রিশটী লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে, ইনি "মহাপুরুষ"। গোস্বামী-প্রভুর শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ পূর্ণরূপে বিদ্যমান, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ ও তদীয় সূক্ষ্মদর্শী শিষ্যাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ একেবারে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

এতদ্ভিন্ন "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে পূর্ণপুরুষের যে সকল আভ্যন্তরীণ লক্ষণের বিষয় বিবৃত আছে, তাহাও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত বলিয়া নিম্নে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা ঃ—

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসাযুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচিবর্শী।
স্থিরোদান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ।
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহ হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দু তয়াক্কচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥"

"পুরুষোত্তম" বা "পূর্ণপুরুষের" অসাধারণ গুণসমূহ এই,—সুরম্যাঙ্গ (সুগঠনযুক্ত অঙ্গ), সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, রুচির (সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নানন্দকারী), তেজস্বী, বলীয়ান, বয়সান্বিত (বার্দ্ধক্যেও যিনি যুবার ন্যায়), বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ,* সত্যবাক্য (যাহার বাক্য মিথ্যা হয় না), প্রিয়ম্বদ (অপরাধী জনের প্রতিও যিনি প্রিয় বা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করেন), বাবদূক (শ্রবণপ্রিয় বা শ্রুতিমধুর ও অর্থ-পরিপাটিযুক্ত বাক্য যিনি বলেন), সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাযুক্ত, বিদগ্ধ (শিল্প-বিলাসাদিতে যুক্তিযুক্ত), চতুর (এককালে অনেক কার্য্যের সমাধানকারী), দক্ষ (দুঃসাধ্য কার্য্য শীঘ্র সম্পাদনকারী), কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ (যিনি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করেন), শাস্ত্র-চক্ষুঃ (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন), শুচি (পাপনাশক ও

* গোস্বামী-প্রভুর কাকিনা অবস্থানকালে তথাকার রাজা বাহাদুর ৺মহিমা-রঞ্জন রায় মহাশয়, "সকল দেশের ভাষা না জানিয়া কি প্রকারে তত্তদঞ্চলের সাধু মহাত্মাদিগের কথা বুঝিতে পারেন"—এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিয়াছিলেন, "যাঁহার জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানের সহিত যুক্ত হয়, তাঁহার কিছুই জানিতে বাকী থাকে না।"

বিশুদ্ধ,) বশী (জিতেন্দ্রিয়), স্থির (ফলোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না), দান্ত (ক্লেশ-সহিষ্ণু), ক্ষমাশীল, গম্ভীর (যাঁহার মনোগত ভাব অতিশয় দুর্বোধ), ধৃতিমান্ (যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ ও ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও শান্ত), সমঃ (রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্ত), বদান্য (দান-বীর বা অতিশয় দাতা), ধাম্মিক (যে ব্যক্তি স্বয়ং ধর্ম্ম যাজন করেন ও অপরকে ধর্ম্ম যাজন করান), শূর, মান্যমানকৃৎ (মান্য ব্যক্তিকে মানদানকারী), বিনয়ী, দক্ষিণ (স্বীয় সুস্বভাব দ্বারা কোমলচরিত্র), হ্রীমান্ (লজ্জাশীল), শরণাগতপালক, সুখী, ভক্ত-সুহৃৎ, প্রেমবশ্য, করুণ (পরদুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম), সর্ব্ব-শুভঙ্কর (সর্ব্বসাধারণের হিতকারী), প্রতাপী, কীর্ত্তিমান্, রক্তলোক (সমস্ত লোকের অনুরাগভাজন), সাধু-সমাশ্রয় (সাধু-সজ্জনের পক্ষপাতী), সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, বলীয়ান্, ঈশ্বর (স্বতন্ত্র ও দুর্লঙ্ঘাজ্ঞ ; অর্থাৎ—কোন ব্যক্তি যাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না),—পুরুষোত্তমের এই পঞ্চাশৎ গুণ। ইহা সমুদ্রের ন্যায় দুর্বিগাহ্য। এই সমস্ত গুণ যদি জীবগণের থাকা সম্ভব হয়, তবে যে যে জীব ভগবানের অতিশয় অনুগৃহীত, কেবল সেই সকল জীবে বিন্দু বিন্দু রূপেই অবস্থিতি করে ; কিন্তু একমাত্র পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য কুত্রাপি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না।' গোস্বামী-প্রভুকে যথার্থরূপেই যাঁহারা জানিবার বা চিনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, বলাবাহুল্য—উক্ত দুর্লভ গুণাবলী তজ্জীবনে কিভাবে ও কি পরিমাণে স্ফূর্তি পাইয়াছিল একমাত্র তাঁহারাই তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে বা ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণের সময় উপস্থিত হইলে, গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্যসহ পরিক্রমণ করিতে মনস্থ কবিলেন। চৌরাশি ক্রোশব্যাপী ব্রজ-মণ্ডলস্থিত মধুবন, বেহুলাবন, কাম্যবন প্রভৃতি দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ বনের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন অন্যতম। পূর্ব্বে সমস্ত স্থানগুলিই নিবিড় জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের একাংশ এখন সহরে পরিণত হইয়াছে, অপর বনসমূহ প্রায় যেমন তেমনই আছে। ভগবান্ যশোদানন্দন, রাখালগণসহ গোচারণচ্ছলে সেই সকল স্বাভাবিক নিভৃত কুঞ্জে গোপিকানিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া অপার অপরিসীম লীলারস সম্ভোগ করিতেন। কথিত আছে যে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম-সময়ে দেবগণ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়া ব্রজভূমির চৌরাশি ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক লোক এইরূপে পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদ গোস্বামীপাদগণ এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও বিভাগ করিয়া প্রতিদিনের পরিক্রমণ-পথ ও স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর পরবর্ত্তী দশমী হইতে এই পরিক্রমণ আরম্ভ হয়। গোস্বামী-প্রভু পরম ভাগবত গৌর শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীরাধা নাম স্মরণপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডবাসী শ্রীমদ্ বেণীমাধব পাণ্ডা ও

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায় আগমন করিয়া ভুতেশ্বর মহাদেব, জন্মস্থলী, ধ্রুবটীলা, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান সকল দর্শন করিলেন। পরদিবস তালবন, মধুবন, কুমুদবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া শান্তনুকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। শান্তনু রাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম শান্তনুকুণ্ড হইয়াছে। এই স্থানে তিনি পুত্রার্থে গঙ্গাদেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে ভীষ্ম সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্তনুকুণ্ডস্থিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই ভ্রম জন্মে। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতীব মনোহর। চারিদিকে প্রস্ফুটিত কমল-শোভিত প্রকাণ্ড জলাশয়; মধ্যস্থলে অত্যুচ্চ টীলা, টীলার উপরিভাগে ভগবানের মন্দির বিরাজ করিতেছে। একটী সেতু পার হইয়া মন্দিরে যাইতে হয়। এই স্থলে একটী অপরিচিতা নিষ্ঠাবতী গোপী, নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় খুব ভক্তির সহিত ভাল ফল ও উৎকৃষ্ট বরফি দিয়া গোস্বামী-প্রভুর সেবা করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে গোস্বামী-প্রভু শান্তনুকুণ্ড হইতে বেহুলাবনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসজীর কৃপাপ্রাপ্ত একটী বৃদ্ধা বিধবা রমণী রুগ্ন অবস্থায়ও পরিক্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া, গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গ ধরিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে 'মা' বলিয়া মাতার ন্যায় শুশ্রূষা করিতেন। বেহুলাবনে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, অতি প্রত্যুষে 'জয় রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া তাঁহারা রাধাকুণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাঢ় গ্রাম অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ভারত-বর্ষের চারি ধাম পরিক্রমণকরতঃ শেষে যখন মথুরামণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন এই কুণ্ডে অবগাহন করিয়াছিলেন।

সূর্য্যকুণ্ড হইতে প্রায় দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে গোস্বামী-প্রভু সদলবলে রাধা-কুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী-প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ৺শ্রীধর ঘোষ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আসিয়া শ্রীমদ্ বেণীমাধব পাণ্ডার বাড়ীতে*

* গোস্বামী-প্রভু এই বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বেও একবার শীতকালে ২।৩ মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শীতাধিক্যবশতঃ তথায় সর্ব্বদা ধুনী জ্বালান থাকিত, এই নিমিত্ত উত্তরকালে ইহা ধুনী-ঘর নামে প্রসিদ্ধ হয়। বেণীমাধব, প্রভুজীর স্মৃতি-রক্ষাকল্পে, প্রভুর শিষ্যবর্গ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে একটী পাকা কোঠা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনি ও তৎপুত্র যুগলকিশোর অকালে পরলোকগমন করায়, তাঁহাদের ঋণের জন্য ধুনী-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীযোগজীবন গোস্বামী মহোদয়ের শিষ্য নোয়াখালী দালালবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়দ্বয় প্রভুর স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ঐ

স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন, এবং পরিক্রমণের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়া কুণ্ডদ্বয় প্রদক্ষিণ করিলেন। এই স্থানে ললিতাদি অষ্ট সখীর পৃথক্ পৃথক্ কুণ্ডও আছে। রাধাকুণ্ডের তীরে বৈরাগী-শিরোমণি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর ও ভক্তপ্রবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে গৃহে বসিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে।

রাধা কুণ্ডের অপরাপর দ্রষ্টব্য স্থান সকল দর্শন করিয়া, গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুসুম-সরোবর হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। যখন সঙ্গের অপরাপর সকলে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোস্বামী-প্রভু কুসুমসরোবর হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একাকী গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পর্ব্বতের কোন নির্জ্জন স্থানে একটি গোফার সন্নিকটে কতকগুলি কঙ্কাল খট্ খট্ করিয়া নাড়িয়া উঠিল। তিনি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন যে একখানি কঙ্কাল-হস্ত ইসারা করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। গোস্বামী প্রভু নিকটবর্ত্তী হইলে অস্থিমাত্রে পরিণত একটি মনুষ্য মূর্ত্তি দণ্ডায়মান্ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই মহাপুরুষটির কোন অঙ্গেই রক্ত-মাংসের সংস্রব নাই, কেবল চোখের কোটরে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু ও মুখ-গহ্বরে জিহ্বাটি মাত্র বর্ত্তমান আছে এবং হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতির কঙ্কালাংশ সন্ধিস্থল-গুলিতে যথাযথ সংযুক্তই রহিয়াছে, সুতরাং হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে কোন বাধা জন্মে না। এই অদ্ভুত পুরুষ দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং ভক্তিভরে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাতে বাধা প্রদানকরতঃ নিজেই গোস্বামী-প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। গোস্বামী-প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার যে শরীর দেখিতেছি ইহাকেই কি সূক্ষ্ম-শরীর বলে?" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন—"না, ইহাকে সূক্ষ্ম-শরীর বলে না, তাহা ভিন্ন প্রকার। তবে ভগবান্ এই এক প্রকারে আমাকে রাখিয়াছেন। আমার

বাড়ীটী ক্রয় করিয়াছেন, এবং ঐ ধুনী-ঘরের সংলগ্ন করিয়া আর একটী বড় কোঠা, একখানা পাকের ঘর ও পায়খানা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এখন এই ধুনী-ঘরটী শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শনার্থী প্রভুজীর শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্তবর্গের অতি সুন্দর আশ্রয়স্থলী হইয়াছে। সম্প্রতি প্রভুজীর উপবেশন-স্থানে, একখানা আসন স্থাপনপূর্ব্বক নিত্য নিয়মিত ধূপ-দীপাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় ধুনী-ঘরটী আশ্রমাকারে পরিণত হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রভুজীর শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্তবৃন্দের যথার্থই আশীর্ভাজন ও ধন্যবাদার্হ।

শরীরের এক এক ইন্দ্রিয়ের বাসনা ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎ অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছে, কেবল চক্ষু ও জিহ্বার বাসনা আছে, তাই সেই দুইটি মাত্র অবশিষ্ট আছে।" গোস্বামী-প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আবার কি বাসনা থাকিতে পারে?" তিনি উত্তর করিলেন—"ভগবানের লীলা দর্শন ও হরিনাম করিবার বাসনা এখনও আছে, সেইজন্য চক্ষু ও জিহ্বা রহিয়াছে। ভগবান যশোদানন্দনের কৃপায় অদ্য আমার একটি বাসনা পূর্ণ হইল।" এই বলিয়া তিনি গোস্বামী-প্রভুকে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কত কাল এইভাবে অবস্থিতি করিতেছেন?" মহাপুরুষ উত্তর করিলেন যে তাঁহার বয়ঃক্রম চারিশত বৎসরের অধিক হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল—ইত্যাদি।* কোন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে, "ভগবানের এক অবতার হইতে আর এক অবতার হওয়া পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব-অবতারের একজন করিয়া পার্ষদ সেই দেহেই বর্ত্তমান থাকেন। লীলারাজ্যের ইহা একটি অব্যর্থ নিয়ম। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের শ্রীদাম সখা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ভাণ্ডীর বনে একটি গোফার মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া ছিলেন। পরে অভিরাম গোস্বামী নাম ধারণ করিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।" এই কঙ্কালাবশিষ্ট মহাপুরুষ গৌরাঙ্গ-লীলা দর্শন করিয়া, ভগবানের অন্য কোন্ ভাবী অবতারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহা মাদৃশ অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য। সে যাহা হউক, এই মহাত্মার আর একটি অদ্ভুত মহিমার কথা অবগত হইলে বিস্মিত হইতে হয়। বৎসরের মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি একবার মাত্র উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' এই ধ্বনি করেন। তখন তাঁহার জিহ্বা মাত্র হইতে এই শব্দ এতদূর উচ্চনাদে নিনাদিত হয় যে, ৭।৮ মাইল দূর হইতে তাহা শ্রবণ করা যায়। গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি সপ্ত মাইল দূরবর্ত্তী কোন একটী স্থান হইতে তাঁহার এই 'হরিবোল' ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।**

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু কুসুম-সরোবর হইতে যাত্রীদিগের সঙ্গে গোবর্দ্ধন পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে 'দাউজী'র চরণ-চিহ্ন দর্শন করিলেন। বালক বলরামের বৃহৎ পদচিহ্ন দেখিয়া একজনের মনে সন্দেহ হইলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে ইহা নবদ্বীপচন্দ্রের পদচিহ্ন। মহাপ্রভুও পাষাণের বুকে পদ প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। এবিষয়ের প্রমাণ পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

** শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসী প্রাচীন বৈষ্ণবগণ এখনও ইহার কথা বলিয়া থাকেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্তর্দ্ধানের কিয়ৎকাল পরে ইনি লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছেন।

মন্দিরে গেলেই পাওয়া যায়। দাউজীর চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহারা দানঘাটে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহা ধরিয়া কতই রোদন করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমণ করিতে করিতে বলদেবকুণ্ড হইয়া অতঃপর তাঁহারা গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোপালদেবের মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিকটে পুরী-স্বামীজীর আসন (বৈঠক) বিদ্যমান্। গোবিন্দকুণ্ডের নিকটস্থ একটী মন্দিরে শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দাস নামক একজন বৈষ্ণব-মহাজন বাস করিতেন। ইনি গোবর্দ্ধনে একাসনে চল্লিশ বৎসর সাধন করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিবামাত্রই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন—আবার কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন!" এইস্থানে গোস্বামী-প্রভু পথ চলিতে-চলিতে কি যেন দেখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে লোকসমাগম অবলোকন করিয়া ভাব সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় চলিতে লাগিলেন।

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমণ শেষ হইলে গোস্বামী-প্রভু মানসীগঙ্গা, যশোদাকুণ্ড, হরদেবজী, গুলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল, রূপসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া অলকাগঙ্গায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে জননী শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী বনযাত্রীদিগের সঙ্গে একটী বৃহৎকায় মহাবীরকে (হনুমান) পরিক্রমণ করিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং গোস্বামী-প্রভুর নিকটে এই কথার উল্লেখ করিলে, তিনি বলিলেন—"বনযাত্রীদিগের রক্ষকস্বরূপ হইয়া স্বয়ং মহাবীরই অলক্ষিতভাবে তাঁহাদের সহিত পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া যায়, তাঁহারা তাঁহার দর্শন পাইবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় কি?"

অলকাগঙ্গা হইতে আদি বদ্রি হইয়া তাঁহারা কাম্যবনে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে হঠাৎ বনরাজির মধ্য হইতে সুমধুর চিত্তাকর্ষক সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু গায়ককে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাঁহার দর্শন না পাইয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া "কে অলক্ষিতভাবে থাকিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতেছেন? দয়া করিয়া আমায় দর্শন দিন।"—এইরূপ অনুরোধ করিবামাত্র সেই স্থানের একটী বৃক্ষ জটাজূটধারী একটী মহাপুরুষের আকার ধারণ করিয়া তৎসমীপে উপনীত হইলেন। গোস্বামী-প্রভু সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে, তিনি বলিলেন—"এইস্থানে যতগুলি বৃক্ষ দেখিতেছেন, সকলেই এক একটী মহাপুরুষ! শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নিত্যলীলা দর্শন করিবার জন্য আমরা এই এইভাবে অবস্থান করিতেছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু

সেই স্থানের বৃক্ষরাজিকে উদ্দেশ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উঠিয়া দেখিলেন, বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ তন্মধ্যেই অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

কাম্যবন হইতে গোস্বামী-প্রভু বিমলাকুণ্ড হইয়া 'লুক্‌লুকি' কুণ্ডে উপনীত হইলেন। এই স্থানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বয়স্যবর্গের সহিত চোক্‌-বাঁধাবাঁধি খেলা করিতেন। অতঃপর লঙ্কাকুণ্ড দর্শন করিয়া চরণপাহাড়ী আগমন করিলেন। চরণপাহাড়ী, কদমখণ্ডী, কালীয়াদহ প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলের বহু স্থানে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের সেই জগমনোমোহন লীলাসমূহের অনেক চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। চরণপাহাড়ীতে পাষাণের গাত্রে অদ্যাপি অসংখ্য পদচিহ্ন বিদ্যমান থাকিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানাভিমানী সুধীবৃন্দের দর্প চূর্ণ ও ভক্তবৃন্দকে মহা প্রেম-সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ত্রিজগম্মানসাকর্ষী, সুমধুর মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রগাঢ় প্রেমভরে পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রবীভুত হইয়া মোমের সমধর্ম্মিতা প্রাপ্ত হইত! তদবস্থায় মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি যে সকল জীব-জন্তু তথায় বিচরণ করিত, তাহাদেরই পদচিহ্ন পড়িয়া যাইত। পরে মোহন বংশীধ্বনি নীরব হইলে, পাষাণরাশি পুনরায় ধীরে ধীরে স্বীয় স্বাভাবিক কাঠিন্য প্রাপ্ত হইলেও, পদচিহ্নগুলি কিন্তু আর বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা অদ্যাপি যেমন তেমনই রহিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের গাত্রে বৃন্দাবনচন্দ্র, রাখালগণ ও গো-বৎসাদির অনেক পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন দেখিয়া রাখালগণের পদচিহ্ন হইতে ভগবানের পদচিহ্ন পৃথক করিয়া লওয়া যায়। গোস্বামী-প্রভু থাকিয়া থাকিয়া সেই সব স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তৎপরে গোস্বামী-প্রভু যাত্রীদলের সহিত কদমখণ্ডীতে উপনীত হইলেন। এই স্থানে একপ্রকার 'দোনার' (ঠোঙ্গার) গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবৃন্দা-বনবিহারী বয়স্যগণসহ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দুগ্ধপান করিবার জন্য বৃক্ষের নিকট পানপাত্র যাচঞা করিলে, ব্রজভুমির কল্পবৃক্ষ হইতে সেই সকল দোনা সংগ্রহ করিয়া কামধেনু হইতে দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক আনন্দে পান করিতেন। অদ্যাবধি দিবা-দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই সকল বৃক্ষের বহু সংখ্যক পত্র আপনাআপনি সঙ্কুচিত হইয়া অপূর্ব্ব দোনার আকার ধারণ করে; এবং কিয়ৎকাল এই অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে গোস্বামী-প্রভু ও তাঁহার সহচরগণ এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

কদমখণ্ডী হইতে একটী ময়ূর গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গ ধরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। যে-যে স্থানে তিনি সশিষ্য উপবেশন করিতেন, সেই সকল স্থানে ময়ূরটী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অদ্ভুত নৃত্য দেখাইত; আবার, তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলেই ময়ূরটীও সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

এই প্রকারে প্রায় ১৪।১৫ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইলে, ময়ূরটী হঠাৎ একদিন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না !

অতঃপর তাঁহারা মানগড়ে উপনীত হইলেন। এইস্থলে অনেক নূপুরের বৃক্ষ আছে। যশোদাদুলাল ব্রজ-বালকবৃন্দসহ বৃন্দাবনের বনে বনে নৃত্য করিবার জন্য কল্পবৃক্ষের নিকট নূপুর চাহিলে তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে তাহা প্রদান করিত। তদবধি এই সকল বৃক্ষে নূপুর জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ বকফুলের ছড়ার ন্যায় একটী বৃন্তে একটী করিয়া ছড়া বাহির হয়। পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের অগ্রভাগ পুনরায় মিলিত হয় ও নূপুরের আকার ধারণ করে। ছড়াগুলি পরিপক্ক হইলে ভিতরের বীজগুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। তখন তাহা নাড়িলে নূপুরের ধ্বনির ন্যায় 'ঝুমুর ঝুমুর' শব্দ বাহির হয়। বৃন্দাবনের স্বভাব-শিশুদিগের ইহাই নূপুর। ভগবান্ যশোদানন্দন, রাখাল বালক সমভিব্যাহারে এই সকল নূপুর পরিধানপূর্ব্বক মধুর মুরলীধ্বনি করিতে করিতে সময়ে সময়ে অপূর্ব্ব নৃত্য-লীলার অনুষ্ঠান করিতেন। তাহা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনের পশু-পক্ষী-পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া যাইত, ময়ূর-ময়ূরী পেখম ধরিয়া তালে তালে নৃত্য করিত, ধেনু-বৎসগণ না জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া 'হাম্বা' 'হাম্বা' রবে বনভূমি মাতাইয়া তুলিত, শুক-শারী প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ প্রেমে বিগলিত হইয়া, যশোদাদুলালের সেই মুরলীর মোহন-ধ্বনিসহ সুমধুর কুজনে সমগ্র ব্রজভূমি মুখরিত করিত। শুকপিকের কাকলি-মিশ্রিত সেই মুরলী-নিঃস্বনে না জানি কত মুনিঋষির ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, কত ব্রজমাতার স্তন যুগল হইতে স্নেহভরে দুগ্ধ ক্ষরণ হইয়াছে ! অহো ! অদ্যাপি সেই লীলামাধুরী স্মরণ মনন্ করতঃ, কত শত ভক্তবৃন্দ যে প্রেমরসে বিবশ হইয়া দরবিগলিত আনন্দাশ্রু-ধারায় ধরিত্রীদেবীকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি প্রকারে তাহার বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে ?

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণসহ নন্দঘাট, রামঘাট, বলরামকুণ্ড, পাণিগ্রাম প্রভৃতি লীলাস্থল দর্শন করিয়া ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তাঁহারা বেলবনে আগমন করিলেন। এই স্থানেও কয়েকটী বৃক্ষে 'হরেকৃষ্ণ', 'রামকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত আছে। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন মহাত্মা বৃন্দাবনের রজঃ-প্রভাবে অচল বৃক্ষাকার ধারণ করিয়াছেন, আর নামগুলি তাঁহারই গাত্রের ছাপ মাত্র। গোস্বামী-প্রভু এই স্থান হইতে লোহবন হইয়া মহাবনে উপনীত হইলেন। মহাবনে নন্দের বাড়ী। এই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন প্রভাতে তিনি শিষ্যগণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডঘাটে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন। পরে দধিমন্থনস্থান ও যমলার্জ্জুন হইয়া নূতন গোকুলে উপনীত হইলেন। এই স্থানে গোকুলের গোস্বামীগণ বাস করিয়া

থাকেন। সম্মুখেই যমুনা। গোস্বামী-প্রভু যমুনা পার হইয়া মথুরায় উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে শুভ একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাদশী তিথিতে তিনি পুনরায় নিজ বৃন্দাবন পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন ও প্রথমে কেশীঘাট, পরে জ্ঞানগোধুরী ও রাধাবাগ হইয়া বদ্রিনাথ দর্শন করিয়া রাজঘাটে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। মহাপ্রভু এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নিকটে কোনও একটী প্রাচীন বৃক্ষমূলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বিগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া যাত্রিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে উত্তরাভিমুখে দাবানলকুণ্ড, কালীয় হ্রদ, কিশোরঘাট হইয়া শৃঙ্গারঘাটে উপস্থিত হইলেন। শৃঙ্গারঘাটে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ দর্শন করিয়া বস্ত্রহরণঘাট, গোবিন্দঘাট ও ভ্রমরঘাট হইয়া পুনরায় কেশীঘাটে আগমন করিলেন। এতদিন শ্রীবৃন্দাবন লোকাভাবে কি এক গভীর দুঃখব্যঞ্জক নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিল, আবার লোকসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন-বিহারীর জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল।

এদিকে বৃদ্ধ গৌর শিরোমণি মহাশয়, তদীয় প্রাণের দরদী গোস্বামী-প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন। এখন তাঁহার সেই প্রাণের প্রিয়তম বস্তুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎসহবাসে অতীব আনন্দের সহিত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন শিরোমণি মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"দেখুন, প্রভু! আমি রাধারাণীর কৃপায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সময়ে সময়ে লীলারস সম্ভোগও করিয়া থাকি; কিন্তু জানি না কেন তাহা স্থায়ী হয় না। এই দুঃখে দিবানিশি আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলিতে থাকে। শাস্ত্রে আছে, সদ্‌গুরুর শক্তি-লাভ শ্রীবৃন্দাবনের মধুর লীলায় প্রবেশাধিকার জন্মে না। আপনিই সেই সদ্‌গুরুরূপে ভাগ্যবান্ জীবকে কৃপা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইয়াছি। অতএব, প্রভু আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। আমাকে সেই বস্তু প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শিরোমণি মহাশয় কলেবর পরিত্যাগ করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে অতিশয় সমারোহের সহিত মহোৎসব ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। গোস্বামী-প্রভু সশিষ্য তাহাতে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মহোৎসবের কয়েক দিন পরে শিরোমণি মহাশয় একদিন দিব্যদেহে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"প্রভো, আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আপনার কৃপায় আমি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ইহার পর মাঘ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়। কুম্ভমেলা

ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাপুরুষদিগের সম্মিলনক্ষেত্র। প্রতি তিন বৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, পঞ্চবটী ও উজ্জয়িনী—এই চারি স্থানে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়া থাকে।

"গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ ধারা গোদাবরীতটে।
কলসাখ্যোহি যোগেঽয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ ..

অস্যার্থ—যে যোগ উপলক্ষ করিয়া গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে), প্রয়াগে, ধারা (অবন্তিকা, উজ্জয়িনী) ও গোদাবরী-তটে (পঞ্চবটী, নাসিক) অমৃত-মহোৎসব হইয়া থাকে, শঙ্কর প্রভৃতি তাহাকে কলসাখ্য (অর্থাৎ কুম্ভ) যোগ বলিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে সমুদ্র-মন্থনে অমৃত কলস (কুম্ভ) উত্থিত হইলে, উহা লইয়া দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে মহা-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তখন দেবতারা অসুরদিগের ভয়ে ভীত হইয়া ঐ অমৃত-কলস পৃথক্ পৃথক্ দিনে হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তদবধি দেবতা ও মহাপুরুষগণ ঐ সকল স্থানে সমবেত হইয়া (সম্ভবতঃ কুম্ভ রাশিতে) অমৃত-কুম্ভ মহোৎসব সম্পন্ন করেন। পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ উৎসব উপলক্ষে ঐ সকল স্থানে তিন তিন বৎসর অন্তর কুম্ভ রাশিতে তাঁহার সম্প্রদায়ের সাধু-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন। ক্রমে অপরাপর সম্প্রদায়ও উহাতে যোগদান করেন।*

বর্ত্তমান সময়ে ইহার কোন উদ্যোগকর্ত্তা নাই, আবাহনকর্ত্তা নাই, সংবাদদাতা নাই। কুম্ভমেলা সকলেরই মেলা, সকলেই স্বয়ং আহূত। এই সকল সম্মিলনক্ষেত্রে নানা স্থানের সাধু-সজ্জনগণ, এমন কি পাহাড়-পর্ব্বতবাসী মহাপুরুষেরাও একত্র হইয়া, প্রশান্তভাবে নির্ব্বিবাদে পরস্পর ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনমার্গের অবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন ; এবং দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মভাব কিরূপ, কি প্রকার ব্যবস্থা করিলে দেশের লোকের কল্যাণ হয়, তাহা স্থির করিয়া এক এক দেশের ভার এক একটী মহাপুরুষের উপর অর্পণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। এবং এই সুযোগে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু গৃহস্থ নরনারী মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া, সাধু-সন্দর্শন ও তাঁহাদের ভবব্যাধি-বিনাশক, ত্রিতাপজ্বালা-নিবারক উপদেশামৃত পান করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হন।

পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইত না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমৎ রূপ-সনাতন প্রমুখ বৈষ্ণবদিগের প্রযত্নে শ্রীবৃন্দাবনে এই সাধু-সমাগমের ব্যবস্থা হয়। তদবধি যে বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়, তাহারই কিছু পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ শ্রীবৃন্দাবনে সমবেত হইয়া, এক মাসকাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যথাকালে হরিদ্বারে গমন করেন।

---

* আর্য্যদর্শন, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

গোস্বামী-প্রভু প্রতিদিন মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া সাধুসন্দর্শন ও তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। যতদিন মেলা ছিল, ততদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মেলা অন্তে সাধুগণ হরিদ্বার গমন করিলেন। গোস্বামী-প্রভুও হরিদ্বার যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীকে শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, সকলেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। যিনি জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কল্পনাও করিতে পারেন নাই, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্বামী হইতে দূরে অবস্থান করিতে হইলে যিনি সর্ব্বদা ম্রিয়মানা থাকিতেন, কিছুদিন পূর্ব্বে যিনি পতি-বিরহে ব্যাকুল হইয়া পাগলিনীপ্রায় ঢাকা হইতে বৃন্দাবনে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পতিপ্রাণা সতী আজ স্ব-ইচ্ছায় পতিকে ছাড়িয়া থাকিতে কৃতসংকল্প, ইহার কারণ কি? কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই জননী যোগমায়া গুরুকৃপায় নিত্য বৃন্দাবন-বাসের অধিকারিণী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার গুরুদেব, সর্ব্বস্ব-ধন জীবন-স্বামীকে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত অভিন্নরূপে অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর সন্দর্শন করিয়া, দিবানিশি সেইভাবেই বিভোর ও তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে যোগমায়া দেবী দেহে থাকা সত্ত্বেও যে রাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তথায় সময় এবং স্থানের ব্যবধান নাই, মায়ার আবরণ নাই। সেখানে যাহা কিছু আস্বাদনীয় ও দর্শনীয় আছে, তৎ-সমস্তই এখন জননী যোগমায়া দেবী তাঁহার নিকটে, অতি নিকটে, প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতেছেন! সুতরাং সতীর আর এখন পতি-বিরহের আশঙ্কা কোথায়?

অতঃপর জননী যোগমায়া দেবী, স্বীয় পতিদেবতার অনুমতি-গ্রহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিন নির্ণয়-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের দিন মাঘী ত্রয়োদশী তিথিতে বিসূচিকা রোগ উপলক্ষ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। বঙ্গ-আকাশের সুবিমল চন্দ্রমা চিরদিনের তরে শ্রীবৃন্দাবন-শৈলে অস্তমিত হইলেন। কত শত নর-নারী আজ তাঁহাকে হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? জননী যোগমায়া এখন সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত মায়ার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অপ্রাকৃত স্বীয় স্বরূপে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জনগণের কল্যাণ-কামনায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। যাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন এবং তাঁহার স্নেহবিগলিত স্তন্যসুধা পান করিয়া ভব-ক্ষুধা মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন। আর যাঁহারা আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার কৃপার প্রার্থী হইবেন, তাঁহারাও যে তাঁহার অসীম করুণা উপলব্ধি করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর অপূর্ব্ব জীবন-চিত্র মৎ-প্রণীত "যোগমায়া ঠাকুরাণী" নামক পৃথক্ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনপ্রাপ্তির পর, গোস্বামী-প্রভু ঢাকাতে স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নিকটে যোগমায়া দেবীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

"ওঁ হরিঃ।

শ্রীবৃন্দাবন।

দাউজীর মন্দির, গোপীনাথের বাগ।

কল্যাণবরেষু,

গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাস-নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজ সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শোভা-সৌন্দর্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে যে, সে যেন শোক না করে, ইহা শোকের ব্যাপার নহে, বহু সৌভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব।

শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে খাওয়ায়।

মা শান্তি, শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শীঘ্র পারি, আমরা ঢাকা যাইব।

আশীর্বাদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন। হিমালয় ও কৈলাস-পর্ব্বত ভ্রমণ বিবরণ।

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর তিরোভাবের মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ১২৯৭ সনের ফাল্গুন মাসে গোস্বামী-প্রভু কুম্ভমেলায় যোগদান করিবার জন্য হরিদ্বার গমন করেন। হরিদ্বার পহুঁছিয়াই তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং স্নানান্তে শ্রীমদ্ যোগজীবন গোস্বামী দ্বারা শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর একখণ্ড অস্থি গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করাইলেন। অতঃপর ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে গঙ্গার উপরে একটী পাণ্ডার বাটী ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই বৎসর মেলা উপলক্ষে প্রায় তিন লক্ষ ধর্ম্মার্থীর সমাগম হইয়াছিল। হরিদ্বারে স্থানের অল্পতাবশতঃ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে, গঙ্গার চড়ায়, কনখল প্রভৃতি স্থানে সাধুসন্ন্যাসিগণ আপন আপন আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। দিবানিশি হরিনাম গান, হরিকথা আলাপন প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা মেলাস্থলে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত হইত। এক দিবস গোস্বামী-প্রভু তদীয় পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী এবং শ্রদ্ধেয় শিষ্যবর্গ ৺রামকৃষ্ণ গুহ, ৺রাজকুমার দত্ত, ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৺শ্রীধর ঘোষ প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কনখলে সাধুদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর দিকে কিয়ৎকাল স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবাবেশে গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর।

"যাঁদের হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝরে,
ঐ দেখ, তারা দু'ভাই এসেছে রে।
(যাঁরা প্রেমে জগৎ ভাসাইল)
(যাঁরা নামে জগৎ মাতাইল)
তাঁরা দু'ভাই এসেছে রে॥"—ইত্যাদি

গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যগণ গানে যোগদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটি প্রবল ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোস্বামী-প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক গোস্বামী-প্রভুকে বেষ্টন-পূর্ব্বক তারক-ব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনিতে মুহুর্মুহু দশদিক্ প্রকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সাধু মহাত্মাগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন,—এমন অদ্ভুত নৃত্য, এমন অপূর্ব্ব ভাব, এবম্প্রকার প্রাণমাতান নামকীর্ত্তন তাঁহারা যেন কখনও শ্রবণ করেন

নাই। রাধাকুণ্ডবাসী স্বর্গীয় বেণীমাধব পাণ্ডা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে গোস্বামী-প্রভুর বক্ষে—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—এই শ্লোকটী উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলেন।

অতঃপর লোক সংঘট্ট দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু ভাব সংবরণপূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলে, উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাত্মা জগতে অতীব দুর্ল্লভ। ভক্তিভাজন ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এসম্বন্ধে বলিতেন—"কোটীতে গোটী (একটী)।"

ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

অর্থাৎ—"সহস্র লোকের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে যত্ন করে। এইরূপ সিদ্ধিলাভে যত্নশীল ব্যক্তির মধ্যে আবার ক্বচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ঈদৃশ সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যেও ক্বচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ অবগত হইতে পারে।"

এই কুম্ভমেলায় শত সহস্র সাধু সমবেত হইলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র তিন চারিজন প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাদের একজনের সহিত গোস্বামী-প্রভুর এই সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।—"হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় প্রায় লক্ষ সাধুর সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিনজন মাত্র যথার্থ তত্ত্বদর্শী, আর সকলে বেশভুষা, সম্প্রদায়, মতামত লইয়া ব্যস্ত। এই তিনজনের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সাধুরা এত কঠোরতা করিয়াও তত্ত্বলাভ করেন না কেন? তিনি হিন্দিতে বলিলেন—"বাবা, আমি ক্ষুদ্র কীট, কি বলিব?" অনেক ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে বলিলেন—"এখন কেহ ভগবানকে চায় না। মান মর্য্যাদা, বুজরুকী, মোহান্তগিরি চায়, তাহা পায়। কিন্তু 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—ইত্যাদি।"*

একদিন মেলাস্থলে চারিশত বৎসরের অধিক বয়স্ক একজন সাধুর সহিত শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভুর যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা:—"একদিন কুম্ভমেলার একস্থানে বসিয়া মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত-প্রভুর কথা বলিতেছি, এমন

* ৺মতিলাল ভৌমিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত গোস্বামী-প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত

সময়ে গুজরাটদেশীয় মিতভাষী একজন প্রাচীন সাধু বলিলেন—'বাবা! বাঙ্গালা দেশছে এক আদমি হামারা গুজরাট্ দেশমে গিয়াথা, উন্‌কা নাম থা কমলাক্ষ।'—অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশ হইতে কমলাক্ষ নামক এক ব্যক্তি গুজরাট দেশে গিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল?' তিনি বলিলেন—'সো আদমি বোলা উন্‌কা ঘর নদীয়া শান্তিপুর। উন্‌কো একঠো গীতা মেরাপাছ্ হায়।'— অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাড়ী নদীয়া শান্তিপুর। তাঁহার একখানি গীতা আমার নিকট আছে। কি আশ্চর্য্য! লোকে এত দীর্ঘজীবী হয়? সব মিলে গেল। অদ্বৈত-প্রভুর নাম কমলাক্ষ ছিল। অদ্বৈত নাম শেষে হয়।* কি উপায়ে এত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সাধুটী গোস্বামী-প্রভুকে নির্জ্জনে লইয়া হঠযোগের কতিপয় প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইঁনি হিঙ্গুলাজের অপর একটী জীবিত সাধুর কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি দ্বাপর যুগের লোক এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত এখন আর আসন হইতে উঠিতে পারেন না। তাঁহার চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়াতে চক্ষু সর্ব্বদা বন্ধ হইয়াই থাকে। কিছু দর্শন করিবার সময়ে হস্ত দ্বারা চক্ষুর পর্দ্দা তুলিয়া তবে দেখিতে হয়। -

এই স্থানে গোস্বামী-প্রভু, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত একটী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে অতিশয় হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে জন্য হরিদ্বার আগমন করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই সাধুর সঙ্গে গোস্বামী-প্রভু কৈলাস পর্ব্বত দর্শন করিতে গমন করেন। যোগীঋষিদের তপস্যার প্রকৃষ্ট স্থল ভুস্বর্গ হিমালয়ের বহু নিভৃত স্থান ও কৈলাস পর্ব্বতাদি ভ্রমণ গোস্বামী-প্রভুর জীবনের একটী প্রধান ঘটনা। কিন্তু এসম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার উপায় ছিল না। কারণ তিনি নিজে এই সকল আত্ম-কথা আদৌ প্রকাশ করিতেন না, অথবা কোন স্মরণ-লিপি রাখিতেন না। বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া কোন কথা বলিতে হইলেও, তিনি সর্ব্বদাই অধিকারি-ভেদে কথা বলিতেন। যে তত্ত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তাঁহার নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতেন না। এবং যে ঘটনার যে অংশ যিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না বুঝিতেন, তাঁহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতেন না—তাঁহার সহিত সেই অংশ বাদ দিয়া কথা বলিতেন। সুতরাং গোস্বামী-প্রভু কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ সময়ে বর্ণিত কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঘটনা, অধিকারি-ভেদে পৃথক্ পৃথক ব্যক্তির নিকটে অল্পাধিক পরিমাণে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও, যাঁহারা পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা উঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য

---

* যশোহর কালিয়ানিবাসী গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এ. সংগৃহীত গোস্বামী-প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

দেখিতে পান। সে যাহা হউক, গোস্বামী-প্রভুর হিমালয় ও কৈলাস পৰ্ব্বত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্ত সাধুটীর মুখেই প্রথম তদীয় শিষ্যগণ অবগত হন। এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদিও এই ঘটনা ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময়ে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়ায়, আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানেই উল্লেখ করিলাম।*

গোস্বামী-প্রভুর কৈলাস পৰ্ব্বত দর্শনমানসে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ ও অপর দুইজন সাধুর** সঙ্গে জ্বালামুখী হইতে আলমোড়া হইয়া হিমালয় পৰ্ব্বত আরোহণপূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটী পুলিশের থানা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা কৈলাস যাইতেছেন শুনিয়া, পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, সে পথ অতিশয় দুর্গম ও বরফাবৃত। অনেক লোক কৈলাস পৰ্ব্বত দর্শন করিতে গিয়া শীতাধিক্যবশতঃ

* গোস্বামী-প্রভুর কৈলাস পৰ্ব্বত ভ্রমণের সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।—১২৯০ সনের মধ্যে গয়া, আকাশ-গঙ্গা পৰ্ব্বতে মানস সরোবরবাসী ভগবান্ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকটে যোগদীক্ষা গ্রহণ করিবার কিয়ৎকাল পরে, তাঁহারই উপদেশমত ৺কাশীধাম শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের নিকট হইতে যথা-শাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। তৎপরে পুনরায় স্বীয় গুরুদেবের আদেশে বিন্ধ্যাচল পৰ্ব্বতে অবস্থানপূর্ব্বক নির্জ্জন সাধনে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে সাধন-শক্তির প্রভাবে গোস্বামী-প্রভুর ভিতরে নামাগ্নি প্রজ্জলিত হইতে থাকে। উহার অত্যধিক উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি সাধন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, তদীয় গুরুদেব তাঁহাকে জ্বালামুখী গিয়া সাধন করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক বলেন, যে তথায় গিয়া সাধন করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত নামাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সরস অবস্থা আগমন করিবে। তদনুসারে গোস্বামী-প্রভু বিন্ধ্যাচল হইতে জ্বালামুখী গমন করেন। তথায় কিয়ৎকালে সাধনের পর অতি অপূর্ব্ব স্থায়ী সরস অবস্থা লাভ করেন; এবং এই স্থান হইতেই তিনি কৈলাস গমন করিয়া সাক্ষাৎ হরপাৰ্ব্বতীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি পুনরায় গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে আগমন করেন। প্রায় এক বৎসর নিরুদ্দেশের পর তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া তদীয় শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন।

** গোরখপুরের প্রসিদ্ধ গম্ভীরানাথ বাবার সহিত কৈলাসের পথে গোস্বামী-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি ১৩২৩ সনে কলিকাতায় অবস্থানকালে এই কথা তদীয় জনৈক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শরীরের রক্ত জমাট হইয়া মারা পড়ে। এইরূপ বৃথা লোকক্ষয় নিবারণের জন্য সরকার হইতে এই থানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে আগন্তুক সাধুদিগকে কৈলাস দর্শনে কৃতসঙ্কল্প অবগত হইয়া, পুলিশের কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে অন্য একটা পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার উপকরণ 'চকমকি' পাথর, শোলা ও বহু পরিমাণ দীপ-শলাকা প্রদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভু, সাধুদিগের সহিত একত্রিত হইয়া হিমালয়ের বহু স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক চলিতে চলিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া, সন্ধ্যার সময়ে একটি সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলেন। সাধুটী অতিথি-সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কচুর পাতার ন্যায় কতকগুলি পত্র আনয়নপূর্ব্বক রুটির মত করিয়া ধুনির অগ্নিতে সেঁকিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে দিলেন। নবাগত ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণ তাহা ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। এই অপূর্ব্ব রুটির কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "উহার আস্বাদ অনেক পরিমাণে আমাদের দেশীয় ময়দার রুটির মত, তবে একটু লবণ হইলে খাইতে আর কোন রকমের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।" পরদিন প্রাতে হিমালয়-বাসী সাধুটী জঙ্গল হইতে কয়েকটী বেলের ন্যায় ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বদিনের মত ধুনিতে দগ্ধ করিয়া ভিতরের জিনিস বাহির করিয়া তদ্দ্বারাই অতিথিসেবা করিলেন। গোস্বামী-প্রভু এই ফলের আস্বাদ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, "চিড়া দুধে ভিজাইয়া চিনি মিশ্রিত করিলে খাইতে যেমন স্বাদ হয়, উহাও প্রায় তদ্রূপ"। বিশ্ববিধাতার কি অপার করুণা! তিনি এই সকল নির্জ্জন-কাননবাসী সাধুদিগের আহারের জন্য নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফল-মূলের, এমন কি, দুগ্ধেরও সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল স্থানে অনেক বন্য চামরী গাভী বিচরণ করে। তাহাদের বৎসেরা যখন একটী বাঁট হইতে দুগ্ধ পান করে, তখন অপর বাঁট হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া, দৈবাৎ নিম্নে কোন ক্ষুদ্র গর্ত্তময় স্থানে পতিত হইলে, শীতাধিক্যবশতঃ জমিয়া যায়। এই সকল জমাট দুগ্ধ উষ্ণ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করলেই অতি উৎকৃষ্ট দুগ্ধে পরিণত হয়। সাধুরা এই সকল জমাট দুগ্ধখণ্ড সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া থাকেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবজন্তুর আহার প্রদান করিতেছেন, তিনি যে এই সকল তপোবনবাসী, সংসারবিরাগী, তদ্গত-চিত্ত, ধর্ম্মার্থী সাধুদিগের শরীর ধারণোপযোগী দ্রব্যাদি যোগাইবেন, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

যাহা হউক, এই অতিথিপরায়ণ সাধুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু সন্ন্যাসী বন্ধুদিগের সহিত পুনরায় কৈলাস পর্ব্বতাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য-পূর্ণ, অতিশয় রমণীয় স্থান সকল তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে পার্ব্বত্য-হ্রদে

বিবিধ বর্ণের অসংখ্য শতদল, সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সহস্র সহস্র ভ্রমর তদুপরি পরিভ্রমণপূর্ব্বক মধুর ঝঙ্কারে এই সকল নিভৃত বনভূমির গাম্ভীর্য্যের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চার করিতেছে। স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য বিহঙ্গমগণ বিচিত্র ফল-ফুল-শোভিত বৃক্ষোপরি উপবেশন করিয়া, সুমিষ্ট কাকলীতে সেই নির্জ্জন বনস্থলীকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কোথাও বা দলে দলে মৃগযূথ শত শত মৃগশাবকে পরিবেষ্টিত হইয়া, মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই যেন গাম্ভীর্য্য ও আনন্দের সংমিশ্রণে এক মহাভাব বিরাজ করিতেছে।

এই প্রকার অশেষবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে, বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধ লামাদিগের একটী মঠে উপস্থিত হইলেন; এবং কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিলেন। এই বৌদ্ধ মঠ সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু একদিন জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, যথা :—"হিমালয়ে বৌদ্ধ লামাদিগের সেরূপ একটি মঠ আছে। আমি মঠে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। তাঁহাদের সাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ হইল। শাক্যসিংহ প্রথমে সাধন-পথের ঐ সকল জোয়ার-ভাটা ভোগ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি পূর্ব্বশিক্ষা,—যাহা নিজের আত্মার অঙ্গীয় হয় নাই, তাহা ভুলিতে চেষ্টা করিয়া, পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন; তখন তাঁহার এক একটি সত্য লাভ হইতে লাগিল, এবং ইহা তাঁহার আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া তাঁহাকে অবশেষে বুদ্ধত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল। বৌদ্ধগ্রন্থ যদি দেখিতে চাহেন, তবে পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া হিমালয়ে বৌদ্ধ-মঠে গিয়া অধ্যয়ন করুন। অনুবাদে অনেক ভুল আছে। লামাগুরুদিগের আচার-ব্যবহার ও তাঁহাদের সাধন-প্রণালী দেখিলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়।"* অতঃপর তাঁহারা এই বৌদ্ধ লামাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই প্রকারে কিয়দ্দিন গত হইলে, অবশেষে তাঁহারা একটী স্বচ্ছসলিলা হ্রদের (মানস-সরোবর) সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় কতিপয় মহাপুরুষ পত্র-পুষ্পাদি নানাপ্রকার পূজোপহার হস্তে লইয়া হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা এই নবাগত মহাত্মাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহারা স্নান করিয়া আসিলে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের দ্রব্যাদি হইতে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিয়া বলিলেন,—"অচিরাৎ এই সরোবর হইতে ভগবান্ সদাশিবের রথ উত্থিত হইবে। আমরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।" অতঃপর,

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য কালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেন সংগৃহীত উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত।

এই স্থানে যে একটী অতীব আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা গোস্বামী-প্রভুর স্ব-কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। কোন সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রায় মহাশয়ের, পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ এইরূপ—"এক সময়ে আমি কয়েকজন সাধুর সঙ্গে হিমালয় পার হইয়া সেই স্বর্গের পথে চলিতে থাকি। বরফের উপর দিয়া অনেক কষ্টে চলিতে লাগিলাম। সরু রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে একস্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম। সেই স্থানে একটি কুণ্ড (হ্রদ) দেখিলাম—মহাদেব কুণ্ড ও মহাদেবের পূজা করিতে হয়। আমরা পূজা করিয়া যেমন শঙ্খধ্বনি করিলাম, অমনি কোথা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হনুমান আসিয়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। পরে কুণ্ড হইতে এক রথ উঠিল। তার মধ্যে মহাদেব দর্শন করিলাম। অতি আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম। পরে সেই হনুমানদিগকে যথাসাধ্য ফলাদি খাইতে দেওয়া হইল। তাহারা খাইয়া চলিয়া গেল। অমনি রথ সহ মহাদেব সেই কুণ্ডে অন্তর্হিত হইলেন।"* কিংবদন্তী এই যে, এই দিবস এই রথ দর্শন করিতে না পারিলে, কৈলাসপুরী গমন অথবা জগতের আদি পিতামাতা হর-পার্ব্বতীকে দর্শন করিতে পারা যায় না।

অতঃপর তাঁহারা পুনরায় দীর্ঘকাল পথ চলিতে চলিতে, অবশেষে একটী অতি নিভৃত, পরম রমণীয় পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে; তাহাতে কয়েকটী সাধু বাস করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে হরপার্ব্বতীর তপস্যার স্থল কৈলাসপুরী অবস্থিত। কৈলাসপর্ব্বতের এই স্থান পর্য্যন্ত অতি কষ্টে সাধুসজ্জনগণ আগমন করিতে পারেন; কিন্তু, ইহার পর অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহার পর হইতেই পর্ব্বতের চিরতুষারাবৃত অংশ আরম্ভ হইয়াছে। হঠযোগের প্রক্রিয়াবিশেষ অভ্যস্ত না থাকিলে, সেই স্থানের ভীষণ শীত সহ্য করা যায় না। অনেক মহাত্মা প্রাণের টানে কৈলাসনাথকে দর্শন করিবার আশায় ইহার পরও অগ্রসর হইতে গিয়া, শীতাধিক্যবশতঃ শরীরের রক্ত জমাট হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সকল বরফাবৃত স্থানে মৃতদেহ পচিয়া যায় না। শরীরের রক্তমাংস প্রথমতঃ জমাট বাঁধিয়া সমগ্র শরীরটী বরফে পরিণত হয়, এবং এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিলে, বিশ্বনিয়ন্তার কি এক আশ্চর্য্য কৌশলে, অবশেষে বরফ হইতে প্রস্তরে পরিণত হয়। এইরূপ প্রস্তরময় কয়েকটী মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া, গোস্বামী-প্রভু ও তদীয় সহযাত্রী সাধুগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের সময়ে মহামতি যুধিষ্ঠির এই বিষয় অবগত হইয়া, পরবর্ত্তী যাত্রীদিগকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে একখানি প্রস্তরখণ্ডে "অত্র অগ্রে ন গচ্ছন্তি"—এ কয়েকটী কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাও দর্শন করিলেন।

* শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

গোস্বামী-প্রভুর শরীর অপটু ছিল, তাহাতে তিনি হঠযোগের ক্রিয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সঙ্গীয় সাধু দুইটী হঠযোগসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা বরফময় প্রদেশের উপর দিয়া কৈলাসপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশস্থ শিব-মন্দিরে অপরাপর সাধুদিগের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।* পূর্ব্বোক্ত বহু বিস্তৃত বরফময় স্থান অতিক্রম করিবার পর হঠযোগসিদ্ধ উক্ত মহাপুরুষদিগের দৃষ্টিপথে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য পতিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রে তপোবনের যেরূপ বর্ণনা আছে, কৈলাস পর্ব্বতের এই সকল নিভৃত স্থানে তাদৃশ অনেক তপোবন তাঁহারা দর্শন করিতে লাগিলেন। নরমাংসভোজী অনেক অসভ্য জাতিও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের গাত্রে যে একপ্রকার দ্বিভুজ, সূর্য্যাকৃতি ও একমুণ্ডবিশিষ্ট অস্বাভাবিক জীবের চিত্র অঙ্কিত আছে (উদর পদাদি নিম্নাঙ্গ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না), তদ্রূপ অনেকগুলি প্রাণীও তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল অদ্ভুত জীব যেন কৈলাসপুরীর প্রহরীস্বরূপ হইয়াই আগন্তুকদিগকে কৈলাস গমনে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়া থাকে। বাধা না মানিলে তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। বিহঙ্গম-যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক শূন্যপথে উড্ডীয়মান্ হইয়া, সাধুদ্বয় এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শিবরাত্রির দিবস তাঁহারা অবিকল শিবলিঙ্গের আকারবিশিষ্ট একটী পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তদুপরি একটী সুবর্ণময় পুরী দর্শন করিলেন। এই পর্ব্বতের গাত্রস্থিত একটী প্রকাণ্ড গোফার মধ্যে তাঁহারা বহু প্রাচীন ঋষিমুনিদিগের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শন করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঘটনাটী গোস্বামী-প্রভুর কৈলাসধামযাত্রার সহচরদিগের মধ্যে একজনের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইঁহার সহিত গয়া আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী-প্রভুর পুনরায় একবার দেখা হইয়াছিল। তৎকথিত বিবরণ এইরূপঃ—"কিছুদিন গমন করিয়া পথের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত পাইলাম, আর পথ নাই। সেই পথ ঐ স্থানে শেষ। সম্মুখে পাহাড়ের নিকট যাইয়া দেখিলাম যে, এক প্রকাণ্ড পাথরের দরজা। দুই দিকে দুইটী ঘণ্টা রহিয়াছে। ভিতরে যতদূর দেখা যায়, দেখি যে অসংখ্য তপস্বী। কেহ দীর্ঘকায়, কেহ শীর্ণকায়, কাহারও কেশসমূহ শুভ্র, কাহারও দীর্ঘশ্মশ্রু। শরীরের রং কাহারও কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও শ্বেতবর্ণ। কেহ হোম করিতেছেন, কেহ যোগ করিতেছেন, কেহ ভজন-সঙ্গীত গাইতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন—ইত্যাদি। বহুবিধ পুরাতন ঋষি, মুনি, তপস্বী, যোগী,

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

দেব, নর—ইত্যাদি যেন অমরভবনে যুগযুগান্তর ধরিয়া তপোনিরত। সাধুগণ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আহা! এইত চির-শান্তিময় স্বর্গধাম, অক্ষয়, অব্যয়, প্রলয়ের অধীন নহে (সম্ভবতঃ এই স্থানই 'মুক্তিনাথ')। সেই দেব দ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেব, এই কোন ধাম ?" তিনি বলিলেন, "হরগৌরী ধাম। অদূরে ঐ যে মন্দির দেখিতেছ, ঐ স্থানে হরগৌরী বিরাজ করিতেছেন।"* ইহাই কৈলাসপুরী। সন্ধ্যার সময়ে পুরীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। মহাপুরুষগণ অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পুরীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। অতঃপর এক স্থানে গোস্বামী-প্রভুকে দেখিয়া তদীয় সহযাত্রী সাধুদ্বয় অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "কি উপায়ে তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বেই কৈলাসপুরীতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন"—এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া ক্ষুণ্নমনে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে দয়ার সাগর ভগবান্ আশুতোষ দয়া করিয়া তাঁহাকে সূক্ষ্ম শরীরে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্থূল শরীর পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থিত একটি মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। অনন্তর মহাপুরুষগণ দেখিতে পাইলেন, একটী মন্দিরের মধ্যস্থলে একখানি বিচিত্র হিরন্ময় সিংহাসনে যোগেশ্বর মহাদেব যোগমায়া পার্ব্বতীদেবীকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট আছেন। জগতের আদি পিতামাতাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মহাপুরুষগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভক্তি-গদগদচিত্তে নানা প্রকার স্তব পাঠ করিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শিবরাত্রি অতীত হইয়া গেল। প্রত্যূষে ভগবান্ মহাদেব ও ভগবতী পার্ব্বতীদেবী মহাপুরুষদিগকে শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক, গোস্বামী-প্রভুকে পুনরায় পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত স্বীয় স্থূলদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া অপ্রাকৃত কৈলাসধামে গমন করিলেন। অতঃপর নন্দীকেশ্বর মহাপুরুষগণকে পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলে পুরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। মহাপুরুষেরা সানন্দচিত্তে 'হর হর, বম্ বম্' শব্দে কৈলাসপর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বলাবাহুল্য, ভূস্বর্গ হিমালয়স্থিত শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীর আদি তপস্যার স্থল এই প্রাকৃত-কৈলাসধামে, জগৎগুরু সদাশিব ভগবতী পার্ব্বতীদেবী সহ মর্ত্তলোকবাসী সাধুমহাপুরুষদিগকে দর্শন দান করিবার জন্য, প্রতি বৎসর এক মাত্র শিবচতুর্দ্দশীর দিনই প্রকাশিত হন।** আমরা শুনিয়াছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মহাপুরুষদিগের কৃপায় কৈলাসপুরী দর্শন করিয়াছিলেন।

* শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ রায় মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

** গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রত্যাদেশ। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ৺নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা। স্বর্গীয়া মনোরমা দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গোস্বামী-প্রভু হরিদ্বার হইতে ঢাকায় আগমন করিয়া শিষ্যগণসহ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে সাধনরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ও চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া, দিবানিশি ভগবানের সহবাসে চিরশান্তি ও ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন। ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা প্রভৃতি সমস্তই এখন গোস্বামী-প্রভুর নিকট উন্মুক্ত। স্থান ও সময়ের ব্যবধান তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভুত, ভবিষৎ, বর্ত্তমান, ইহলোক, পরলোক প্রভৃতি সমস্তই তিনি এখন 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' প্রত্যক্ষ করিতেছেন। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" গোস্বামী-প্রভু তাঁহার জীবনে এই ঋষিবাক্যের জাজ্জ্বল্যমান চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহটি পর্য্যন্ত নামব্রহ্মের মন্দির হইয়া গিয়াছিল। শেষজীবনে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গে, আসনে, বসনে, এমন কি গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ আম্রবৃক্ষে (যাহার তলদেশে তিনি হোম, পাঠ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, সেই বৃক্ষের গাত্রে) নাম, নামের প্রতিপাদ্য দেবতার মূর্ত্তি প্রকটিত হইত, তাহা ইতঃপূর্ব্বে এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

গোস্বামী-প্রভুর জীবনের শেষ ছয় সাত বৎসর তিনি একেবারে নিদ্রা যান নাই। দিবানিশি স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা, পাঠ-পূজা, সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। আহার সম্বন্ধেও তিনি একদিন বলিয়াছেন,—"আমার শরীর রক্ষার্থে এখন দিনান্তে আম্র, কলা প্রভৃতি কোন একটী ফলের কিয়দংশ হইলেই হয়", পরে বলিলেন—"ইহাও না হইলে চলে।" কোন ভক্ত সাধক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের রূপ বর্ণনা করিয়া গাহিয়াছেন —"একাধারে বিরাজিছে রাধাশ্যাম।" প্রকৃতি-পুরুষের এই একাধারে মিলনের পূর্ণ লক্ষণ যেমন গোস্বামী-প্রভুর শেষজীবনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আর কোথাও দৃষ্ট অথবা শ্রুত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যাঁহারা তাঁহার এই অপূর্ব্ব শারীরিক লক্ষণাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই আশ্চর্য্য ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সময়ের রূপ বর্ণনা করিয়া তদীয় অন্যতম শিষ্য, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গণপুরগ্রামনিবাসী ৺মহাবিষ্ণু জ্যোতী মহাশয় একটি সুমধুর সঙ্গীত রচনা

করিয়াছেন। সহৃদয় পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা ঃ—

পরজমিশ্র—ঝাঁপতাল।

অপরূপ শ্রীগুরু-রূপ, হৃদয়ে সদা ভাবনা রে।
ভবন বন সমান হ'বে, শমন-ভয় আর রবে না রে॥
তরুণ রবি-কিরণ দু'টী চরণ পাশে পরকাশে,
ধন্য সে জন ও চরণ (যা'র) হৃদি-সরসে সদা ভাসে,
কোটী জন্মের পাপ নাশে, ও রাঙ্গাপদ-পরশে,
মজ ও পদে মন-ভৃঙ্গ রস-রঙ্গ ছাড় না রে॥
কটিতে ঝাঁপি কৌপীন বহির্ব্বসন শোভে সুন্দর,
দণ্ড কমণ্ডলু করে, শোভে কিবা মনোহর,
(জিনি) মদমত্ত কুঞ্জর, গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস, মধুর ভাষ, মধুমাখা সব ব্যবহারে॥
সুবিশাল বক্ষে শোভে সপ্ত-লহরী-মাল,
ঊর্দ্ধ তিলক রেখা ভালে কিবা শোভে ভাল,
মৌলী-রচিত-চূড়া—যেন শ্যামের মোহন চূড়া,
কিংবা ফণি-ফণা যেন ধরে গঙ্গাধর শিরে॥
পৃষ্ঠে দোলে বেণী—যেন ভানু রাজনন্দিনী,
প্রেম-নীরে ভাসে সদা, শ্রীমুখ-কমলখানি,
আনন্দময় সব, আনন্দ-রস-খনি,
মগন দিবা-রজনী কিবা আনন্দ-সায়রে॥

তাই বলিতেছিলাম—যে সাধন-ভজন করিয়া গোস্বামী-প্রভু দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে সকল অবস্থা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সকল যুগে সকল সাধকের পক্ষেই সুদুর্ল্লভ। তাঁহার আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্য ও বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে।

গোস্বামী-প্রভুর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইত। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সুমধুর হরিনাম শ্রবণে স্থাবরজঙ্গমাদি সকলেই পুলকিত হইয়া, বিবিধ অদ্ভুত প্রণালীতে স্ব স্ব আনন্দোল্লাসের পরিচয় প্রদান করিত। আশ্রমস্থ যে আম্রবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া গোস্বামী-প্রভু অনেক সময় পাঠ, পূজা, ভজনাদি করিতেন, সেই বৃক্ষের পত্র হইতে ১২৯৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে অজস্র মধুবর্ষণ হইয়াছিল, এবং সেই মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য ভ্রমর পিপীলিকাদি মনের আনন্দে মধুপানে তৎপর হইয়াছিল। ক্রমে এই ব্যাপারটী সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, হিন্দু, মুসলমান, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, দরিদ্র

প্রভৃতি বহু লোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা বলিযাছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—"যেমন মনুষ্যের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান বিবিধ শ্রেণীর লোক আছে, বৃক্ষাদির মধ্যেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। অহৈতুকী ভক্তি প্রণোদিত সশক্তিক-হরিনাম শ্রবণ করিলে, সাত্ত্বিক মনুষ্যের ন্যায় সত্ত্বগুণ-প্রধান বৃক্ষাদিরও আনন্দরস উথলিয়া উঠে, এবং তখন তাহারা পুষ্পবর্ষণ, মধুবর্ষণ, প্রভৃতি প্রণালীতে ঐ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই মধুবর্ষণ যে কেবল এই বৃক্ষ হইতেই হইল, এমন নহে। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, হরিনাম-ধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে, সেই সীমার মধ্যে সত্ত্বগুণ-প্রধান সকল বৃক্ষেই এইরূপ ঘটিয়াছে।" বস্তুতঃ তাহাই হইযাছিল। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে, গোস্বামী-প্রভুর স্বীয় বাসগৃহের সংলগ্ন দুইটী নিম্ববৃক্ষ হইতে মধু অজস্র বর্ষিতে লাগিল, এবং আশ্রমসমীপস্থ অন্যান্য স্থানের কোন কোন বৃক্ষ হইতেও ঐরূপ মধুবর্ষণ লক্ষিত হইল।"*

এতদুপলক্ষে গোঁসাইজী আরও বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে একটী নিম্ববৃক্ষ হইতে এইরূপ মধু-ধারা নিঃসৃত হইতে আমি দেখিয়াছি। এই বৃক্ষমূলে একজন অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত ভজন করিতেছেন।" এই সকল ঘটনা সাধারণের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। শাস্ত্রাদিতে ইহার উল্লেখ আছে।† এবং প্রকৃত উপাসনার স্থানে এইরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটিত। আমাদিগের শ্রাদ্ধক্রিয়ার একটি মন্ত্র এইরূপ ঃ—

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধী মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ
পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তুনঃ পিতা মধুমান্নো
বনস্পতি র্ম্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীগাবো ভবন্তু নঃ॥"

অর্থাৎ—"বায়ু মধু বহন করিতেছে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধিসমূহ মধুময় হউক, রাত্রি, ঊষা, পার্থিব রজঃ মধুমান্ হউক, দ্যুলোক, পিতৃলোক, বনস্পতি, সূর্য্য এবং আমাদের গাভীসমূহ মধুময় হউক।" এই

* রায়সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ। তিনি স্বচক্ষে ঐ সকল মধুবর্ষণ দর্শন করিয়াছিলেন।

† বনলতাস্তরবঃ আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥
;, ১০।৩৫।৫

মন্ত্র রূপক নহে, শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইলে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত মধুময় হয়, তাহাতে প্রেতাত্মা তৃপ্তিলাভ করেন।

বৃক্ষগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ গোস্বামী-প্রভুর চাঁচুড়তলায় অবস্থিতিকালে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে পুষ্প-বর্ষণ। হিন্দুশাস্ত্রাদিতে এইরূপ পুষ্পবর্ষণ সম্বন্ধে ভুরি ভুরি ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু হায়! আজকাল শিক্ষাভিমানী নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই নিকট উহা রূপক বলিয়া গণ্য হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জড় মস্তিষ্কের স্থূল ক্রিয়াফলের অতিরিক্ত অন্য কিছু যে বুঝিবার কি জানিবার বিষয় আছে, তাহা আমরা একবার চিন্তাও করিয়া দেখি না। সৎসঙ্গ লাভ হইলে—আধ্যাত্মিক জগতে কিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে পারিলেই, যাহা এখন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও 'খেয়াল' বলিয়া উড়াইয়া দেই, তৎসমুদয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও প্রচলিত আচার ব্যবহারের দোষে লোকের হৃদয় সংশয় অবিশ্বাসাদি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, এবং সহানুভূতির ক্ষমতাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। লৌকিক বিজ্ঞানে অলৌকিক্ তত্ত্ব কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম অসীমকে কি প্রকারে ধারণা করিবে? শরীর ক্ষণবিধ্বংসী, কিন্তু মানবাত্মা অমর ও চিরস্থায়ী। হায়! চিরদিনের পথের সম্বল সঞ্চয় না করিয়া, আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য সুখান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া দুঃখের পর দুঃখে, নিরাশার পর নৈরাশ্যে এবং অশান্তিতে ডুবিয়া ক্লেশ পাইতেছি,—তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না। মহাপুরুষগণ একবার এই অধঃপতিত জীবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। সৎপুরুষের কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হউক, এবং আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হউক।

আশ্রমস্থ ভজনকুটীরের গর্ত্তের মধ্যে একটী সর্প বাস করিত। গোস্বামী-প্রভু তাহাকে দুগ্ধ, কলা প্রভৃতি আহার্য্য বস্তু প্রদান করিতেন। সর্পটী সময়ে সময়ে তাঁহার জটা অবলম্বন করিয়া স্কন্ধে ও মস্তকের উপর আরোহণ করিয়া পুনরায় আপনাআপনি নামিয়া যাইত; অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সর্প কদাচ কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। শুনিয়াছি, ইনি একজন উচ্চস্তরের ফকির ছিলেন,—সর্পদেহ ধারণ করিয়া সাধনভজনের জন্য ঐ স্থানে বাস করিতেন।*

একদিন গোস্বামী-প্রভুকে প্রশ্ন করা হইল—'সাপ আপনার গায়ে মাথায় উঠে কেন? আমাদের ত কাছ দিয়াও আসে না'। উত্তরে তিনি বলিলেন—"নামের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের ক্রিয়া চলিতে থাকিলে, দেহের অভ্যন্তরে উহার একপ্রকার মধুর অব্যক্ত ধ্বনি হইতে থাকে। সাধারণতঃ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী

* স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

স্থান হইতে ঐ শব্দ শুনা যায়। সর্প উহাতে আকৃষ্ট হইয়া উহা শুনিবার জন্য মস্তকে আরোহণ করে, এবং সময়ে সময়ে উহার সহিত স্বর মিশাইয়া শিষ দিতে থাকে। এইজন্য মহাদেবের অঙ্গে সর্ব্বদাই সাপ বাস করিত। তোমাদের ঐরূপ অবস্থা লাভ হইলে তোমাদের গায়েও সাপ উঠিতে পারে। ঐ অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে দেহটী হিংসাশূন্য হইয়া যায়। তখন নিতান্ত হিংস্র জন্তুও তাঁহাকে আর হিংসা করে না। তাঁহার কাছে আপন হইয়া যায়। সাধু মহাপুরুষগণ পাহাড়ে জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্তুর মধ্যে যে নির্ভয়ে বাস করেন তাহার কারণও ঐ।"

গভীর রাত্রে দুইটী কোলাব্যাঙ প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুর ভজন-কুটীরে উপস্থিত হইত, এবং একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া গলা ফুলাইতে ফুলাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া সমাধিস্থের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। রাত্রি প্রভাত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আবার ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিত।*

আশ্রমে একটী কুকুর ছিল। আশ্রমবাসীরা তাহাকে "কেলে" বলিয়া ডাকিতেন। সে কীর্ত্তন শুনিতে অতিশয় ভালবাসিত। সে যেখানেই থাকুক, কীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং অনেক সময়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কীর্ত্তনের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইত। এই সময়ে তাহার কর্ণমূলে হরিনাম উচ্চারণ না করিলে কিছুতেই আর চৈতন্য হইত না। কুকুরটীর একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, আশ্রমে যত অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত হইতেন, নিতান্ত পরিচিতের ন্যায়, সে সকলেরই নিকটে গিয়া উপস্থিত হইত ও লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। এমন কি, বিদায়ের কালে তাঁহাদিগকে দোলাইগঞ্জ-ষ্টেশন পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিয়া আসিত। দিবাভাগে অথবা রাত্রিতে কখনই তাহাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখা যায় নাই। কোন কোন সময়ে কুকুরটী গোস্বামী-প্রভুর আসনের কিছু দূরে স্থিরভাবে বসিয়া, তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। এই দৃশ্য যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। একদিন কুকুরটীর এই অবস্থার প্রতি গোস্বামী-প্রভুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তিনি করুণস্বরে বলিলেন—"কালু, আমাকে মিনতি করিলে কি হইবে ? তোমার এ জন্ম এইরূপে কাটাও, পরজন্মে উদ্ধার পাইবে। এখন হইবে না"। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কুকুরটী এই কথা শুনিয়া 'ভেউ, ভেউ' করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া দর্‌দর্‌-ধারে জল পড়িতে লাগিল। ইহাকে কেহ কখনও মাংস খাইতে দেখে নাই। এই সকল গুণে সকলেই কুকুরটীকে অতিশয় আদর ও যত্ন করিত, এবং দেহান্তে আশ্রমবাসীরা আশ্রমের এক প্রান্তে তাহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

* স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে একটী কামধেনু ছিল। সকলে তাহাকে "রাণী" বলিয়া ডাকিতেন। গাভীটী কখনও গর্ভধারণ করে নাই, অথচ প্রয়োজনমত দোহন করিলেই অল্প পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করিত। কামধেনুর একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, কেহ কোন দুরভিসন্ধি লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেই সে তাহাকে তাড়া করিত। এক সময়ে একটী কীর্ত্তনের দল, জানি না কি অভিপ্রায়ে, কীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু কীর্ত্তনের ধ্বনি আশ্রমস্থ সকলের নিকটেই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইলেও, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে রাণী-গাভী পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক দাড়ি ছিঁড়িয়া গর্জ্জন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দলের মধ্যে গিয়া পড়িল, এবং সেই সঙ্গে কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল।

অপর একদিন কোথা হইতে একটী লোক আশ্রমে উপস্থিত হইলে রাণী তাহাকে পুনঃপুনঃ তাড়া করিতে লাগিল। তিনি ভীত হইয়া আশ্রমস্থ কোন গৃহে প্রবেশ করিলেন। লোকটা চলিয়া গেলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"রাণী-গাভীর পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আছে। এই লোকটী পূর্ব্বজন্মে কসাই ছিল, রাণী তাহা অবগত হইয়া গোজন্মের সংস্কারবশতঃ উহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছিল।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু কঠিন ডবল-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় নবীনকৃষ্ণ ঘোষ, এল. এম. এস, মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, দুই পার্শ্বের ফুস্‌ফুস্ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, জীবনের আশা অতি কম। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু কোন ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, সুতরাং আত্মীয়স্বজন অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে ১৪।১৫ দিবস অতীত হইলে, গোস্বামী-প্রভু একদিন দধি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহই দধি দিতে সম্মত হইলেন না। পরে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয় কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবিলম্বে দধি আনিয়া উপস্থিত করিলেন, এবং গোস্বামী-প্রভু তাহা অতিশয় তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে হায়! হায়! করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহাতেই গোস্বামী-প্রভু রোগমুক্ত হইলেন। পরদিন তিনি অন্নপথ্য করিলেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রদ্ধেয় নবীনবাবু তাঁহাকে বলিলেন—"মহাশয়, আপনি বেদবিধির অতীত। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আপনার নিকট পরাস্ত হইয়াছে।"

সাধনপথে অগ্রসর হইবার সময়ে সাধকের শরীরের রজস্তমোবিশিষ্ট পরমাণু-সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া, ক্রমে সত্ত্বগুণের পরমাণুতে পরিণত হয়। এই প্রকারে সাধক ক্রমে ভাগবতী তনু লাভ করেন। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে প্রকৃতিভেদে

এক এক দেহে এক এক প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কোন দেহে জর-বিকার, কোন দেহে উদরী, কোন দেহে নিউমোনিয়া ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ব্যাধিই নয়, সাধন-ঘটিত অবস্থাবিশেষ। এই সকল ব্যাধির পর সাধকের এক একটি নূতন অবস্থা লাভ হয়। এই ব্যাধির পর গোস্বামী-প্রভুর নিদ্রা প্রায় অন্তর্হিত হইল। শেষ রাত্রে এক আধ ঘণ্টা মাত্র তন্দ্রার মত হইত। পরে ১৩০০ সনের প্রয়াগ-ধামে কুম্ভমেলার সময়ে তাঁহার নিদ্রা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। তাহার পর হইতে তিনি জীবনের অবশিষ্ট ভাগে আর কখনও নিদ্রা যান নাই। শাস্ত্রে আছে যে, সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট পুরুষকে নিদ্রায় অভিভূত করিতে পারে না, এবং যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি নিদ্রা জয় করিতে সমর্থ হন।*

এই স্থানে একবার গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য বিক্রমপুরের অন্তর্গত টেউটিয়ানিবাসী ৺রাজকুমার দত্ত মহাশয়, তদীয় কঠিন-রোগগ্রস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতুষ্পুত্রের রোগারোগ্য কামনায় বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় অনেক সময়ে চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অনেক রোগীকে যোগবলে রোগমুক্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু এইবার তিনি কি জানি কি ভাবিয়া তাঁহাদিগকে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী-প্রভু তখন স্বীয় আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময়ে রোগী ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবামাত্র গোস্বামী-প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি রোগীর অতিশয় শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, দয়ার্দ্রচিত্তে পুনঃপুনঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে

* সত্ত্বগুণাবলম্বী সাধকের নিদ্রাজয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে—

"সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তো স্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥"

শ্রীভাঃ। ১১ স্ক, ২৬ অঃ, ১৯ শ্লোঃ।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
তত্রসত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥" গীতা, ৫৮ শ্লোক।

অপচি—"সিদ্ধস্য ত্রীণি চিহ্নানি দাতা ভোক্তাপ্যযাচকঃ॥
বিন্দু ত্রয়ো রথাল্পত্বং ভবোন্নিদ্রাজয়স্তথা
জপধ্যানরতো মৌনী ন খেদ মধিগচ্ছতি॥"
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্রের শ্লোক, ১৭ বিলাস।

লাগিলেন। ইত্যবসরে গোস্বামী-প্রভুর গুরুদেব মানস-সরোবরবাসী পরমহংসজী অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"এ কি করিতেছ ? তুমি এইরূপে রোগারোগ্য করিতে থাকিলে তোমার নিকটে যে কেহই ধর্ম্ম চাহিবে না।" গোস্বামী-প্রভু সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন—"রোগীর কাতরতা দর্শন করিয়া তাহার রোগ দূর করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করি নাই।" পরমহংসজী বলিলেন—"তোমার সকরুণ দৃষ্টিতেই উহার রোগ আরোগ্য হইবে। কিন্তু সাবধান, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন পুনরায় কখনও ঐরূপ কার্য্য করিও না।"*

শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্তির পর, গোস্বামী-প্রভু তথায় একটী সর্ব্বজনহিতকর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া, ঢাকা, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যোগমায়া দেবীর অস্থি সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা প্রচার করিতে আদেশ করেন। নাম-ব্রহ্মের প্রতিনিধি কি, ইহা জিজ্ঞাসা করাতে, নিম্নলিখিত অক্ষর কয়েকটী গোস্বামী-প্রভুর নিকটে স্বর্ণাক্ষরে আকাশপটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ওঁ হরিঃ

নাম-ব্রহ্ম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

"নাম-ব্রহ্ম পূজার প্রত্যাদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আরও বলিয়াছিলেন যে, "নাম-ব্রহ্মই কলির একমাত্র দেবতা। এই নাম-ব্রহ্ম-পূজা এবং আচার্য্য-পূজাই কলিতে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সময়ে ইহার এমনই একটী রোল উত্থিত হইবে, যাহাতে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইবে।"

গেণ্ডারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোস্বামী-প্রভু একদিন উপস্থিত শিষ্য-মণ্ডলীর নিকটে উক্ত প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করতঃ, পূজার উপকরণ শঙ্খ, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপাদি ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। উপকরণাদি আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে নাম-ব্রহ্মের একখানি পট অঙ্কিত করিয়া সাধনকুটীরে স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যহ তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা ও আরতির ব্যবস্থা

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

করিলেন। তদবধি প্রত্যহ নাম-ব্রহ্মের পূজা ও আরতি হইতে লাগিল। আরতির সময়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী গান যথাক্রমে গীত হইত।

কীর্ত্তনের সুর—যৎ।

১। ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তন সুমধুর-ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
কত কোটী চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাকে করযোড় করে।
সহস্রবদনে ফণী শিবে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ বেদ-বিচারে।
নাহি পারাপার ভাব ভরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভদাস শ্রীগৌরচরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

২। নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই।
(আমার) গৌর নিতাই নাচে অদ্বৈত গোঁসাই॥
(নাচে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে রে)
(তোরা দেখ্‌বি যদি ত্বরায় আয়, দরশনের সময় যায়)
(শ্রীবাস আঙ্গিনার মাঝে, নাচে আমার গৌর নিতাই)
আমরা এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।
(গৌর নিতাইর মত রে)
(যাঁরা জেতের বিচার নাহি ক'রে যারে তারে প্রেম বিলায়)
(কলিজীবের ঘরে ঘরে যেয়ে রে)
ওরে এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই।
(সীতানাথ অদ্বৈতের মত রে)
(যে আনিল গৌরমণি রে) (কত অসাধ্য সাধন ক'রে)
(কলিজীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে)॥

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

৩। তোরা কে নিবি লুট লুটে নে, নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য,
মুন্সিগির দিলেন অদ্বৈতেরে ;
হরিদাস খাদাঞ্জি হ'য়ে লুট বিলালো নগরে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তারা ভেবে নিরন্তর,
ধ্যান করিয়া না পেলেন যাঁহারে।
নারদ ঋষি মগ্ন হ'য়ে বীণাযন্ত্রে গান করে ॥—ইত্যাদি।

কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে হরিরলুট (বাতাসা, সন্দেশ ইত্যাদি) বিতরণ করিতেন।

অতঃপর আশ্রমস্থ আম্রবৃক্ষের নীচে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বাঙ্গলা ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে মহাষ্টমী তিথিতে মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর অস্থি (যাহা গোস্বামী-প্রভু ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন হইতে সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহার কতকাংশ হরিদ্বারে গঙ্গাসাৎ করিয়া অবশিষ্টাংশ সঙ্গে আনিয়াছিলেন) সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি যথাশাস্ত্র মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্ব্বক ৺নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৺ঠাকুর স্থাপন করিবার জন্য উপর্য্যপরি তিনটি স্তর (থাক) সমন্বিত একখানি আসন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহার সর্ব্বোপরের থাকে শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্মের পট, মধ্যের থাকে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর আলোক-চিত্র (ফটো) স্থাপন করা হইল, এবং নিম্নের থাকে যোগমায়া দেবীর ব্যবহারের শাঁখা, সিন্দুরের কৌটা প্রভৃতি কোন কোন দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছিল। পূর্ব্বের ৺নাম-ব্রহ্মের পটখানি নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, ঢাকা, শোলঘরনিবাসী শ্রীমান্ যশোদাকুমার বসু কর্ত্তৃক একখানি নূতন পট অঙ্কিত করাইয়া স্থাপন করা হইয়াছিল।*

তদবধি এই আশ্রমে শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের ধ্বনির সহিত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কোন সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ ফণিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের উপর এই নাম-ব্রহ্ম পূজার ভার অর্পিত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্রানুসারে নাম-ব্রহ্মের পূজায় জাতি কিংবা বর্ণবিচারের আবশ্যকতা নাই। ইঁহার নিকটে নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদের তুল্য ; তাহা হীনবর্ণের লোক দ্বারা অর্পিত অথবা স্পৃষ্ট হইলেও, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের গ্রহণীয়,—কেহ অবজ্ঞা করিলে তাহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রে যে এই পূজাবিধির

* ঐ পটখানি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর হইতে বিগ্রহের কলেবর পরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রত্যেকবারই নূতন মুদ্রিত পট স্থাপন করা হইতেছে।

উল্লেখ আছে, তাহা ব্যক্ত করিলেন।* নাম-ব্রহ্ম পূজার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অন্যান্য বিগ্রহাদি পূজার ন্যায় সেবাপরাধের সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভুর উপদেশ এইরূপ,—"ভক্তিই ৺নামব্রহ্ম পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ভক্তিপূর্ব্বক দিনান্তে একটী প্রণাম করিলেও ইহার পূজা হয়। কোন কারণে মন্দিরের দরজা দুই দিন বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন বাহ্য লোকদেখান ভাব যেন ইহার মধ্যে প্রবেশ না করে, এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু দয়াপরবশ হইয়াই দুর্ব্বল কলির জীবের জন্য এই সহজসাধ্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়েছেন।"†

শৌচা মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম ছয়টী অধ্যায়ে প্রণবসংযুক্ত ব্রহ্মনামের অথবা নাম-ব্রহ্মের মানসিক ও বাহ্য-ভেদে দ্বিবিধ পূজার ব্যবস্থাই বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। বাহ্য পূজাতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবানের কোন না কোনরূপ বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু নাম ও নামী অভেদ** হইলেও নামের অক্ষরের বা অনুলিপির (মন্ত্রমূর্ত্তির) বাহ্য পূজা কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর সময় হইতেই নাম-ব্রহ্মের পূজার সূত্রপাত হয়। কিন্তু উহা তাঁহাদের ভক্তমণ্ডলীতেই আবদ্ধ থাকায় জনসাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হইতে পারে নাই। শ্রীপাট্ অম্বিকা কালনায় সিদ্ধ ৺ভগবান্‌দাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

* মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৩য় উল্লাস।—শ্রীসদাশিব উবাচ:—

"অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চ যৎ।
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ॥
গঙ্গাতোয় শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোঽপি বর্ত্ততে।
পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।
নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিবেচনম।
ন কালো নিয়মোঽপ্যত্র শৌচা শৌচং তথৈব চ॥
যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈ গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ।
যে ত্যজন্তি নরা মূঢ়া মহামায়েন সংস্কৃতং।
অন্নতোয়াদিকং ভদ্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ।"

† শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী-প্রমুখাৎ শ্রুত।

** "নাম শ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নাম নামিনঃ॥"
পদ্মপুরাণ॥

মহাশয়ের পাটবাটীতে বহুদিন হইতে ৺নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৺ভগবান্‌-দাস বাবাজীর আশ্রমে একখণ্ড নিম্বকাষ্ঠে কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এবং দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের পাটে একখানি প্রস্তরফলকে চারিযুগের চারিটী তারকব্রহ্ম নামই ক্ষোদিত হইয়া বিগ্রহের ন্যায় পূজিত হইতেছেন। গোস্বামী-প্রভুর নিকটে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর নাম-ব্রহ্ম পূজার প্রত্যাদেশকালে নাম-ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে আকাশে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা একটু স্বতন্ত্র রকমের হইলেও মূলতঃ একই বস্তু। তবে উহা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য। উক্ত চিত্রোল্লিখিত "ওঁ হরি"—এই পরব্রহ্মবাচক নাম অথবা মহামন্ত্রটী ব্রহ্মের প্রতীক অর্থাৎ প্রতিমা এবং 'হরেনাম ইত্যাদি' শ্লোক ঐ প্রতিমার পিঠাসনস্বরূপ। এই সকল নাম অথবা মন্ত্রমূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা বহু শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোক আছে ঃ—

"ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং যঃ সম্যগ্ দর্শনঃ পুমান্ ॥"

অর্থাৎ—"উক্তরূপ মূর্ত্তির উল্লেখ করতঃ মন্ত্রমূর্ত্তিধারী মূর্ত্ত্যন্তরবিরহিত যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হইবে, এবং এবম্বিধ অর্চ্চনাকারী পুরুষই সম্যক্ দর্শনবিশিষ্ট।"

উক্ত শ্লোকের শ্রীশুকদেবকৃত "সিদ্ধান্তপ্রদীপ" নামক টীকা যথা ঃ—

ইত্থং মূর্ত্ত্যভিধানেন, অমূর্ত্তিকং—প্রাকৃতমূর্ত্তিশূন্যং, মন্ত্রমূর্ত্তিকং—মন্ত্রবাচ্য-বাচকয়োরভেদাৎ বাসুদেবাদিনামমন্ত্রবাচ্যমূর্ত্তির্যস্য স মন্ত্রমূর্ত্তিকোঽপ্রাকৃতমূর্ত্তিঃ, যজ্ঞপুরুষং যো যজতে স সম্যগ্দর্শনঃ। অস্যার্থঃ—অমূর্ত্তিকং—প্রাকৃতমূর্ত্তিবিরহিত, মন্ত্রমূর্ত্তিকং—মন্ত্রবাচ্য বাচকের অভেদহেতু হরিবাসুদেবাদি নামরূপ মন্ত্রবাচ্যমূর্ত্তি যাঁহার—তাঁহাকেই মন্ত্রমূর্ত্তি বলে, অর্থাৎ অপ্রাকৃত মূর্ত্তিবিশিষ্ট, এবম্প্রকার যজ্ঞপুরুষের যিনি ভজনা করেন, তিনিই সম্যক্দর্শী।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যালেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধাস্মৃতা ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৭।২৯ শ্লোক।

অর্থাৎ—"প্রতিমা অষ্ট প্রকার, যথা ঃ—শৈলী অর্থাৎ প্রস্তর নির্ম্মিত, দারুময়, লোহময় ; লেপ্যা—লিপ্+ন্যৎ+আপ্ অর্থাৎ যাহা লিপিবদ্ধ করা যায় তাহাকে লেপ্যমূর্ত্তি বলে ; আলেখ্যা—আংপূর্ব্বক লিপ্ ধাতু ন্যৎ, অর্থাৎ কোন মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে চিত্রিত করিলে তাহাকে আলেখ্য মূর্ত্তি বলে। সৈকতা—বালুকা

দ্বারা নির্ম্মিত, মনোময় ও মণিময়।" লেপ্যা ও আলেখ্যা যদি এক অর্থ-ব্যঞ্জকই হইত, তাহা হইলে দুইটী পৃথক্ বিশেষণের প্রয়োজনীয়তা থাকিত না।

'ওঁ' এই অক্ষরটীও শাস্ত্রে পরব্রহ্মের প্রতীক অর্থাৎ প্রতিমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ঃ—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি। গীতা।

এই চরণের শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা, যথা ঃ—ওমিত্যেকং যৎ অক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিমাদিবৎ ব্রহ্ম। প্রতীকত্বাৎ বা ব্রহ্ম। অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষরটী ব্রহ্মবাচকহেতু ব্রহ্মের প্রতিমাদিব ন্যায় ব্রহ্ম, অথবা প্রতীক অর্থাৎ প্রতিনিধি হেতু ব্রহ্মই।

"প্রাংবাহি পরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পবং স্মৃতম্" ইত্যাদি মাণ্ডুক্যোপনিষদের বচনের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"নতু পরমেশ্বরস্যৈব তৎ-যোগ্যতাসম্ভবাৎ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি মন্তব্যম্। মৎস্যকূর্ম্মাদেঃ অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণ অবতারোঽয়ং ইতি অস্মিন্ অর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎ সম্ভবাৎ।" অর্থাৎ—বর্ণমাত্রে ভগবৎ সামর্থ্য যোগ্যতা নাই বলিয়া উল্লিখিত বাক্য স্তুতিস্বরূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের ন্যায় পরমেশ্বরের বর্ণ রূপেতেই প্রকাশ বা আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে, এবং ভগবানের সহিত অভিন্নতা-বশতঃ বেদোক্তি বলে ঐ প্রণব উক্তার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি যথা ঃ—

"প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥"
"কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥"
"নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর উক্তি যথা ঃ—

"ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হেতু লহ হরিনাম।
নাম-ব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ॥"
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নাম-ব্রহ্মের শক্তি নিত্যাসিদ্ধ হয়॥

শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থধৃত পদ্মপুরাণের বচন যথা ঃ—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

অর্থাৎ—"স্বল্প পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিদিগের মহাপ্রসাদে, ভগবানে, নাম-ব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মে না।"

এইস্থলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"প্রত্যাদেশ নানা প্রকারে হইয়া থাকে। পরলোকের আত্মা প্রত্যাদেশ করিলে এবং কোন মহাত্মা সূক্ষ্মদেহে আসিয়া উপদেশ করিলে, তাহাকেও প্রত্যাদেশ বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাদেশ ভগবদাদেশ। বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাহা শোনা যায় না। ভগবদাদেশ বিবেক নহে, মনের ভাবও নহে। তাহা আত্মাতে শ্রবণ করা যায়। প্রত্যাদেশ সত্য, পতিতপাবন, জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ, অমর, তাহার সহিত কাহারও অনৈক্য হয় না।

"প্রকৃত প্রত্যাদেশ জীবনে দুই একটীর অধিক হয় না। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—বুদ্ধদেব এই প্রত্যাদেশ শুনিয়া জগৎ জাগ্রত করিয়াছেন। 'জীবে দয়া, নামে রুচি'—আদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে মত্ত করিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট,—'ভগবৎ সেবাতে জীবের উদ্ধার হয়, একজন দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না'—এই প্রত্যাদেশ পাইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে মোহিত করিয়াছেন। ঋষিরা যে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহাই উপনিষদ্‌রূপে বর্ত্তমান। এইরূপে যিনি যে প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, তাহা ঘরের কোণে লুক্কায়িত থাকে না, জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।"* গোস্বামী-প্রভু যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও যে কালে জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় নারায়ণগঞ্জে সপরিবার কিছুদিন বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা শ্রীমতী মনোরমা দেবীও গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য। ইঁহারা উভয়ে মাঝে মাঝে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। শ্রীমতী মনোরমা দেবী সংসারের নানাবিধ রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটনের মধ্যে পাঁচ ছয়টী সন্তান-সন্ততি লইয়া বাস করা সত্ত্বেও সাধনমার্গের যে প্রকার উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, সংসার-বিরাগী, কৌপীন-বহির্ব্বাসধারী, পর্ব্বত-গুহাবাসী সন্ন্যাসীদিগকেও সচরাচর সে অবস্থা লাভ করিতে দেখা যায় না। শ্রীমতী মনোরমা দেবী সময়ে সময়ে ৩২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত একাসনে সমাধিস্থ হইয়া উপবিষ্টা থাকিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার ক্রোড়ের শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া লইতে হইত; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইত না। জননী মনোরমা যখন ধীর-স্থির অটলভাবে চক্ষু নিমীলন করিয়া সমাধিস্থা হইয়া ভগবৎসত্তায় ডুবিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল যে কি এক অনৈসর্গিক শোভা ধারণ করিত, এ

* মৌনী অবস্থায় গোস্বামী-প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত উপদেশ।

জগতে তাহার তুলনা মিলে না, তাহা দেখিলে নিতান্ত অবিশ্বাসীরও মন ভগবদ্ভাবে বিগলিত হইয়া যাইত।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী দেহে থাকিতেই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া, গোস্বামী-প্রভুর সাধন-প্রণালীর চিরশান্তিময় অবশ্যম্ভাবী ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরলোকপ্রাপ্তির পর গোস্বামী-প্রভু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"ইনি (মনোরমা দেবী) ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিত। সংসারের নানাপ্রকার অভাব-অনটনের মধ্যে পতিপুত্রাদি লইয়া বাস করিয়াও যে মানুষ ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়, এই মহা-সত্যের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই অলোকসামান্যা রমণীর জীবনবৃত্তান্ত "মনোরমার জীবনচিত্র" নামক পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং এ বিষয়ে আমরা অধিক লিখিতে বিরত থাকিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শান্তিপুরের রাসযাত্রা দর্শন। কলিকাতায় অবস্থান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ। ঢাকায় অবস্থান। ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ সভার সভ্যপদ প্রত্যাখ্যান। মহাত্মা মৌনী বাবার পত্রোত্তর প্রদান। স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের লক্ষ মুদ্রা দান প্রত্যাখ্যান। স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন। অসাধারণ মাহাত্ম্যসূচক কতিপয় ঘটনা।

১২৯৮ সালের কার্ত্তিক মাসে গোস্বামী-প্রভু স্বীয় মাতৃদেবীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া হঠাৎ ঢাকা হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। তিনি গৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তদীয় মাতৃঠাকুরাণী স্বর্ণময়ী দেবী যেন তাঁহারই অপেক্ষায় গৃহদ্বারে দন্ডায়মানা আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোস্বামী-প্রভু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। স্বর্ণময়ী দেবী তাঁহার অকস্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"মা, তুমি যে আমাকে 'বিজয়' 'বিজয়' বলে ডে'কেছিলে, আমি তাহা শুনেছিলাম।"

স্বর্ণময়ী দেবী জনৈক সিদ্ধ ফকিরের আবেশে যে সময়ে সময়ে উম্মাদগ্রস্ত হইতেন, তাহার পরিচয় সহৃদয় পাঠকবর্গ একাধিকবার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে ঐ কারণে তাঁহার পাগলামী সহ্য করিতে না পারিয়া জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছিলেন যে, তিনি দুই তিনবার 'বিজয়' 'বিজয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলা-বাহুল্য, ঐ আর্ত্তনাদ যোগিবর গোস্বামী-প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। আঘাতের চিহ্ন তখনও স্বর্ণময়ী দেবীর অঙ্গে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ না করিয়া, গোস্বামী-প্রভুকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনার পরে গোস্বামী-প্রভু আর কখনও স্বর্ণময়ী দেবীকে সঙ্গ-ছাড়া করেন নাই।

শান্তিপুরের রাস চির-প্রসিদ্ধ। এই রাসোৎসব দর্শন করিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে বহু ভক্তমণ্ডলী প্রতি বৎসর শান্তিপুর আগমন করেন। এই বৎসর রাস-পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময়ে গোস্বামী-প্রভু সশিষ্য রাসোৎসব দর্শন করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমে নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ৺শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিবার জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।

এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক শ্যামসুন্দরের দিকে দৃষ্টি করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দর্ দর্ ধারে চক্ষের জল পড়িয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় দশ পনের মিনিট কাল এইভাবে অতীত হইলে, তিনি ভাব সংবরণপূর্ব্বক পুনরায় শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া বড় রাস্তার উপরে চলিয়া আসিলেন। এবং এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়াই তাঁহারা রাসযাত্রা দর্শন করিতে লাগিলেন। শান্তিপুরের বিভিন্ন বাড়ীর বিগ্রহসমূহের বহুমূল্য বেশ ভুষা ও সাজ-সজ্জার পারিপাট্য দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আহা! যাঁহারা যথার্থই ভগবৎ-বুদ্ধিতে আপন আপন ঠাকুরকে এইরূপ ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়া আনন্দ-উৎসবে মাতিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। আর যাঁহারা শারীরিক সুখ-সচ্ছন্দতা উপেক্ষা করিয়া বিবিধ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক দূরদূরান্তর হইতে আগমন করতঃ এই জীবন্ত আনন্দোৎসবের স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাঁহারাও ধন্য। এতৎপ্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন,—'ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলযাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন এবং শান্তিপুরের রাসযাত্রা দেখিবার জিনিষ। চক্ষে যাঁরা না দে'খেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না। এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি উদ্বেগ নষ্ট হইয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে।"

একদিন গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া নীলকণ্ঠের যাত্রাগান শ্রবণ করিতে জনৈক ভদ্রলোকেব আলয়ে উপস্থিত হইলেন। 'কোকিলকণ্ঠ' নীলকণ্ঠের ভাব-তাল-লয়যুক্ত সুমধুর গান শুনিয়াই গোস্বামী-প্রভুর ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ক্রমে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নীলকণ্ঠ অধিকতর উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু অবশেষে ভাবাবেশ সংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্দন্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠও সেইভাবে বিভাবিত হইয়া গান করিতে করিতে গোস্বামী-প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং হাত নাড়িয়া তাঁহাকে আরতি করিতে লাগিলেন। অদম্য ভাবের স্রোত ক্রমে শিষ্যদিগের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহারাও উচ্চ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু অরসজ্ঞ কতিপয় গোস্বামী-সন্তানের উহা ভাল লাগিল না। তাঁহারা নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন -"এরা ভারি গোলমাল ক'চ্ছে, শীঘ্র এদের থামিয়ে দাও।" মহাভাবের এইরূপ অমর্য্যাদা দেখিয়া নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিয়া দিয়া অত্যন্ত তেজের সহিত বলিলেন,—"যে স্থানে এই সব ভাবের আদর নাই, আর ভক্ত মহাপুরুষের মর্য্যাদা নাই, সে স্থলে আমি গান করি না, এবং সেস্থানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।"—এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আসর হইতে চলিয়া গেলেন। গোস্বামী-প্রভুও শিষ্যদিগের সহিত চলিয়া আসিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে গোস্বামী-প্রভু শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া, মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীটের একটী আলয়ে ১০।১২ দিবস অবস্থান করেন। এই সময়ে একদিবস সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে মুক্তি-ফৌজের (Salvation army) অধ্যক্ষ বুথ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীয় লোকদিগের কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা কাঙ্গালের বেশে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ, খোঁড়া, এমনকি, কুষ্ঠরোগীদিগকেও আগ্রহের সহিত স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে আনয়নপূর্ব্বক অত্যন্ত যত্ন সহকারে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। নিরাশ্রয় অন্ধ আতুরদিগের প্রতি মুক্তি-ফৌজের এইরূপ দরদ ও ভালবাসার কথা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"পরদুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থের স্বরূপ, তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।" এই বলিয়া বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিলেন।

একদিন অপরাহ্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় (স্বামী রামানন্দ) গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"নির্জ্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।" তখন গোস্বামী-প্রভুর ইঙ্গিতে উপস্থিত শিষ্যগণ অন্যত্র গমন করিলে, বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"গঙ্গোত্তরী হইতে হিমালয়ের উপরে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েকটী উপদেশ দিলেন এবং আপনার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার উপদেশমত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া ক'রে আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে— তাহাও বলিয়া দিন।" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"সর্ব্বত্রই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে উপকার হয়। সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরলভাবে চলিলে সব হয়। গৈরিক ধারণ করিলে বীর্য্যও ধারণ করিতে হয়, শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা আছে, না হ'লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।" এই কথা বলিয়া গোস্বামী-প্রভু নিজের একখানা বহির্ব্বাস বিদ্যারত্ন মহাশয়কে প্রদান করিলেন। তিনিও উহা লইয়া গোস্বামী-প্রভুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিবস অপরাহ্নে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য এই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী যথার্থই আনন্দময়ী ছিলেন। তিনি যখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন, স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাসাতে সেই স্থানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে যেন

আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিতেন। সেইদিন গোস্বামী-প্রভুর রাত্রিকালীন আহারান্তে মা আনন্দময়ী একটী একতারা সংযোগে তাঁহাকে গান শুনাইতে বসিলেন। গান ক্রমেই জমাট হইয়া উঠিল। উপস্থিত সকলেই নীরব-নিস্পন্দ-ভাবে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী দেবীও ভাবে বিহ্বলা হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভাবের তরঙ্গ এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, গোস্বামী-প্রভুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বশরীরে ঘন ঘন অশ্রু কম্প পুলকাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি কখনও "হরিবোল ধ্বনি" কখনও "জয় রাধে," কখনও বা "আঃ, উঃ"—ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে যেন একটী প্রবলশক্তি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরের ও বহির্ভাগের লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিকে একটি অব্যক্ত আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। আবার কতকগুলি লোক এই অবস্থায়ই গড়াইতে গড়াইতে গোস্বামী-প্রভুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

লোকজনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় এই বাড়ীতে নানারূপ অসুবিধা হইতে লাগিল। অতঃপর স্বর্গীয় শ্রীচরণবাবুর দ্বারা শ্যামবাজারের বড় রাস্তার তে-মাথার উপরে শ্রীযুক্ত কান্তি ঘোষের বাড়ীর তে-তালাটী ভাড়া করিয়া গোস্বামী-প্রভু পরিবারবৃন্দসহ তথায় গমন করিলেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে এক দিবস গোস্বামী-প্রভু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তদীয় পার্ক ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে গমন করেন। এই কার্য্যের জন্য মহর্ষি তদীয় অনুগত ভক্ত শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"মহর্ষি অত্যন্ত অসুস্থ, চক্ষে কম দেখেন, কাণেও কম শুনেন। আপনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি আপনাকে একবার দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন গোপনীয় কথা তিনি আপনাকে বলিতে চান।" শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই গোস্বামী-প্রভু মহর্ষির উদ্দেশ্যে করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আমার বহু সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। কোন্ সময়ে গেলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে?" শাস্ত্রী মহাশয় সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য যথাসময়ে কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে মহর্ষির আলয়ে উপনীত হইলেন।

অতঃপর মহর্ষির সহিত গোস্বামী-প্রভুর যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং আনুসঙ্গিক যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ১২৯৮ সনের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রায় তিনটার সময়ে আমরা পার্ক ষ্ট্রীটে মহর্ষির ভবনে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মুখের হল-ঘরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই খুব আনন্দ করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এবং মহর্ষিকে সশিষ্য ঠাকুরের আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। মহর্ষি ঐ সময়ে মগ্নাবস্থায় ছিলেন বলিয়া, আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদিগকে অবস্থান করিতে হইল। বাক্য-স্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রই মহর্ষি সকলকে উপরে যাইতে সংবাদ দিলেন। ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলেই যাইয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

"দেখিলাম, প্রকাণ্ড হল-ঘরের মধ্যস্থলে একখানা ইজি-চেয়ার মহর্ষি অর্দ্ধ-শয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। দক্ষিণে ও বামে দু'খানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে দুখানা লম্বা বেঞ্চ এমনভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহাতে বসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে পবিত্র মূর্ত্তি বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদ্‌গদ্‌ স্বরে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

—'গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ,' বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়া মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন,— "ইঁহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইঁহারা কে?" শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইঁহারা সকলেই গোঁসাইর শিষ্য।"

মহর্ষি বলিলেন—"মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খাইয়া অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও (গোস্বামী-প্রভু) সেইরূপ নিজে যাহা ভোগ করিতেছেন, শিষ্যদিগকেও তাহা দিতেছেন; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই। শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করেন। ইনিই ধন্য,

ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তাপহারক। ইঁহাদের দেখিলে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।” এই সকল কথার পর তিনি ঠাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়া বোলপুরের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন—“বোলপুরে একটী আশ্রম হইযাছে। শীঘ্রই উহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য হইবে। সশিষ্যে তুমি ঐ উৎসবে যোগদান করিলে বড়ই আনন্দ হইত। ঐ আশ্রমটীর প্রয়োজন এবং নিয়মপ্রণালী কিরূপ হওয়া তুমি ভাল মনে কর, জানিতে ইচ্ছা হয়।”

“ঠাকুর বলিলেন—“ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আশ্রম আছে। তাই সাধু-সন্ন্যাসীরা ঐসকল দেশে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ প্রকার কোন ধর্ম্মাশ্রম নাই বল্‌লেই হয়। যে দুই একটী আছে, তাহাও সম্প্রদায়-বিশেষের। সকল ধর্ম্মার্থিগণ একটী স্থানে আশ্রয় পে’য়ে আপন আপন ভজন-সাধন অবাধে ক’র্‌তে পারেন, এরূপ একটী আশ্রমের বড়ই প্রয়োজন মনে হয়। শান্তিনিকেতন যদি সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, দরবেশাদি সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ভগবদুপাসকগণের শান্তির সাধারণ স্থান হয়, তবে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায না। দেশে এটির বড়ই অভাব।

“মহর্ষি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘সাধু! সাধু!! বাস্তবিক যাঁহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম, তাঁহাদের কথায় অন্তরকে স্পর্শ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হ’য়ে যায়। যথার্থ সাধুর কথা এইরূপই হয়। না হ’লে কথা ভাসা ভাসা হ’য়ে যায়। তুমি যে রকম বলিলে, তাহাই হওয়া ঠিক, ইহা সত্য। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের ভার যাঁহাদের উপর রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্য, গোলমাল চলিতেছে। তোমার এই অসাধারণ উদার ভাব কখনো তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমার অন্তরের কথা আমি কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝিবে, তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা বলিয়া ঠাণ্ডা হইব।’ এই বলিয়া মহর্ষি নিজ জীবনের কথার সঙ্গে হাফেজের কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মহর্ষি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—ভগবান্‌কে যেমনভাবে পাইতে আকাঙ্ক্ষা, তেমনভাবে পাইতেছি না। সময়ে সময়ে তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যান, যতক্ষণ আবার প্রেমময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি। প্রাণ আমার ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌ করে। সময় যে কিভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়া করিয়া দর্শন না দিলে, কি আর করিব? জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ

প্রেমভক্তি তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। তাহা তো চেষ্টাসাধ্য নয়, তাঁহার দয়ায় হয়; "পুরুষকার" অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করিয়া তিনি আমায় গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করিয়া তাঁর দয়ার দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছি।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর, "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিতে লাগিলেন। একটু পরে চোখ মুখ মুছিয়া মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন—"যেক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব্ব হইতেই তাহার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন—এই চারটী একসঙ্গে না থাকিলে প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোল-আনা ধর্ম্ম লাভ হয় না। তোমাতে এই চারটী উপযুক্তরূপে রহিয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বৈত-প্রভুর বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছ, তাঁর কৃপায় প্রকৃত সৎশিক্ষা, সদুপদেশ পাইয়াছ। তারপর, মনুষ্য-চেষ্টায় সাধন-ভজনও যতটা সম্ভব, তাহাও পূর্ণমাত্রায় তুমি করিয়াছ, সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা—তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রহিয়াছে। তুমি ধন্য।" এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটী শ্লোক পড়িলেন—

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥"

পরে বলিলেন—"তুমি যাহাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান্ তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"আপনিই তো আমাকে হাত ধ'রে মানুষ করে'ছেন। আমার সবই তো আপনা হ'তে। আপনিই তো আমার গুরু।" ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন্—'হাঁ, তা ঠিকই ব'লেছ, গুরু ত বটেই! তবে সে যে পাঠশালার ছেলের গুরুমহাশয়ের মত! ক, খ, শিখিতে হইলে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমহাশয়ের নিকট শিখিতে হয়। পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পাইয়া ঐ গুরুমহাশয়ের গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমহাশয়কে গুরু বলিলে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হইতেছে।' ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন— 'আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।' মহর্ষি প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।'

"আমরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামকরতঃ বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি খুব হৃষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'তোমাদের মঙ্গল হইবে। গোঁসাইকে তোমরা কখনও ছাড়িও না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন।' গোস্বামী-প্রভুর সহিত মহর্ষির এই শেষ দেখা।

মহর্ষির আলয় হইতে বাহির হইবার পরেই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিয়াছি সদ্‌গুরুর কৃপা না হ'লে ব্রহ্মদর্শনের অধিকার হয় না। তা'হলে মহর্ষির এরকম অবস্থা লাভ হ'ল কি ক'রে? তিনি ত গুরু গ্রহণ করেন নাই।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন- "কে বলিল, মহর্ষির সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই? মহর্ষি নিশ্চয়ই সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীচরণবাবু তৎক্ষণাৎ মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি গুরু গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? মহর্ষি তাঁহাকে এই প্রশ্ন করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোস্বামী-প্রভুর সহিত তাঁহার সদ্‌গুরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। মহর্ষি প্রথমতঃ গুরুকরণের কথা অস্বীকার করিলেন। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"হাঁ, হইয়াছে, গোস্বামী-মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। আমি এক দিন হিমালয়ের কোন নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতেছিলাম। হঠাৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি যে, অনতিদূরে একটী পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে একজন মহাপুরুষ আমার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষুর উপরে আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই, তাঁহার চক্ষু হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আমার শরীরে প্রবেশ করিল, এবং আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। তদবধি আমার অন্তরে ধর্ম্ম-ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল। ইহার পূর্ব্বে শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাহা প্রাণে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।" আমরা শুনিয়াছি, গোস্বামী-প্রভু গয়া হইতে যোগদীক্ষা গ্রহণানন্তর উচ্চাবস্থা লাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, এক দিবস মহর্ষি তাঁহার নিকটে নিজের আধ্যাত্মিক দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহা দূর করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি মহর্ষিকে কৃপা করিবার জন্য স্বীয় গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। পরে তিনিই এক দিবস অলক্ষিতভাবে মহর্ষিকে উল্লিখিত প্রকারে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন।*

মহর্ষির সহিত গোস্বামী-প্রভুর বিভিন্ন সময়ের ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ৺শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "দাসী" পত্রিকায় 'সাধু সমাগম' নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথাঃ—

* প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীমুখাৎ শ্রুত।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যখন ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেন, তখন প্রয়োজনবশতঃ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেই, ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমরা অনেকেই দুই তিনবার গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে মহর্ষিকে দেখিতে গিয়াছি। মহর্ষি একবার গোস্বামী-মহাশয়কে দর্শন করিবামাত্র, "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ"—ইত্যাদি শ্লোকের আধখানা উচ্চারণপূর্ব্বক পরম সমাদরে গোস্বামী-প্রভু ও তাঁহার সহগামী শিষ্যগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন—আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্ম দর্শনের ফল হয়,—"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যগণ মহর্ষির পদস্পর্শ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রেমিকের নিকটই প্রেমিকের প্রাণ খুলিয়া যায়, রসিকের কাছেই রসিকের স্ফূর্ত্তি হয়। সাধু দর্শন করিতে হইলে মানুষ যেন সাধুর সঙ্গেই সাধু-দর্শনে যায়, জহুরি না হইলে রতন চেনে কে? মহর্ষির চৌরঙ্গিস্থ মনোহর উদ্যান-বেষ্টিত সুরম্য দ্বিতল গৃহের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এই সাধু-সমাগম হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর একবার যখন আমরা গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে গমন করিয়াছিলাম তখন মহর্ষি আমাদিগকে উপবেশন করাইয়াই উপনিষদের শ্লোকসকল আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি আত্মস্থ হইলেন। গোস্বামী-প্রভু স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনার ভিতরে ডুবিয়া গেলেন। নিমীলিত-নেত্রে উভয়েই কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন। পাছে আমাদের সম্মুখে সাধনের গূঢ় তত্ত্বসকল প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্যই যেন উভয়ে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রাণে প্রাণে আলাপ করিতে লাগিলেন; তখন গৃহটী গম্ভীর নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাদের সেই মগ্নাবস্থা দেখিয়া প্রাচীন কালের পূজ্যপাদ ঋষিগণকে স্মরণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার কথা আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ খুলিয়া গেল।" গোস্বামী-প্রভু করযোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন—"আপনিই আমার সকল, আপনার কৃপাতেই আমার শান্তিলাভ হইয়াছে।" মহর্ষি কহিলেন—"ধর্ম্মপ্রচারে অনেক লোকই প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং যাঁহার হাত ধরিয়া একার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন আপনা হইতেই সরিয়া যায়।" একটু পরে গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক মহর্ষি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"আপনি যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার কৃপায় ইহারা সফলকাম হউক।" মহর্ষি, গোস্বামী-প্রভুর দিকে আবার ফিরিয়া বলিলেন—"পূর্ব্বে যে সকল কথা বিশ্বাস করিতাম না, এখন নিজের জীবনেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমি তাঁহার কাছে যাইতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু

তিনি আমাকে বলিলেন—তুই আরও পবিত্র হ, আরও নির্ম্মল হ, আমার সহবাসের উপযুক্ত হইলে আমি তোকে ডাকিব। তখন মহর্ষিকে প্রশ্ন করা হইল—"আপনি এ সকল কথা কিরূপে শুনিলেন ?" তিনি উত্তর করিলেন—"একটা বাণী শুনিলাম ; সে বাণী অতি স্পষ্ট, অতি পরিষ্কার।" সেই বাণী শুনিয়া অবধি আমি তাঁহার ডাকের অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমার চক্ষু-কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকলই লইয়াছেন, আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতের পুতুল! কি খাইব, কি পরিব নিজে কিছুই জানি না। তিনি যাহা করান, তাহাই করি ; তিনি যে দিকে ফিরান, সেদিকেই ফিরি ; আমাকে আর কতদিন এভাবে থাকিতে হইবে, জানি না। এই কথা বলিতে বলিতে মহর্ষির প্রশান্ত মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল ; তাঁহার আরক্তিম শ্রীমুখ-কমলে দুই একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাতকালের প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের উপব শিশিরবিন্দু পড়িলে যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়, মহর্ষির শুভ্র শ্মশ্রুতে অশ্রুবিন্দু পড়িয়াও সেইরূপ অতুল শোভা ধারণ করিল। গোস্বামী-প্রভুর স্বাভাবিক সৌম্যমূর্ত্তি হইতে প্রেমভক্তির সুস্নিগ্ধ রশ্মি বিকীর্ণ হইতে লাগিল ; এক অপূর্ব্ব ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ তাহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। আমরা সেই অতুল শোভা, অপূর্ব্ব ভাব, অদ্ভুত প্রেমছবি, প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। মহর্ষি গোস্বামী-প্রভুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আজ তোমাকে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম, তাঁহার জন পাইলে, তাঁর কথা বলিতে আমার বড়ই উৎসাহ জন্মে। প্রাণের কথা আর কাহাকেই বলি, আর কেইবা বুঝিবে ? ভুক্তভোগী না হইলে বুঝিতে পারে না, বুঝিবেই বা কি প্রকারে ? আমি নিজেই দেখিতেছি, এতদিন যাহা নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন তাহা ক্যাশ ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা খাইতেছি।" মহর্ষির কথার মর্ম্ম আমরা এই বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি শাস্ত্রালোচনা করিয়া বুদ্ধিতে যে সকল তত্ত্ব বুঝিয়া-ছিলেন, এবং স্মৃতি যাহা ধারণা করিয়াছিলেন, অবশেষে সাধন দ্বারা তাহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অবধি মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কেবল ধর্ম্মের কথা লইয়া কেহ কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে না ; কেবল তত্ত্বালোচনা দ্বারা কেহ কস্মিন্ কালেও তত্ত্বদর্শী হইতে পারে না ; ধর্ম্মতত্ত্ব জীবনে সাধন করিতে হয়। নতুবা ধর্ম্মজীবন গঠন হয় না। ধর্ম্ম যতদিন যুক্তি-তর্কের উপর দাঁড়ায়, ততদিন তাহা লইয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ধর্ম্ম যখন জীবনে ফুটিয়া উঠে, তখনই মানুষ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। কথার ধর্ম্ম যেমন অসার ও অস্থায়ী, শুধু ভাবের ধর্ম্মও তেমন মত্ততাপূর্ণ ও অনিত্য, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

এইস্থানে অবস্থানকালে একদিবস গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া

কালীঘাটে ৺কালীমাতাকে দর্শন করিতে গমন করেন। ঐ দিন মন্দিরাভ্যন্তরে লোকের অত্যন্ত ভিড় ছিল। পাণ্ডামহাশয়গণ গোস্বামী-প্রভুকে অতিশয় আগ্রহ ও যত্ন সহকারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তিনি দেবীকে মালা ও ডালি অর্পণ-পূর্ব্বক করযোড়ে নমস্কার করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুনঃপুনঃ 'মা! মা!' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবীর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি এদিকে ওদিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার এবংপ্রকার ভাব দর্শন করিয়া সঙ্গীয় শিষ্যগণ তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আসিলেন। এই সময়ে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার চরণধূলি লইতে লাগিল। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু একটী রোয়াকে বসিয়া ভাবাবেশে কালিকাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"জগন্নাথদেবের রূপের সহিত এই কালীর রূপের অনেক সাদৃশ্য আছে। মা'র কত দয়া! সকলকেই মা দয়া ক'চ্ছেন।" এই সময়ে আলুলায়িতকেশা, ছিন্নবেশা একটী বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী আসিয়া গোস্বামী-প্রভুর কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মহাবিষ্ণুর স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। একটী নগণ্যা ভিখারিণীকে বিশুদ্ধভাবে স্তব পাঠ করিতে দেখিয়া সকলেই কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। স্তব পাঠ সমাপন করিয়াই তিনি গোস্বামী-প্রভুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন "বাবা, আজ আমার জন্ম সার্থক।" এই বলিয়া একটি পয়সা প্রদানপূর্ব্বক লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। গোস্বামী-প্রভু অতিশয় আগ্রহ সহকারে পয়সাটী লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং "অযাচিত দান অগ্রাহ্য করিতে নাই"—এই বলিয়া জনৈক শিষ্যের হাতে উহা প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট কয়েকটী সাধুকে সেবার্থে কয়েকটী টাকা প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে জনৈক শিষ্য পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত ভিখারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"উনি মায়ের (কালিকাদেবী) সঙ্গিনী; মা আজ বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তাই অভ্যর্থনার জন্য উহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

একদিবস কলিকাতার সুবিখ্যাত বদান্য স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা গোস্বামী-প্রভুকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি (ঠাকুর মহাশয়) লোকমুখে গোস্বামী-প্রভুর অযাচক-বৃত্তি, ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী বহু ব্যক্তিকে আশ্রয়দান—ইত্যাদি অনেক গুণগ্রামের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে একলক্ষ মুদ্রা উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এবং গোস্বামী-প্রভু যদি অবসরমত একবার তাঁহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঐ টাকাটা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন—ইত্যাদি। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনিয়া গোস্বামী-

প্রভুর চক্ষে জল আসিল। মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিলেন—"ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন, আমার এখানে যাহা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে ভগবান্ তাহা প্রতিদিন দি'য়ে থাকেন। একটী কানাকড়িরও অভাব রাখেন না। সুতরাং তিনি ঐ টাকা ধর্ম্মার্থে যথায় ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি তাহা গ্রহণ করিলে আমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে মনে করি। আর বড় লোকের বাড়ী যেতেও আমার বড় ভয় হয়। দীন-হীন কাঙ্গাল হ'য়ে ভগবানের নাম নি'য়ে যেন তাঁহারই দ্বারে প'ড়ে থাক্‌তে পারি, ঠাকুর মহাশয়কে এই আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন।" এই কথা শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, গোস্বামী-প্রভুকে নমস্কারপূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করিলেন। বলাবাহুল্য, বিদ্যারত্ন মহাশয় অতিশয় সৎভাবেই ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য ডাক্তার স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাসাবাটী গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার গুরুতে অটল ভগবৎ-বুদ্ধি, গুরুভ্রাতাদিগের প্রতি অপার্থিব স্নেহ, ভালবাসা ও আড়ম্বরশূন্য সদনুষ্ঠান—ইত্যাদি যিনি একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। শ্রদ্ধেয় নবীনবাবু প্রত্যহ নিয়মিত আহ্নিক সমাপনান্তে নির্জ্জন ও অবসর বুঝিয়া, ফুল, চন্দন, তুলসী লইয়া তাঁহার গুরু ও ইষ্টদেব গোস্বামী-প্রভুকে পূজা করিতে আগমন করেন এবং তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়াই অশ্রু কম্প পুলকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। গোস্বামী-প্রভুর চরণ-কমলে পূজোপহার অর্পণ করিতে অগ্রসর হইলেই, 'তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন,' এই বলিয়া গোস্বামী-প্রভু তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। যে গোস্বামী-প্রভু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় ভক্ত ব্রাহ্ম কেশববাবুর (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র) পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তিনি এখন শিষ্য কর্ত্তৃক পদপূজা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন। ইহা বাহ্যদৃষ্টিতে অতীব বিসদৃশ প্রতীয়মান হইলেও, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ঐ দুই কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহার প্রথমটির উদ্দেশ্য, অসত্য নিবারণ ও দ্বিতীয়টার উদ্দেশ্য সত্য-প্রতিষ্ঠা। মুঙ্গেরে যাঁহারা কেশববাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার জ্ঞান করিয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন মানুষকে ভগবানের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ। তাই গোস্বামী-প্রভু তখন ঐ অসত্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এখন ভগবৎ-নির্দ্দেশে সৎ-গুরুর আসনে উপবিষ্ট। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীগত

ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তিনি এখন নিত্য সত্য ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র ও সদাচারের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক, উহার মাহাত্ম্য প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। স্ব স্ব গুরুদেবকে ভগবৎ-বুদ্ধিতে দর্শন করা ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেশ।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

গুরু-গীতা।

সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবহমানকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বাগ্রে গুরু-পূজা না হইলে হিন্দুদিগের কোন ধর্ম্মকার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র ও সদাচারের প্রচারক হইয়া তিনি এখন কি প্রকারে শিষ্যদিগকে তদনুমোদিত কার্য্য করিতে বাধা প্রদান করিতে পারেন? একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন কোন প্রকার স্বার্থ-সাধন, সম্মান অথবা আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহাই যদি থাকিবে, তবে তিনি ইতিপূর্ব্বে পৈত্রিক শিষ্য কর্ত্তৃক পদপূজা বন্ধ করিয়া একেবারে শিষ্যবাড়ীর সংস্রব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন? তবে একথাও সত্য যে, শিষ্য হইলেও তিনি যখন তখন, যাহাকে তাহাকে পদপূজা করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই। দৈবাৎ যখন কোন গুরুগত প্রাণ শিষ্য ভগবৎ-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ-বুদ্ধিতে গুরুপূজা করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনিই কেবল ঐরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপরের পক্ষে তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করাও কঠিন ছিল।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার সংগ্রামপুর নামক গ্রামে মাতুলালয়ে, ১২৪৯ সনের ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ৺রামকুমার ঘোষ, মাতার নাম গুণমণি দাসী। ৺রামকুমার ঘোষ মহাশয় পরম ভাগবত ছিলেন। অতিথি-বৈষ্ণব-সেবা তাঁহার নিত্যকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলেও তাঁহার অহঙ্কার আদৌ ছিল না, সর্ব্বদাই দীনহীনের ন্যায় থাকিতেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ তাঁহার পিতৃদেবের ঐ সকল সৎ গুণের পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত কষ্ট-সহিষ্ণু ছিলেন, এবং ধর্ম্মকথায় সময় অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার ন্যায় সত্যবাদী জগতে দুর্ল্লভ। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছেন বলিয়া কেহ অবগত নহেন, এবং এই সত্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে আজীবন যে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হেয়ার স্কুল (Hare School) হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকেল

কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এল এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ নবীনবাবু তাঁহার প্রকৃত বয়সের কথা উল্লেখ করিয়াই সরকারী চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন। কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি তাহার দরখাস্ত পাঠ করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি বয়স কম করিয়া লিখ, নচেৎ চাকুরী পাইবে না।" তদুত্তরে নবীনবাবু বলিলেন,—"চাকুরী পাই আর নাই পাই, আমি কখনও মিথ্যা কথা লিখিতে পারিব না।" তাঁহার এইরূপ সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া অধ্যক্ষ সাহেব অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার দরখাস্তের উপরে জোর সুপারিস (Recommend) করিয়া উপরে পাঠান এবং তাহাতেই তিনি চাকুরী পান। ইহার প্রায় ১০।১২ বৎসর পরে যখন তিনি চাকুরী ছাড়িয়া কালীঘাটে ডিস্পেনসারী (Dispensary) দিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন একদিন গভীর রাত্রে জনৈক ছদ্ম-বেশী গোয়েন্দা বিভাগের লোক তাঁহার নিকটে কিছু ব্রাণ্ডি (Brandy) ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় নবীনবাবু বলিলেন যে, তাহার ব্রাণ্ডি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স নাই, সুতরাং তিনি উহা বিক্রয় করিতে পারেন না। তাহাতে ঐ লোকটী অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলিল যে, তাহার পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এত রাত্রে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি দিয়া তাহার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করুন। পরদুঃখকাতর নবীন-বাবু তখন নিতান্ত দয়া-পরবশ হইয়া আবশ্যকীয় ব্রাণ্ডি বিনামূল্যে দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ঐ লোকটী অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া মূল্য দিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে লাইসেন্স বিভাগের কর্ম্মচারী ঐ লোকটীকে সঙ্গে করিয়া নবীনবাবুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকল্য রাত্রে এই লোকটীকে তিনি ব্রাণ্ডি বিক্রয় করিয়াছেন কি না? তখন তিনি অম্লান বদনে উহা স্বীকার করিয়া ২০ টাকা অর্থ দণ্ড দিলেন, তথাপি কিঞ্চিন্মাত্র সত্য হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ঐ বিশ্বাসঘাতকের কথা অস্বীকার করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১২৬৭ সনের ২রা ফাল্গুন ২৪ পরগণার পেয়াড়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসীর সহিত শ্রদ্ধেয় নবীনবাবু বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন, এবং তাঁহার গর্ভে তিনি ৪টী পুত্র এবং একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ ঘোষ ব্যতীত অপর সন্তান-সন্ততিগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এবং ক্রমাগত এই সকল শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তদীয় সন্তানবৎসলা স্ত্রী একেবারে উম্মাদগ্রস্ত হন। ইহাতে নবীনবাবুর সংসার-জীবন আগাগোড়াই দুঃখান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু উহাতে তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য

কর্ম্ম হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার উন্মাদগ্রস্তা স্ত্রীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল অম্লান বদনে তাহার অশেষবিধ অত্যাচার অপচার সহ্য করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া বর্দ্ধমান, জামালপুর, বাজিতপুর, বেটিয়া প্রভৃতি বাঙ্গলা ও বেহার প্রদেশের বহু স্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জলপাইগুড়ী বদলি হন। এবং তথায় কিছুদিন সিভিল সার্জ্জনের (Civil Surgeon) কার্য্য করিবার পর ভেমোগিরিতে বদলী হন। এইস্থানে আসিয়া তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবং তাহার উন্মাদগ্রস্তা স্ত্রীকে লইয়া পুনঃপুনঃ স্থানান্তরিত হওয়াও কষ্টকর বোধ হওয়ায়, তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কালীঘাটে আসিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১২৯৩ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রদ্ধেয় নবানবাবু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ১২৯৭ সনের ২১শে চৈত্র ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে যুগল মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই সময়ের মনের ভাব তিনি নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা ঃ

"২১শে চৈত্র, ১২৯৭ শুক্রবার ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে শ্রীযুক্ত পরমারাধ্য গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাশয় আমাকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সে সময়ে হৃদয়-মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। সে সময়ের ছবি আমার হৃদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া থাকু। জয় গোপীবল্লভ।" একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন যে, স্থুলদেহে যুগলমূর্ত্তি দর্শন করা যাইতে পারে কিনা? তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"হাঁ, দর্শন হইতে পারে, কিন্তু উহা দর্শন হইলে আপনার দেহ থাকিবে না।"

এই সময় হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের মূল মন্ত্র 'জীবে দয়া, নামে রুচি' তত্ত্ব তিনি তাঁহার জীবনের সার করিয়া লইয়াছিলেন। দরিদ্র রোগী উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার নিকট হইতে দর্শনী (Visit) এমন কি ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত লইতেন না। এতদবস্থায় ব্যবসায়ের উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? এতদ্ভিন্ন যে সকল অবস্থাপন্ন রোগী তাহার চিকিৎসাধীন হইয়াছিলেন, তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান নন্দলালের চিকিৎসার্থে প্রায় ৮।৯ মাস বিদেশে থাকায়, তাঁহারাও তাঁহার হাতছাড়া হইয়া গেলেন। এই কারণে তিনি কালীঘাট পরিত্যাগ করিয়া শ্যামবাজার আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই স্থানের লোকেরা তাঁহাকে রহস্য করিয়া "মরা পোড়ান" ডাক্তার বলিয়া অভিহিত করিত। কারণ তিনি গরীবদুঃখীদিগের নিকট হইতে দর্শনী ও ঔষধের মূল্য ত লইতেনই না, অধিকন্তু তিনি অসমর্থ রোগীদিগকে পথ্যের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন এবং একবার জনৈক মৃত রোগীর সৎকারের লোকের অভাব হওয়াতে নিজেই তাহাকে

দাহ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ক্রমশঃ ব্যবসায়ের লোকসান হইতে থাকিলে, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের (ইনি ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন) স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে স্বীয় সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। ক্রমে তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি ও মানদ—ইত্যাদি বৈষ্ণব লক্ষণ সকল তাঁহার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, সকলকেই দর্শনমাত্র উপুর হইয়া নমস্কার করিতেন, কেহই তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বে নমস্কার করিবার অবসর পাইত না। একসময়ে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু নামক তদীয় জনৈক গুরু-ভ্রাতার বাড়ীতে প্রত্যেক রবিবারে কীর্ত্তন হইত। এবং তিনি নিয়মিত তাহাতে যোগদান করিতে যাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই উপুর হইয়া উপস্থিত সকলকে নমস্কার করিতেন। প্রত্যহ এইরূপ করাতে তাঁহার গুরু-ভ্রাতারা একদিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, অদ্য নবীনবাবু আসিলেই সকলে তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবেন, কিন্তু তাঁহার প্রণাম কেহই গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলেই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন এবং যেই নবীনবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন, অমনি চারিদিক হইতে সকলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আসনে পায় গুটাইয়া বসিলেন। তখন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বৃদ্ধ নবীনবাবু সকলের পদধূলি লইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া, সকলের প্রতি যোড়হাত করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন – "গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন যে ধর্ম্মরাজ্যের পন্থা সমস্ত নরনারীর পায়ের তল দিয়া। এখন কেহই যদি আমাকে পদধূলি না দেন, তবে আমার গতি কি হইবে?" তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলে আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদিগকে গুরুবুদ্ধিতে দর্শন ও মর্য্যাদা করিতেন এবং ছোট বড় সকলেরই কোন না কোনরূপ সেবা করিতে সর্ব্বদা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু স্বয়ং কখনও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। এমন কি, নিজের চাকর চাকরাণীদের সেবা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন। একদিন তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসু (গুরুকৃষ্ণ দাস) তাঁহার সেবা করিবার মানসে গোপনে তাঁহার তামাক খাইবার কল্কিতে তামাক ও টিকা দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে নবীনবাবু তামাক খাইতে গিয়া ঐরূপ দেখিয়া—"কে তামাক সাজিয়া রাখিয়াছে, এমন কাজ কে করিল?" ইত্যাদি বলিয়া বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক সাজা কল্কি ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া খাইলেন। তাঁহার ন্যায় অদোষদর্শী লোক জগতে দুর্ল্লভ। একদিন তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতা অপর কোন গুরু-ভ্রাতার কোন অন্যায় কার্য্যের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্লোকটী এই ঃ—

"এককৃষ্ণ ভগবান্ আর সব তাঁর ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

ধন-জন, বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্যও অহংকার তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। একদিবস নবীনবাবু তাঁহার কোন গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন…বাবু, লোকের এত অভিমান কেন? তাহাদের অভিমান প্রকাশ করিবার কি আছে?" গুরুভ্রাতাটী তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উত্তর করিলেন—"কেন? ধন-জন, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি যাহার যাহা আছে, তাহার তাহা প্রকাশ করাতে দোষ কি?" তখন তিনি, "বলং বলবতাচাস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং, বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি—ইত্যাদি গীতার শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন—"জগতে সৎ গুণ ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, সবই যদি তিনিই হইলেন তাহা হইলে 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিয়া মানুষের এত অভিমান কেন?" একদিবস গোস্বামী-প্রভু নবীনবাবুর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"নবীনবাবু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ইনি দেহে থাকিয়াই ব্রজধামের অপ্রাকৃত প্রেমরস আস্বাদন করিতেছেন।" ইদানিং শ্রদ্ধেয় নবীনবাবু সর্ব্বদা সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ পুরাণপাঠশ্রবণ, হরিনামকীর্ত্তন-রসাস্বাদন—ইত্যাদি কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেন। এবং সাধারণের উপকারার্থে হোমিওপ্যাথিকশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একবাক্স ঔষধ রাখিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে মেডিকেল কলেজ পাঠকালীন তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহকারীরূপে কিয়ৎকাল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি-অভ্যাগত দুঃখী-দরিদ্র ইত্যাদি তাহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ হইয়া যাইত না। তিনি যথাসম্ভব সকলেরই সৎকার করিতেন। যশ বা প্রতিষ্ঠাকে তিনি শূকরের বিষ্ঠার মত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। উহা তাঁহার বাহ্য কার্য্য-কলাপ হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িত। একবার পুরীধামে গোস্বামী-প্রভুর সমাধি-আশ্রমে তিনি একাকী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আপনাদের দয়া আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ ঘোষের স্ত্রী, অল্পবয়স্ক একটী কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিলে, উহাদের লালন-পালনের ভার নবীনবাবুর উপরেই পড়ে, কারণ শ্রীমান্ ভোলানাথ আর বিবাহ করেন নাই। কন্যাটীকে যথাসময়ে সৎপাত্রস্থ করা হয় এবং পুত্র শ্রীমান্ তারক-চন্দ্র ঘোষ তাঁহার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে। ১৩৩১ সনে টালা সরকার-বাগান নীলমণি ষ্ট্রীটস্থ নিজ বাটীতে শ্রদ্ধেয় নবীনবাবুর অতিশয় আদর

ও যত্নে প্রতিপালিতস্নেহের পুত্তলী শ্রীমান্ তারক হঠাৎ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার সংসার-বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেলে, তিনি ৺কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে তাঁহার একান্ত অনুগত পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ, ১৩৩১ সনের ২৬শে অগ্রহায়ণ তাঁহাকে লইয়া কাশীধামে আগমনপূর্ব্বক ২৬নং হারাবাগের একটী ত্রিতল বাড়ীতে অবস্থান করেন। তথায় এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক, তদীয় কতিপয় গুরু-ভ্রাতার সঙ্গে সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিয়া, ১৩৩২ সনের ২৪শে পৌষ, শুক্রবার, বেলা ১২টা ৫০ মিনিটের সময় ৮৩ বৎসব বয়ঃক্রমকালে সজ্ঞানে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চিরপ্রার্থনীয় অপ্রাকৃত ব্রজধামে গমন করেন। তাঁহার কাশীবাসী গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ পুষ্পমালায় সজ্জিত করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে লইয়া যান, এবং তথা হইতে নৌকা-যোগে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গিয়া শ্রীমান্ ভোলানাথের সহযোগে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

৺কাশীধামে আগমনের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শ্রীমান্ ভোলানাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনার কোন বাসনা থাকিলে আজ্ঞা করুন, আমি তাহা পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে তাঁহার কোন বাসনা নাই। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তোমার ঠাকুরদাদা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে রাধা-কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদ্বারা উহা ঘটিয়া উঠে নাই, অতএব তুমি যদি পার ঐ কাজটী করিও।" তাঁহার এই আদেশানুসারে তাঁহার পিতৃবৎসল পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ, কাশীধামে ২৭০নং পীতাম্বরপুরার বাটী ক্রয় করিয়া, ১৩৩৩ সনের ৩০শে বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ নামকরণপূর্ব্বক ৺রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-করতঃ, স্বোপার্জ্জিত যাবতীয় সম্পত্তি দেবতার নামে অর্পণ করিয়া স্বয়ং সেবা-পূজা চালাইতেছেন।

অতঃপর ঢাকা হইতে সংবাদ আসিল যে, গোস্বামী-প্রভুর পুত্রবধূ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। সংবাদ পাইয়াই তিনি প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামীকে তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করিয়া, কিয়দ্দিন পরে নিজেও তথায় গমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন রোগিণী রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, জীবনের আশা কম। ইহা দেখিয়া গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন যে, রোগিণীর রোগ-যন্ত্রণা আর দেখা যায় না, অতএব শীঘ্র ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ইনি অনতিবিলম্বে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চাবস্থা লাভ করিবেন। কিন্তু এখনও একটু অবশিষ্ট আছে। কোন আত্মীয় লোকের দুর্ব্ব্যবহারে সংসারে ইনি মর্ম্মান্তিক

যাতনা ভোগ করিয়াছেন। সেই যাতনার সংস্কার অথবা দাগ এখনও ইহার অন্তর হইতে তিরোহিত হয় নাই। সেই ব্যক্তি ইঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করিবেন।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ সেই ব্যক্তি অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে রোগিণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, সাশ্রুনয়নে কৃত অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং রোগিণীও অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার প্রার্থনার অনুমোদন-সূচক ভাব ব্যক্ত করিলেন। তখন গোস্বামী-প্রভু শ্রদ্ধেয় প্রসন্নবাবুকে বলিলেন—"এখন ইহার মুক্তাবস্থা।" ইহার কিয়ৎকাল পরেই রোগিণী পরলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর গোস্বামী-প্রভু স্বীয় গুরুদেবের আদেশে ১২৯৯ সালের রাসপূর্ণিমার দিবস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া প্রায় এক বৎসরকাল মৌনী ছিলেন। দীর্ঘকাল সাধন-ভজনের পর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপসমূহ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই সাধারণতঃ সাধুরা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে উহা পরিত্যাগ করেন। এতদ্ভিন্ন ইহার অপরাপর প্রয়োজনীয়তাও আছে। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং তদবস্থায় কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে লিখিয়া উত্তর দিতেন। এই সকল প্রশ্নোত্তর অনুগত শিষ্যমণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা হইতে কতগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গোস্বামী-প্রভু মৌনী হইবার পরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তাঁহাকে উক্ত সমাজের সাধারণ সভার (General Committee) সভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয় দ্বারা যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। উত্তর গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; পত্র এইরূপ ঃ—

"তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মতে নাই। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। সত্য জানিবার জন্য সকল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান নিজে করিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং যাগ-যজ্ঞ, মালা-তিলক, জটাজুট, ভস্ম, ব্রত, উপবাস কিছুই অবজ্ঞা করা যায় না। এজন্য তিনি সকল দলেই যোগ দিতে পারেন। সাধারণ বাহ্য বস্তু জানিতেই কত শিক্ষার প্রয়োজন। ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে অধিক শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ করেন। সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমার নিকটে প্রণাম করেন। ভগবান্ বিশেষ প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন—বিশ্বাস করেন। এই সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। এজন্য তিনি বলেন, তফাৎ থাকাই ভাল।"

এই সময়ে সত্যনিষ্ঠ, নিরভিমান, তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম স্বর্গীয় প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় (ইনি "মৌনী বাবা" বলিয়া পরে লোকসমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন) দাক্ষিণাত্যের ওঁকারনাথ হইতে স্বীয় সাধনের অবস্থা বিবৃত করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে হিজুলে-কাঁথি গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক দিবস কোন সরোবরের একটী প্রস্ফুটিত কমলের উপরে "কমলে-কামিনী" মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু ভাবাবেশে সরোবরে ঝম্প প্রদান করিলে, শ্রদ্ধেয় প্যারীবাবুই তাঁহাকে অচৈতন্যাবস্থায় পাড়ে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে একদিন গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "সত্য জিনিষ একবার প্রকাশিত হইলে তাহা আর কখনও অপ্রকাশ হয় না, অনন্তকাল একই অবস্থায় থাকিয়া যায়। এই স্থানেই উপকথা-প্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত সওদাগরের কমলে-কামিনী দর্শন হইয়াছিল। যাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, তিনি এখনও এইস্থানে কমলে-কামিনী দেবীর দর্শন পাইতে পারেন।" যাহা হউক, ঐ সময় প্যারীবাবু উক্ত দেবীমূর্ত্তি এবং গোস্বামী-প্রভুর তৎকালিক অবস্থা দর্শনে ও তাঁহার সংস্পর্শে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, এই ঘটনার পর হইতেই তিনি সংসারে আরও বিরাগী হইয়া নির্জ্জন তপস্যার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; এবং অত্যল্পকাল মধ্যে গোঁসাইজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষুদ্র বেষ্টনী অতিক্রমকরতঃ নানা তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে নর্ম্মদা তীরে ওঁকারনাথে উপস্থিত হইয়া কঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনও তিনি গুরু-গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এইরূপ,—"তিনি সাধনপথে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। আহারের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন, মৌনী হইয়াছেন, আসন স্থির করিয়াছেন—সময়ে সময়ে মহাদেবের দর্শন পান, ব্যাসদেবও আসিয়া কখন কখন উপদেশ করেন ইত্যাদি; কিন্তু, তিনি যে ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্ত হইবার জন্য এত কঠোরতা করিতেছেন, তাহা তাহার লাভ হয় নাই। সুতরাং কি উপায়ে তিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সদুত্তর যেন গোস্বামী-প্রভু দয়া করিয়া প্রদান করেন—ইত্যাদি।" গোস্বামী-প্রভু শ্রদ্ধেয় প্যারীবাবুকে তাঁহার পত্রের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"বাহিরের ধর্ম্ম লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার জন্মে না। ধ্রুব পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে 'পদ্মপলাশলোচন' 'পদ্মপলাশলোচন' বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তথাপি গুরুকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন পাইলেন না; ঈশা 'জন্ দি ব্যাপটিষ্টে'র নিকট দীক্ষিত, শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন ব্রহ্ম-দর্শন হয় না। আহার

যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনীও হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে ; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হইবে না। যদি ব্রহ্ম-দর্শন করিতে চান তবে অন্তরের পূর্ব্ব সংস্কার দূর করুন। কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন না। এখনও সেই পূর্ব্বের শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন। উহা সত্য নহে। ব্রহ্ম-দর্শনে প্রকৃত জ্ঞান যখন উজ্জ্বল হইবে, তখন এক-একটী সত্য জানিতে পারিবেন। গুরু করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়, তখন ঐ দর্শন পাওয়া যায়। অন্তরে যে বাসনা আছে তাহা পাইবেন, ব্রহ্ম পাইবেন না। ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে। নিজের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিবেন না ; যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে ততক্ষণ ব্রহ্ম-মহাবল অনেক দূরে।

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে পারে, আপনি তাহা করিয়াছেন ; এখন গুরুকরণ ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

"ভগবান সমস্ত কার্য্য নিয়মে করেন। বাহ্য জগতের কোন কার্য্য যেমন অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তর্জগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না। ব্রহ্ম-দর্শনের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এইজন্য এত লিখিলাম।"

ইহার কয়েক বৎসর পরে গোস্বামী-প্রভু যখন কুম্ভমেলায় যোগদান করিবার জন্য প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পুনরায় শ্রদ্ধেয় প্যারীবাবু, গোস্বামী-প্রভুকে দিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকটে এইখানি পত্র প্রদান করেন। শ্রদ্ধাভাজন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় কুম্ভমেলা দর্শনার্থ প্রয়াগে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে যাইতেছেন শ্রবণ করিয়া, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবু ঐ পত্র মনোরঞ্জনবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া উহা গোস্বামী-প্রভুকে প্রদান করেন। পত্রখানি ৪।৫ খণ্ড টুক্‌রা কাগজে লেখা। উহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি। সম্পূর্ণ পত্র শ্রীমৎ কুলদানন্দ-কৃত "সদ্‌গুরু সঙ্গ"-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

পূজনীয় দেব,

আমি আপনার বাহিরের বাঁধাবাঁধি অথবা আঁটাআঁটি শিষ্য নহি, কিন্তু ভিতরে আমার সহিত আপনার কি প্রকার যোগ, তাহা অন্তর্য্যামী পুরুষ জানেন এবং আপনিও জানেন, যেহেতু আমি স্পষ্ট তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা জানিতেছি যে, আপনি তাঁহার সহিত এক অর্থাৎ তিনিই আপনার পরমাত্মা। সেই পরাৎপর পরমাত্মাই আপনার এবং আমার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি। যেহেতু দয়াময় হরি অতিশয় দয়া করিয়া কঠিন আঘাতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যিনিই যত বড় হউন

না কেন, তিনি ভিন্ন মানুষের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি দ্বিতীয় নাই। আমার বিশ্বাস যে, আপনি যদিও সমস্ত জানেন, তথাপি আমি অজ্ঞানতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমার মনের সন্তোষের জন্য আপনাকে লিখিতেছি, বাহিরের শিষ্য না হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই, ভিতরের বন্ধন ছিন্ন করেন, এরূপ শক্তি আপনারও নাই, আমারও নাই। ইহলোকে না হয় পরলোকে দেখা দিতেই হইবে। আমার বিষয় শুনুন ঃ—আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া যখন অনসূয়া-মার আশ্রমে বাস করিতেছিলাম, সেই সময়ে একদিন—একদিন কেন, অনেক দিন হৃদয়ের শূন্যতা এবং কুৎসিত কদাকার আত্মার আক্রমণে আমি যে বস্তু যে প্রকাব, তাঁহাকে সে প্রকার পর্য্যন্তও দেখিতে পারিতাম না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সকলই অশ্লীল-তাতে পরিপূর্ণ। যাহা কিছু দেখি, শুনি, বলি, সকলই অশ্লীল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় বসি, অশ্লীল চেহারা সকল আমার চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়ায়। ...সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতেই আমার দিন অতিবাহিত হইতেছে পিতার বড় কৃপা, তাই আমি বাঁচিয়া আছি। এই সময়ে পিতার চরণে পড়িয়া কাঁদিব, এরূপ অবস্থাও আমার ছিল না। একদিন আশ্রমের সমস্ত লোক আনন্দিত ; আমি নদীতীরে একখণ্ড প্রস্তরের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে, আমি কতকগুলি অশ্লীলভাবপূর্ণ পাঞ্চভৌতিক শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহি! তাহার পর একদিন প্রার্থনা করিতে পারিলাম।... এই দিন হইতেই আমি জানিতে আবম্ভ করিলাম যে, আমি কিছুই নই—তিনিই সমস্ত। এরূপ দিন গিয়াছে যে, কে যেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, আমি যখন পিতার নাম করিতে গিয়াছি, আমাকে অশ্লীল ভাষা বলাইয়াছে ; আমি কাঁদিতে গিয়াছি, আমার হৃদয়ে বসিয়া বিকট হাসি হাসিযাছে। এই পাঁচ বৎসরে পিতা যে আমাকে কতই করুণা করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। চিত্রকূটে যখন পীড়িতাবস্থায় ছিলাম, তখন যে পিতাকে কতবার কতভাবে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। পিতার করুণার কথা আর কি বলিব? আপনি সকলই জানিতেছেন। এখন বর্ত্তমানে আমাকে এই অবস্থায় আনিয়াছেন। আমার অহঙ্কার চুর্ণ করিয়াছেন। পিতারই জ্ঞান, প্রেম, শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আমি আর কিছুই নই। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, বিধানকর্ত্তা, শিক্ষাদাতা উপদেষ্টা, এককথায় তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, এ জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ দৃঢ়তরকরিতেছেন এবং প্রতিদিনের ঘটনায় জানাইতেছেন। আমার ফলাকাঙ্ক্ষাকে চুর্ণ করিয়াছেন।... আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিন অপসারিত করিতেছেন।... আমার মনের উদ্বেগাদি ত নাই। কেবল ভক্ত-সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে মাতিয়া তাঁহার নাম-গান করিবার প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্ম-প্রচার করিবার প্রবৃত্তি এবং এই পাঁচ বৎসরকাল তাঁহার যে অপূর্ব্ব করুণা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিবার প্রবৃত্তি এখন আমার মনকে চঞ্চল করিয়া

থাকে। এক্ষণে আমি আপনার নিকটে এই জানিতে চাই যে, এক্ষণে আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হইলে আমি তাঁহাতে নিমগ্ন হইতে পারিব? কারণ আপনি ধ্যান দ্বারা আমার মঙ্গলামঙ্গল সকলই জানিতে পারেন। আমি, আপনি ভিন্ন এবিষয়ে আর অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। এ পর্য্যন্ত ভগবানের কৃপা ভিন্ন গুরুরূপে আর কাহাকেও গ্রহণ করি নাই এবং পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা নাই। এই পাঁচ বৎসর কাল কতদিন আপনার জন্য কাঁদিয়াছি, কিন্তু কোথায়? সন্তানকে ত দেখা দিলেন না। ··· ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মা এবং জ্ঞানী পুরুষগণ, যাঁহাদের নিকট নিত্য চক্ষের জল ফেলিতেছি, তাঁহারাও কথা বলেন না। বুঝিয়াছি পিতার দয়া না হইলে কেহ দয়া করেন না। কারণ মূল প্রস্রবন হইতে যতক্ষণ দয়া না আসে, ততক্ষণ সমস্ত স্রোতই বন্ধ থাকে। আমার শারীরিক অবস্থাও যে প্রকার, তাহাতে দেশে দেশে গুরু গুরু করিয়া বেড়াইতে পারিব না। বর্ত্তমানকালে সৎ গুরু মেলাও কঠিন। আমি আপনাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারিতেছি, অন্য কাহাকেও সে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারি না। মূল কথা, আপনি যদি ধ্যান দ্বারা আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ না করেন, তবে এই স্থানেই দেহত্যাগ করিয়া পিতার রাজ্যে চলিয়া যাইব। পিতা এবং পিতার ভক্ত একই মনে করিয়া আপনার যাহা ভাল হয় করুন। আমি আপনার সন্তান।

ঠিকানা
Mouni Baba
Bhairab ghat.
P. O. Moinihata
Onkerji, Nimir.
(Khandwa)"

শ্রদ্ধেয় মৌনী বাবার পত্র আগাগোড়া মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া গোস্বামী-প্রভু তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এইরূপ বলিলেন যে, তিনি দীক্ষাপ্রার্থী, কিন্তু অতিশয় পীড়িত, নিকটে আসিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহাকেই ওঁকারনাথে যাইতে হইবে। দু'একদিন পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি কবে ওঁকারনাথ যাইবেন। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, আর যাইবার প্রয়োজন নাই, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

আমরা বিশ্বাস করি, গোস্বামী-প্রভু এই সময়ে যোগবলে ওঁকারনাথ গমন করিয়া প্যারীবাবুকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যাপার গোঁসাইজীর জীবনে কতবারই যে ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। শ্রদ্ধেয় প্যারীবাবু ইহার পরও এক বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু আর কখনও গোস্বামী-প্রভুকে পত্র

লিখেন নাই। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার গুরু-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে...নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বাউল ঢাকা সহরে বাস করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ওকালতি করিতেন, পরে বাউল সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ব্বক নিজের প্রতিভাগুণে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুর সহিত ইনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া চলিতেন এবং ভিতরে ভিতরে তাঁহার বহু অনিষ্ট চিন্তা করিতেন। তিনি প্রায়ই আশ্রমে আসিয়া গোস্বামী-প্রভুর সহিত কু-তর্ক করিবার চেষ্টা পাইতেন এবং কোন আগন্তুক গোস্বামী-প্রভুকে কোন প্রশ্ন করিলে, তিনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেন। এই সকল কারণে আশ্রমবাসীরা সকলেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু একদিনের তরেও তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রকাশ করেন নাই, বরং মর্য্যাদা সহকারে তাঁহার সকল উপদ্রবই সহ্য করিয়াছেন। একদিন বাউল মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"দেখুন, আমার ২০।২৫ হাজার শিষ্য। তাহার সকলেই আমাকে অবতার বলে। তাহারা যে কিছু না জানিয়া শুনিয়াই ঐ কথা বলে, তাহা বলা যায় না। আপনার দৃষ্টি অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। আপনি আমার মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পান কি?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"কৈ, আমি ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না।" বাউল মহাশয় বলিলেন—"তাহা হইলে আপনার দৃষ্টি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। ও সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চান? এই দেখুন।" এই বলিয়া তাঁহার নাসিকার কোণে একটী তিল দেখাইয়া বলিলেন—"এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন ত?" গোস্বামী-প্রভু চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু উপস্থিত দুই একজন লোকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে বাউল মহাশয় কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

এই সব ঘটনার কয়েকদিন পরে বাউল মহাশয়ের জনৈক শিষ্য গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমনপূর্ব্বক বাউল মহাশয়ের অনেক অদ্ভুত শক্তির বর্ণনা করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে বলিল—"সহরে বুঝি এখন আর কল্কি পান না, তাই জঙ্গলে এ'সে সাধু হ'য়ে বসেছেন। অদ্বৈত বংশের কুলাঙ্গার পৈতা ফেলে, জাতি-ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হ'য়ে বহু লোকের এখন সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন। গোঁসাইরা কে, কবে, কোথায় পৈতা ফেলেছেন? ইত্যাদি।" গোস্বামী-প্রভু এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐ সব কথা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ লোকটাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি, পৈতা নাই বল্‌ছো, সোণার পৈতা আছে। দশ গণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দিতে পারি। কিন্তু তুই কি ক'রে দেখ্‌বি, তুই যে অন্ধ।" এই সময় সুভড্যানিবাসী যদুবাবু নামক একটী সাধু-প্রকৃতির লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং তারস্বরে

"এ্যাকিরে! এ্যাকিরে!" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। পূর্ব্বোক্ত লোকটী গোস্বামী-প্রভুর তিরস্কারেই একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যদুবাবুর ঐরূপ ভাব অবলোকন করিয়া ভয় পাইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বাহিরে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। পরে গোস্বামী-প্রভুকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবানের আশ্রিতজনের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার অপমান হ'লে মহাপুরুষেরা তাহা সহ্য করেন না, গুরুতর শাসন করেন। ঐ সময় একটী মহাপুরুষ আসনের কাছে ছিলেন। তিনিই আমার মুখ দিয়া ঐ লোকটীকে ঐরূপ শাসন করিয়াছিলেন। উহার একটী কথাও আমার নয়।" পরের দিন উক্ত যদুবাবু পুনরায় আশ্রমে আসিলে, তাঁহাকে পূর্ব্বদিন ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"মহাপুরুষদের সকলই অদ্ভুত। লোকটা যখন ঐরূপ গোঁসাইকে গালাগালি ক'রেছিল, তখন দেখি গৌরবর্ণ একটী তেজস্বী ব্রাহ্মণ গোঁসাইর দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন—'পৈতা নাই, সোণার পৈতা আছে। তুই দেখ্‌বি কি ক'রে, তুই যে অন্ধ।' এই সব দেখে শুনে আমি যেন কেমন হ'য়ে গেলাম।" তাঁহার মুখে এই সব কথা শুনিয়া আশ্রমবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গোস্বামী-প্রভুর পূর্ব্বদিনের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিলেন।

অতঃপর ১২৯৯ সনের চৈত্র মাসে গোস্বামী-প্রভুর মাতৃদেবী শ্রীযুক্তেশ্বরী স্বর্ণময়ী দেবী পরলোকগমন করেন। দেহত্যাগ করিবার কিয়ৎকাল পরে তদীয় পিতৃপুরুষগণ গোস্বামী-প্রভুর নিকট প্রকাশিত হইয়া, গঙ্গা-তীরে গমনপূর্ব্বক যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয় দ্বারা তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গোস্বামী-প্রভু কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ৯০।৫ নং মেছুয়া বাজার রোডস্থিত, সোমরা-নিবাসী শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসাটীতে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার পরিবারস্থিত প্রায় সকলেই গোঁসাইজীর শিষ্য। এই বাটীতে থাকিয়া গোস্বামী-প্রভু শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের দ্বারা যথাশাস্ত্র স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত কার্য্যের অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতৃদেবী দিব্যদেহে আবির্ভূতা হইয়া তৎপ্রদত্ত জল গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং এতদ্ভিন্ন অপরাপর সময়ে পারলৌকিক তত্ত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ গোস্বামী-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছে;—

"মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃলোক মাতৃলোকদিগের সহিত আসিয়া বলিলেন যে, একাদশ দিবসে যোগজীবন তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবে, অর্থাৎ—তাঁহার

নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দুঃখীদিগকে দান করিবে। অপর পক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দান করিবে। অপরপক্ষ আশ্বিন মাসে। দান যথাসাধ্য। কি কি দান করিবে? তণ্ডুল, বস্ত্র, জলপাত্র, ফল-মূল, খাদ্যবস্তু—ইত্যাদি। মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হয়। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ঘুরিতে থাকে। ঘর হইতে বাহিরে আসিলে আত্মা উর্দ্ধে দৃষ্টি করে। তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হয়, পিতৃলোকে অথবা মাতৃলোকে লইয়া যায়, এবং তাঁহাকে লইয়া এক বৎসরকাল আনন্দ করে। এই এক বৎসর পরে তাহার যেরূপ কর্ম্ম, সেইরূপ অবস্থা লাভ করে। এই এক বৎসব শ্রাদ্ধের ফলভোগ করে। পাপাত্মা হইলে এই এক বৎসর উৎকট পাপ-যন্ত্রণা ভোগ করে। এইরূপ অনেক কথা মাতা জানাইতেছেন ইহা আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা।"*

শ্রাদ্ধের দিন গৃহের সন্নিকটস্থ ময়দানে কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাসের কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের মধ্যে গোস্বামী-প্রভু মহাভাবে বিভোর হইয়া—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—"জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! জয় পদ্মাবতী-কুমার! কলির জীবের আর ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই!"—ইত্যাদি বাক্য এমন গম্ভীর-স্বরে এমন গদগদভাবে মুহুর্মুহুঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত জনমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ ললিত নামক একটী ৮।৯ বৎসরের বালক একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। কীর্ত্তনান্তে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গালী প্রভৃতিকে পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করান হইয়াছিল।

গোস্বামী প্রভু যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, মধুলুব্ধ মক্ষিকার ন্যায় দলে দলে ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া বাস করিতেন, এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহার আলয়ে আহারাদি করিতেন। কিন্তু, গোস্বামী প্রভুর আশ্রমের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় না থাকিলেও, কোথা হইতে, কি প্রকারে এতগুলি লোকের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হইত, তাহা ভাবিলে বস্তুতঃই নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণবাবুর বাড়ীতে গোস্বামী-প্রভুর সম্পর্কে কোন কোন দিন প্রায় ৫০।৬০ জন লোক আহার করিতেন; কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে তাঁহার আয় অতি সামান্য ছিল। এই স্থানে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। গোস্বামী-প্রভুর আগমনের এই পরিবারের সকলেই আনন্দে আত্মহারা; সুতরাং আয়-ব্যয়ের

* ঢাকা কুলচরিত্র-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দে মহাশয়ের খাতা হ'তে উদ্ধৃত

হিসাব করিবার অবসর তাঁহাদের অতি কম। ঘরের মেয়েরা চাউলের জালা হইতে উপযুক্ত মত চাউল লইয়া রান্না করিতে আরম্ভ করেন, তারপর বাজার হইতে তরি-তরকারী ইত্যাদি যেমন আসিতে থাকে, আর অমনি উহার রান্নার ব্যবস্থা হইতে থাকে। গোস্বামী-প্রভুর আগমনের ৫।৭ দিন পরে শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণবাবুর মাতৃদেবী তাঁহার পুত্রবধূদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জালাতে চাউল আছে কিনা?" তাঁহারা যখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, জালাতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল রহিয়াছে, তখন তাঁহারা অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; কারণ, সপ্তাহ-অন্তে তাঁহাদের গৃহে এক মণ করিয়া চাউল আসিত এবং তদ্দ্বারাই পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহ হইত; কিন্তু, সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুর আগমনের পর ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ কতই না লোকে আহার করিতেছেন; অথচ চাউল আজও ফুরায় নাই! গোস্বামী-প্রভু এই সময়ে মৌনী ছিলেন। তাঁহাকে এই বিষয় জানান হইলে, তিনি 'হুঁ হুঁ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এইরূপ আর একটা ঘটনা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রবাবুর বাটীতে সংঘটিত হয়। ঘটনাটি নগেন্দ্রবাবুর সহধর্ম্মিণীর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—"আমাদের গুয়াবাগানের বাসায় গোসাই ও ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত। দিন রাত্রি মহোৎসব চলিল। এক খোড়া দধি দি। তিন দিন মহোৎসব চলিল, তথাপি দধি ফুরাইল না! তিন দিন পরে আমার হুঁস হইল। গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'ইহা স্বয়ং মধুসূদন যোগাইয়াছেন, ফুরাবে কেন?"*

স্বীয় মাতৃদেবীর পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া গোস্বামী-প্রভু পুনর্ব্বার ঢাকায় গমন করেন। এবং কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিয়া, ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ৪১ নং স্থকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি একদিবস স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে কাঁকুরগাছি যোগোদ্যানে গমনপূর্ব্বক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোভাবের উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ ও প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরমহংসদেবের দেহাশ্রিত অবস্থায়ও কোন উৎসব উপলক্ষে, পরমহংসজীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য গোস্বামী-প্রভু স্বর্গীয় হরিনারায়ণ রায় ও অপর কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস কীর্ত্তনের সময়ে গোস্বামী-প্রভু ও পরমহংসদেবের মধ্যে যেরূপ অভুতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত; তাঁহারা ভাবাবেশে প্রথমতঃ হরিনামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভাবাধিক্যহেতু লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব আসন

* শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

হইতে উত্থিত হইলেন, এবং পরস্পর মুখোমুখী হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে এক একবার উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া যেন এক হইয়া যাইতে লাগিলেন, আবার দূরে সরিয়া গিয়া দুই হইতে লাগিলেন। এইরূপ পুনঃ-পুনঃ ভাবাবেশে পরস্পর পরস্পরকে এক একবার গাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে নৃত্যকালে, তাঁহাদের কাঁহারও পদতল ধরাতল স্পর্শ করে নাই। তাঁহারা একেবারে শূন্যে থাকিয়াই নৃত্য করিয়াছিলেন।* এই অদ্ভুত ব্যাপার কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

অপর এক সময়ে গোস্বামী-প্রভু হুগলী-জেলাস্থিত বাঁশবেড়িয়া ব্রহ্মমন্দিরের উৎসব উপলক্ষেও তথায় কীর্ত্তনের মধ্যে শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তখন উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী দেবী এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে মাতঙ্গিনী দেবী তাহার পুত্র শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, তোরা কেহ লক্ষ্য করিস্ নাই, আজ কীর্ত্তনে গোস্বামী মহাশয় শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।"† গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সময়ে বোলপুরের কোন কীর্ত্তনে এবং অপর একজন শিষ্য পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময়ে কীর্ত্তনের মধ্যে কিয়ৎকাল শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।‡ সংকীর্ত্তনের শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক সময়ে কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শূন্যে উঠিতেন, এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার অপ্রকটের পরে ঈদৃশ ব্যাপার আর কখনও কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

গোস্বামী-প্রভু কখনও কোন শিষ্যের মতের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিতেন না, পক্ষান্তরে, তাহাদের সহিত যতটুকু সহানুভূতি দেখাইবার তাহা দেখাইতেন। সামান্য সামান্য ঘটনাতেও তাহা প্রকাশ পাইত। কলিকাতা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে অবস্থানকালে একদিন পাঠের সময়ে কতিপয় শিষ্য কোন বিষয় লইয়া নীচের তলায় উচ্চৈঃস্বরে তর্কবিতর্ক করিতে থাকিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের গোলমাল?" স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ও স্বামী দেবপ্রসাদ (দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী) নিকটে ছিলেন। স্বামীজী ঘটনাস্থল হইতে অনুসন্ধান করিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি তাঁহাদিগকে গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আমি নিষেধ করিতে ত বলি নাই, কারণ জানিতে চাহিয়াছিলাম।"

* স্বর্গীয় হরিনারায়ণ রায় মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।
† শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শ্রুত।
‡ স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

তিনি মানুষকে কতদূর ভালবাসিতেন, জীবের ক্লেশে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ বাজিত, নিম্নলিখিত ঘটনা কয়েকটী হইতে তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে।

১। একদিন রাত্রিতে গোস্বামী-প্রভু তদীয় অন্যতম সেবক, স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন রায় মহাশয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বীয় মস্তকের জটা বাছিয়া দিতে বলেন। তিনি ধীরে ধীরে জটা বাছিতেছেন, এমন সময়ে এক স্থানের কেশে টান পড়িলে, গোস্বামী-প্রভু হঠাৎ "উহু উহু" শব্দ করিয়া উঠিলেন। তখন শ্রদ্ধেয় মোহিনীবাবু ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে তথায় একটি বিষম আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। গোস্বামী-প্রভুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"কোন কারণে দেবেন্দ্রের (দেবপ্রসাদ স্বামীর) পিতা পাদুকা দ্বারা দেবেন্দ্রের মস্তকে আঘাত করিয়াছেন, তাহা আমার মস্তকেই লাগিয়াছে।" ঘটনা-ক্রমে তৎপর দিবস স্বামীজী পিত্রালয় হইতে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন ; এবং শ্রদ্ধেয় মোহিনীবাবুর প্রমুখাৎ পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা অবগত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব তাঁহার ভোগ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই ক্রন্দনের কারণ। বলাবাহুল্য যে তাঁহার পিতৃদেব এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে, তদীয় কোন আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায়, স্বামীজীর মস্তকে বস্তুতই বেগে পাদুকার আঘাত করিয়াছিলেন।

২। কোন সময়ে শীত-ঋতুতে কাকিনা অবস্থানকালে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় গোস্বামী-প্রভু অকস্মাৎ অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিলেন। নিকটস্থ সেবকবৃন্দ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিয়দ্দূরে অবস্থিত একটী শীতার্ত্ত কম্পমান্ বালককে দেখাইয়া দিয়া শীঘ্র তাহাকে নিজের গাত্রাবরণ প্রদান করিতে বলিলেন। তদনুসারে উক্ত বস্ত্র প্রদান করিবার পর বালকের শীত নিবারিত হইলে, গোস্বামী-প্রভুর শরীরের কম্পও দূর হইল। প্রয়াগ, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ আরও অনেক ঘটনার কথা তাঁহার সঙ্গীয় শিষ্যগণ অবগত আছেন।

৩। প্রচারক অবস্থায় একদিন রাত্রে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে ফুটপাথের উপরে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিতা একটী বারাঙ্গনাকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। সে খুব ব্যস্ততার সহিত রাস্তার এদিকে ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহার শুষ্ক মলিন মুখ ও সকাতর চাহনি দেখিয়া গোস্বামী-প্রভুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মেয়েটির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, এত রাত্রিতে এভাবে তুমি দাঁড়িয়ে কেন ?" সে উত্তর কবিল—'দেখুন, তিন চার দিন আমার কিছু রোজগার হয় নাই। দু'দিন আমি কিছু খাই নাই।' তাহার কথা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু কাঁদিয়া ফেলিলেন, পরে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিলেন—'মা, একটু অপেক্ষা কর, দেখ ভগবান্ কিছু দেন কিনা।' এই বলিয়া তিনি রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়েকজন ব্রাহ্ম-বন্ধুর নিকট পাঁচটী টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক, তাহা হইতে আট আনার খাবার, ২৷৷৹ টাকা

দিয়া একখানা ভাল শাড়ী এবং ২৲ টাকা লইয়া মেয়েটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে নমস্কার করিয়া ঐ সমস্ত হাতে দিয়া বলিলেন—'মা, আজ ভগবান্ তোমাকে এই দিলেন। এই খাবার নিয়ে খাও গিয়ে, আর এই কাপড়-খানা পরে' তুমি রাস্তায় দাঁড়িও।' এই কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে দয়া ও সহানুভূতিতে সাধারণ নীতি টিকে না।

৪। এক সময়ে মাদারিপুর হইতে জনৈক শিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, 'স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন না করা পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করিবেন না'—এই সঙ্কল্প করিয়া, অনুমান রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে ষ্টীমার আরোহণ করিলেন। পরদিবস সন্ধ্যার সময়ে ষ্টীমার গোয়ালন্দ পঁহুছিল। এদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া অতি কষ্টে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটার গাড়ীতে আরোহণ করিবার পর তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, সময়ে সময়ে স্বীয় অজ্ঞাতসারে কোঁকাইতে লাগিলেন; তবুও কিছু আহার করিলেন না। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হইল—তিনি সম্পূর্ণ সুস্থের ন্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরদিবস তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়া, গোস্বামী-প্রভুর মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে প্রায় এক ঘটিকার সময়ে তাঁহার প্রসাদ পাইলেন। ইহার পূর্ব্বে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা তাঁহার মনেও একবার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, আহারান্তে শিষ্যটী কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পূর্ব্ব-রাত্রের অকস্মাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণার অন্তর্দ্ধানের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"দেখ, গত রাত্রে অনুমান ১১ ঘটিকার সময়ে হঠাৎ ঠাকুর অতীব ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় আমার নিকট হইতে আহার্য্য লইয়া ভক্ষণ করিলেন। অসময়ে তাঁহার ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"একটী ছেলে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্লেশ পাইতেছিল। আমি আহার করাতে তাঁহার ক্ষুধা দূর হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যটী তাঁহার গুরুদেবকে অতিশয় ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া পূর্ব্ব রাত্রের সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন।

৫। কোন সময়ে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে একদিবস গোস্বামী-প্রভু অসময়ে প্রচুর আহার করিলে, জনৈক শিষ্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন -"যে সকল মহাপুরুষ আতিবাহিক দেহে অবস্থান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের মুখে আহার করিয়া থাকেন। ঈদৃশ একজন মহাপুরুষ অদ্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আমার মুখে ভক্ষণ করিয়াছেন।"

প্রকৃত গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কিরূপ স্বাভাবিক ও কত মধুর এবং গোস্বামী-

প্রভু শিষ্যগণকে কিভাবে দর্শন করিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনা কয়েকটী হইতে তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১। এক সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনার প্রতি সঙ্কোচ-ভাব যায় না কেন?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"নিজকে যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও তেমনি মনে করিবেন। নন্দ-যশোদা গোপালকে যেরূপভাবে দেখিতেন, আমাকে সেইভাবে দেখিবেন। শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইলে তিনি গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন। এই সময়ই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন। তৎপর সখীগণ ও শ্রীমতী একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিলে, তিনি প্রকাশিত হইয়া রাসলীলা করিলেন। তখন সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা, শ্রীমতীও সখীগণের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আত্মহারা। সেইরূপ গুরু যদি শিষ্যকে অবজ্ঞা করেন, তবে ভগবান্ গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু-শিষ্য একত্র হইয়া ক্রন্দন করিলে ভগবান্ প্রকাশিত হন। তখন গুরু শিষ্যকে ভগবানের পার্শ্বে দর্শন করিয়া নয়ন সফল করেন এবং শিষ্যও গুরুদেবকে ভগবানের বামে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।"

২। অপর এক সময়ে জনৈক আগন্তুক, কতিপয় শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহারা সকলেই কি আপনার শিষ্য?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আমরা সব একই,—আমরা সকলে ধর্ম্মার্থী হইয়া একত্র বাস করিতেছি।" কিয়ৎকাল পরে লোকটী উঠিয়া গেলে গোস্বামী-প্রভু পুনরায় বলিলেন—"ভগবানই একমাত্র গুরু। তিনিই একজনের মধ্য দিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য গুরু যদি মনে করেন আমি গুরু, আর ইনি আমার শিষ্য, তাহা হইলেই গুরুর পতন হয়।"

গোস্বামী-প্রভুর বন্ধুপ্রীতি এক অপার্থিব জিনিষ। মৃত্যুও সে প্রীতিবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দিগের সহিত গোস্বামী-প্রভুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একবার গোস্বামী-প্রভু শাস্ত্রী মহাশয়ের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দেশের বাটীতে গমন করেন। গিয়া দেখেন যে শাস্ত্রী মহাশয় বাটীতে নাই। তখন গোস্বামী-প্রভু, "এই আমার বন্ধুর গৃহ," "এই আমার বন্ধুর গৃহ" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অবশেষে ভাবের আধিক্য-হেতু সমস্ত উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আর একবার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মজিলপুরের বাড়ীতে গিয়া, "এই আমার বন্ধুর গৃহ" বলিয়া উঠানের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

একবার গোস্বামী-প্রভু স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদের কোন উৎসবে গমন করেন। রাত্রি প্রভাত হইতে না

হইতেই, গোস্বামী-প্রভু শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া তাঁহাকে চা প্রস্তুত করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এত ভোরে চা করিতেছেন কেন ?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ঘুম হইতে উঠিয়াই আপনার চা খাওয়ার অভ্যাস, এই সময় চা খেলে আপনার কতই আরাম হবে, তাই আপনার জন্য চা প্রস্তুত করিতেছি।" কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোস্বামী-প্রভুর এই নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধুপ্রীতি মৃত্যুরূপ প্রগাঢ় বিস্মৃতির কালিমাতেও মলিন করিতে সমর্থ হয় নাই। পুরীধামে দেহরক্ষা করিবার পর তিনি তদীয় পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মহোদয়কে অলৌকিকভাবে, উঁহাদিগের প্রত্যেককে তার-যোগে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। উঁহারাও সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সময়ান্তরে গোস্বামী-প্রভুর সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বন্ধুর প্রতি প্রীতি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যবাৎসল্য অতুলনীয়, অশ্রুতপূর্ব্ব। বর্ত্তমান যুগে সচরাচর এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী মাত্র ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। এক সময়ে শান্তিপুর অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করেন। পাঠ শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রবাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। গ্রীষ্মাধিক্যহেতু তাঁহার গাত্র দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া গোস্বামী-প্রভু পাঠ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে পাখা-দ্বারা বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন।

২। কলিকাতা ৪৫নং হ্যারিসন রোডের বাটীতে অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য স্বর্গীয় শ্রীধর ঘোষ মহাশয় কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে গোস্বামী-প্রভুর আত্মীয়স্বজন ভীত হইয়া তাঁহার নিকটে উক্ত শিষ্যটীকে হাসপাতালে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাব শুনিয়া তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"সে কি ? তাহা কখনও হইতে পারে না। যদি শান্তির (গোস্বামী-প্রভুর কন্যা) ছেলেদের কাহারও বসন্ত হ'ত, তা'হলে কি ঐ কথা মুখে আনতে পা'রতে ?" এই কথা শুনিয়া আত্মীয়টী বলিলেন, "তবে উহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে কে ?" গোস্বামী-প্রভু হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "আমিই কর্‌বো"। এই কথা বলিয়া তিনি তখনই রোগীর জন্য পৃথক ঘর, ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসকের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ রোগীর ঘরে গিয়া সেবা-শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান

করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয় জীবনের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক রোগীকে ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করাইয়া তদীয় গুরুদেবের কার্য্যেরই সহায়তা করিয়াছিলেন।

৩। ঐস্থানে অবস্থানকালে জনৈক শিষ্য প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করণানন্তর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ক্ষুধার উদ্রেকহেতু ভাণ্ডার-ঘর হইতে কিছু লইয়া আহার করিতেন। ইহাতে একদা জনৈক সেবক তাঁহাকে অনুযোগ প্রদান করেন। ঘটনাটী গোস্বামী-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত শিষ্যটীকে নিকটে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন,—"আমার গ্রন্থাদি রাখিবার চৌকির নীচে তোমার জন্য প্রত্যহ হরির লুট রাখিয়া দিব। তুমি এইস্থানে হইতে লইয়া খাইও।" তদবধি যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত শিষ্যটী তাঁহার নিকটে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভু প্রত্যহ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হরির লুট রাখিয়া দিতেন, তিনিও গঙ্গাঘাট হইতে আগমন করিয়া মনের আনন্দে আহার করিতেন।

৪। দুই একটী চঞ্চল প্রকৃতির শিষ্য দ্বারা আশ্রমে সময়ে সময়ে বড়ই অশান্তি উৎপাদিত হইত। ইঁহারা কখনও সামান্য কারণে, কখনও বা বিনা কারণে অপরের সহিত ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত করিতেন। এই সকল কারণে গোস্বামী-প্রভুর জনৈক আত্মীয়া তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, "কেন ইহারা আশ্রমে পড়িয়া থাকেন? ইহারা সময়ে সময়ে যেরূপ অশান্তি উৎপন্ন করে, তাহাতে ইঁহাদিগকে অন্যত্র গিয়া থাকিতে বলিলেও ত হয়।" উত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ইঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া আমি কাছে স্থান দেই নাই। ইঁহারা এমন এক একটী প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছেন যে, কোথাও স্থান পান না। এখন আমিও যদি ইঁহাদিগকে যে'তে বলি, তা'হলে ইঁহারা দাঁড়ান কোথায়? আমি দয়া ক'রে ইঁহাদিগকে কাছে রেখেছি।

গোস্বামী-প্রভু শিষ্যদিগের নিকটে সময়ে সময়ে যেরূপ পত্র ব্যবহার করিতেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ একখানি পত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা,—

"ওঁ হরিঃ।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার—

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পূর্ব্ব পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হয়—ধর্ম্ম আর কথার কথা থাকে না। কোন বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হয় না, সকলই প্রত্যক্ষ।

পত্র লিখুন বা নাই লিখুন ক্ষতি নাই। যাঁহারা সাধন গ্রহণ করিয়াছেন,

তাঁহারা নিকটে। সম্প্রতি ঢাকাতেই আছি, শীঘ্র কোন স্থানে যাওয়া হইবে বোধ হয় না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শিরোনাম—
ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়
সমীপে।"

নারী-জাতির প্রতি গোস্বামী-প্রভু কিরূপ বিশুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ১৩০৬ সনের ১লা আষাঢ় তারিখের "ধর্ম্মতত্ত্ব" হইতে একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা ঃ—"একদিন গোস্বামী-মহাশয় পত্নীসহ নির্জ্জনে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে পত্নীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মুখে জগজ্জননীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার ভাবাবেশ উপস্থিত হইল। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পত্নী একেবারে অবাক্ এবং কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। যে স্বামী আপনার পত্নীর মুখে জগন্মাতার আবির্ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন, নারী-জাতির সম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার বিশুদ্ধ ভাব, অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে পত্নী তাঁহার সঙ্গে বহু বর্ষ যাবৎ ক্লেশ বহন করিয়া পরিশেষে শিষ্যমণ্ডলীতে আদৃত হইয়া সুখী হইলেন, তিনি স্বর্গস্থা হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী তৎপ্রতি হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা করিলেন।"

নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভুর উপদেশ এইরূপ ঃ—"নারীজাতিকে মাতৃভাবে দর্শন করিবে। নারীজাতিকে যত সম্মান করিবে ততই নিজে পবিত্র থাকিবে, যাঁহাকে সম্মান করি তাঁহাকে কুৎসিতভাবে দৃষ্টি করা যায় না। বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করা যেন একটা উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি বাবুদের বলা যায় যে নারীজাতিকে সম্মান কর, তখন তাঁহারা 'হো হো' করিয়া হাসিবে। নারীজাতি বিলাসের সামগ্রী নহেন। উত্তর-পশ্চিমে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান আছে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির সম্মান অধিক। তাহাতেই তাঁহাদের মধ্যে সব বীর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ কেবল নারীজাতিকে সম্মান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাতি হইল। পুরাণে আছে, যেখানে নারীজাতির সম্মান সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্ত্তমান। নারীজাতিকে সম্মান করিতেই হইবে, নচেৎ এ দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই। এক সতীর (দ্রৌপদীর) অপমানে ভারতবর্ষ এখনও জ্বলিতেছে!"*

স্বদেশের জন্য গোস্বামী-প্রভুর প্রাণ কিরূপ কাঁদিত, দেশের সর্ব্বসাধারণের

* "উপদেশ মঞ্জরী" হইতে উদ্ধৃত।

ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তিনি কত চিন্তা করিতেন, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোধগম্য হইবে।

১। হিমালয় ভ্রমণকালে বরফান প্রদেশে একজন মহাপুরুষ দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন -"এদেশ সকল বিষয়ে দিন দিন হীন হইয়া যাইতেছে, কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে?" তদুত্তরে মহাপুরুষ বলিলেন—"বীর্য্য-রক্ষা ও সত্য প্রতিপালন করিতে পারিলেই এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন হইবে।" পরবর্ত্তীকালে কোন এক সময়ে দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে গোস্বামী-প্রভু কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা যদি ছেলেদের সহিত বিশেষভাবে মিশিয়া, তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া নিজ জীবনের সমস্ত বিষয় বলিবার সুবিধা দিয়া, বীর্য্যরক্ষা ও সত্য প্রতিপালন করিতে অভ্যাস করাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয়।"

২। একবার কলিকাতার নিকটস্থ থৈপাড়া নামক স্থানে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সহিত একত্র হইয়া গোস্বামী-প্রভু কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন ছিলেন। এমন সময়ে কি যেন দেখিয়া তাঁহার ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, প্রেমাশ্রুতে গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইল। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবাবেশে অস্ফুট ভাষায় কত কি বলিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে তদ্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে গোস্বামী-প্রভুর ভাব অপসারিত হইলে তিনি বলিলেন - "আজ একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম।" ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যদি বলিতে বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে এখন কি দর্শন করিলেন বলুন।" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"আজ দেখিলাম মহাপুরুষগণ দেশের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া ভগবানের নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময়ে ভগবান্ অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইলেন। এত উজ্জ্বল প্রকাশ আমি পূর্ব্বে আর কখনও দর্শন করি নাই। তাহার প্রকাশে নক্ষত্রসকল উজ্জ্বল, পর্ব্বতসকল কম্পিত ও সমুদ্র উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাপুরুষদিগের মধ্যে কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহবা উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভগবান্ তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"*

জীবের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াই তিনি তাঁহার কঠোর সাধনালব্ধ ধন অকাতরে যাঁকে-তাঁকে দান করিয়াছিলেন। তিনি একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"নিজের প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রীকে অন্যকে দান করিতে লোকের

* শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত

হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়, উহা অতিশয় আদরে ও গোপনে রক্ষণীয়া। সেইরূপ বহু সাধনের ধন এই জিনিষ সাধুরা কাহাকেও দান করেন না, গোপনে রক্ষা করেন।" এই কথা শুনিয়া জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে আপনি এই দেব-দুর্লভ বস্তু যাকে-তাকে বিতরণ করিতেছেন কেন?" উত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ইহ সংসারের ত্রিপাপ-জ্বালা আমি নিজে ভোগ করিয়াছি। ইহা হইতে জগৎ রক্ষা পাইবে এই আশায় সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে দান করিতেছি।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রয়াগধামের কুম্ভমেলায় যোগদান। আপনাকে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন। শ্রীশ্রীগৌরনিতাইর মৃন্ময় বিগ্রহ স্থাপন। মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা, ছোট কাঠিয়া বাবা, নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা, গম্ভীরনাথ, অমরেশ্বরানন্দ স্বামী, দয়াল দাস, অর্জ্জুন দাস বা ক্ষ্যাপাচাঁদ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মকরস্নানোৎসব।

১৩০০ সনের অগ্রহায়ণ মাসে গোস্বামী-প্রভু প্রয়াগধামে ত্রিবেণীক্ষেত্রে কুম্ভমেলার মহাধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য, কলিকাতা হইতে বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে প্রয়াগ যাত্রা করেন। পথে শোনপুরের হরিহর-সত্রের মেলা দর্শন করিবার জন্য কিছুদিন বাঁকিপুর অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে পৌষ মাসে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন। "ভারতের শ্যামল-বক্ষ-প্রবাহিতা ধন-ধান্যের নিদানভূতা বিমল-সলিলা গঙ্গা-যমুনা এই প্রয়াগধামে একত্র মিলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে আর একটি নদী গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মিলিয়া এই স্থানকে ত্রিবেণী নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই তিনটী পয়ঃস্বিনীর সলিলে ভারতের আদ্যন্ত ইতিহাস, বেদ-বেদাঙ্গ, স্মৃতি-দর্শন, কাব্য-পুরাণ, গণিত-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণা, শৌর্য্য-বীর্য্য, স্বাধীনতা, সমস্তের স্মৃতিই মিশ্রিত রহিয়াছে।...

"এই স্থানে সেই ভরদ্বাজাশ্রম, যে আশ্রমে বনগমনকালে-শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকী সহ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে এই স্থানে শম-দম-দয়া-নিধান পরামার্থতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজের মুনিজন-মনোহর পবিত্র আশ্রমে প্রতি বৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে মুনিঋষিগণ সমবেত হইয়া ত্রিবেণী স্নান, অক্ষয় বট স্পর্শ এবং ভগবানের পাদপদ্ম পূজা করিতেন। এই স্থানের দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামী-মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।...এই পুণ্যক্ষেত্রে, এই অনন্ত কীর্ত্তির স্মৃতি-মন্দিরে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়াছিল।

"গঙ্গার পশ্চিম পারে এলাহাবাদ এবং পূর্ব্বে পারে ঝুঁসি। মধ্যস্থলে গঙ্গাগর্ভে প্রকাণ্ড চড়া, ক্ষুদ্র একটী দ্বীপের ন্যায়। এই চড়া ও ঝুঁসির মধ্যে অনতিবিস্তৃত

একটী গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত। এলাহাবাদ হইতে চড়ায় যাইতে বিস্তৃত নৌ-সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল। চড়া হইতে ঝুঁসি যাইতে হইলে এই পুল পার হইয়া প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী দারাগঞ্জ নামক স্থানের অপর একটী সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। এই চড়াতেই অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আসন স্থাপিত হইয়াছিল, ঝুঁসিতেও কতক সাধু ছিলেন।

"সাধুদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় প্রধান ছিলেন—সন্ন্যাসী, নানকসাহী ও বৈষ্ণব। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দশনামা, দণ্ডী, পরমহংস ও শাক্ত প্রভৃতি শাখা, এবং শাক্তের অন্তর্গত ভৈরব ও আলেক প্রভৃতি উপশাখা ছিল। এতদ্ভিন্ন নানকসাহী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত দাদুপন্থী, গরীবদাসী, বেহার-বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা শাখা ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদাযেব প্রধানতঃ চারি শ্রেণী ছিল। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, শ্রী ও নিম্বাদিত্য। এতদ্ভিন্ন কবীরপন্থী, গোরোখনাথী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং শাখা-সম্প্রদায় ছিল। সন্ন্যাসীরা মেলার উত্তর দিক, বৈষ্ণবেরা দক্ষিণ দিক, এবং নানকসাহীরা মধ্যস্থল অধিকার করিয়াছিলেন।

"কল্পবাসোপলক্ষে প্রয়াগে প্রতি বৎসরেই মাঘ মাসে বহু সংখ্যক নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে। এই বৎসরে কুম্ভমেলা হওয়াতে কল্পবাসীর সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় নয় দশ লক্ষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে উদাসীন সাধুর সংখ্যাই অন্যূন তিন লক্ষ হইবে। এত জন-সমাগম কিসের জন্য ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নয়, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নয়, কোন প্রদর্শনীর জন্য নয়, কেবলমাত্র সাধুদর্শনের জন্য! এরূপ ব্যাপারে এরূপ জনতা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। সহস্র সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী, কেহ কুটীরে, কেহ বস্ত্রাবাসে, কেহ ছত্রাচ্ছাদনে, কেহবা সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় বসিয়া আছেন। কেহ গৈরিকধারী, কেহ কৌপীন বহির্ব্বাসধারী, কেহবা শুদ্ধ কৌপীনধারী; কাহারও গাত্রে কিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে, কেহবা শুদ্ধ বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ জটাধারী। পুরাণে নৈমিষারণ্যে যে ঋষি-সভার বর্ণনা পাওয়া যায়, এ দৃশ্য তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই সাধু দলে মহাপণ্ডিত আছেন, মহাধ্যানী, মহাকর্ম্মী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা—ইত্যাদি সমস্তই আছেন।"* গোস্বামী-প্রভু যে দিন শিষ্যদল-পরিবেষ্টিত হইয়া—

"নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম নাম-ব্রহ্ম বল ভাই।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই।"

—এই সুমধুর নাম-গান করিতে করিতে নৌ-সেতু পার হইয়া গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী বালুকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন তখন সেই স্থানে

* ৺মনোরঞ্জন গুহ প্রণীত "প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

মহাভাবের যে এক অপূর্ব্ব স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। গোস্বামী-প্রভু যখন ভাব-মদিরায় মাতোয়ারা হইয়া হরিনামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পৃথিবীতে প্রকৃতই স্বর্গের শোভা দীপ্যমান হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুমণ্ডলী কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই নবাগত মহাপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, না জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং তাহাতে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল যে, সেই ভীষণ জনস্রোতের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে কোথা হইতে একটী জ্যোতিষ্মান্, খর্ব্বকায় মহাত্মা সমীপবর্ত্তী হইয়া, "আও মেরা প্রাণ" বলিয়া গোস্বামী-প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাভাবের সঞ্চার হওয়াতে ঐ মহাত্মার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার শরীরে মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পশ্চিমদেশীয় এই অপরিচিত সাধুর দেহে ঈদৃশ মহাভাবের বিকাশ দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গিগণ অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণকাল পরে উক্ত মহাপুরুষ হঠাৎ কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন, কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে শিষ্যদল-পরিবেষ্টিত গোস্বামী-প্রভু স্বীয় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর এই অপরিচিত মহাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"ইনি আমার গুরুদেব পরমহংস বাবাজী। তোমাদিগকে কৃপা করিয়া দর্শন দিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে আগমন করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু আপনাকে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্প্রদায়। স্বয়ং নারায়ণ ইহার প্রবর্ত্তক। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও এই মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীর একটী তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।—
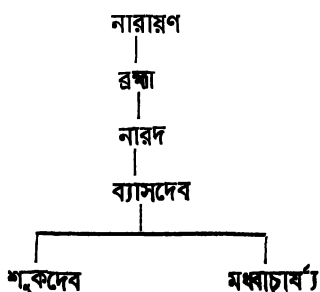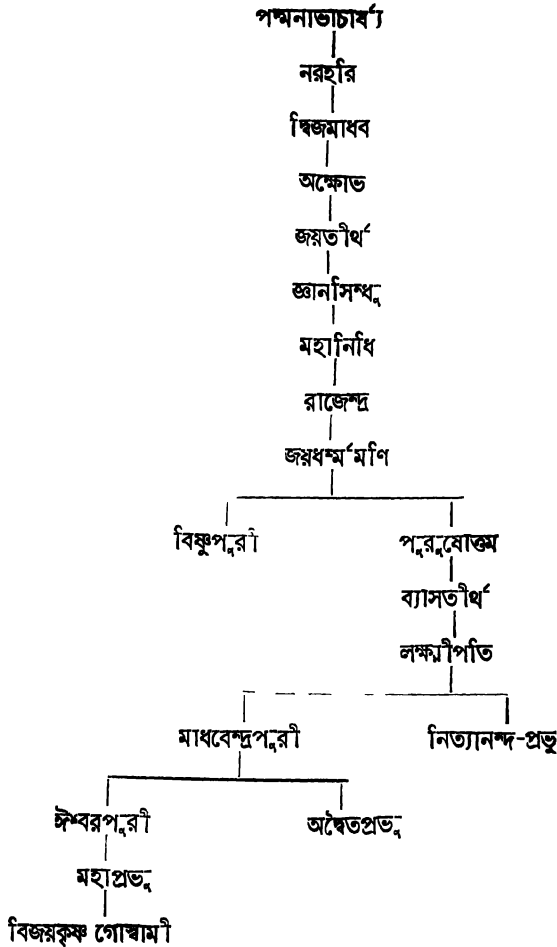
গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমের ব্যবহারের জন্য গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সার দিনকর রাও বাহাদুর একটী প্রকাণ্ড তাঁবু প্রদান করিয়াছিলেন। আশ্রমের দ্বারে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—এই শ্লোকটি বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, এবং উহার এক প্রান্তে কলিযুগপাবনাবতার "শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইর" মৃন্ময় বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত গোস্বামী-প্রভু মেলাস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অতীব সমারোহের সহিত প্রতিদিন এই বিগ্রহদ্বয়ের যথারীতি পূজা-আরতি,

ভোগ-রাগ ইত্যাদি সম্পন্ন হইত এবং পূজান্তে কীর্ত্তন হইত। মেলা অন্তে বিগ্রহদ্বয় গোস্বামী-প্রভুর আদেশে ত্রিবেণীতে বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল।

"একদিবস শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইর বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য ৺মহাবিষ্ণু জ্যোতিঃ তাঁহার স্বরচিত গান গাইতে আরম্ভ করিলেন; গানটী এই ঃ—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

সাজ ভাই সবে মিলে আজ হরি-সংকীর্ত্তনে।
মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে॥
তীর্থরাজ এই প্রয়াগধামে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে,
শ্রীগুরুগোবিন্দ সনে, এমন সুযোগ আর পাবিনে॥
আনন্দে দু'বাহু তুলে,' ডাক দীনবন্ধু ব'লে,
শুনেছি সে থাক্‌তে নারে, ডাক্‌লে কাতর-প্রাণে॥
নামটী হরির দীনবন্ধু, দীন-দুঃখীজনের বন্ধু,
কে আছে ভাই পাপীতাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে।
কোথায় কমল-আঁখি ব'লে, ডেকেছিল দুধের ছেলে,
অম্‌নি কোলে নিলে তুলে,' সেই সরল শিশুর কান্না শুনে॥
আর এক ছেলে অসুরকুলে, মেতেছিল হরি ব'লে,
ম'ল না (সে) জলে-অনলে, এই তারকব্রহ্ম নামের গুণে॥
'কোথায় দীনবন্ধু' ব'লে, ডাক ভাই রে নয়নজলে,
ডাক একবার হৃদয় খুলে (সেই) প্রাণের-প্রাণ সাধনের ধনে॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, শ্রীহরিচরণে মজ,
দেখ চেয়ে চেতন হ'য়ে, দিন ফুরাল দিনে দিনে॥
মান অপমান দূরে থু'য়ে, তৃণ হ'তে সুনীচ হ'য়ে,
মনে-প্রাণে নিশিদিনে ভাস হরিদাস হরিনামে॥

এই গান গাহিতে গাহিতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল, কিন্তু গান জমিতেছে না দেখিয়া সকলেই উন্মনা হইলেন। ঠাকুর (গোস্বামী-প্রভু) বলিলেন—'ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গান কর, তাঁহার কৃপার ছিটা-ফোঁটা পাইলে সব ভাসিয়া যাইবে।' ক্রমে গান জমিতে লাগিল। বাহির হইতে সাধু সন্ন্যাসী সকল জড় হইতে লাগিলেন। ঠাকুর ও সকলে উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অপূর্ব্ব তড়িৎশক্তি সকলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। ঠাকুর 'অবধূত, অবধূত,' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে একজন মুণ্ডিতমস্তক, ভস্মাচ্ছাদিত উলঙ্গ পুরুষ কীর্ত্তনে প্রবেশ করিলেন। আসিয়াই দুই হাত

তুলিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; যেই তাঁহার প্রবেশ অমনি যে যেখানে ছিল, সে তদবস্থায়ই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক অব্যক্ত শক্তিতে খোল করতাল বাদিত হইতে লাগিল। সকলেই মুগ্ধ। অশ্বিনী (গোস্বামী-প্রভুর জনৈক শিষ্য) বলিল, তাহার হাতে করতাল ছিল, সকল শরীর অবসন্ন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! না জানি কোন শক্তিতে যেন হাত নাড়িয়া আপনাআপনি বাজিতে লাগিল! রামযাদব বাক্চী (গোস্বামী-প্রভুর জনৈক অনুগত ভক্ত) কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে পদপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তদবস্থায়ই রহিলেন। এমন সময়ে ঐ মহাপুরুষ সম্মুখস্থ নিত্যানন্দ বিগ্রহের মালা আনিয়া ঠাকুরের গলায় জড়াইয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া গেল, অনুসন্ধান করিয়া আর পাওয়া গেল না। কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিলেন—'আজ কৃপা করিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ করিলেন। তিনি আসলও করিয়াছেন, নকলও করিয়াছেন। আমি সংকীর্ত্তনের সময়ে ভাবিতেছিলাম, গৌর-নিতাই সংকীর্ত্তনের সময়ে কিরূপ করিয়া দাঁড়াইতেন, অমনি আমার সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন হইল। এমন সময়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া প্রকটভাবে দেখা দিয়া গিয়াছেন, তোমরা ধন্য হইয়াছ।' যোগজীবন গোঁসাই বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। ক্ষ্যাপাচাঁদ (মহাত্মা অর্জ্জুনদাস) কি বুঝিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিয়াছিলেন। কুঞ্জঠাকুরতা (গোস্বামী-প্রভুর জনৈক শিষ্য) তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল।"*

একদিবস গোস্বামী-প্রভু কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"যিনি এই মহামেলায় এক মাস কাল রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধন করিবেন, তিনি কোন অদ্ভুত ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।" কথাটী কেহ তেমনভাবে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম উদাসীন শিষ্য স্বর্গীয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় প্রথমেই গুরুদেবের এই উপদেশটী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি এক দিবস দেখিতে পাইলেন যে, হঠাৎ তাঁবুটী অন্ধকারময় হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, গোস্বামী-প্রভুর আসনে আর তিনি নাই, তৎপরিবর্ত্তে চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, কালিকাদেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে কৃষ্ণ-বলরাম বিরাজ করিতেছেন। পরে দর্শন করিলেন, কৃষ্ণ-বলরাম নাই, গৌর-নিতাই বিদ্যমান। পরিশেষে দেখিতে পাইলেন, গৌর-নিতাইর পরিবর্ত্তে আসনে গোস্বামী-প্রভুই পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেছেন। বলাবাহুল্য যে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া শিষ্যটী আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। অপর একদিবস রাত্রি অনুমান ৩ ঘটিকার সময়ে পূর্ব্বোক্ত শিষ্যটী গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি দিব্যকান্তি পুরুষ ও রমণী

* ঘটনাস্থলে উপস্থিত দুইজন দর্শকের হস্তলিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

যদৃচ্ছা গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেছেন। এই গভীর রজনীতে মাঘ মাসের দারুণ শীতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত-গাত্রে ইহাদিগকে এইভাবে বিচরণ করিতে দেখিয়া, তিনি অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিধু, গঙ্গাতীরে কি দেখিলে ?" তদুত্তরে তিনি আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণন করিলে, গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"কুম্ভস্নান উপলক্ষে দেবতারা আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন।"

একদিবস বেলা অনুমান ৮।৯ ঘটিকার সময়ে একজন তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁবুতে আগমনপূর্ব্বক গোস্বামী-প্রভুকে অদ্বৈত জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী মহাপণ্ডিত, সমস্ত বেদ-বেদান্ত যেন তাঁহার কণ্ঠস্থ। গোস্বামী-প্রভু অহর্নিশি সমাধিস্থ থাকেন, ইহা বোধহয় তিনি শুনিয়া থাকিবেন। তাই তাঁহার সমাধি যে শ্রেষ্ঠ সমাধি নয়, ইহা তিনি নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর ঐ সকল অযাচিত উপদেশ ক্রমশঃ উপস্থিত সকলেরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। কিন্তু, গোস্বামী-প্রভু কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই সময় ১০।১২ বৎসরের পশ্চিমদেশীয় একটী নবীন সন্ন্যাসী গোস্বামী-প্রভুর কিঞ্চিৎ ব্যবধানে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ উত্তেজিত-ভাবে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীটিকে ধমক্ দিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, "তুমি কাহাকে শাস্ত্রের কথা শুনাইতেছ ? শাস্ত্রের ছন্দোবন্ধ জান না, রীতিমত উচ্চারণ করিতে পারিতেছ না, চুপ করিয়া থাক। বলিতে হয় অন্য কথা বল, শাস্ত্রের কথা মুখেও আনিও না। তাহাতে সন্ন্যাসীটী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া নবীন সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বটে, আমি শাস্ত্র জানি না ! তুমি কখনও শাস্ত্র পড়িয়াছ ?" নবীন সন্ন্যাসীটী তখন "তবে শুন," এই বলিয়া সন্ন্যাসী যে সকল শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরেও ৪।৫টী শ্লোক ছন্দেবন্দে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসীটী একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন, মুখ দিয়া আর কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ হইল না। তখন বালক সন্ন্যাসীটী, সমাধির যত প্রকার অবস্থা লাভ হইতে পারে, তাহা নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া বলিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন—"ইনি (গোস্বামী-প্রভু) এখন সমাধির যে অবস্থায় রহিয়াছেন, মানব-দেহে ইহার উপরের অবস্থা লাভ হইতে পারে না। গো-শৃঙ্গে সর্ষপ যতটুকু সময় থাকিতে পারে, ততটুকু সময়ের জন্যও সেই অবস্থা লাভ হইলে দেহ ছুটিয়া যায়। সেই সমাধিও ইঁহার আয়ত্ত। কিন্তু, দেহ থাকিবে না বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে অবস্থান করিতেছেন না। নবীন সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া প্রবীণ সন্ন্যাসী অবাক্—অপর সকলে স্তম্ভিত। পরে এই অদ্ভুত বালক-সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ইনি কাশীর প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ

স্বামী। পূর্ব্বজন্মে একটু কর্ম্ম বাকী ছিল, তাহা শেষ করিবার জন্য আসিয়াছেন।" ইতঃপূর্ব্বে সাধু-মহান্তদিগের মহাসভায় গোস্বামী-প্রভুর অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পর হইতে অনেক সাধু মহাত্মারা গোস্বামী-প্রভুর নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী হন। তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে নির্জ্জনে তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিবার জন্য তাঁবুর বাহিরে খলপা দ্বারা ঘেরাও করিয়া একটী ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অপর একদিন এই স্থানে নির্জ্জনে গোস্বামী-প্রভুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক-সন্ন্যাসীটী মেলাস্থান হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, কেহই বলিতে পারেন না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, তিনি মুক্তির পরের অবস্থা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-ভক্তি আয়ত্ত করিবার শক্তি লাভ করিবার জন্যই গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিয়াছিলেন এবং কার্য্যসিদ্ধি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন রাত্রি অনুমান ১১টার সময় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অকস্মাৎ একটি লোক আসিয়া তাঁবুর দরজায় দাঁড়াইল। তাঁহার পরিধানে কোট পেণ্টলন, মাথায় টুপি। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া গিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বীয় আসনে আনিয়া বসাইলেন এবং প্রেম-গদগদ চিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সদালাপের পর তিনি উঠিয়া গেলেন। তখন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে একটি ছাতা দিবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু গোস্বামী-প্রভু নিষেধ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা, নাম সা সাহেব; জাতিতে মুসলমান, এখন জাতি-বুদ্ধি নাই,—পরমহংস অবস্থা। তাঁহার শক্তি অসাধারণ। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আসিয়াছেন, কিন্তু এক ফোঁটা জলও গায়ে পড়ে নাই। যাইবার সময়েও এইভাবে যাইবেন। আমরা কি ভাবে আছি, সেই খবর লইতে আসিয়াছিলেন। এলাহাবাদে খুব গোপনে আছেন। অতি অল্প লোকেই ইঁহার সন্ধান রাখেন।

হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই মূলতঃ এক এবং এক স্থান হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে, মেলা-স্থলে এই বিষয়টীই মহাত্মা সা সাহেব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"বৃন্দাবনমে যো ধেনু চড়ায়া, ওহি আরব দেশ মে বক্‌ড়ি চড়ায়া—ইত্যাদি।"

অপর একদিন বেলা অনুমান ১টার সময় একটি পাঞ্জাবদেশীয় ভদ্রলোক গোস্বামী-প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই করজোড়ে অভিবাদনপূর্ব্বক ধুনির সম্মুখে বসাইলেন। তাঁহার শরীরে কোনপ্রকার ধর্ম্মের চিহ্ন নাই। আকৃতি সুস্থ ও সুদীর্ঘ, বর্ণ গৌর। মস্তকে শুভ্র বস্ত্রের পাগড়ী, শ্মশ্রু-গোঁফ পরিপক্ক। তিনি মুখে একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া চুপ করিয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকট বসিয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার দিকে তাকাইতে

লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুও নির্ব্বাক্ অবস্থায় তাঁহার দিকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁবুস্থ সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই সকল ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সকলেই নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। একটী অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তি যেন সকলকেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইভাবে থাকিয়া এই অসাধারণ মহাপুরুষটি গোস্বামী-প্রভুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামী-প্রভু এইরূপ বলিলেন যে, ইনি কর্ণেল অলকটের গুরু—কোথম ঋষি ; ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। ইনি মুখে কোন কথাই বলেন নাই বটে, কিন্তু দৃষ্টিতে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তবে দশ জনের মধ্যে প্রকাশ হইতে চান না। ইহার প্রভাব অসাধারণ। গোস্বামী-প্রভুর মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু আর কোন খোঁজ-খবর পান নাই। এই মহামেলায় এইরূপ কত প্রাচীন ঋষি-মুনির সমাবেশ হইয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক সাধু মহাত্মারা তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। লোকালয়ে এই সকল ঋষির আগমনের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায়, গোস্বামী-প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন যে, ভগবানের বিধানানুসারে এইরূপ কয়েকটী প্রাচীন ঋষি ও মহাত্মাদিগের উপর সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত আছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের অবস্থা অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া এই কুম্ভমেলার সুযোগ ধরিয়া আগমন করিয়াছেন। এবং উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া এক একটি মহাত্মার উপরে এক এক দেশের ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া যাইবেন। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার এবার কাঠিয়া বাবার উপরে দিবেন স্থির হইয়াছে। তখন গোস্বামী-প্রভুকে প্রশ্ন করা হইল—"বাঙ্গলা দেশের ভার তাঁহারা কাহার উপরে দিবেন ?" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"তা কি এখন বলা যায় ?" গোস্বামী-প্রভুর এইরূপ উত্তরে শিষ্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ ভার তাঁহার উপরেই দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই মহামেলাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহাপুরুষগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা। কাঠের কৌপীন পরিধান করিতেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে 'কাঠিয়া বাবা' বলিত। ইনি কিয়ৎকাল হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেখানে কন্দমূলই সাধুদিগের একমাত্র উপজীবিকা। একবার অনাবৃষ্টি হেতু কন্দমূল উৎপন্ন হইবে না আশঙ্কায়, সেই স্থানের অপরাপর সাধুদিগের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কাঠিয়া বাবা প্রাণে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন এবং এইরূপ

অযথা নির্ভরের ভাব পোষণ করা অপেক্ষা, যে স্থানে ভিক্ষা সহজলভ্য, এইরূপ কোন স্থানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাধন-ভজন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সুগঠিত, অটুট শরীর, আজানুলম্বিত হস্তদ্বয়, শুভ্র কেশকলাপ-বিমণ্ডিত মস্তক, গভীর জীব-বৎসলতা-ব্যঞ্জক সুস্নিগ্ধ মনোহর দৃষ্টি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিলে পুরাকালের ঋষিদিগের কথাই স্বতঃ মনে উদিত হইত। শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিবার পর, অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহার যশোসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং স্থানীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলী ইঁহাকে চৌরাশি ক্রোশ-ব্যাপী ব্রজমণ্ডলের মোহান্তপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রজবাসীরা ইঁহাকে বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ বলিতেন, অর্থাৎ ইনি দেহে থাকিয়াই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় (শান্ত দাস) ইঁহারই মন্ত্র-শিষ্য। ইঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও প্রেমিক সাধু মেলাতে অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুম্ভস্নানের দিবস সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী ইঁহাকেই অগ্রণী করিয়া স্নান করিয়াছিলেন।

২। মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা। ইনি অতিশয় নির্ভরশীল ছিলেন। ইহার ন্যায় শীতোষ্ণসহনশীল সাধু প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ইঁনি কোন প্রকার মাদক দ্রব্যাদিও ব্যবহার করিতেন না। মাঘ মাসের ভয়ানক শীতে সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে, গাত্রে কোন প্রকার বস্ত্রাবরণ ব্যবহার না করিয়াই ইঁনি এলাহাবাদের চড়াতে দিবস-যামিনী অতিবাহিত করিয়াছেন ; এবং কদাচ কাহারও নিকটে কোন দ্রব্য যাঞ্চা করেন নাই।

৩। মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা। মানস-সরোবরে ইঁহার তপস্যা-স্থান ছিল। তথায় বহুকাল তপস্যা করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া, ইঁনি কুম্ভমেলা উপলক্ষে লোকালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধ্যানপরায়ণ সাধু কুম্ভমেলায় অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ে ইঁনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার ভালবাসা এক অপার্থিব বস্তু। "তুহি মেরা প্রাণ" বলিয়া ইঁনি যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বাবাজী মহাশয় সমস্ত সংসারকেই যেন আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তিনি বালকের ন্যায় সরলভাবে সম্মুখে যাহাকে দেখিতেন, নিঃসঙ্কোচে তাহারই নিকটে খাবার চাহিয়া আহার করিতেন। ইঁহার শেষ জীবন ইঁনি লোকালয়েই অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং কিয়ৎকাল কলিকাতা সহরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার অসাধারণ সাধুতা, সরলতা ও ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গদেশীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

৪। মহাত্মা গম্ভীরনাথ। ইঁনি নাথযোগী, এবং গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের

মোহান্ত। বহুদিন পূর্ব্বে ইঁনি গয়াধামে আসিয়া কপিলধারার নিকটস্থ একটী নির্জ্জন আশ্রমে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। সাধুরা বলিতেন, হিমালয়ের নীচে এত বড় মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। ক্ষণকাল এই মহাত্মার নিকটে বসিলেই মন স্থির হইয়া যাইত। গোস্বামী-প্রভু প্রণীত 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক গ্রন্থে গয়া, 'বরাবর' পাহাড়স্থিত যে চারিটী সিদ্ধ মহাপুরুষের কথা উল্লিখিত আছে, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গম্ভীরনাথ দয়া করিয়া কলিকাতা সহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসী তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। গত ১৩২৩ সনের বারুণী স্নানের দিবস নাথজী গোরক্ষপুরে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

৫। মহাত্মা ভোলাগিরি। ইনি দণ্ডী সন্ন্যাসী। ইঁহার বর্ত্তমান আশ্রম হরিদ্বারে অবস্থিত। মেলার মধ্যে ইনি একজন অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। স্নানের দিন নাগা সন্ন্যাসিগণ ইঁহাকেই অগ্রে করিয়া স্নানে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইঁনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং অতিশয় মিষ্টভাষী। ইঁহার গুণ-গ্রামে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের বহু সম্ভ্রান্ত নর-নারী ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

৬। মহাত্মা অমরেশ্বরানন্দ স্বামী। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চবটীতে ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম। ইনি পাঠ্যাবস্থায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই ইঁনি শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হন। ইঁনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং মেলাতে একজন বিশেষ প্রতিভাসমন্বিত সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

৭। মহাত্মা অর্জ্জুন দাস বা ক্ষ্যাপাচাঁদ। ইঁনি একজন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ। ইঁহার কার্য্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার দেখিলে স্বভাবতঃ ইঁহাকে পাগল বলিয়াই ভ্রম জন্মে; কিন্তু ইঁনি একজন ভাগবৎলক্ষণাক্রান্ত পরম ভক্ত। মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'এ জ্ঞানপাগলা হ্যায়'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্ব বহু সাধুসন্ন্যাসীর নিকটেই অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু মহাত্মা অর্জ্জুন দাসের নিকট কিছুই অবিদিত নাই। বাঙ্গালা কোন গ্রন্থাদি না পড়িয়াও তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিলেন। "কেমন করিয়া তিনি বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন?"—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ বলিয়াছিলেন—"ধ্যানমে মিলা।" ইঁহার প্রেমের কথা অবর্ণনীয়। "মহাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।"—এই তত্ত্বটী ইঁহার মধ্যে যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। কেহ কাহাকেও আঘাত করিলে ইঁনি স্বীয় প্রাণে তাহা অনুভব করিয়া বালকের ন্যায়

ক্রন্দন করিতেন। ইঁনি সকলের মধ্যেই ইঁহার ইষ্টদেবের প্রকাশ উপলব্ধিকরতঃ আত্মহারা হইয়া তাঁহাদিগকে হাত ঘুরাইয়া আরতি করিতেন।

৮। মহাত্মা দয়াল দাস। ইনি গরীবদাসী-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি। স্বর্গীয় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) ইঁহার অশেষ গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার দানযজ্ঞ কুম্ভমেলার একটী প্রধান ঘটনা। ইঁনি মেলায় এক মাসকাল একটী অন্নসত্র খুলিয়া অগণিত সাধুসন্ন্যাসী ও কাঙ্গালিগণের আহার যোগাইয়াছিলেন।

সমাগত সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে অনেকে গোস্বামী-প্রভুকে প্রথম প্রথম তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদিগের কেহ কেহ অদূরদর্শিতা নিবন্ধন তাঁহার কার্য্য-কলাপের মধ্যে নানারূপ ত্রুটী দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ তিনটী আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। ১।—তিনি বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন। তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা একত্রে ব্যবহার করেন, জটা রাখিয়াছেন অথচ তিলকও ধারণ করেন। ইহাতে বৈষ্ণবমণ্ডলীর অসম্মান করা হইয়াছে। ২।—ইঁহার আশ্রমে গৌর-নিতাইর বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দশাবতারের মধ্যে তাঁহাদের নামোল্লেখ নাই। ৩।—তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমে শ্বাশুড়ী, কন্যা প্রভৃতি কতিপয় মহিলাকে স্থান প্রদান করিয়াছেন (অবশ্য ইঁহারা সকলেই প্রভুজীর মন্ত্রশিষ্য)। দুইজন বাঙ্গালী সাধুর (উঁহার মধ্যে একজন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্ত ছিলেন) প্ররোচনা ও চেষ্টায় এই সকল বিষয় লইয়া সাধুদিগের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে আন্দোলন হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্য প্রধান প্রধান মোহান্তগণ, সাধুদিগের একটী সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা অমরেশ্বরানন্দ স্বামীজী প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বলিলেন যে, "এই বৈষ্ণব বাবা যে বেশ ধারণ করিয়াছেন, শাস্ত্রে ইঁহার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে ইহাকে 'অবধূত'বেশ বলে।" শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন সম্বন্ধে বলিলেন— "আমি পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপ অবস্থানকালে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছি। গৌর-নিতাই যে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ও বর্ত্তমান। ইঁহারা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত।" মহাত্মা কাঠিয়া বাবাজী মহাশয়ও গোস্বামী-প্রভুকে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "গোঁসাইজী সাক্ষাৎ মহাদেব। উঁহার ললাটদেশে অনবরত অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। উঁহাতে যাহা কিছু পড়িতেছে, সমস্তই ভস্ম হইয়া যাইতেছে। ইনি যেমন প্রেমিক, তেমনই সামর্থ্যবান। ইনি যে বৈষ্ণবী-মণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা বাড়িয়াই গিয়াছে।" মহাত্মা ভোলাগিরি

বলিলেন যে, "সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকা নিষেধ বটে, কিন্তু সামর্থ্যবান্ সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে সে নিয়ম প্রযুজ্য হইতে পারে না। ইনি (গোস্বামী-প্রভু) অতিশয় সামর্থ্যবান্ পুরুষ, সাক্ষাৎ শিবতুল্য। ইনি শাস্ত্র-বিধির অতীত এবং অহর্নিশি সমাধিমগ্ন। ইঁহার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না"।* তিনটী প্রধান সম্প্রদায়ের তিনজন সর্ব্বপ্রধান মহাত্মার এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তিযুক্ত উক্তর শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী সাধুদ্বয় লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কিন্তু উপস্থিত সাধুমণ্ডলী অতীব প্রীত হইলেন এবং সেই অবধি তাঁহারা গোস্বামী-প্রভুর নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যতই তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অসাধারণ গুণে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন! এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করিবার আশায়, অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু মেলাক্ষেত্রে আগমনাবধি প্রায় প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে, কোন কোন দিন বা অপরাহ্নেও শিষ্যদল পরিবেষ্টিত হইয়া সাধুদর্শনে বহির্গত হইতেন। এই সময়ে তিনি যে পথ দিয়া গমন করিতেন, সেই সকল স্থানের সাধুগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে হরিধ্বনি করিতেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া অতি বিনীতভাবে ধর্ম্মতত্ত্বাদি আলোচনা করিতেন। তখন তাঁহার বিনয়-নম্র বাক্যে, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সাধুসজ্জনগণ অতীব আকৃষ্ট হইতেন। একদিবস পূর্ণানন্দ স্বামী নামক জনৈক বিখ্যাত মোহান্ত, গোস্বামী-প্রভুর-ললাটে তিলক দেখিয়া বলিলেন—"তেরা ললাটমে ত মেরা মহাদেব ঝাড়া ফের্‌তা।" গোস্বামী-প্রভু বিনীতভাবে উক্তর করিলেন—"মেরা ত বহুত ভাগ হ্যায় কি মহাদেবজী হামরা ললাটমে টাট্টি ফের্‌তা।" তাঁহার এইরূপ উক্তর শুনিয়া স্বামীজীর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

সাধুসন্ন্যাসিগণ, মৎস্যাহারী বলিয়া বাঙ্গালীদিগকে এযাবৎ বড়ই ঘৃণার

---

* শ্রীসদাশিব উবাচ—

"অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যং তৎসর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতং॥
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং প্রতিব্রতাং
ত্যক্ত্বাসমর্থান বন্ধুংশ্চ প্রব্রজন্ নারকী ভবেৎ॥

*   *   *

কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তঃ নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮ম উল্লাস।

চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী-দিগকে একরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বর্জ্জিত বলিয়াই অনুমান করিতেন। কিন্তু এই এক মাসকাল কুম্ভমেলায় গোস্বামী-প্রভুর আচার-ব্যবহার, কার্য্যকলাপ, ধ্যান-ধারণা, ভাব-সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার দূর হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বড় বড় মহাত্মাগণ একবাক্যে গোস্বামী-প্রভুকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, তাঁহাদিগের কেহ কেহ তাঁহাকে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহাত্মা বড় কাঠিয়া বাবা গোস্বামী-প্রভুর নাম করিয়া বলিতেন—"বাবা প্রেমী হ্যায়, উন্‌কা বহুৎ প্রেম হ্যায়।" ইঁনি গোস্বামী-প্রভুকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, তাঁহার নাম শুনিলেই 'বিজয়কিশোর' (কৃষ্ণ), 'বিজয়কিশোর' বলিয়া অস্থির হইতেন। গোস্বামী-প্রভুর বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তিনি তাহা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বে কোন এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, কতিপয় স্থানীয় সাধু গোস্বামী-প্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাত্মা কাঠিয়া বাবা মর্ম্মাহিত হইয়া সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া সাতিশয় তেজের সহিত বলিয়াছিলেন—"কেয়া বোল্‌তে হ্যায়, দেখতা নেহি উন্‌কা (গোস্বামী-প্রভুর) ললাট মে আগ্‌ জ্বল্‌তা হ্যায়! তোম লোগ ঐছা এক আসন পর হরদম বৈঠ রহোতো, শরীর খান্‌ খান্‌ হো যায়েগা,"—অর্থাৎ তোমরা কি বলিতেছ? দেখিতেছ না উঁহার (গোস্বামী-প্রভুর) ললাটে অগ্নি জ্বলিতেছে। উহার মত অষ্টপ্রহর একাসনে বসিয়া থাক ত? তাহা হইলে তোমাদের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। মহাত্মা ভোলাগিরি গোস্বামী-প্রভুকে দেখিলেই 'মেরা আশুতোষ' 'মেরা আশুতোষ' বলিয়া অধীর হইতেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর ইঁনি একদিন দীন-গ্রন্থকারের নিকট বলিয়াছিলেন—"আমার আশুতোষের অভাবে আজ বাংলাদেশ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" ইঁনি অপর এক সময়ে গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিনো মিলায় করকে এক ব্যাটা হ্যায়," অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনজন মিলিয়া এই একজন হইয়াছেন।

মহাত্মা গম্ভীরনাথ গোস্বামী-প্রভু সম্বন্ধে বলিতেন—"এমন প্রেমিক সাধু অতীব দুর্লভ।" মহাত্মা দয়াল দাস গোস্বামী-প্রভুর কোন শিষ্যকে অনেকবার বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী বাবাকে আমি আবার কিরূপে কোথায় দেখিতে পাইব?" গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যদিগের কীর্ত্তন শুনিয়া ইঁনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা দিনের মধ্যে অনেকবার গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন; এবং বিদায়ের কালে এমন ভাব প্রকাশ করিতেন যেন তিনি তাঁহার সঙ্গচ্যুত হইতে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ

অনুভব করিতেছেন। তিনি গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কভি রামজী, কভি গণেশ দেখ্‌তা হ্যায়, বড়ী তাজ্জবকা বাৎ হ্যায়।" মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা গোস্বামী-প্রভু সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"হাম সাচ্‌ কয়তেহে, এ বাবা সাক্ষাৎ রামজী হ্যায়, জ্যোতিঃস্বরূপ হ্যায়।" ইঁনি গোস্বামী-প্রভুর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর ৺পুরীধামে তাঁহার সমাধি-আশ্রমে গিয়া অনেক সময়ে বাস করিতেন।

মহাত্মা অর্জ্জুন দাস (ক্ষ্যাপাচাঁদ বাবা) দিবানিশির অধিকাংশ সময়ে গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমে তাঁহার আসনের একধারে পড়িয়া থাকিতেন, এবং সময়ে সময়ে ভাবাবেশে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিয়া করজোড়ে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের স্তব পাঠ করিতেন। আবার কখনও বা হাত নাড়িয়া নাড়িয়া গোস্বামী-প্রভুকে আরতি করিতেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন—"দেখতা নেহি কেত্তা রামজী, কিষণজী মহারাজকো (গোঁসাইজীর) জটাকো সেবা কর্‌তা হ্যায়। মহারাজ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! মহাপ্রভু হ্যায়। এ বাঙ্গলাদেশকো চেতন কিয়া। হাম জেতনা কুম্ভ দেখা হ্যায়, মহারাজকো দর্শন কর্‌কে সব পূরণ ভায়া।" ইঁনি কোন কোন সময়ে গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিতেন, কোন সময়ে বা অতি বিনীতভাবে করজোড়ে কীর্ত্তনের পিছনে থাকিতেন, আবার কোন সময় বা আনন্দে অধীর হইয়া ছুটাছুটি করিতেন, এবং গোস্বামী-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"এসা মহাত্মা হাম্‌ কভি নেহি দেখা, হাম্‌ উন্‌কা নোফরকা নোফর।" মহাত্মা অর্জ্জুন দাস অনেক সময়ে গোস্বামী-প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া মনের আনন্দে ভোজন করিতেন এবং কোন কোন সময়ে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন। এক দিবস তিনি সাধুদিগের পাদোদক সংগ্রহপূর্ব্বক কতকাংশ পান করিয়া অবশিষ্টাংশ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন—"মহারাজ! যে মহামৃত সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছেন, তাহা কি একাই পান করিতে হয়?" এই কথা শুনিয়া মহাত্মা অর্জ্জুন দাস অতীব লজ্জিত হইয়া চরণামৃতের পাত্রটী গোস্বামী-প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পান করিয়া, অবশিষ্টাংশ অপরাপর শিষ্যদিগকে পান করিতে দিলেন। এই সাধুর চরণামৃতের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন।

উত্তরসংক্রান্তির দিবস প্রাতঃকাল হইতেই মকরস্নানের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধুসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার আয়োজন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মোৎসাহের মহাতরঙ্গ উত্থিত হইল। তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে মেলাক্ষেত্রের সমগ্র অধিবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিল। সকলেই আজ কুম্ভমেলার মহাধিবেশনের সময়ে পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া

পবিত্র হইবার আশায় শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বাহ্নে অনুমান আট ঘটিকার সময়ে সর্ব্বাগ্রে নাগা সন্ন্যাসিগণ মহাজাঁকজমকের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহির্গত হইলেন। দুইজন নাগা সন্ন্যাসী তাঁহাদের সম্প্রদায়ের চিহ্ন স্বর্ণখচিত বহুমূল্য প্রকাণ্ড ঝাণ্ডা (নিশান) স্কন্ধে বহন করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, অপর দুইজন নাগা সন্ন্যাসী দুই পার্শ্বে থাকিয়া, উক্ত ঝাণ্ডাদ্বয়কে চামরব্যজন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদিগের পশ্চাতে মোহান্তগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অনুসারে কেহ অশ্বে, কেহ বা পাল্কীতে, আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মোহান্তগণের পশ্চাতে সহস্র সহস্র ভস্মাচ্ছাদিত জটাজুটধারী দিগম্বর নাগা সন্ন্যাসী, সামরিক রীত্যনুসারে ধীরপদবিক্ষেপে উৎসাহভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। নাগাদিগের পশ্চাতে দশনামা সন্ন্যাসিগণ এবং তৎপশ্চাতে অপরাপর সন্ন্যাসিগণ গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সমগ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মেলাবাসীর ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত নৌ-সেতু পার হইয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া যথারীতি স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরে বৈষ্ণবসম্প্রদায়, তৎপরে নানকপন্থিগণ স্নান করিয়াছিলেন। অপরাপর সম্প্রদায় ইঁহাদের পরে স্নান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন লক্ষ লক্ষ কল্পবাসী, অগণ্য দর্শকমণ্ডলী—সর্ব্বসমেত প্রায় দশ লক্ষ নরনারী—মকর সংক্রান্তিতে ত্রিবেণী স্নান করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এই মহাস্নানের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবপূর্ণ ধীর-গম্ভীর অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় দৃশ্য বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কল্পনা করিয়াও ধারণা করা অসাধ্য। ইহা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তপটে উহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্নান করিয়াছিলেন। স্নানের সময়ে তীর্থগুরু মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগকে, ধন জন স্বর্গ ইত্যাদি নানাবিধ কামনাসূচক শ্লোক আবৃত্তি করাইয়া মন্ত্র পড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"ও কি করিতেছেন? উহাদিগকে ঐরূপ মন্ত্র পড়াইবেন না।" ইহাতে তীর্থ-গুরু মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি মন্ত্র পড়াইব?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, উহাদের দ্বারা এইরূপ প্রার্থনা করান যেন ঐ সব কিছু না হয়, এবং উহাদের ভগবানে মতি হয়। তীর্থগুরু মহাশয় তদ্রূপই করিলেন।*

মকরস্নানের পর ২৪শে মাঘ দিবাকর কুম্ভ রাশিতে গমন করিলে, কুম্ভের স্নান হইয়াছিল। মকরস্নান যেভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, কুম্ভস্নানও সেই প্রণালীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অধিকন্তু এই দিন মকরস্নান অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ নর-

* স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ।

নারী ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মার্থে এরূপ জনসমাগম পৃথিবীতে নাকি আর দেখা যায় নাই।

মকরস্নানের পর গোস্বামী-প্রভুর গুরুদেব পরমহংসজী, মেলার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে মেলাক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কুম্ভস্নানের দিবস চড়া পরিত্যাগ করিয়া অপর পাড়ে ত্রিবেণীতে গমন করেন নাই।

এক মাস পরে এই মহমেলার অবসান হইল, চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। সাধুরা কত যুগের বান্ধবের ন্যায় পরস্পরের নিকট হইতে গলদশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক দেশদেশান্তরে গমন করিলেন। মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ বিদায়ের কালে গোস্বামী-প্রভুর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া করজোড়ে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, "তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু"—ইত্যাদি ভগবিষয়ক স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে ভাব সংবরণ করিয়া বলিলেন —"প্রভো! এইস্থানের সকলেই আমাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র আপনিই আমাকে অতিশয় আদর করিয়া চরণপ্রান্তে স্থান দান করিয়াছিলেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। গোস্বামী-প্রভু এই সকল দেবদুর্ল্লভ সঙ্গ হারাইয়া, গভীর বিরহ-বেদনা হৃদয়ে বহনপূর্ব্বক সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মেলাবসানে গোস্বামী-প্রভু কিয়ৎকাল এলাহাবাদ সহরে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত বাণীতোষ বাগচি মহাশয়ের সহিত, তদীয় কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া প্রেমসখীর উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে এলাহাবাদস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিবাহান্তে একদিন গোস্বামী-প্রভুর জনৈক শিষ্য, শ্রীযুক্ত বাণীতোষবাবুর মাতৃদেবীর মন পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা নবদ্বীপ-সমাজের নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-ঘরের লোক হইয়া জাতিত্যাগী গোস্বামী-মহাশয়ের কন্যা গ্রহণ করিলেন কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"আমি সাক্ষাৎ ভগবানের কন্যা গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়াছি।" এইরূপ উত্তর শুনিয়া শিষ্যটী নির্ব্বাক্ হইয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

বিবাহান্তে গোস্বামী-প্রভু কলিকাতা আগমন করিবার জন্য রেল-ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া শিষ্য ও পরিবারবর্গের সহিত একখানি গাড়িতে আরোহণ করিলেন। গাড়ী ছাড়িতে ৪।৫ মিনিট বিলম্ব আছে, এমন সময় গোস্বামী-প্রভুর গুরুভ্রাতা সা সাহেব ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সকলকে ঐ গাড়ী হইতে নামিয়া পার্শ্বের একখানি গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। শিষ্যগণ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর আদেশে তাঁহারা তাড়াতাড়ি মোট-

মাটুরী লইয়া সা সাহেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সা সাহেব নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ করার উদ্দেশ্য শিষ্যদিগের মধ্যে কেহই বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। অতঃপর ঐ গাড়ী মগরা ষ্টেসনে আগমন করিলে অকস্মাৎ অপর গাড়ীর সহিত ভীষণ "কলিসন" হইল। আশপাশের দুইখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, কিন্তু দূরদর্শী সা সাহেব তাঁহাদিগকে যে গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোনই ক্ষতি হইল না। তখন গোস্বামী-প্রভু শিষ্যদিগকে বলিলেন—"এখন সা সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে ত? কখন মহাপুরুষরা কিভাবে কোন কথা বলেন, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন, অবিচারে তাহাই পালন করিতে হয়।" এ ঘটনায় মহাত্মা সা সাহেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীধাম নবদ্বীপের মহোৎসবে যোগদান, চন্দ্রগ্রহণের স্নানোৎসব, শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্থাপিত ৺মহাপ্রভুর বিগ্রহের বিবরণ, প্রসিদ্ধা তপস্বিনী রাইমাতাকে দর্শন, শ্রীধামে মহাপ্রভুর নিত্যলীলা-ব্যঞ্জক অদ্ভুত ঘটনা, ব্যাদড়াপাড়ানিবাসী রাজকুমারবাবুর সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ, শান্তিপুর ভ্রমণ, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভজনস্থল 'বাবলার' অপ্রাকৃত কীর্ত্তন, গৃহপালিত কুকুরের অদ্ভুত বিবরণ।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলার মহাধিবেশন দর্শন করিয়া, গোস্বামী-প্রভু সশিষ্য কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক, কুমারটুলীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে অত্যল্পকাল অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে ১৩০০ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে, কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে আহিরীটোলার ঘাট হইতে ষ্টীমারযোগে কালনা হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হন। তথাকার প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিত ভগবদ্ভক্ত ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় অতিশয় আগ্রহ ও সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে স্বীয় হরিসভার সংলগ্ন টোল বাড়ীতে বাসস্থান প্রদান করেন।

যে ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতে ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। বহুদিন পরে এই বৎসরও ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইবে বলিয়া অতি সমারোহের সহিত জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। দূর-দূরান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ এতদুপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন এক অদ্ভুত শক্তি নবদ্বীপবাসীকে মাতাইয়া তুলিল। দিন নাই, রাত নাই,—দলে দলে সংকীর্ত্তন বাহির হইতে লাগিল, এবং তারক-ব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। আজানুলম্বিতভুজ, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, অতুলদর্শন গোস্বামী-প্রভু, ভাবে মাতোয়ারা শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রেমভরে হেলিয়া-দুলিয়া নাচিতে নাচিতে যখন কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হইতেন, তখন নবদ্বীপ-বাসীর মনে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তনলীলার স্মৃতি জাগরূক হইত। তাঁহাদের প্রেমের হুঙ্কার, তাঁহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য, তাঁহাদের অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক লক্ষণের বিকাশ যিনিই প্রত্যক্ষ করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এমন কি, স্থানে স্থানে কুলবধূগণ পর্য্যন্ত তাহা দর্শন করিয়া ভাবে উন্মাদিনী

হইয়া গোস্বামী-প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য লজ্জা-ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কীর্ত্তনের মধ্যে প্রবেশ করিতেন ; জাতি, কুল, মান ইত্যাদি লৌকিক আচারের দুশ্ছেদ্য বন্ধনও তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। একটী অদ্ভুত পাগলিনী প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্ত্তনে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেন। নৃত্যকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কদম্বপুষ্পের ন্যায় পুলক দেখা দিত।

গোস্বামী-প্রভুর বাসস্থান টোলবাড়ীর সন্নিকটেই ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয়ের পিতৃদেব ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হরিসভার মন্দির অবস্থিত। বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন অতিশয় উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, শ্রীমান্ মহাপ্রভু যেরূপ অপরূপ মনোহর ভঙ্গিমাতে তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন, ঠিক তদনুযায়ী একটী শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যহ তথায় যথারীতি ভোগ-রাগ-আরতি-কীর্ত্তন ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। নবদ্বীপে অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণসমভিব্যাহারে প্রায়ই এই হরিসভার কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। সন্ধ্যার পরই চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইবে। প্রাতঃকাল হইতেই সমগ্র নবদ্বীপময় এক মহানন্দের রোল উত্থিত হইল। চারিদিকেই হরিনাম-মহোৎসবের বিবিধপ্রকার আয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল। যে তিথি-নক্ষত্রের শুভযোগে স্বয়ং গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাম-প্রেম বিলাইতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ ৪০০ বৎসর পরে আবার সেই মাহেন্দ্রযোগ সমুপস্থিত। ভক্তমণ্ডলীর আজ বুকভরা আশা, তাঁহারা এই শুভদিনে ভগবান গৌরচন্দ্রের কোনও না কোনরূপ আবির্ভাব দর্শন করিবেন। নবদ্বীপবাসী ৺মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর) এই মহা শুভযোগে তাঁহার আলয়ে নবগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রভূত আয়োজন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ আনন্দে, উৎসাহে মাতোয়ারা।

অপরাহ্ণ হইতে না হইতেই দলে দলে কীর্ত্তনীয়াগণ সহস্র সহস্র ভক্তমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তারকব্রহ্ম হরিনামের সিংহনাদে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া পতিতপাবনী সুরধুনীর তীরে সমবেত হইতে লাগিলেন। টোলবাড়ী হইতে সশিষ্য গোস্বামী-প্রভু, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে, বর্ষাকালীন বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় জাহ্নবীতীরস্থ সেই কীর্ত্তনসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে, তথায় যে মহাভাবের উত্তাল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত জনৈক দর্শকের স্বকথিত বিবরণ হইতে কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে। তৎপ্রদত্ত বিবরণ, যথা :—

"১৩০০ সনের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিবস সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আমরা ঠাকুর গোঁসাইর (গোস্বামী-প্রভুর) সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে টোলবাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া, সন্ধ্যার পরই নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে অসংখ্য সংকীর্ত্তনের দলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চলিল। আমাদের কীর্ত্তন ও অপরাপর দলের কীর্ত্তন পথে মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-লহরী ছুটিতে লাগিল। গোঁসাই সকল সম্প্রদায়কেই আপন জ্ঞানে স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য করিয়া সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারাও তাহাতে অপূর্ব্ব শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া দেখি যে, গঙ্গার ঘাট লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য কীর্ত্তনের সম্প্রদায় গান ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে। লোক চলাচল অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অভীপ্সিত স্থানে যাইবার পথ পাওয়া যায় না, অথবা কোনও স্থানে স্থিরও থাকিবার উপায় নাই; লোকপ্রবাহ বিভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায়সমূহকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত করিতেছে। ইহার মধ্যে গোঁসাই স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন, আর 'জয় শচীনন্দন', 'জয় শচীনন্দন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কখনও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে কীর্ত্তনের মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, কখনও বা তাঁহাকে সমাগত অনুভব করিয়া যেন তাঁহার শ্রীমুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া সাদরে আরতি করিতেছেন। ইহাতে উপস্থিত জনমণ্ডলী সত্যদর্শনানুভবের প্রবাহ নিজ নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ পুলকিত, কেহ উল্লসিত, আর কেহ বা বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাচিতে নাচিতে কেহ নৃত্য আর থামাইতে পারেন না, অনেকে মাথা টলিয়া পার্শ্বে বা পশ্চাৎ দিকে পতিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। এমন সর্ব্বব্যাপী কীর্ত্তন ও তাহাতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভগবৎকৃপা-সঞ্চার আর কখনও দেখি নাই, ভবিষ্যতে দেখিব কি না বলিতে পারি না। এই ত গেল সাধারণ দৃশ্য। তারপর আমাদের ঠাকুর গোঁসাইর অবস্থা ও তাঁহার আশেপাশে যাহা ঘটিল, তাহার বিবরণ আর ব্যক্ত করা যায় না। নদীর প্রবাহ দেখিয়া তৎপ্রসূতি হ্রদের গাম্ভীর্য্য এবং বেগও যদি ধারণা ও অনুভব করা সম্ভব হয়, তাহা হইলেও গোঁসাই ও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যে সকল শিষ্যবর্গ কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাবগাম্ভীর্য্য ও পর্ব্বতবিদারণকারী অদম্য বেগ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে না—তাহা এতই গম্ভীর, এতই অতলস্পর্শ।

"অদ্যকার এই মহাসংকীর্ত্তনের মধ্যে গোঁসাই-প্রভু অপূর্ব্ব মাধুরীর নৃত্য ও জয়ধ্বনি করিতেছেন, চতুর্দ্দিকে এক মহা-উত্তেজনাময় আনন্দ-প্রবাহ বিকীর্ণ হইতেছে, দর্শকমণ্ডলী চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছে, এমন সময়ে দূর হইতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও

বদান্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের গুরুদেব সুপ্রসিদ্ধ সাধু হরিবোলানন্দ স্বামী, কি জানি কি ভাবে আবিষ্ট হইয়া দুই বাহু প্রসারণকরতঃ তীরবেগে গোঁসাইর দিকে ধাবিত হইলেন, এবং নিকটবর্ত্তী হইলেই গোঁসাই-প্রভু স্বীয় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াই সমাধিস্থ হইলেন। এই-ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে দুই জনেই মহাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ হইতে অসংখ্য লোক ছুটিয়া আসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"যেন সাক্ষাৎ গৌর-নিতাই নাচ্ছে গো!" সাধু হরিবোলানন্দ গোঁসাইকে নির্দ্দেশ করিয়া উম্মাদের ন্যায় কখনও লম্ফ, কখনও অদ্ভুত নৃত্য, কখনও বা গভীর উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন ইঁহাকে পাইয়াই তাঁহার আরাধনার ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"গ্রহণ আরম্ভ হইবামাত্র গোঁসাই-প্রভু উর্দ্ধে দৃষ্টিকরতঃ সদ্য রাহুগ্রস্ত সুধাকরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্থির নেত্রে দণ্ডায়মান দাঁড়াইয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এতদবস্থায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। অতঃপর তিনি সুরধুনী-তীরে উপবেশনপূর্ব্বক পুনরায় চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি স্থিরকরতঃ 'ঐ দেখ, ঐ দেখ' বলিয়া সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহাযোগী যোগারূঢ় হইয়া গ্রহণ-মুক্তিকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে এককালে ভক্তি-মাধুর্য্য ও যোগৈশ্বর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার মধ্যে কি দেখিয়া 'ঐ দেখ, ঐ দেখ' বলিলেন, তিনিই জানেন, তাহা সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগোচর।

"গ্রহণাবসানে গোঁসাই-প্রভু গঙ্গাস্নান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার সহিত জলকেলী আরম্ভ করিলেন। সকলেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন, তিনিও সহাস্যবদনে তাঁহাদের ঐ আদর গ্রহণ করিলেন। স্নানান্তে নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিয়া শিষ্যগণকে পুনরায় কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন।"* বরিশাল বানরীপাড়া-নিবাসী ৺কালাচাঁদ গুহ মহাশয় গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

গোরা শচীর দুলাল যাঁচে রে।
যাঁচে প্রেম রাধাভাবে বিভোর হ'য়ে রে॥
উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠাঁই রে,
ধরিয়া ধরিয়া প্রেম করে।

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ।

(গোরা) গোলোক হ'তে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে,
উদয় হ'ল রে ॥
পতিত হেরিয়ে কাঁদে, গোরার হিয়া নাহি স্থির বান্ধে রে,
সুরধুনী বহে দু'নয়নে।
যাচে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেম, বলে কে নিবি নে রে,
আয় রে তোরা আয় রে ॥
(এবার বিনা মূলে বিলাইব)

—এই কীর্ত্তন করিতে করিতে সশিষ্য গোঁসাই-প্রভু, স্বীয় বাসভবন টোলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ভাবে পুনঃ পুনঃ ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। বরিশাল-নিবাসী স্বগীয় গোরাচাঁদ দাস মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর সাধু শ্রীধর 'জয় নিতাই' বলিয়া মুহুর্মুহুঃ গভীর গর্জ্জনে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোথা হইতে একটী ক্ষিপ্তপ্রায় লোক একখণ্ড বাঁশ স্কন্ধে লইয়া—"তুই এত দিন কোথায় ছিলি? আজ সাম্নে পেয়েছি, এই বাঁশ দ্বারা পিটিয়ে ঠিক ক'রব"—ইত্যাদি বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে তীরবেগে গোস্বামী-প্রভুর দিকে ছুটীয়া আসিতে লাগিল। শিষ্যগণ তাঁহার রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লোকটী নিকটে আসিয়াই বংশখণ্ড দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক গোস্বামী-প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, এবং ক্ষণকাল পরে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ব নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইভাবে সেই দিনের মহাসংকীর্ত্তন সমাধা করিয়া, গোস্বামী-প্রভু স্বীয় বাসভবন টোলবাড়ীতে আগমনপূর্ব্বক শিষ্য ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিলেন।"*

গ্রহণের পরদিন প্রাতে গোস্বামী-প্রভু কীর্ত্তনসহ টোলবাড়ী হইতে হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। স্বগীয় হরিমোহন চৌধুরী ভাবে বিভোর হইয়া অদ্ভুতপূর্ব্ব নৃত্য করিয়াছিলেন এবং কয়েকটী লোক ভাবাবিষ্ট হইয়া জানু পাতিয়া করজোড়ে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কীর্ত্তন শেষ হইল। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানেই প্রসাদ পাইলেন।

ঐ দিন শেষরাত্রে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্য-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ী উপস্থিত হন। এই স্থানের বিগ্রহ শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্থাপন করেন। এমন অপরূপ মূর্ত্তি গৌড়মণ্ডলে অতি অল্পই

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্যদ্বয় স্বর্গীয় বেণীমাধব দে ও স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গুহঠাকুরতা মহাশয়-প্রদত্ত বিবরণ। ইঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

আছেন। হঠাৎ দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই ভ্রম জন্মে। কথিত আছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর ভাবী বিরহজনিত শোকে অতীব অভিভূত হইয়া পড়েন। তদ্দর্শনে মহাপ্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক এই বর প্রদান করিলেন যে, তিনি মনে করিলেই তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু শ্রীমতী তাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"কৈ? এই মূর্ত্তি ত আমি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। অতএব এই মূর্ত্তি যাহাতে আমি স্বহস্তে সেবা পূজা করিতে পারি, তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সুনিপুণ কারিকর দ্বারা স্বীয় দেহের অনুরূপ একটী দারুময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বীয় পূর্ণত্বহেতু নিজেও পৃথকভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দুইটী শ্রীমূর্ত্তি আকারে-প্রকারে এরূপ সাদৃশ্যপ্রাপ্ত হইল যে, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুতেই উঁহাদের পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার যাঁহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার, তুমি যাঁহাকে স্পর্শ করিবে তিনিই তোমার নিকটে থাকিবেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া দারুময় মূর্ত্তিটীই স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন। স্পর্শমাত্র চৈতন্যময় মূর্ত্তি অচৈতন্যবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অদ্ভুত-পূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহই এখন ৺নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পূজিত হইতেছেন।

উৎসবাদির সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রায় সমগ্র রাত্রিই কীর্ত্তন হয়। একদলের কীর্ত্তন শেষ হইলে অপর দল আসিয়া কীর্ত্তন করেন। সশিষ্য গোস্বামী-প্রভু তথায় উপস্থিত হইলে, প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ৺রসিক দাসের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার সময়ে করজোড়ে গোস্বামী-প্রভুকে নমস্কার করিয়া কীর্ত্তনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহার মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় যেন কোন এক অভিনব তড়িৎশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তন খুব জমাট বাঁধিয়া উঠিল। গোস্বামী-প্রভু ভাবে বিহ্বল হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিগ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক, "ঐত! ঐত!" বলিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহাতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার ভাব সংক্রামিত হওয়াতে, তাঁহারাও ৺মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী-প্রভু শিষ্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া টোলবাড়ীতে আগমন করিলেন।

এই স্থানে একদিন একটী অপরিচিতা গোয়ালিনী একটী দুধের ভাঁড় হস্তে

করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কিয়ৎকাল গোস্বামী-প্রভু ও তদীয় শিষ্যবর্গের প্রতি নির্ণিমেষ-নয়নে দৃষ্টি করিয়া হঠাৎ বলিতে লাগিলেন—"তোরা সব এখানে কি ক'রে এলি? তোরা ত সব ব্রজের লোক! আমি তোদের জন্যই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।" এই কথা বলিয়া বিক্রয়ের জন্য আনীত সমস্ত দুগ্ধ আদর করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অদ্ভুত গোয়ালিনীর কথা উল্লেখ করিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন—"ইনি একজন উচ্চস্তরের সাধক।"

একদিবস গোস্বামী-প্রভু সশিষ্য নবদ্বীপের প্রসিদ্ধা তপস্বিনী রাইমাতাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী গোস্বামী-প্রভুকে দেখিয়াই ভাবাবেশে করজোড়ে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং "তুই-ই ত মহাপ্রভুকে এনেছিলি, আচণ্ডালে হরিনাম বিলিয়ে জীব উদ্ধার করে'ছিলি"—ইত্যাদি দৈন্যোক্তিকরতঃ কতই আদর করিয়া হাত ধরিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর যাবতীয় বস্তু, এমন কি, তাঁহার গাছপালাটি পর্য্যন্ত একে একে দেখাইতে লাগিলেন!—গোস্বামী-প্রভু যেন তাঁহার কতই পরিচিত, কতই আপনার জন। অতঃপর গৃহে যে কিছু প্রসাদ ছিল, সমস্ত আনিয়া, সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সমস্ত প্রদান করিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি নাই। আরও খাওয়াইতে ইচ্ছা, কিন্তু কি দিবেন খুঁজিয়া পান না। অবশেষে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দোকান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রসগোল্লা ও পানতোয়া আনাইয়া সকলকে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা মাতাজীর এইরূপ আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই ত্রেতাযুগের পঞ্চবটীর শবরীর কথা মনে হইতে লাগিল।

বিদায়ের কালে মাতাজী সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার জন্য করজোড়ে অনুনয়-বিনয় করিলে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগান্তে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। মাতাজী মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য (বরিশাল) গাভানিবাসী স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উচ্ছিষ্ট পাতা উঠাইয়াছেন দেখিয়া, মাতাজী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"উচ্ছিষ্ট পাতা রাখিয়া দাও, নহিলে আমি নিশ্চয়ই এখানে খুন হইব।" ইহাতেও সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইতেছেন না দেখিয়া, মাতাজী গোস্বামী-প্রভুর নিকটে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। অতঃপর গোস্বামী-প্রভুর আদেশে তিনি পাতা রাখিয়া দিলেন। মাতাজী সকলের পাতা হইতে কিছু কিছু ভুক্তাবশিষ্ট সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুগত লোকদিগকে খাইতে দিলেন।

প্রসিদ্ধা রাইমাতার আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে 'হরিসভার' বাড়ীতে নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর নিত্যলীলাব্যঞ্জক

অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি জনৈক দর্শকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা।—"শনিবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রাইমাতার বাড়ী হইতে ফিরিবার সময়ে গোস্বামী-প্রভুর সহিত আমরা হরিসভায় উপস্থিত হইলাম। উহার নাটমন্দিরে ৺মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ঠাকুরের (গোস্বামী-প্রভুর) সহিত কিছু আলাপ করিয়া একটী অপূর্ব্ব তমাল গাছ দেখাইতে তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। তমাল গাছটী এমনভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, দেখিলেই বোধহয় যেন একটী অপূর্ব্ব শ্যামল লতামণ্ডপ প্রস্তুত রহিয়াছে। গাছটী দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহার তলায় যাইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া গাছের সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, এমন সময়ে একস্থানে পদরত্ন মহাশয়ের ২।৩ বৎসরের একটী দৌহিত্রকে দণ্ডায়মান্ দেখিতে পাইয়া ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'এ ত বেশ ছেলে!' আমরা অমনি সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, ঠাকুব সেই ছেলেটীর আপাদমস্তক অতি আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন; আর বালকটী ঠাকুরকে দেখিয়া যেন লজ্জায় অভিভূত হইয়া তাহার চক্ষুদ্বয় এক একবার চাপিয়া ধরিতেছে, আর এক একবার মুখ তুলিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া মধুর হাসিতেছে। এইরূপ দুই তিনবার করার পরে দেখা গেল, বালকটী নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামের মত সর্ব্বশরীরে একটানা একটী শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। ঠাকুর এক একটী করিয়া সমুদয় লক্ষণ আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন—'লোকে যাঁহার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, তিনি যে কোথায় কোন্ গলিতে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না। তিনি সর্ব্বদা গুপ্তভাবে নবদ্বীপে নিত্যলীলা করিতেছেন। তাঁহার নিত্যলীলা কি মিথ্যা হইতে পারে? নবদ্বীপে প্রত্যহ কোনও না কোনও স্থানে তাঁহার নিত্যলীলা হইতেছে। এই বালকের যেরূপ গঠন ও অঙ্গভঙ্গী এরূপ কি কোন বিগ্রহের দেখিয়াছ? যাঁহারা লোক চিনেন, তাঁহারাই ভগবান কোথায় রতি করেন, তাহা জানিতে পারেন। পদরত্ন মহাশয় পণ্ডিত লোক, তাই তিনি ইঁহার মহল্লক্ষণ চিনিতে পারিয়া ইঁহাকে আদর করিয়া থাকেন।' বালকের অশ্রু, কম্প, ঘন ঘন শ্বাস ইত্যাদি শেষ হইতে না হইতেই, তাহার প্রায় সমবয়স্কা পদরত্ন মহাশয়ের পৌত্রীটী অকস্মাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া প্রথমে বালকের একটি হাত ধরিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, পরে দুইটী হাত ধরিল, তৎপরে অতিশয় আদরের সহিত তাহার কোন কোন অঙ্গ চুলকাইয়া দিতে লাগিল, এবং অবশেষে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বালকের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার বামপার্শ্বে প্রেমভরে দাঁড়াইল। তখন নেপাল গোঁসাই (ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র গোস্বামী)—'ইনি আবার কে এইরূপ প্রেম দেখাইতে উদয় হইলেন?'—এই বলিয়া, 'জয় রাধারাণী' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমরা সকলে

অবাক! অতঃপর পদরত্ন মহাশয়ের আদেশে বালকটী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, ঠাকুর বলিলেন—'থাক, নমস্কারের দরকার নাই। তুমি আর কাহাকেও নমস্কার করিও না। তুমি আজ যাহা দেখাইলে তাহাতে ধন্য হইয়া গেলাম।' পরে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা ধন্য হইলে। দোলের দিন ভগবান দয়া ক'রে তোমাদিগকে প্রকৃত দোল দেখাইলেন। তোমাদের অনেক জন্মের সুকৃতিতে আজ ইহা দেখিতে পাইলে।"*

অপর একদিবস ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীনবগৌরাঙ্গ দর্শন করিতে গিয়া, গোস্বামী-প্রভু স্থিরদৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—"চুপ কর, হাঁপাসনে, দেবে, আমি ব'লে দে'ব, সোনার বালা ও নূপুর দেবে।" পরে বলিলেন—"ঐ দেখ ঠাকুর হাঁপাচ্ছেন।" তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, প্রকৃতই শ্রীবিগ্রহের চক্ষুতে পলক পড়িতেছে ও বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে। তাহাতে বক্ষঃস্থল-সংলগ্ন পুষ্পের মালাগুলি পর্য্যন্ত নড়িতেছে।** এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বলাবাহুল্য, অতঃপর ভক্তিভাজন মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় আগ্রহসহকারে শ্রীশ্রী'নব-গৌরাঙ্গ' ঠাকুরকে সোনার বালা ও নূপুর প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আর একদিন গোস্বামী-প্রভু শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুর দর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, সেবকগণ তাঁহার নিকটে 'ভেট' (অর্থাৎ দর্শনী) প্রার্থনা করিলেন। যে কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে, দেশে দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন দান করিয়া হরিনাম উপদেশ করিতেন, আজ তাঁহাদেরই লীলাভুমি ৺নবদ্বীপধামে কপর্দ্দকশূন্য কাঙ্গালগণ দর্শনী ব্যতীত তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারিবেন না, নবদ্বীপবাসীর এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন যে, আঙ্গিনায় প্রণামপূর্ব্বক বিগ্রহ দর্শন না করিয়াই স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবদ্বীপের গঙ্গা পুরাতন নবদ্বীপকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকৃত বসতবাটী কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই বৎসর নবদ্বীপের গঙ্গার অপর পাড়স্থিত মায়াপুর (মেয়াপুর) নিবাসী কতিপয় বৈষ্ণব-পণ্ডিত

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ। ইনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

** গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ। ইনি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রতিপন্ন করিয়া, তথায় শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। মহোৎসবের দিবস ঐ স্থান হইতে কতিপয় লোক গোস্বামী-প্রভুকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আমরা নবদ্বীপকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া অবগত আছি, সুতরাং তাঁহার বসতবাটী অন্বেষণ করিবার জন্য নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কুত্রাপি যাইতে ইচ্ছা করি না।"*

নবদ্বীপের মহামহোৎসবের দিবস উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষগণ সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে তদীয় ভিন্ন বর্ণের শিষ্যদের হইতে পৃথক্ আসন প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আমি উহাদের সহিত এক পংক্তিতেই ভোজন করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যদিগের সহিত একত্রে ভোজনে বসিলেন। ভোজনের সময়ে কথাপ্রসঙ্গে জনৈক নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"আপনার শিষ্যদিগের মধ্যে কীর্ত্তনের সময়ে যেরূপ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ দেখিয়াছি, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তবে, ইহারা মালা-তিলক ধারণ করেন না কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আমার গলদেশে বিস্তর মালা দেখিতে পাইতেছেন না? উঁহাদের মালা তিলকের ভার এবার আমিই গ্রহণ করিয়াছি।" সাধকের অবস্থা অনুসারে মালা তিলক প্রভৃতি চিহ্ন-ধারণের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু গোস্বামী-প্রভু কখনও কোন শিষ্যকে এই সমস্ত বাহ্য চিহ্ন ধারণ বিষয়ে বাধ্য করিতেন না। সাধনের সময়ে যিনি মালা তিলক প্রভৃতির আবশ্যকতা স্বীয় প্রাণে উপলব্ধি করিতেন, তিনি স্ব-ইচ্ছায়, কখনও বা গোস্বামী-প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ করিতেন।

এক দিবস গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের ব্যাদড়া-পাড়া-নিবাসী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুগায়ক স্বর্গীয় রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি, যথাঃ—
"একবার গোস্বামী-প্রভু কৃপা করিয়া অনেকগুলি শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার জন্মভূমি নবদ্বীপের বাড়ীতে উপস্থিত হন। আমি তাঁহাদিগকে হঠাৎ মধ্যাহ্নে এই গরীবের বাড়ীতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া যুগপৎ ভয়ে, আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। কিন্তু জানি না কি প্রভাবে গোস্বামী-প্রভু একটী কথায় আমার ভয় দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি শিষ্যদিগের

* নবদ্বীপনিবাসী এবং হরিসভার স্বত্বাধিকারী পণ্ডিত শিতি-কণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ।

জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, গোঁসাই-প্রভুকে বাড়ীর ভিতর লইয়া বসাইলাম। আমার মাতৃদেবী তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—'রাজকুমারবাবুকে আমি ভাই-এর মত দেখি, সুতরাং আপনি আমার মা, আপনার প্রণাম আমি কি করিয়া গ্রহণ করিব?' মা বলিলেন—'তোমাকে দেখিয়া আমার মহাদেব মনে পড়িয়াছে।' গোঁসাই বলিলেন—'তবে আপনি মহাদেবকে প্রণাম করুন, আমি মাকে প্রণাম করি।' এইরূপে আমার মায়ের সঙ্গে প্রণামের আদানপ্রদান হইল। পরে আমি গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"একবার রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কীর্ত্তনের পর আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক।' কিন্তু এত আমাদের বিবাহের মন্ত্র। যাহা হউক, আপনার শ্রীমুখ হইতে যখন এত বড় একটী উচ্চ কথা বাহির হইয়াছিল, তখন আমার হৃদয়ের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া আপনার চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। অতএব আপনি আমাকে এমন একটী উপদেশ দিন যাহাতে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও আমার কলুষিত চিত্ত ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে। কিন্তু খুব সহজভাবে শুভঙ্করীর রকমের উপদেশ না দিলে আমার দ্বারা তাহা প্রতিপালিত হইবে না। পরে আমি উপযুক্ত হইলে আমাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।" গোঁসাই-প্রভু হাসিয়া বলিলেন 'আপনাকে সেইরূপ একটী উপদেশ দিতেছি। ইহা সহজও বটে, শক্তও বটে। সহজ বলিতেছি এইজন্য যে ইহা অতি অল্পায়াসসাধ্য, এবং শক্ত এইজন্য যে ইহা সকলেই জানে অথচ কেহই ধরিতে পারে না। আপনি ওঁকারের অর্থ সাধন করুন। ওঁকারের অর্থ অ, উ, ম, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন আছে, আবার পরে থাকিবে না। ছিল না, আছে, থাকিবে না—এই অর্থ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা ইত্যাদি যাহা কিছু চক্ষে পড়িবে সেই সমস্ত পদার্থেই আরোপ করুন। ইহা ছিল না, ইহা আছে, ইহা থাকিবে না—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার আর এক চক্ষু খুলে যা'বে। তখন আপনি আপনার ঠাকুরঘর (হৃদয়মন্দির) যে সকল 'থাকে না' অর্থাৎ অস্থায়ী পদার্থের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, উহারা ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে থাকিবে; কেন না, 'ছিল না—আছে—থাকে না' জিনিষের প্রতি মমতা থাকে না। আর মমতা না থাকিলে সে জিনিষ আর হৃদয়ে স্থান পায় না। ক্রমে এই সাধনে আপনি যতই সিদ্ধিলাভ করিবেন, ততই দেখিবেন যে আপনার হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িতেছে। তখন স্বতঃই আপনার একটী অভাব-জ্ঞান আসিবে এবং এই সময়ে আপনি মনে করিবেন যে, আমি এযাবৎ কতকগুলি 'থাকে না' জিনিষ লইয়া বেশ মুগ্ধ হইয়া ছিলাম, এ যে আমার সব গেল! এই সময়ে আপনার কোন 'থাকে' (চিরস্থায়ী) জিনিষের জন্য একটী তীব্র ব্যাকুলতা আসিবে, এবং

সেই সময়ে আপনার দীক্ষা গ্রহণের সময় উপস্থিত হইবে। অতএব আপনি ওঁকার মন্ত্রের সাধন দ্বারা ঠাকুরঘরের আবর্জ্জনা সকল দূর করিতে থাকুন।"

নবদ্বীপে উৎসবান্তে গোস্বামী-প্রভু গঙ্গাপথে শান্তিপুর গমন করেন। উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শান্তিপুরবাসী সজ্জনগণ তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার তাঁহারা গোস্বামী-প্রভুকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনিও শান্তিপুরবাসী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-সন্তানদিগের বংশমর্য্যাদা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বহস্তে মাতৃস্থানীয়া কতিপয় স্ত্রীলোকের চরণ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে একবার শান্তিপুরবাসিগণ গোস্বামী-প্রভুকে অগ্রণীকরতঃ চৌদ্দ মাদলের কীর্ত্তন লইয়া অদ্বৈত-প্রভুর ভজনস্থল 'বাবলায়' উপনীত হইয়া সমারোহের সহিত তথায় একটি মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এই স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন এবং সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এইস্থান সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কেহ কেহ এই স্থানে সুমধুর কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিতে পান বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গোস্বামী-প্রভুর কতিপয় শিষ্য এই স্থানে অপ্রাকৃত কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কীর্ত্তন সম্বন্ধে একদিন গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন—"এ কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। ছেলেবেলায় প্রায়ই আমি বাবলায় আসিয়া এই কীর্ত্তন শুনিয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে ছুটাছুটী করিতাম। এইস্থানে একটু স্থির হইয়া বসিয়া নাম করিলেই স্থানের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়।" পরবর্ত্তীকালে যখন এতদ্দেশে সবেমাত্র দুই একটী 'ফনোগ্রাফ' আসিয়াছে, তখন একদিবস 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোপালগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (ইঁহারা দুইজনেই গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য) একটী ফনোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে ঐ যন্ত্রধৃত গান শ্রবণ করান। গান শুনিয়া গোস্বামী-প্রভু যন্ত্রের আবিষ্কারককে অত্যন্ত প্রসংশা করিলেন, এবং বাবলার পূর্ব্বোক্ত অপ্রাকৃত সংকীর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিলেন—"ভগবানের রাজ্যে তিনি এমন সকল কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন যে, মানুষের সাধ্য কি যে কেহ কিছু গোপন করিবে। মানুষে ভালমন্দ যাহা কিছু বলে, করে, প্রকৃতিতে সমস্তেরই ছাপ পড়িয়া যায়, এবং কার্য-কারণের সংযোগ হইলেই তাহা পুনরায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বাবলাতে সপার্ষদ মহাপ্রভু যে কীর্ত্তন করিতেন, তাহার ধ্বনি প্রকৃতিতে রহিয়া গিয়াছে; এবং কার্য্য-কারণের সংযোগ হইলেই তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র।"

বহুদিন হইল শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর স্বপ্নাদেশে বালেশ্বরবাসী জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব এইস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ

স্থাপনপূর্ব্বক সেবা-পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি গোস্বামী-প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমৎ সীতানাথ গোস্বামী-মহাশয়ের উপর এই স্থানের সেবা-পূজার ভার অর্পিত হইয়াছে।

এক সময়ে গোস্বামী-প্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের প্রকৃত ভজনস্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে, শান্তিপুরবাসী প্রভুপাদ জগদ্বন্ধু গোস্বামী ও শ্রীযুত কালীভূষণ ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বাবলাতে গমন করেন। যাইবার সময়ে গৃহপালিত একটী কুকুর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। পথিমধ্যে অপরাপর কুকুর ইহাকে দংশন করিতে পারে—এই আশঙ্কা করিয়া প্রভুপাদ জগদ্বন্ধু দুই তিন বার কুকুরটীকে বাটী ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে গোস্বামী-প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে কুকুরটীকে সঙ্গে লওয়া হইল। বাবলায় উপনীত হইয়া গোস্বামী-প্রভু সহচরদিগের সঙ্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত কুকুরটী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান পদনখ দ্বারা আঁচাড়াইতে আঁচড়াইতে পুনঃ পুনঃ 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ কুকুরটীর এবম্প্রকার আচরণ দর্শন করিয়া গোস্বামী-প্রভু ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে স্থানটী খনন করা মাত্রই অল্প মৃত্তিকার নীচে একখণ্ড কাষ্ঠ পাদুকা ও একটী পঞ্চপাত্রের সহিত একটি পিত্তলের হাঁড়ী সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল; দ্রব্যগুলি দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"এই সমস্তই শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর ব্যবহার্য্য জিনিষ, বহু সৌভাগ্যে অদ্য ইহা আবিষ্কৃত হইল।"* পূর্ব্বোক্ত কুকুরটীর এই প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত সকলে বিমুগ্ধ হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর নিদর্শন-চিহ্নগুলি স্থানীয় মন্দিরের সেবায়েতের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া, গোস্বামী-প্রভু সঙ্গীয় লোকসহ স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই কুকুরটি সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু একদিন বলিলেন—"এ পূর্ব্বজন্মে সাধক ছিল, ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইবে।" এই কথা বলিয়াছেন, এমন সময়ে কুকুরটী নিকটে আগমন করিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"আর কেন? বেশী দিন থাকিলে কষ্ট হ'বে, এখন দেহ ছাড়িয়া দাও।" তাহার পরদিবস লোকে গঙ্গায় গিয়া দেখে যে, উক্ত কুকুরের শব গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ জলের ভিতরে ও অপরার্দ্ধ তীরের উপর পতিত আছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শান্তিপুরবাসিগণ গোস্বামী-প্রভুর অলৌকিক প্রভাব অনুভব করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।†

---

* শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত কালীভূষণ ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ।

† শান্তিপুরবাসী প্রভুপাদ সীতানাথ গোস্বামী-প্রদত্ত বিবরণ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় অবস্থান, শ্রীবৃন্দাবন গমন, গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ধুলট উৎসব।

শান্তিপুর হইতে কলিকাতা আগমনপূর্ব্বক পুনরায় গোস্বামী-প্রভু কয়েক মাস সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ শ্রদ্ধাস্পদ রাখালবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমসখী কঠিন জ্বররোগে দেহত্যাগ করেন। রোগীর যখন আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, গোস্বামী-প্রভু তখন দৈনন্দিন নিয়মিত পাঠাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। গৃহে কান্নার রোল পড়িল, তাঁহার পাঠও চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ধীরে ধীরে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গোস্বামী-প্রভু নৃত্য করিতে করিতে প্রেমসখীর মস্তকে দক্ষিণ চরণ স্থাপন করিয়া কিয়ৎ-কাল চক্ষু মুদ্রিতকরতঃ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী প্রেম-সখীর পবিত্রাত্মা মরদেহ ত্যাগ করিয়া গুরু-কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মধুর লীলায় প্রবেশ করিলেন।

শ্রীমতী প্রেমসখীর অন্তিমকালে গোস্বামী-প্রভুকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তদীয় স্নেহশীলা শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, তোমাতে দয়া-মায়ার লেশ মাত্র নাই। মেয়েটা ম'রে যা'চ্ছে, আর তুমি কিনা নাচছ? এই কি তোমার আনন্দ কর্‌বার সময়?" উত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলাম শ্রীমতীর প্রসূতি (যোগমায়া ঠাকুরাণী) সহ শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলার সহচরীগণ প্রকাশিত হইয়া শ্রীমতীকে ক্রোড়ে গ্রহণ-পূর্ব্বক কতই আদর করিয়া মুখ চুম্বন করিতে করিতে নিত্য-ধামে লইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া আমি হাসিব, না কাঁদিব।" কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে অবস্থানকালে যে গোস্বামী-প্রভু তদীয় প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সন্তোষিণীর মৃত্যু-জনিত শোকে অভিভূত হইয়া 'শোকোপহার' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিনিই আজ কনিষ্ঠা কন্যার পরলোকগমনের সময়ে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বস্তুতঃ সাধনে পূর্ণকাম হইলে, সাধক সর্ব্বনিয়ন্তা, অনন্ত মঙ্গলের আধারস্বরূপ, আনন্দ লীলাময়ের মঙ্গল-হাত ও লীলা-মাধুর্য্য সন্দর্শন করিয়া কিরূপ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন, এই ঘটনা তাহারই একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ গোস্বামী-প্রভুর কুলাধিদেবতা

৺শ্যামসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ অঙ্গহীন হইলে অপর একটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া শান্তিপুর প্রেরণ করেন। যে প্রস্তরখণ্ডের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত ছিল, তাহাতে গোস্বামী-প্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি-ভ্রাতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী-মহাশয়ের নাম ও তন্নিম্নে তাঁহার নিজের নাম খোদাইয়া আনা হইয়াছিল। এই বিগ্রহই এখন শান্তিপুরে ৺শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরবর্ত্তীকালে গোস্বামী-প্রভু অনেক সময়ে এই শ্যামসুন্দরের অশেষ কৃপা সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কথা বলিতেন। একদিন বলিলেন—"৺শ্যামসুন্দর বাল্যকাল হইতেই আমাকে বড় কৃপা করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্ম অবস্থায়, 'আজ পূজারী জল দেয় নাই' বলিয়া জল চাহিতেন। গুপ্ত স্থানে রক্ষিত টাকার সন্ধান বলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঁশী ও চূড়া চাহিতেন। উপাসনাকালে হঠাৎ সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলত" বলিয়া কৌতুক করিতেন। আমি কত বলিতাম—"আমি এই সব বিশ্বাস করি না, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু শ্যামসুন্দর ছাড়েন কি?" পরে একদিন শ্যামসুন্দর প্রকাশিত হইলে বলিলাম—"শ্যামসুন্দর, তোমার মনে যদি এই ছিল, তবে আর ব্রাহ্মসমাজে নিয়াছিলে কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আরে যা, আমিই তোকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়েছিলাম, আবার আমিই তোকে ফিরাইয়া আনিয়াছি, ভাঙ্গিয়া গড়িলে কিরূপ সুন্দর হয় জানিস?—ইত্যাদি।"*

শ্রদ্ধেয় রাখালবাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামী-প্রভু শ্যামবাজার কম্বলীটোলাস্থিত একটী বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এইস্থানে মাহাত্মা অর্জ্জুনদাস বা ক্ষ্যাপাচাঁদ গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রয়াগধামে কুম্ভমেলাতে গোস্বামী-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, অর্জ্জুনদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পদব্রজে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ নবদ্বীপধামে গিয়া বহু লোকের নিকটে, "গৌর নাচা" বাবাজীর (গোস্বামী-প্রভুর) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভুর প্রকৃত নাম ভুলিয়া যাওয়াতে বাবাজী মহাশয় উক্ত নামেই তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু, কেহই তাঁহাকে "গৌর-নাচা" বাবার সংবাদ দিতে পারে নাই। পরে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানে কলিকাতায় আগমন করেন। ভগবদিচ্ছায় গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য ও জামাতা শ্রীযুক্ত বাণীতোষ বাগচী মহাশয়ের সঙ্গে পথিমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বাণীবাবু তাঁহাকে কম্বলীটোলাতে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত করেন। প্রথম সাক্ষাৎ হইবার পর উভয় উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার ভাবের উত্তাল তরঙ্গ

* গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বসু, বি. এল. মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ কতিপয় দিবস গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছিলেন। শেষ রাত্রিতে গোস্বামী-প্রভুর সহিত একত্র হইয়া বাবাজী মহাশয় যখন ভগবানের গুণগান করিতেন, তখন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত পাষণ্ডের প্রাণও দ্রবীভূত হইত। উভয়ে যখন ভাবাবেশে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন এক অনির্ব্বচনীয় অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া উপস্থিত সকলকে অভিভূত করিত। গানটী এই—

পিলু—পোস্তা।

চল ভাই ভার নিয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে।
দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে ভার কেবা র'বে॥
পাপে হ'য়েছি ভারী, আর ত ভার সইতে নারি,
বিনা সেই ভূ-ভারহারী, সে বিনে ভার আর কে ব'বে।
দিয়ে ভার নিয়ে শরণ, বলব দুটী ধ'রে চরণ,
এবার যেমন বইলেম ভার, এমন ভার আর দিও না ভবে॥

বাবাজী মহাশয় এক দিবস গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"গোসাইজী, হাম তুমহারা হোগিয়া।" সম্ভবতঃ ইহারই পূর্ব্ব-রাত্রে আশ্রমস্থ সকলের অজ্ঞাতে তিনি গোস্বামী-প্রভুর নিকটে, মুক্তির পরের অবস্থা পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম-ভক্তি আরম্ভ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই দেব-দুর্লভ বস্তু লাভ করিবার জন্য তিনি প্রয়াগধামে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে অনেক দিন অনেক সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তথায় এক দিন রাত্রি অনুমান দুই ঘটিকার সময় তিনি গোস্বামী-প্রভুর নিকটে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, 'আহা! মেরা রামজী হো! তুহার লিয়ে হাম ত্রেতাযুগসে পড়া রহা হায়, তিন যুগ হামারা গুজাড় গিয়া। আবতো কৃপা করকে তু হামকো সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া। আব হামকো কৃপা কর। আব হামকো তোহার করু লে।" অর্থাৎ—"হে আমার রামজী, তোর জন্য আমি ত্রেতাযুগ হইতে পড়িয়া আছি। আমার তিন যুগ বৃথাই চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে তুই আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলি। এখন আমাকে কৃপা কর, আমাকে তোর করে নে।" ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র বন গমনকালে যখন দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেই স্থানের ঋষিগণও তাঁহার নিকটে এই বস্তু লাভের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই কৃপায় তাঁহারা দ্বাপর যুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে সেই বস্তু লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের উল্লেখ একস্থানে করা হইয়াছে। মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় অবস্থান-কালে ইহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন—"ইঁনি ত্রিকালজ্ঞ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ। ইঁনি আপন ইচ্ছানুসারে সশরীরে

ব্যোমমার্গে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারেন। শুধু নিজে পারেন তা নয়, আর দুইটী লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন, কাশী, দ্বারকা, রামেশ্বর, সেতুবন্ধ, পুরী প্রভৃতি স্থানে ঘুরায়ে এনেছেন ইত্যাদি।" এই দুইটী বিষয় হইতেই স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি, যাহা ব্রজলীলায় প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা কত উচ্চস্তরের জিনিষ এবং কিরূপ দেবদুর্ল্লভ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকে শিখরিণীর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মরিচ (গোল মরিচ) ও কর্পূর উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিলে একপ্রকার অতি উপাদেয় ঠাণ্ডা পানীয় প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরমের সময় ইহা পান করিলে সমস্ত শরীর মন শীতল হইয়া যায়। ইহাকে শিখরিণী বলে। নিদাঘ-তপ্ত শরীর মন যেমন শিখরিণীর দ্বারা স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তাপত্রয় দ্বারা দগ্ধীভূত জীবাত্মাও জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে ভগবানের প্রেমরস অর্থাৎ পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমভক্তি দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রশান্ত, স্নিগ্ধ ও শীতল হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ঈশিত্ব, বশিত্ব ইত্যাদি কোন প্রকার যোগৈশ্বর্য্যই উক্ত ত্রিতাপের মূল উৎপাটন করিয়া পরাশান্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"এ কি বলেন? আমিই আপনার।" মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ বলিলেন—"নেহি, হামরা বাত শুন, হাম তুমহারা মাফি জটা রাখেঙ্গে, মালা তিলক ধারণ করেঙ্গে; আউর সব দেশমে এছা বাত হাজির করঙ্গে কি, নবদ্বীপমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হুয়ে হায়, উনকো ভজন করো।" গোস্বামী-প্রভু তাঁহার এইরূপ কথা শুনিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক দিবস সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের কালে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য এবং মূক-বধির বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রদ্ধেয় রেবতীমোহন সেন প্রমুখ শিষ্যবৃন্দ গান ধরিলেন—

কীর্ত্তনের সুর।

ভাবাবেশে গৌর এসে নদীয়ায়।
হরিগুণ গায়, প্রেমেতে মাতায়,
(তাঁর) পাছে পাছে নিত্যানন্দ প্রেমের ভাণ্ড লইয়া যায়।
গদাধর অদ্বৈত সঙ্গে, সংকীর্ত্তন রসরঙ্গে,
নাচে গোরা প্রেমতরঙ্গে (নদে) ভেসে যায়, ওকি শোভা পায়।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করে, নাচে গোরা হায় মরি হায়।
আনিয়া গোলোকের ধন, নিতাই কল্লেন্ প্রেম বিতরণ,
ঘরে ঘরে প্রেম বরিষণ চেতন দেয়, অবধূত রায়।
(তোরা) কে নিবি কে নিবি বলে, বাহু তুলে নেচে বেড়ায়।

(গৌর নিতাই, দয়াল নিতাই)
(নিতাই) যারে দেখে আপন কাছে, ঘন ঘন তারে পুছে,
আর কি পতিত আছে এ ধরায়, হরি বলে ধায়,
জেতের বিচার নাহি ক'রে, যারে তারে প্রেম দি'য়ে যায়।
(দয়াল নিতাই)
সংকীর্ত্তন কোলাহল, শুনে কুলবধূ এল, কুলমান ভাসা'য়ে
দিল গোরার পায়, ত্যজে লাজ ভয়,
অধীন রা'য়ে ভেবে বলে, অন্তে দেখা দিও আমায়।

এই গান ধরিবামাত্রই কীর্ত্তনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। গোস্বামী-প্রভু, "জয় শচীনন্দন" "জয় শচীনন্দন" ধ্বনিতে দশদিক প্রকম্পিত করিয়া স্বীয় আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক দু'বাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ উন্মাদের ন্যায় কখনও লম্ফন, কখনও ছুটা-ছুটি, আর কখনও বা হাত ঘুরাইয়া গোস্বামী-প্রভুকে আরতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের ভাব উপস্থিত ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে এক মহাভাবের উত্তাল তরঙ্গ সমুত্থিত করিল। উহার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হইয়া কেহ কেহ ধরাশায়ী হইলেন, বহু লোক দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পদভরে সমগ্র গৃহটী কম্পিত হইতে লাগিল। আগন্তুক দর্শকবৃন্দ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে ঐ সকল দর্শন করিতে লাগিল। ঐ দিনের কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত ভক্তবৃন্দের নৃত্য-কালীন পদভরে গৃহটী এতদূর কম্পিত হইয়াছিল যে, পরদিবস গৃহস্বামী গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া, পুনরায় দ্বিতলে কীর্ত্তন না করিয়া একতলায় কীর্ত্তন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য (বরিশাল) বাইসারী-নিবাসী সুগায়ক স্বর্গীয় প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর নিকটে যখন নিম্নলিখিত গানটী গাইতেন, তখন গোস্বামী-প্রভুর সহিত উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ব্রজের ভাবে বিভোর হইয়া মহাপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন। গানটী এই—

মিশ্র রাগিণী—তাল তেওট।

(ওমা) নন্দরাণী, বনেতে দেখলেম অপূর্ব্ব লীলে।
দেখ্‌লেম দশভুজা এক রমণী কানাই ভাইকে নিলে কোলে।
(মা তোর কানাই বুঝি মানুষ নয়, মানুষ নয়)
করিতে গোষ্ঠের খেলা কানাইর সনে, সব রাখাল
মিলে, আমরা দেখে এলেম সকলে,
সিংহ-পৃষ্ঠে দশভুজা, ঐরাবতে এল ইন্দ্র রাজা,
সবাই করে কৃষ্ণপূজা, মা তোর কৃষ্ণধনের নাম বলে।

আমরা সকলেতে, দেখ্‌লেম সাক্ষাতে
কৃষ্ণের জন্মাবধি স্বচক্ষেতে দেখি নাই আর এমন লীলে।
এল আরও একজন, বৃষবাহন, ভস্মমাখা গায়,
মুখে ববম্‌ ববম্‌ গাল বাজায়।
কৃষ্ণরূপ নিরখিয়ে, ধূলাতে লুণ্ঠিত হ'য়ে,
করজোড়ে প্রণাম করে, মা তোর প্রাণ-গোপালের রাঙ্গা পায়।
মকরবাহন, এলো আরও একজন,
মা তোর প্রাণ-গোপালের যুগল চরণ মস্তকে ধারণ করিলে।
মা তোর কানাইকে মানুষ বলে, কানাই মানুষ নয়,
বনে দে'খে হ'য়েছি বিস্ময়।
চতুরানন হংস-পরে, কানাই চরণ পূজা করে,
নারদ ঋষি বীণা যন্ত্রে, মা তোর প্রাণ-গোপালের গুণ গায়।
দুই বাহু তুলে, সবাই হরি বলে, আর কেউ
কানাই চরণ পূজা করে সচন্দন তুলসী-দলে।

এই স্থানে অবস্থানকালে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ লোক চক্রান্ত করিয়া সন্দেশের সহিত হলাহল মিশ্রিতকরতঃ গোস্বামী-প্রভুকে আহার করাইয়াছিল; কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় ও মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের যোগ-প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় এ যাত্রায় তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কম্বলীটোলা হইতে গোস্বামী-প্রভু পটলডাঙ্গা সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ১৪।২ নং ভবনে আসিয়া দীর্ঘকাল বাস করেন। তাঁহার আশ্রমে পাঠ পূজা কীর্ত্তনাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসকল প্রত্যহ যেভাবে সম্পন্ন হইত, তাহার উল্লেখ এক স্থানে করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আশ্রমে প্রায় সর্ব্বদাই শিষ্যদিগের কেহ কেহ স্বতন্ত্রভাবে ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ করিতেন, কেহ হোম করিতেন, কেহবা ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। এইভাবে দিবানিশি একটী প্রবল ধর্ম্মের স্রোত আশ্রমের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। এই স্থানে একদিন কতিপয় শিষ্যের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইলে গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে নিম্নলিখিত আশ্রমের নিয়মাবলী লিখিয়া নীচের তালায় সাধারণের বসিবার ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—

"শ্রীশ্রীহরি সহায়।

সবিনয় নিবেদনমিদং,

এই আশ্রমে যাহারা বাস করিবেন এবং দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমি বিনীত নিবেদন করিতেছি—এই আশ্রমে কেহ পর-নিন্দা, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বিবাদ-বিসম্বাদ করিবেন না। অপিচ কাহারও সম্বন্ধে কোন বলিতে হইলে তাহার সাক্ষাতে বলিবেন, নতুবা পরস্পরের মধ্যে

অসম্ভাব হইতে পারে। মনুষ্য-জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী, বৃথা আলাপে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এইজন্য সকলের চরণে নিবেদন করিলাম।

নিবেদক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

এই স্থানে অবস্থানকালে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় বেণীমাধব দে প্রভৃতি গোস্বামী-প্রভুর নিকটে করতালসংযোগে সাধারণতঃ যে সকল ভজন গান করিতেন, তম্মধ্য হইতে তিনটী মাত্র গান নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

১। রাগিণী ভৈরো—ঠুংরি।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ গাওরে।
গাও শ্রীমধুসূদন, যশোদানন্দন, কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ প্রাণারামে ॥

২। ললিত—ঠুংরি।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।
তব গুণ কথনে, শ্রবণ মননে, সব শোকতাপ হরে ॥
গায় ঋষিগণ তন্নাম অবিরাম, হে পরমেশ, প্রাণেশ প্রাণারামে
অনুদিন যোগভরে।
কিবা তব নাম, প্রেম-নিরঞ্জন, যোগী তপোধন, ধ্যান করে,
সুধাগন্ধে অন্ধ ভক্ত-অলিবৃন্দ, (তব) পদারবিন্দে বাস করে ;
ও পদ সেবনে দর্শনে স্পর্শনে (কত) মহাপাতকী তরে ॥

৩। ললিত বিভাষ—একতালা।

রাই জাগো, রাধে জাগো, শুক-সারী বোলে।
বৃন্দাবনমে, কুসুমিত কাননে, ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে ॥
তমালকি ডালে পিক কুহরতু, পাপিয়া ছোরতহু তানে।
কদমকি মূলে গোচারণ-চ্ছলে, কানুয়া তুয়া লাগি ধাওয়ে ॥

এই স্থানে সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের সময় প্রায়ই কোকিল-কণ্ঠ সুগায়ক শ্রদ্ধেয় রেবতী-মোহন সেন মহাশয় অগ্রণী হইয়া কীর্ত্তন করিতেন, এবং স্বর্গীয় বেণীমাধব দে, শ্রীযুক্ত সরলানাথ গুহ, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার মিত্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ কীর্ত্তনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। কীর্ত্তনে কোন কোন দিন যেরূপ অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইত তাহা বর্ণনাতীত। তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তপটে তাহা চিরকালের তরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কীর্ত্তনান্তে গোস্বামী-প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী আবৃত্তি করিয়া লুট বিতরণ করিতেন। শ্লোক যথা ঃ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥

কীর্ত্তনের পর কোন কোন দিন গোস্বামী-প্রভু যখন কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত স্বরে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী একাধারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার গভীরতা, মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইত। গান যথা—

ললিত বিভাষ—একতালা

এমন দয়াল ভাই আর নাই, গৌর-নিতাই দু'ভাই ভিন্ন।
কলিযুগে, জীবের লেগে, হ'লেন নদে অবতীর্ণ,
বলিহারি যাই রে, জীবের ভয় আর নাই অন্য।
শ্রীচৈতন্যরূপের কি লাবণ্য, জিনি জাম্বুনদ স্বর্ণ, অভিন্ন
চৈতন্য নিত্যানন্দ বলরাম ধন্য ;
এই যে নিমাই, ব্রজের কানাই, শচী-রত্ন-গর্ভ-রত্ন,
শ্যামরূপ ঢাকা, রাইরূপ মাখা, নয়ন বাঁকা আছে চিহ্ন।
পুষ্পবন্ত যুগে সদয়, চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয়, কিরণে সমুদয়
চিত্তসন্দ তমোশূন্য ;
আচণ্ডালে, করি' কোলে, অশ্রুজলে নিতাই মগ্ন,
প্রেমে নাচে, প্রেমধন যাচে, নাহি বাছে কোন বর্ণ ॥

এই গান করিতে করিতে গোস্বামী-প্রভু নিজে নয়নজলে ভাসিতেন ও অপরকেও ভাসাইতেন। আবার কখনও কখনও তিনি আপন মনে গান করিতেন,—

মুলতান মিশ্র—আড়খেমটা।

(গৌর) তোর লাগি কাঙ্গাল হ'য়ে আমার এ যন্ত্রণা।
কেউ সুধায় না, কেউ সুধায় না'রে, আমায় কাঙ্গাল ব'লে সবে করে ঘৃণা ॥
কাঙ্গালের দোষ পদে পদে, সে রহে না কোন বিসম্বাদে,
তবু তারে ফেলাও বিপদে ;
(গৌর) তোর নামের কি এমনি ধারা, নাম নিলে হই পাগলপারা,
যে জন গৌর ব'লে ডাকে, তারে ফেলাও পাকে, আমি বুঝতে
নারি, এ তোর কি মন্ত্রণা ॥
যে জন গৌর তোর অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত, এ তো
তোমার না হয় উচিত ;
(গৌর) তুমি সুখে বা দুঃখেতে রাখো, আমি তোমায় ছাড়বো নাকো,
খেদে উত্তমচাঁদ বলে, গৃহে বা জঙ্গলে, সদা গৌর ব'লে ডাকি এই বাসনা ॥

তাঁহার শ্রীমুখে করুণ-রসপূর্ণ এই গান শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীর কেহ কেহ সাধকজীবনের কঠোর পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া চিন্তান্বিত হইতেন, আবার কেহ কেহ বা ভক্ত সাধকের এই মর্ম্ম-গাথার অন্তর্নিহিত অহৈতুকী প্রেম-কাহিনীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন।

একদিন শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে ব্রাহ্ম-সমাজের গান ধরিলেন—

আমার মন পাগ্‌লা রে, হরদমে আল্লাজীর নাম লইও।
দমে দমে লইও নাম, কামাই নাহি দিও॥—ইত্যাদি

যখন এই গান হইতেছিল তখন মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ মহাবীরের আবেশে "দেশ সব ম্লেচ্ছাচারী হোগিয়া, ভ্রষ্ট হোগিয়া"—ইত্যাদি বাক্য সতেজে উচ্চারণ-পূর্ব্বক যষ্টিহস্তে নানাপ্রকার ভীতিজনক হাবভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক একবার গৃহের বারান্দায় যাইতে লাগিলেন, পুনরায় এক লাফে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত ভাব দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু, "মহাবীর! স্থির হউন", "মহাবীর! স্থির, হউন"—ইত্যাদি স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রশান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অকস্মাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ চলিয়া গেলে পর শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবু গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উনি (ক্ষ্যাপাচাঁদ) কি রাগ করিয়া গেলেন?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"না, তোমাদের উপরে কিছু নয়, দেখ্‌চোনা যে উনি হাওয়ার সঙ্গে লড়াই কচ্ছিলেন।"

মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একদিন গোস্বামী-প্রভুকে চুপে চুপে হিন্দি ভাষায় বলিলেন—"গোঁসাইজী, আমি ৫২ প্রকার কল্পসাধন জানি। আপনার অনুমতি হইলে আপনার শরীরের সমস্ত পরমাণু পরিবর্ত্তন করিয়া আপনাকে একেবারে নীরোগ করিয়া দিতে পারি।" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"মহারাজ, ইহাতে কি আমার প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হইবে?" মহাত্মা ক্ষ্যাপাচাঁদ উত্তর করিলেন—"মহারাজ, সো বাত হাম কহেনে নেহি শক্তে হে।" তখন গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"তবে আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উহাতে প্রয়োজন নাই?" এই প্রারব্ধ কর্ম্ম দূর করিবার অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে একদা গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও একটী সাময়িক আনন্দের স্রোত খুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট করিতে একমাত্র সদ্‌গুরু ভিন্ন অপর কেহ অধিকারী নহেন।"

এই স্থানে এক দিবস অবসরপ্রাপ্ত বিলাতপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী সত্যানুরাগী ৺পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। ইনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালে একটী ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদিন তাঁহার শয়নকক্ষে একটী হিন্দুদেবীর (ভুবনেশ্বরীর) প্রকাশ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। অপর একদিন তিনটী মহাপুরুষ তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হন। উঁহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায়—'Go back to India' বলিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি কলিকাতায় আসিয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, তিনি যে তিন জন মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনিও (গোস্বামী-প্রভুও) একজন, অপর দুই জন মহাপুরুষের দর্শন তিনি কোথায় গেলে পাইতে পারেন। গোস্বামী-প্রভু হরিদ্বারের নাম উল্লেখ করিলেন। ইহার পর শ্রদ্ধেয় পার্ব্বতীবাবু হরিদ্বার যাইয়া তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক পুনরায় গোস্বামী-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকরতঃ হরিদ্বারের ঘটনা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বিদায়ের কালে অতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"গোঁসাই, এ দেহে আর কিছুই হইতে পারে না; অনেক কদাচার করিয়া, অখাদ্য খাইয়া দেহ-মন অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছি। দেবতা ও মহাপুরুষদিগের কৃপায় এবারে যাহা হইল, আমার মত ভ্রষ্টাচারী নাস্তিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি পুনরায় বিলাতেই যাইব স্থির করিয়াছি।" অতঃপর তিনি বিলাতে গিয়া 'From Hinduism back to Hinduism' (হিন্দুধর্ম্ম হইতে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন) নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। উহা পাঠ করিলে নিতান্ত নাস্তিকের মনেও আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রদ্ধেয় পার্ব্বতী-বাবু বাল্যকাল হইতেই অতীব অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। গোস্বামী-প্রভু গেণ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে এক সময়ে তিনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"গোঁসাই, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নাই, আর কাহারও কথায় আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারি না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি ঠিক করিয়া বল তো ভগবান্ আছেন কিনা?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"হাঁ, তিনি আছেন।" পার্ব্বতীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁহাকে কি দেখা যায়?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"হাঁ, দেখা যায়।" পুনরায় পার্ব্বতীবাবু প্রশ্ন করিলেন—"তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"হাঁ, দেখিয়াছি।" গোস্বামী-প্রভুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া তিনি যেন আশ্বস্ত হইলেন।

একদিন জনৈক ব্রাহ্ম গোস্বামী-প্রভুকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি না কি রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বিগ্রহ মানেন? তাঁহাদের নিকটে প্রণাম করেন এবং ঈশ্বর

সাকার এই কথা বিশ্বাস করেন? আমার কিন্তু আপনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিক এ সকল কথা সত্য কিনা, তাহা আপনার মুখে শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছি।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক তিনবার 'শ্রীবিষ্ণু' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"আজ আপনি আমার আশ্রমটী অপবিত্র করিলেন। আপনি জানেন পরের মুখে ঝাল খাইয়া আমি কখনও কোন কথা বিশ্বাস করি নাই। যখন যে সত্যটী প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছি, তখন তাহাই ধরিয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি। যে মুখে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়াছি, সেই মুখেই ঈশ্বর সাকার বলিতেছি। তাঁহার রূপ অবাঙ্মনসোগোচর। তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। তাঁহার মুখ, হস্ত, পদ ইত্যাদি সকলই আছে, তবে তাহা জড়ীয় নহে। সত্য সত্যই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, আস্বাদন করা যায়। শুধু তাহাকে দর্শন করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, তাঁহার দুই হাত দুই পা টিপে দেখেছি। বাস্তবিক তাঁহার দুই হাত দুই পা আছে। তাঁহার অপরূপ রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছি, আর আপনাকে কত বল্‌বো? আমাকে এই প্রকার প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি।" এই বলিয়া গোস্বামী-প্রভু ধ্যানস্থ হইলেন। লোকটী কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।*

এই স্থানে গোস্বামী-প্রভুর গুরুভ্রাতা মহাত্মা সা-সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে আগমন করেন। প্রয়াগের কুম্ভমেলা হইতে কলিকাতায় আগমনকালে ইনিই সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে রেলষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করাইয়া দিয়া ট্রেণ-সংঘর্ষণ-জনিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইদানীং দৈবদুর্ব্বিপাকে ইঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যোগৈশ্বর্য্য দেখাইয়া কলিকাতার কয়েকটী ধনী লোককে বশীভূতকরতঃ ইনি নানাবিধ ভোগ-বিলাস উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে অতিশয় সমাদরপূর্ব্বক স্বীয় আসনের পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে বসাইয়া অনেক সদালাপ করিবার পর তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। অতঃপর গোস্বামী-প্রভু একদিন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার আলয়ে গমন করেন এবং তৎপ্রদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রার্থনা করিলেন। সা-সাহেব একখণ্ড মিশ্রি কামড়াইয়া খাইয়া নিঃসঙ্কোচে অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভু তৎক্ষণাৎ তাহা আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিলেন। কিয়ৎকাল সদালাপের পর গোস্বামী-প্রভু হঠাৎ তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ অকস্মাৎ পাদস্পর্শ

---

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ। ইনি ঘটনার স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

করিতে দেখিয়া গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হইল। পথে আসিবার সময় তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"উনি গুরুদত্ত শক্তির বড়ই অপব্যবহার করিতেছিলেন, তাই গুরুজীর আদেশে উহার শক্তি আকর্ষণ করিয়া লওয়া হইল।" তাঁহার মুখে এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই ভীত ও চমকিত হইলেন। এ ঘটনার কিয়দ্দিন পরে সা-সাহেবের কোন কোন বুজরুকি ধরা পড়াতে, স্বীয় অনুগত লোকদিগের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন, এবং কিয়ৎকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই স্থানে অবস্থানকালে দুইটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। ১ম। কলিকাতা দপ্তরী-পাড়া নিবাসিনী প্রসিদ্ধা ধাত্রী এবং গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যা শ্রীমতী ক্ষীরদাসুন্দরী দাসী তাঁহাকে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গরূপে দর্শন করিয়া ভাবে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখন অতি কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। ২য়। এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের মাতৃদেবী (ইঁনিও ব্রাহ্মিকা) গোস্বামী-প্রভুর কৃপালাভ করেন। দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্রই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক-ভাবসকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। ভাবের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। বহুক্ষণ কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিলেন—"প্রভো, আমি পেয়েছি, আমার ভগবদ্দর্শন হইয়াছে।" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"এ কথা অতীব সত্য। সত্যই আপনি ভগবানের দর্শনলাভ করিয়াছেন, এবং আপনার দেহত্যাগও হইয়া গিয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আমাকে পুনরায় বাঁচালে কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"কি করবো? পাহাড় জঙ্গল হ'লে মৃতদেহটা একদিকে টানিয়া ফেলিয়া দিলেই চলিত; কিন্তু এ যে কলিকাতা সহর। তোমাকে না বাঁচালে এখনই পুলিশের লোক আসিয়া ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত করিত।" প্রভুজীর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি যে স্বতন্ত্র পুরুষ ছিলেন, একথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এক দিবস বদান্য-প্রবর স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার নিকট আগমন করিয়া গোপনে কিছু বলিতে চাহেন। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, তাঁহার নিকটে সর্ব্বদাই লোকজন স্বাধীনভাবে যাতায়াত করেন, কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না। সুতরাং নির্জ্জনে কথা হইবার সম্ভাবনা অতি কম। অতঃপর একদিন শ্রদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে

গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করেন। গোঁসাইজী ঠাকুর মহাশয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে একখানা পৃথক আসন প্রদান করিলেন। কিন্তু বিনয়ের খনি ঠাকুর মহাশয় সে আসনখানা পশ্চাতে রাখিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন, এবং কথা-প্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার প্রাণের জ্বালা যায় না কেন ? সংসারক্ষেত্রে যশ, প্রতিপত্তি, ভোগ-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু বাঞ্ছনীয় সমস্তই তাঁহার করায়ত্ত, তথাচ তিনি শান্তি পান না, ইহার কারণ কি ? গোস্বামী-প্রভু উত্তরে বলিলেন—"ভগবান যাঁহাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই তিনি শান্তি পাইতে পারেন। তিনি আপনাকে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন, উহার সদ্ব্যবহার করিলেই শান্তি পাইবেন।" ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—"আমি ত তাহা করিয়া থাকি।" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আপনি দান করিয়া খবরের কাগজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন কবে ঐ ঘটনা প্রকাশিত হইবে। এ ভাবে দান করিলে সে শান্তি পাইবেন না। সম্পূর্ণ গোপনে ও প্রতিষ্ঠার আশা পরিত্যাগ করিয়া দান করিতে হইবে।" ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—"মনিঅর্ডার অথবা রেজেষ্টরী খামে টাকা পাঠাইতে হইলেইও ত নাম সহি করিতে হইবে।" গোস্বামী প্রভু - "আপনি শুধু খামে পুরিয়া পাঠাইবেন।" ঠাকুরমহাশয়—"উহা যদি পথে মারা যায়।" তখন গোস্বামী-প্রভু খুব তেজের সহিত বলিলেন—"কি, মারা যাইবে ? ঐরূপ দান স্বয়ং ভগবান্ বহন করেন।" অতঃপর ঠাকুর মহাশয় কিয়ৎকাল সাধুর বেশধারী ব্যক্তিদিগের অত্যাচারের কথা কিছু কিছু বলিয়া স্বীয় বাসভবনে প্রস্থান করিলেন। এই কথা উপলক্ষ্য করিয়া কিয়দ্দিন পরে গোস্বামী-প্রভু স্বর্গীয় মনোরঞ্জনবাবুকে বলিয়াছিলেন—"উনি (ঠাকুর মহাশয়) যেরূপ সরল ও অমায়িক লোক, তাহাতে ধূর্ত্ত লোকের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া উঁহার পক্ষে কঠিন। যদি উঁহার কোন হিতৈষী সুবোধ কর্ম্মচারী থাকেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি নিজে বিশেষভাবে না জানিয়া কোন সাধুকে উঁহার নিকটে যাইতে না দেন।"

এই সময়ে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে তত্ত্ববিদ্যা সমিতির এক অধিবেশনে স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়, অভ্রান্ত-গুরুবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানকরিতে আহূত হন। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ ও নবীন বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন, কয়েকটি বিদুষী মহিলাও একদিকে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু ইতঃপূর্ব্বে ব্রাহ্ম-পরিচালিত কোন পত্রিকাতে অভ্রান্ত-গুরুবাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে একটী প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। কিন্তু উহা কোন কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের মনঃপূত না হওয়ায় প্রথমতঃ তাঁহারা উক্ত পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেন। অতঃপর একদিন তাঁহারা একত্র পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে সম্ভবতঃ বিচারে পরাস্ত করিবার জন্যই ঐ

সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সভায় উপস্থিত হইয়া মনোরঞ্জন বাবু করজোড়ে আপন ইষ্টদেবকে স্মরণ করতঃ সকলকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন – "আমার প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে মানুষের 'অভ্রান্ত' ও 'অচ্যুত' অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর কিনা ? অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানরাজ্যের আমি যতটুকু আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে আমি অভ্রান্ত। অনন্ত উন্নতি-সোপানের আমি যে স্তরে দাঁড়াইয়াছি, উহা যত নিম্নেই হউকনা কেন, উহার উপরে উঠা আমার সময়-সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তন্নিম্নে আমার পতন হইবে না—এরূপ অবস্থা মানুষের সম্ভবপর কিন ?"

বক্তা সংক্ষেপতঃ আপন প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিলে, একজন বিশিষ্ট সভ্য উঠিয়া বলিলেন—"যদি জ্ঞেয় ও জ্ঞান দুই-ই অনন্ত হইল, তবে মধ্যবর্ত্তী স্তরে দাঁড়াইয়া 'অভ্রান্ত' ও 'অচ্যুত' অবস্থা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইত্যাদি।"

তদুত্তরে মনোরঞ্জনবাবু উঠিয়া বলিলেন—"জ্ঞেয় ও জ্ঞান যখন অনন্ত 'নেতি' 'নেতি', তখন মধ্যপথে দাঁড়াইয়াই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য এই নহে যে—কোন ব্যক্তিবিশেষ যাহা বলিবেন, তাহাই অভ্রান্ত হইবে, এবং তিনি যে স্তরে দাঁড়াইয়াছেন উহা হইতে তাঁহার পতন হইতে পারে না, বা ইহাপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর নাই। আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে—অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে, উহার প্রথম শিক্ষার্থী যেমন এক একটি শ্রেণীর অধীত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া তদুপরের শ্রেণীতে উন্নীত হয়, তাহার পরের শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু সে যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহাতে তাহার কোন ভ্রম নাই। যেমন এক আর দুই যোগে তিন হইবে, এই বিষয়ে আমি অভ্রান্ত; 'ক' আর 'আ' মিলনে 'কা' হয়, এ বিষেয়ে আমি অভ্রান্ত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে এরূপ অভ্রান্তি সুতরাং অচ্যুতি সম্ভবপর কিনা ? একটি একটি করিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করিতে করিতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে, মনুষ্য-জীবনও ঐরূপ ক্রমোন্নতিশীল। বোম্বাই-যাত্রী গাড়ী এলাহাবাদ পঁহুছিয়া পন্থাচ্যুত হইল, এখন পুনরায় ঠিক পন্থায় আসিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার যেস্থানে গতিবন্ধ হইল, উহা বাঙ্গলা হইতে শত শত মাইল দূরে। তদ্রূপ মহোচ্চ আধ্যাত্মিক-প্রাসাদের কয়েকটি সেপোনে উঠিয়া, তৎপরবর্ত্তী সোপান অতিক্রম করা একজনের সময়-সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু যতটুকু সে উঠিয়াছে, সেই অধিকৃত স্তরে উহার স্থিতি অচ্যুত, ইহা স্বীকার না করিলে, 'মনুষ্য জীবন ক্রমোন্নতিশীল'—এই সত্য অস্বীকার করিতে হইবে। যদি আধ্যাত্মিকরাজ্যে সাধকের স্থির হইয়া দাঁড়াইবার মত 'নিরাপদ ভূমি' না থাকে, তবে ধর্ম্ম-সাধনার সার্থকতা কোথায় ? এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিদিন উপাসনান্তে যে সার্ব্বজনীন প্রার্থনা করিতেছেন—'আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে

লইয়া যাও', 'অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও', 'মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে লইয়া যাও'—এই প্রার্থনার সার্থকতা কোথায় ? যদি অনন্ত জীবনপথে গমন করিতে, অভ্রান্তির ক্ষুদ্র একটি জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রাপ্তি সম্ভব না হয়, যদি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে অসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হয়, যদি বিচ্যুতিরূপ মৃত্যু হইতে অচ্যুতিরূপ অমৃতত্বে গমন করিতে প্রতি পদক্ষেপে জীবনে অচ্যুতস্থিতির আস্বাদন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের উক্তবিধ প্রার্থনার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ব্রাহ্মসমাজকে হয়, মানুষের 'অভ্রান্ত' ও 'অচ্যুত' অবস্থা সম্ভব—এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে, না হয় উক্ত নিষ্ফল প্রার্থনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া বক্তা আসন পরিগ্রহ করিলে সভায় এক গভীর নিস্তব্ধতার সঞ্চার হইল, সকলেই অধোবদনে বিষয়ের গুরুত্ব-চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি মহিলা বলিলেন—"মনোরঞ্জনবাবুর বক্তব্য বিষয় বিচারসঙ্গত বটে, ইহাতে 'হাঁ' কিম্বা 'না' দুই-ই বলা কঠিন।', অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবুর কথাগুলি বেশ যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু তিনি 'অভ্রান্ত' ও 'অচ্যুত' এই দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিষয়টিকে বড় জটিল করিয়াছেন। অদ্যকার সভাতে ইহার শেষ মীমাংসা করা যাইতে পারে না, বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে, অদ্যকার সভাভঙ্গ করা গেল ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য পুনরায় ঐ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের কোন গুপ্ত সভা হইয়া থাকিলেও, শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জনবাবুকে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আর আহ্বান করা হয় নাই।

অতঃপর এইস্থান হইতে গোস্বামী-প্রভু ১৩০১ সনের ফাল্গুন মাসে সশিষ্য শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে বাটীর মেথরটী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনিও মেথরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই।" তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া মেথরটী কাঁদিয়া ফেলিল, এবং উপস্থিত শিষ্যবৃন্দও অতিশয় অভিভূত হইলেন। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধককে কিরূপভাবে অগ্রসর হইতে হয়, তাহার একটী প্রকৃষ্ট ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। গোস্বামী-প্রভু এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সমস্ত নর-নারীর চরণতল দিয়া।"

শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার সময়ে রেলগাড়ীর মধ্যে গোস্বামী-প্রভু শিষ্যদিগকে স্নেহভরে উপদেশ করিলেন—"দেখ, শ্রীবৃন্দাবন গিয়া সকলেই কয়েকটী নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে। নিয়মগুলি এই যে (১) কোনও ব্রজবাসীকে হীন মনে করিবে না, তাঁহাদের কার্য্যে কোনরূপ দোষ দর্শন করিবে না ; (২) ব্রজমায়ীদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কদাচ কোন কথা বলিবে না,

এবং (৩) প্রত্যহ অন্ততঃ একবার কোন ঠাকুরমন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহ দর্শন করিবে। এই ভাবে না চলিলে কেহ ব্রজে স্থান পাইবে না।" ইহার শেষোক্ত উপদেশটী লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় কতিপয় শিষ্যের নিকটে এই ভাব ব্যক্ত করিলেন যে, গুরুনিষ্ঠা থাকিলে ভগবান্ অথবা তাঁহার বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না করিলেও ক্ষতি নাই। কথাটী গোস্বামী-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন—"ভগবত্তত্ত্ব গুরুতত্ত্বেরই অন্তর্গত। গুরুভক্তি লাভ হইলে, ভগবান অথবা তাঁহার বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না হইয়াই পারিবে না। যদি কেহ বলেন যে তাঁহার গুরুভক্তি লাভ হইয়াছে, অথচ তিনি ভগবদ্বিগ্রহাদি মানেন না, তবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার গুরুভক্তিই লাভ নাই।"

শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোস্বামী-প্রভু কিছুদিন কেশীঘাটে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন; পরে লুইবাজারের তীর্থমুনির কুঞ্জে গিয়া তথায় প্রায় ৭ মাস বাস করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে একদিন জনৈক পাণ্ডা গোস্বামী-প্রভুর জন্য শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলে, তিনি তাহা পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরে পায়খানা পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর রমণী আগমন করিলে, গোস্বামী-প্রভু তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসাদ প্রদানপূর্ব্বক করজোড়ে বলিলেন—"মা, বাল্যকালে মা বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতেন, এখন সেই কার্য্য তুমি করিতেছ। মা ভিন্ন গু ফেলিতে সকলেই ঘৃণা করে, সুতরাং তুমিতো মায়েরই কার্য্য করিতেছ। মা, তোমাকে আমি আর কি দিব? তোমার জন্য আজ গোবিন্দ জীউর প্রসাদ রাখিয়াছি।" গোস্বামী-প্রভুর এইরূপ প্রেমময় বাক্য শুনিয়া মেথররমণী কাঁদিয়া ফেলিল পরে বলিল—"বাবা আমাদিগকে এমন করিয়া কেহ কখনও কথা বলে না। তুমি ধন্য —ইত্যাদি।"

একদিবস শ্রীবৃন্দাবনধামের অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, গোস্বামী-প্রভু দীন গ্রন্থকারকে উপদেশ করিলেন—'শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃতধাম। ইহার এক একটী রজকণা এক একটী মহাবিষ্ণুতুল্য। এই ধামের তরুগুল্মাদি পর্য্যন্ত সাধারণ তরুগুল্ম নয়। কত শত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অপ্রকৃত লীলাদর্শন করিবার জন্য ঐরূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা পর্য্যন্ত এই ধামের তরুগুল্ম লতা হইয়া থাকিতে বাঞ্ছা করেন। ধামটী যেন সামান্য একটী পর্দ্দা দিয়া ঢাকা র'য়েছে মাত্র। একটু চোখের আড়াল ভাঙ্গিলেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবে। এই ধামে পদার্পণ মাত্র সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, জন্মজন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।"

এইস্থানে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় বেণীমাধব দে মহাশয় স্বীয় গুরুদেবের আগ্রহে কখনও রাধাকৃষ্ণলীলা, কখনও বা গৌরলীলা বিষয়ক গান করিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন। শ্রদ্ধেয় বেণীবাবু যখন একতারা-

সংযোগে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী কি জানি কেন, কি ভাবে অভিভূত হইয়া অধিক্ষণ অশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হইতেন না! সেই হৃদয়স্পর্শী গানটী এই—

খাম্বাজ—যৎ।

গৌর অনুগত না হ'লে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়।
(আমরা) জেনে শুনে প্রাণ স'পেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পায়॥
নয়নরঞ্জন খঞ্জন আঁখি, কত দুঃখি, তাপীর দুঃখপাসরা,
নবদ্বীপের নবগোরা দেখবি যদি আয়॥
দ্বিজ গোঁসাই চাঁদে বলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম না নিলে,
কি করবে তার বিদ্যা-কুলে, বৃথা জনম যায়॥

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে নিম্বাদিত্যসম্প্রদায়ভুক্ত 'ব্রজবিদেহী' রামদাস কাঠিয়া বাবা ও সিদ্ধ জগদীশ বাবা অবস্থান করিতেছিলেন। ই'হারা প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমে আগমন করিতেন। গোস্বামী-প্রভুও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন। এই দুইজন মহাপুরুষই গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যদিগকে অতীব স্নেহ সমাদর করিতেন। একদিন মহাত্মা কাঠিয়া বাবা গোস্বামী-প্রভুর সম্মুখে তাঁহার শিষ্যদিগকে বালকের ন্যায় সরলভাবে হিন্দি ভাষায় বলিলেন—"দেখ, বাবা (গোস্বামী-প্রভু) যখন এখানে (শ্রীবৃন্দাবনে) থাকিবেন, তখন ত তোমরা তাঁহার নিকটেই থাকিবে, কিন্তু যখন উ'নি এখানে না থাকিবেন, তখন তোমরা আমার নিকটেই থাকিবে। আমি সত্য বলিতেছি, আমি তোমাদের জন্যই আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছি।" তাঁহার এই বালকোচিত সরলতামাখা ও গভীর স্নেহব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ময়ূরকুট বাবাজী মহাশয়ও এই সময়ে তথায় বাস করিতেছিলেন। ই'নি অনেক সময়ে গোস্বামী-প্রভুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ১২৫৮ সনের ১৩ই শ্রাবণ সোমবার ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামে কিংবা বর্ষানে মহাত্মা ময়ূরমুকুট বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন; এবং শুকদেবের ন্যায় প্রগাঢ় বৈরাগ্যবশতঃ ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমালয়ের নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক জনৈক লামা সন্ন্যাসীর সহিত ৪।৫ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যা-নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষিত হইয়া হিমালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন এবং অবশেষে কৈলাস পর্ব্বতে উৎকট সাধনা করিয়া কৈলাসপতির দর্শন লাভ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তদবধি তাঁহার অন্তরে আপনাআপনি শ্রীবৃন্দাবনের মধুরলীলা স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

এই অপ্রাকৃত লীলারসের আস্বাদ পাইয়া, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইবার অভিপ্রায়ে কৈলাসনাথের শরণাপন্ন হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া বাবাজী মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ প্রদানপূর্ব্বক বলেন যে, তথায় তাঁহার সদগুরু লাভ হইবে, যাঁহার নিকট তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এইরূপ কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলে, এবং কিছুদিন সদ্‌গুরুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলে, একদিবস শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাণী তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার সকল আশা চরিতার্থ হইবে। তদনুসারে বাবাজী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কেশীঘাটে গোস্বামী-প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেবের অনুজ্ঞা ও রাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর স্বপ্নাদেশ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিলেন। শক্তিসঞ্চার মাত্রই বাবাজী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন প্রাপ্ত হন। দর্শন পাইয়াই তিনি ভগবানের নিকটে কিছু নিদর্শন প্রার্থনা করিলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার সমক্ষেই একটী ময়ূরের রূপ পরিগ্রহণপূর্ব্বক পক্ষ ঝাড়া দিয়া কতকগুলি পালক নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই পালকগুলি সংগ্রহ করিয়া বাবাজী মহাশয় একটী মুকুট প্রস্তুত করাইয়া মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি 'ময়ূরমুকুট' বাবাজী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। মহাত্মা ময়ূরমুকুট গোস্বামী-প্রভুর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার তিরোভাবের পরে তদীয় সমাধিস্থান দর্শন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরী (শ্রীক্ষেত্র) গমন করিয়া কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গোস্বামী-প্রভুর গেণ্ডারিয়া আশ্রম দর্শন করিবার জন্য কলিকাতা হইয়া ঢাকায় আগমন করেন, এবং তথাকার আশ্রমের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। এই সুযোগে ঢাকাবাসী বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নর-নারী তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যমণ্ডলীকেও তিনি অতিশয় প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের নিকটে অনেক মনের কথা, প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিয়ৎকাল ঢাকায় অবস্থান করিবার পর, তিনি অযোধ্যা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, এবং তথা হইতে শিষ্যমণ্ডলীর নিকটে ইঙ্গিতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতের কোন নিভৃতকক্ষে অন্তর্হিত হন। তাঁহার এই ভাবী মহাপ্রস্থানের কথা তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিবার সময়ে, গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্যদ্বয় বৃন্দাবনবাসী স্বর্গীয় মন্মথরঞ্জন চৌধুরী ও স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রবাবু তাহাতে দুঃখ প্রকাশ

করাতে তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, মহাপুরুষেরা ত মরেন না, তবে সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হন মাত্র। কিন্তু যখন যেখানে গোস্বামী-প্রভুর গুণগান হইবে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন, এবং ব্রজেন্দ্রবাবু তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

গোস্বামী-প্রভু যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার আশ্রমের আয়-ব্যয় নির্ব্বাহের ভার একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকিত। এই সময়ে কিয়দ্দিনের জন্য গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় পণ্ডিত ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর উক্ত গুরু ভার অর্পিত হইলে, তিনি অতিশয় পরিপাটিরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় নিরীহ, সংযমী, ক্রোধশূন্য, নিরভিমানী এবং পরম ভক্ত লোক ছিলেন। ১২৪৪ সনের মাঘ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর ষ্টেসনের অধীনে কালাসাধা গ্রামে (চলিত নাম তারপাশা) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদেবের নাম ৺গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় ৩০ বৎসরকাল অতিশয় দক্ষতার সহিত ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া 'পেন্সন' গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করেন, এবং জীবনের শেষ ১৫ বৎসর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিয়া ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। গুরু-কৃপায় ইনি দেহে থাকিতেই শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলা সম্ভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু একদিন কথা-প্রসঙ্গে ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "সাধনপ্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে যে কয়েক জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন (অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন), তন্মধ্যে ভারত পণ্ডিত মহাশয় অন্যতম"। গোস্বামী-প্রভু শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে ইনিও তথায় গিয়া গুরুগোবিন্দ একত্র দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্র হইতে পুনরায় তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া নির্জ্জন সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতে লাগিবেন। এই সময়ে তিনি প্রায় নিদ্রা যাইতেন না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া সাধন করিতেন এবং অধিকাংশ সময়ে সমাধিস্থ থাকিতেন। অতঃপর, সন ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ তিনি সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলায় প্রবেশ করেন। ইহার ২।৩ দিবস পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার দেহত্যাগের কথা কতিপয় সতীর্থের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ভাদ্র মাসে গোস্বামী-প্রভু বাঁকিপুর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় কিয়ৎকাল সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ পূর্ব্বের বাসভবনে অবস্থান করিয়া কার্ত্তিক মাসে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। ১৩০২ সনের মাঘ মাসে এই স্থানে মহাসমারোহের সহিত ধূলটোৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতা বরিশাল, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শিষ্য-সেবক আগমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ মুকুন্দ কীর্ত্তনীয়া নিমন্ত্রিত হইয়া

সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানাভাববশতঃ অনেককে তাঁবুতে বাস করিতে হইয়াছিল। আশ্রমে যেন একটি আনন্দের বাজার বসিয়া গিয়াছিল। কেহ পাঠ করিতেছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ বা ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কেহ প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, অপর সকলে তাহা আনন্দে ভোজন করিতেছেন। এইভাবে দিবানিশি উৎসব চলিয়াছিল।

আশ্রমস্থ একটী কাল-জাম বৃক্ষের মূলে প্রকাণ্ড চাঁদোয়ার নীচে যথাশাস্ত্র মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই-সীতানাথের চিত্রপট স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় প্রত্যহ ভোগ পূজা আরতি ও কীর্ত্তন হইত। মাধ্যাহ্নিক পূজা অন্তে নিম্নলিখিত ভোগারতির কীর্ত্তনটী গীত হইত। যথা—

আরতি কীর্ত্তনের সুর।

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপবিহারী
দীন দয়াময় হিতকারী॥

এসহে চৈতন্য প্রভু বৈসহে আসনে,
সুবাসিত জলে কর পদ প্রক্ষালন।
এসহে চৈতন্যপ্রভু কর অবধান,
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান।
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই,
মধ্য আসনে বসলেন চৈতন্য গোঁসাই।
শাক শুকুতা ভাজি দিয়ে সারি সারি,
তাহার উপরে দিলেন তুলসী মঞ্জুরী।
মিষ্টান্ন পক্কান্নাদি বিবিধ প্রকার,
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার।
অদ্বৈত ঘরণী আর শান্তিপুর নারী,
উলু উলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি'।
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি,
ভৃঙ্গার পূরিয়া আনে সুবাসিত বারি।
ভোজন করিয়া প্রভু করেন আচমন,
সুবর্ণ খড়িকায় করেন দন্ত শোধন।
ভোজন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে,
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে।
ফুলের কেয়ারি ঘর ফুলের চৌয়ারি,
ফুলের রত্ন সিংহাসনে চাঁদোয়া মশারি।
ফুলের রেণুকা সব উড়ে পড়ে গায়,
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়।

শ্রীগোবিন্দদাস করেন পদ সম্বাহন,
নর হরিদাস করেন চামর ব্যজন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস,
ভোগ মঙ্গল গায় শ্রীনরোত্তম দাস।

কীর্ত্তনের মধ্যে যখন গোস্বামী-প্রভু হরিনাম-মদিরায় মত্ত শিষ্যবৃন্দসহ মহাভাবে বিভোর হইযা, "জয় শচীনন্দন," "ধন্য কলি"—ইত্যাদি বাক্য সিংহনাদে উচ্চারণ করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন, তখন চারিশত বৎসর পূর্ব্বের শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ভক্তবৃন্দসহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নৃত্যোৎসবের কথা সকলের স্মৃতিপথে সমুদিত হইত। সময়ে সময়ে তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস এতদূর সবল হইত যে, শ্রীঅঙ্গের সমস্ত রোমকূপগুলি শিমুলের কাঁটার ন্যায় ফুলিয়া উঠিত, মস্তকের সুদীর্ঘ জটাটী পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিত। কোন কোন সময়ে তিনি নৃত্য করিতে করিতে ধরাতল হইতে শূন্যে উঠিয়া পড়িতেন। এইরূপে এক সপ্তাহকাল দিবারাত্র মহোৎসব চলিয়াছিল।

উৎসবের শেষ দিবস একটী বিরাট নগরসংকীর্ত্তন বাহির কবা হইয়াছিল। গুরুশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া শিষ্যবৃন্দ আশ্রম হইতে—

"দয়াল নিতাই ডাকে আয়।
প্রেমধন বিলায় গোরা রায়"
(এই ধর প্রেম লও বলিয়ে)

—এই কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন রাজপথে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তির স্রোত ও ভাবের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র সহরটী যেন টলমল করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে উন্মাদ। কীর্ত্তনকারিগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আহ্বান নাই, সংবাদ নাই, দলে দলে লোক আসিয়া এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকেই তারকব্রহ্ম হরি নামের জয়ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব নিস্পন্দ হইয়া কি যে দেখিতেছে, কি যে শুনিতেছে, কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছে না। কেহই আর আপনাতে নাই,—ক্ষণকালের জন্য যেন এই অসার সংসার সহসা আজ ঢাকা সহর হইতে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধর উর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক, "ঐ দেখ ক্ষীরোদ সাগর।" "ঐ দেখ শ্বেতদ্বীপ! ক্ষীরোদ সাগরের ঢেউ ছুটিয়াছে, আজ সমস্ত সংসার ভেসে যাবে—ইত্যাদি" বলিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছিলেন তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একখানি চলন্ত ঘোড়ার গাড়ী সম্মুখে নিপতিত হইলে, তিনি উহার ঘোড়াকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। শত্রুর

নামক জনৈক উড়িষ্যাবাসী শিষ্য ভাবে একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে, অপরাপর শিষ্যগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইলেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্যদ্বয় হবিগঞ্জ হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী গুহ ও ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় প্রায় সমস্ত রাস্তা হামাগুড়ি দিয়া বিদ্যুৎবেগে কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, এবং অপূর্ব্ব উলুধ্বনি করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতে লাগিলেন তাহারই পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে যে রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন যাইতে লাগিল, তাহার দুই পার্শ্বের বাটীসমূহ হইতে নারীবৃন্দ উলুধ্বনি করিয়া পুষ্প, খৈ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পার্শ্বের বিপণিশ্রেণী হইতে লোকসমূহ বাতাসা ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য কীর্ত্তনের দলের উপর অজস্র বর্ষণকরিতে লাগিল। কীর্ত্তনের দল যেমন একস্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল, অমনি পশ্চাৎদিক হইতে অসংখ্য নরনারী সেই স্থানে গড়াগড়ি দিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলি-লেপন ও শতকণ্ঠে অপূর্ব্ব ক্রন্দন করিয়া যেন গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এইভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনের দল ব্রাহ্মসমাজের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, সমাজ-গৃহের দ্বিতল হইতে মহিলাবৃন্দ উচ্চহরিধ্বনি করিয়া কীর্ত্তনে যোগদানের জন্য বেগে ফটকের নিকটে উপনীত হইলেন। তখন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ উপায়ন্তর না দেখিয়া হঠাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল ভাবোন্মাদিনী মহিলাগণের অধিকাংশ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গোস্বামী-প্রভু অশ্বযানারোহণে কীর্ত্তনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। কতকগুলি দেশীয় সৈন্য তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাহাদের স্কন্ধস্থিত বন্দুক অবগত করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে সম্মান প্রদর্শন করিল। বিদ্যুৎবেগে কীর্ত্তনের দল অর্দ্ধঘণ্টাকাল মধ্যে প্রায় ৩।৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আশ্রমে উপস্থিত হইল। এই প্রকারে নগরকীর্ত্তন সমাধা করিয়া শিষ্যবৃন্দ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি করিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই উৎসব সম্বন্ধে জনৈক দর্শকপ্রদত্ত একটী বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা ঃ—"ঢাকার ধূলটের সময়ে অদ্ভুতশক্তি প্রকাশ করিয়া গোঁসাই অনেককে কৃপা করেন। সংকীর্ত্তনের সময়ে ঐ ঢাকা সহরে হরিনামের প্রভাবে ধর্ম্মের এক মহাস্রোত বহিয়া যায়। গোঁসাই-প্রভু যে দিক দিয়া সংকীর্ত্তন লইয়া যান, সেই দিকের লোকসকল উন্মত্ত হইয়া উঠে। যে যে অবস্থায় ছিল আত্মহারা হইয়া সংকীর্ত্তনে মিলিল, এক কর্ম্মকার কাজ করিতে করিতে হাতে যন্ত্রপাতি লইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিল এবং অজ্ঞানবৎ নৃত্য করিতে লাগিল। জনৈক চামার জুতা সেলাই করিতে করিতে আসিয়া নাচিতে লাগিল"; লোকে

লোকারণ্য, সে ব্যাপার বর্ণনা করা অসম্ভব। গোঁসাই সেইদিন ঢাকা সহর মাতাইয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ওদিকে নগরের সব লোক তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। কত লোক কত নামে কীর্ত্তনের দল বাহির করিল। ঢোল লইয়া, খোল লইয়া, অন্যান্য যন্ত্র লইয়া, যাহার যাহা ছিল তাহা লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরে বাহির হইল এবং পাগলের মত বাজাইয়া, গাইয়া রাস্তায় চলিল। আর কিছুক্ষণ এইরূপ হইলে নগরসমেত লোক উন্মত্ত ও পিশাচবৎ হইয়া পড়িত। কত লোক রাস্তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কাহারও কাহারও জ্ঞান ছিল না। ঐ দিন প্রভু বলিলেন,—"আজ যে প্রার্থনা করিবে, সেই সাধন পাইবে।" ঐ দিবস রাত্রিতে অন্যূন ৫০০ লোক সাধন পাইলেন। আশ্রমের বৃক্ষসকল হইতে মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। মধুতে সমস্ত গাছের পাতা যেন ভিজিয়া গিয়াছিল। ঝর্ ঝর্ করিয়া মধু পড়িতেছে। বহু লোক সেই মধু আস্বাদন করিয়া দেখিতেছে। গোঁসাই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ, দেখ, ভগবান্ আজ কেমন মেয়ে মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত!!*

মহোৎসবের সময়ে আশ্রমে পংক্তি-বিচার হইত না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি সকলেই একত্র আহারাদি করিতেন। এই কারণে হিন্দু-সাধারণ ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে আলোচনা হইতে লাগিল। অবশেষে বিষয়টী গোস্বামী-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি এইরূপ বলিলেন,—"ইহা শাস্ত্র সদাচাবের বহির্ভূত কার্য্য হয় নাই। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, 'মহোৎসবে পংক্তিবিচারের আবশ্যকতা আছে কি না', এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য শান্তিপুরে পণ্ডিত-মণ্ডলীর একটী সভা আহূত হয়। ঐ সভায় বহু আলোচনার পরে উপস্থিত পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মহোৎসবে পংক্তি-বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।"

উৎসবান্তে গোস্বামী-প্রভু কলিকাতা যাইবার কথা উল্লেখ করিলে গেণ্ডারিয়া-বাসী শিষ্যগণ মর্ম্মাহত হইলেন। ইঁহাদের গুরুভক্তির তুলনা নাই। আশ্রম প্রতিবেশী আবালবৃদ্ধবনিতা গোস্বামী-প্রভুকে নিতান্ত আপনার জন, প্রাণের একমাত্র দরদী জ্ঞান করিয়া নিঃসঙ্কোচে আপন আপন মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জ্ঞাপন করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূরীভূত করিতেন। তাঁহার প্রতি ইঁহারা যেরূপ উচ্চ ভাব পোষণ করিতেন তাহা দর্শন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদিগের স্বাভাবিক ভালবাসা ও আকর্ষণের কথা স্বতঃই মনে উদিত হইত। ভক্তপ্রবর স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকনিবাসে অবস্থানাবধি যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গোস্বামী-প্রভুর সেবাপরিচর্য্যা করিতেন তাহা সম্যকরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। গোস্বামী-প্রভু কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে

* শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন শুনিয়া শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয় একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার প্রধান লীলাস্থলে পাইবার জন্য, শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয়ের ধীমান্ গুরুবৎসল পুত্র শ্রীমান ফণীভূষণ ঘোষ কলিকাতা গমন করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আনিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। গেণ্ডারিয়াবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইল প্রভুপাদ আবার আসিবেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি আর স্থূলদেহে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইয়া পুরীধাম হইতে শ্রীমান ফণিভূষণের নিকট দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ৪৫নং হারিসন রোডের বাটীতে অবস্থান। কুলীন গ্রামবাসীর প্রতি কৃপা। প্রসিদ্ধ গায়ক নীলকণ্ঠ ও গণেশ দাসের কীর্ত্তন। নিয়ম ভঙ্গ করাতে জনৈক শিষ্যের প্রতি শাসন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুনরায় অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ঢাকার উৎসব সম্পন্ন করিয়া গোস্বামী-প্রভু ১৩০২ সনের মাঘ মাসের শেষে সশিষ্য কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ১৪।২নং ভবনে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর, ১৩০৩ সনের প্রথমভাগে হারিসন রোডের ৪৫নং আলয়ে আগমন করিয়া তথায় প্রায় এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভু, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামবাসীর প্রতি যেরূপ অসামান্য কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে—

"কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যে রহু বহু দূরে॥"

—ইত্যাদি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তির কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাঁহার এই অনুপম কৃপার বৃত্তান্ত কুলীন গ্রামবাসী জনৈক শিষ্যের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল কুলীনগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় বলিলেন—'কে যে গোসাইর কৃপাপাত্র, কে অপাত্র ইহা বুঝিয়া উঠা দায়। একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল দেশের লোকগুলিকে লইয়া গিয়া যদি ওঁর (গোস্বামী-প্রভুর) নিকট দীক্ষা দেওয়াইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে খুব একটা কাজ হয়, লোকগুলি উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা ভে'বে তিনি দেশে পত্র লিখিলেন,—'কে কে গোঁসাইর নিকট হইতে দীক্ষা লইবে চ'লে এস, যাওরা আসার সব খরচ আমার।' এই কথা শুনিয়া যত ইতর লোক—কামার, কুমার, ছুতার, হাড়ি, ডোম, চোর, ডাকাত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোক সব সা'জ্‌ল। ভাল জাতিও ছিল, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কম। কেবল বিদ্বান্, পাণ্ডিত্যাভিমানী, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ রহিলেন। যাঁহারা আসিবেন ভাবিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন মাত্র। দেখিয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির। পণ্ডিত মহাশয়ের (শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়) নিকটে গিয়া বলিলেন—'পণ্ডিত মহাশয়, এখন উপায় কি? যত বেটা চোর ডাকাত ত আসিয়া হাজির, একজন আবার একটী পতিতা রমণীকে

লইয়া আসিয়াছে, কি লজ্জার কথা ! গোঁসাই উপরে আছেন, তাঁহাকে জানাতে যে সাহস হয় না।' সে দিন ত সেই ভাবেই গেল। পরদিন প্রাতে গোঁসাইর নিকটে যেমন যাইতে হয়, তেমনি সকালে যাইয়া বসিতেই শিবচতুর্দ্দশীর কথা আরম্ভ হইল। পশুহন্তা ব্যাধ মহাদেবের কৃপায় কি প্রকারে উদ্ধার হইয়া গেল, গোস্বামী-মহাশয় নিজমুখে তাহা বিবৃত করিলেন। হরিদাসবাবু সুযোগ পাইয়া গোঁসাইকে বলিলেন—'দেবাদিদেব মহাদেব কৃপা করিয়া কেবলমাত্র একটী ব্যাধকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আজ শত শত ব্যাধ কুলীনগ্রাম হইতে আসিয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত। এবার আমার ভোলানাথ কি করিবেন ?' এই কথা বলিয়াই সাধনপ্রার্থী সকলের বিবরণ বলিলেন। গোঁসাই বলিলেন—'কাল দীক্ষা হবে।' এই আদেশ শুনিয়া হরিদাসবাবু হাতে আকাশ পাইলেন, তাঁহার গায়ে আর আনন্দ ধরে না। পরদিন সকলের দীক্ষা হইল। সে দীক্ষা এক অদ্ভুত ব্যাপার ! কেহ কাঁদছে, কেহ হাসছে, কেহ নৃত্য করছে, কেহ বা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। হাঁড়ি, মুচি, বামন শূদ্র, সব এক মিশাল। একে অন্যের পায়ে পড়ছে, আলিঙ্গন করছে—ইত্যাদি। অতঃপর গোঁসাইর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সকলে দেশে গেলেন। দেশে ইঁহাদের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনে ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হ'য়ে গেল। এই সকল দে'খেশু'নে দেশের অপরাপর অনেক লোক আসিয়া গোঁসাইর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া গেলেন। আজকাল কীর্ত্তনে ইঁহাদের যেরূপ ভাব হয়, ভাল ভাল উচ্চ সাধকের মধ্যেও তাহা বিরল।"*

এই স্থানে প্রসিদ্ধ গায়ক নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোকিলকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গণেশদাস মহাশয়দ্বয় আসিয়া গোস্বামী-প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় কীর্ত্তনীয়া গণেশ দাসের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনবাসী সিদ্ধ প্রেমিক ভক্ত বলরামদাস বাবাজী মহাশয়ও গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে গোস্বামী-প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন অবস্থানকালে যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় ছিল। বাবাজী মহাশয় এক সময়ে "সুখময় বৃন্দাবন"—
ইত্যাদি কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে তিন দিন পর্য্যন্ত অচৈতন্যাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; তখন ইঁহার রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইয়াছিল। অনেকে ইঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু যখন তাঁহার বুকের উপর কাণ পাতিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পেটের ভিতর হইতে 'সুখময় বৃন্দাবন' এই কথাটী পুনঃপুনঃ অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইতে শুনিতেছেন, তখন ইঁহার মৃত্যু হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে নিঃসংশয় হইলেন। এই বৎসর এই প্রেমিক মহাপুরুষকে

* শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

অতিথিরূপে পাইয়া গোস্বামী-প্রভু ইঁহাকে যথোচিত আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে ইঁহার ভাবাবেশ যিনিই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য, বীরভূমের অন্তর্গত আলিগ্রাম-নিবাসী সুগায়ক শ্রদ্ধেয় সূর্য্যনারায়ণ রায় মহাশয় প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার ভাবানুরূপ, কখনও রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক, কখনও বা শ্যামা-বিষয়ক গান শুনাইয়া তৃপ্তি প্রদান করিতেন। স্থানাভাববশতঃ ঐ সকল গানের চারিটী মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা—

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

১। ও যমুনে, তোর তীরে শ্যাম আমার বাঁশী বাজাত।
ভুবন-মোহন তানে, ভুবন ভুলাত॥
তরলে, তব তরঙ্গে, ললিত-ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে,
মধুর মুরতি রঙ্গে রঙ্গ মিশাত;
উজানের ছলে প্রেম দুকূল ভাসাত।
আমার না হয় হিয়া পাষাণ, তরলে তোর ত তরল প্রাণ,
না হে'রে সে চাঁদ বয়ান, কেমনে আছ জীবিত।

খাম্বাজ—যৎ।

২। নীপমূলে বামে হেলে, ও কে হাসি হাসি চায় গো,
আবার রাধা রাধা রাধা ব'লে বাঁশরী বাজায় গো।
ওকি মন্ত্র জানে, প্রাণ ভুলিল মধুর তানে,
(আরত গৃহে যাওয়া হ'লো নাগো)
(আমায় বাঁশী যে করলো উদাসী)
আবার কত রঙ্গে ভ্রূভঙ্গে অবলা ভুলায় গো।
চরণে চরণ থু'য়ে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে
আমার প্রাণ-মন বিনামূলে বিকালো রাঙ্গাপায় গো।

খাম্বাজ বেহাগ—ঠুংরি।

৩। আমরা যাবগো করিতে শ্যাম-দরশন।
হেরে সে ধনে, হবে মনোবাঞ্ছা পূরণ॥
সে যে রাজা হ'য়েছে মথুরা ধামে,
কুব্জাদাসী রাণী হ'য়ে ব'সেছে বামে,
দেখি, দেখি করে কি না করে সম্ভাষণ,
ব্রজের দুঃখের কথা বলব তখন,—
কেঁদে অন্ধ হ'ল নন্দরাণী,
রাধা আছে কি না আছে অনুমানি,
দেখি করে কি না করে প্রত্যাগমন॥

যদি প্রিয়ভাষে না আসে বংশীধারী,
তবে কর'ব আমরা সব আইন জারী,
রীতিমত দাসখত দেখা'য়ে শমন,
সেই জোরে মনোচোরে করিব বন্ধন,—
সব সখী মিলে আন্‌বো ধরে'।
দেখি বাধা দি'য়ে কে রাখ্‌তে পারে,
হেন পলাতক খাতকের শাসন কারণ,
রাই রাজার দরবারে করিব অর্পণ ॥

এক দিবস শ্রদ্ধেয় সূর্য্যবাবু কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধীয় একটী গান করিতেছিলেন, এমন সময়ে গোস্বামী-প্রভু তাহাতে বাধা প্রদানপূর্ব্বক অতিশয় বিনীতভাবে বলিলেন—"দয়া ক'রে একটী শ্যামাবিষয়ক গান করুন।" স্বীয় গুরুদেবকে এই ভাবে বিনয় প্রকাশ করিতে দেখিয়া শ্রদ্ধেয় সূর্য্যবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া তাঁহার আদেশানুরূপ নিম্নলিখিত গান করিলেন ; যথা ঃ—

ভৈরবী—একতালা।

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥
কভু পরে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
(শ্যামা) কখনো পার্ব্বতী, কখনো শ্রীমতী,
কখন রামের জানকী হয় ॥
হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দনুজদলে করে সভয়।
(আবার) ব্রজপুরে আসি', বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।
যে ভাবে যে জন, করয়ে ভজন, সে রূপ তার মানসে রয়,
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল মাঝে কমল উদয় হয় ॥

কীর্ত্তনান্তে শ্রদ্ধেয় সূর্য্যবাবু গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"আপনি ওরূপ-ভাবে আমার নিকটে বিনয় প্রকাশ করিলেন কেন ? আমাকে আদেশ করিলেই ত হইত ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"ভাব হইতে ভাবান্তরে লইলে ভাবের কাছে অপরাধ হয়। তাই আপনাকে ঐরূপভাবে বলিয়াছিলাম।" ভাবের অসাধারণ কোমলত্ব ও কমনীয়তা সম্বন্ধে তিনি অপর এক সময়ে বলিয়াছিলেন —"ভাবটী যেন লজ্জাবতী লতা, স্পর্শ করিলেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ভাবের সামান্য অমর্য্যাদা হইলেই ভাব শুকাইয়া যায় এবং ভাবের কাছে ভয়ানক অপরাধ হয়। সুতরাং সকলেরই এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন।"

ইদানীং গোস্বামী-প্রভু শ্যামাবিষয়ক গান শ্রবণ করিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। স্বীয় গুরুদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, কোকিলকণ্ঠ

সুগায়ক শ্রদ্ধেয় রেবতীমোহন সেন মহাশয় শ্যামাবিষয়ক নূতন নূতন গান অভ্যাসকরতঃ বেহালা-সংযোগে গান করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে শ্রবণ করাইতেন। গোঁসাইজীও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। নিম্নে ঐ সকল গানের তিনটী মাত্র উদ্ধৃত হইল,—

ঝিঁঝিট—একতালা।

১। নটবর বেশে, বৃন্দাবনে এসে, কালী হলি মা রাসবিহারী,
পৃথক প্রণব, নানা লীলা তব, কে বোঝে একথা বিষম ভারি,
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটী, এলো চুলে চূড়া বংশীধারী,
আগেতে কুটীল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি,
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদুহাস, ভুলে ব্রজ-কুমারী।
আগে শোনিত সাগরে নেচে ছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনাবারি,
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি মনে বিচারি,
মহাকাল কানু শ্যাম শ্যামাতনু, একই সকল বুঝিতে নারি।

ভৈরবী—যৎ।

২। মন বলি ভজো কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে,
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবা-নিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে।
যত শুন কর্ণপুটে, সকলই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মাকে।

সিন্ধু—যৎ।

৩। কেনরে আমার শ্যামা-মাকে বল কাল।
যদি কাল বটে, তবে কেন ত্রিভুবন করে আলো।
মা (আমার) কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন নীল লোহিত রে,
আমি বুঝিতে নারি, জননী কেমন, আমার ভাবিতে জনম গেল।
মা কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শূণ্য মহাকাশ রে,
কহে কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে, মহেশ পাগল হ'ল।

শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবুর তান-লয়-সমন্বিত প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া একদিবস গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার কণ্ঠ মধুময় হউক।" অপর একদিবস তাঁহার কথা প্রসঙ্গে বলিয়া-

ছিলেন—"উঁহার (রেবতীবাবুর) গান শ্রবণ করিয়া বহু লোক তৃপ্তিলাভ করিবে।"

এই সময়ে কলিকাতার অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্তঃসার শূন্য বড় বড় ধর্ম্মকথা বলিতেন। তাঁহাদের ঐ সকল কথাবার্ত্তা হইতে প্রায়ই ধন, উচ্চপদ ও বিদ্যাভিমান ব্যক্ত হইয়া পড়িত। ইহাতে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু মুখে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাদের শুনাইয়া নিম্নলিখিত গানটী গাইতেন, যথা—

বাউল সুর।

আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে আনন্দ-পুরে।
তথায় রাগের মানুষ চলে নির্ব্বিকারে।
আনন্দময় বাজারখানি, হচ্ছে সদা প্রেমের ধ্বনি,
আগুনে বারুদে এক ঘরে।
তথায় কামী লোভীর যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যার রাগের করণ,
কেবল সেই যে'তে পারে, তুই যাবি কি করে,
(ওরে চাকুরে)
সাহসে কি ঢেঁকি গিলতে পারে।

একদিবস ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"মানুষের মুখ চেয়ে, লোকলজ্জা ক'রে জীবন নষ্ট করিলাম। এখন লোকে বড়লোক বলে, সেই অভিমানে মারা গেলাম। যথার্থ ধর্ম্ম হইল না, নিজেরই ক্ষতি হইল।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আপনি গীতা ও ভাগবত পাঠ করিবেন, কেবল ইংরাজীভাবে থাকিবেন না। যাহারা টাকাকড়ি দিয়া তুষ্ট করিতে চায়, তাহারা চিরদিনই ধর্ম্মজগতে নিন্দিত। ভগবান্ তাহাদের দোষ তাহাদের অন্তরে মাখাইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন। তাহাতে তাহারা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা অপেক্ষা শাস্তি আর কি হইতে পারে? যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা একটু জানিতে পারিলে আর তাহাদের গৃহে পদার্পণ করেন না, ইহাও অল্প শাস্তি নহে।"

কোন একসময়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সব্‌জজ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হয় কিসে?" তিনি উত্তর করিলেন—"ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র অবলম্বন করিলে।" শ্রদ্ধেয় চণ্ডীবাবু বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজ ত এখন তাহা করিয়া থাকেন।" গোস্বামী-প্রভু উত্তরে করিলেন—"না, তাহা করেন না। শাস্ত্রের যে অংশটুকু মতের সঙ্গে মিলে, তাহাই মাত্র অনুসরণ করেন। তাহাতে হইবে না। শাস্ত্র

মানিতে হইলে আগাগোড়াই মানিতে হইবে।"* এ সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু অপর একদিন বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে যখন অভিধান দেখিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতাম, তখন তাহার অনেকাংশ পরিত্যাজ্য বোধ হইত। কিন্তু একদিবস গুরুদেবের কৃপায় যখন ঋষিগণ প্রকাশিত হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, "তোমার অন্তরে শাস্ত্র স্ফূর্ত্তি হউক," তখন হইতে দেখি যে শাস্ত্রের একটী অক্ষরও পরিত্যাগ করিবার যো নাই, সমস্তই সত্য। তবে দেশ-কাল-পাত্রভেদে ব্যবস্থা, অধিকারি-ভেদে উপদেশ।" অপর একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শাস্ত্র অক্ষর নয়, কালি নয়, কাগজও নয়। শাস্ত্র জীবন্ত, স্বপ্রকাশ। ঋষিদিগের আশির্বাদে শ্রেণীবদ্ধ উড্ডীয়মান পক্ষীর ঝাঁকের ন্যায় তাহা স্বর্ণাক্ষরে যথাসময়ে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হয়।**

একদিবস গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যদ্বিষক প্রশ্নে গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন—"যাহা দ্বাবা যে প্রয়োজন সাধিত হইবে, তাহা হইয়া গেলে তাহার আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। মহাবীর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণেব অন্তর্দ্ধানের পব, আহিরীদিগের নিকটে পরাস্ত হইলেন। যে গাণ্ডীবদ্বারা তিনি কুরুক্ষেত্র জয় করিয়াছিলেন, তাহা তখন উত্তোলন কবিবার শক্তি নাই; যদিও বহু কষ্টে তুলিলেন, কিন্তু গুণ দিতে পারিলেন না। তখন নিতান্ত দুঃখিত ও অপমানিত হইয়া বদরিকাশ্রমে ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহামতি ব্যাসদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন—"তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলে। তোমার গাণ্ডীব এখন নিষ্প্রয়োজন, উহাব উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গিযাছে। এখন পবলোকে যাহাতে মঙ্গল হয তাহা কর—তপস্যা কর।" সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের যে প্রয়োজন ছিল তাহা সিদ্ধ হইযাছে। পূর্ব্বের ন্যায় বক্তৃতা দ্বারা এখন উহাকে সেইরূপে বজায় রাখিতে চেষ্টা করা বৃথা। এখন ব্রাহ্মদিগের পক্ষে আপন আপন মঙ্গলের জন্য তপস্যায রত হওয়া দরকার।" ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিযাছিলেন—"খৃষ্টধর্ম্মের হস্ত হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা, এবং দেশে স্নীতি প্রচার ও দুর্নীতি পরিহারের জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম আগমন করিয়াছিলেন।"

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য হবিগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ উকিল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদর্শনার্থ তৎসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে হবিগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক গয়াতে গিয়া ওকালতী ব্যবসায় করিতে আদেশ করেন। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্যকরতঃ গয়ায় উপস্থিত হইয়া, শ্রদ্ধেয় বরদাবাবু প্রভুপাদকে তথাকার আকাশগঙ্গা

* স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত।

** গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

পাহাড়ে অবস্থিত তাঁহার যোগদীক্ষা প্রাপ্তির স্থানটীর স্মৃতিরক্ষার আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি তাঁহাকে তৎকার্য্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত স্থানটী সংস্কৃত ও চিহ্নিত করিয়া গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যদ্বয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বসু, বি এল. ও শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এই স্থলে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মতিবাবু ও কতিপয় স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত লোকের উদ্যোগে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এই স্থানে একটী মহোৎসব হইয়া থাকে।

কোন এক সময়ে গোস্বামী-প্রভু জনৈক শিষ্যকে স্বীয় সাধনপ্রণালী অনুসারে সাধন দিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে তিনি বহু লোককে সাধন প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন আচরণ, সাধু শ্রীধর ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দরবেশজী) প্রমুখ গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যদিগের ভাল লাগে না। এই স্থানে অবস্থানকালে এক দিবস শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক, পূর্ব্বোক্ত শিষ্যটীর আচরণ সম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার আলোকচিত্রের (ফটো) নিম্নে তাঁহার নামের সহিত ভগবৎ শব্দ যোগ করিয়া, উহারই আরতি পূজা করেন। কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়াও উহার কোন প্রতিবিধান করেন না। অধিকন্তু তিনি তাঁহার স্ত্রীলোক শিষ্যের দ্বারা পাদ-সম্বাহনাদি সেবা গ্রহণ করেন। এই সকল কথা শুনিয়াই ক্রোধে গোস্বামী-প্রভুর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বটে! স্ত্রীলোকের দ্বারা অঙ্গসেবা গ্রহণ! এত আমাদের সাধনের প্রণালী নয়। আর তিনি ভগবান্ হইয়া বসিলেন নাকি? শিষ্যেরা তাঁহার ফটো ভগবানের আসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে, আর তিনি তাহা অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন! তাহা হইলে আজ হইতে তাহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের সঙ্গে আমরা একত্র হইয়া প্রাণায়ামাদি কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি সেই অঞ্চলের জনৈক শিষ্যকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেন উক্ত শিষ্য ও তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে সকলপ্রকার ধর্ম্ম-সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সাধকদিগের স্ত্রীলোক হইতে সাবধানতা সম্বন্ধে, গোস্বামী-প্রভু তদীয় "যোগসাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহে সাধন করা আবশ্যক। ইহা ঋষি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের পবিত্র সাধন। কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিত্রতার লেশমাত্র প্রবেশ না করে। যতদিন সাধক পবিত্রস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া আপনার প্রবৃত্তি-নিচয়কে সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনিতে না পারেন, ততদিন চরিত্র স্খলনের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনার মধ্যেও তাঁহার থাকা বিধেয় নহে।"

গোস্বামী-প্রভু নিজে এ সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমস্থ তদীয় সাধন-কুটীরে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। তথায় সেই নিয়ম এখনও প্রতিপালিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর স্থানেও একমাত্র দীক্ষার সময় ব্যতীত তাঁহাব আসনগৃহে স্ত্রীলোকেরা প্রবেশ করিতে পাইতেন না। স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহাদের স্বামী, পুত্র অথবা অপর কোন পুরুষ অভিভাবককে সম্মুখে রাখিয়া তবে সাধন প্রদান করিতেন, এবং তিনি কখনও কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা অঙ্গসেবা গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, তিনি, কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াও কথা বলিতেন না। শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে একবার তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কোন কোন কথা বলেন। গোস্বামী-প্রভু নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় ঐসকল কথার উত্তর দিতে থাকিলে, তদীয় ভ্রাতৃবধূ দুঃখিতা হইয়া বলিলেন—"কি বিজয়, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমার ভ্রাতৃবধূ।" তখন গোস্বামী-প্রভু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন—"মা, ক্ষমা করুন, আমি কখনও আপনার মুখ দর্শন করি নাই। তাই আপনাকে চিনিতেছিলাম না।" বর্ত্তমান সংযোগী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের কথা উত্থাপিত হইলে, তিনি ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কঠোর শাসন-মূলক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া উহাদিগের কার্য্যের অবৈধতা সপ্রমাণ করিতেন। শ্লোক যথা :—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
হেরিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"

একদিবস গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে জনৈক ধর্ম্মোম্মত্ত উদাসীন ব্যক্তি গোস্বামী-প্রভুকে প্রদান করিবার জন্য একখানি মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্র দীন গ্রন্থকারের হস্তে অর্পণ করেন। এই পত্রে উক্ত ব্যক্তি তাঁহার গুরু-দেবকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতার প্রতিপন্ন করিয়া তদীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশের ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অবতারের প্রমাণস্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের শচীমায়ের প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উক্তিমূলক নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছিল; যথা—

"আরও দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে,
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার গুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজেকেও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবতার বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত নিমন্ত্রণ-পত্র গোস্বামী-প্রভুর নিকটে পঠিত হইলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"অবতার হয় কৈ? হ'লে ত বেঁচে যেতাম।" পরে বলিলেন—

"শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিবস গৌর শিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে শীঘ্রই অবতার অবতার বলিয়া একটা হুজুগ উঠিবে। তখন অনেকেই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করিবে। এই বলিয়া তিনি আমাকে ঐসকল কপট অবতার হইতে দূর থাকিতে উপদেশ করিয়াছিলেন।" তখন গোস্বামী-প্রভুকে প্রশ্ন করা হইল তবে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য কি? তিনি উত্তর করিলেন,—"ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আর দুই কলিযুগে শচীমাতার গর্ভে জন্মিবেন, এই কলিযুগে যেমন একবার জন্মিলেন, এইরূপ আর দুইবার জন্মিবেন। এই কলিযুগে আর দুইবার জন্মিবেন এ অর্থ নহে, কোন ব্যক্তিতে আবেশ হওয়া, কি কোথাও প্রকাশ হওয়া, সে ভিন্ন কথা। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তাহার পর কলির প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আরও দুইবার হইবে। আমরা ভাবি কতকাল বাকী, কিন্তু ইহা ভগবানের পক্ষে এক মুহূর্ত্তেও নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন, তাঁহারা গঙ্গা-তীরে, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শান্তিপুরের সান্নিধ্যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে, স্বয়ং শচীমাতার গর্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাকেই বুঝিবেন। এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ চট্টগ্রামে কি অন্য কোথাও আবির্ভূত হন, তবে উঁহারা তাঁহাকে বুঝিবেন না। আর ঐরূপভাবে অবতীর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের আর কোন মাহাত্ম্য থাকে না এবং এই তত্ত্বটীও নষ্ট হইয়া যায়। "ভগবান্ কোন যুগে একই কার্য্য লইয়া একইরূপে, দুইবার অবতীর্ণ হন নাই। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও কলিতে একবারমাত্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ কলিতে আর জন্মাইবেন না। তিনি কি মরিয়াছেন যে আবার জন্মাইবেন? "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥" শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলিযুগের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাবৎ কলিযুগ থাকিবে, তাবৎ তিনি জীব উদ্ধার করিবেন। আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ—এই তিনভাবে তাঁহার লীলা হইতেছে, হইবে। তাঁহার লীলা ত শেষ হয় নাই, সেবার মাত্র উঁকি মারিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। দেখনা এখন কেমন খৃষ্টানদের মধ্যেও খোল বাজিতেছে, এমন সময় আসিবে যখন সমস্তই মৃদঙ্গময় হইবে।*

এই স্থানে অবস্থানকালে এক দিবস গোস্বামী-প্রভু, জনৈক শিষ্যকে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং হিন্দি ভক্তমাল, কৃষ্ণকর্ণামৃত, মনোশিক্ষা প্রভৃতি কয়েকখানি বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি অর্পণ করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই সকল গ্রন্থ তিনি বহুদিন পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়া নিজের আসনের কাছে রাখিয়া প্রত্যহ ফুলচন্দনাদি দ্বারা

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

পূজা করিতেন। গোস্বামী-প্রভুর আদেশানুযায়ী উক্ত শিষ্যটী ঐসকল গ্রন্থ কিয়দ্দিন পাঠ করিবার পর, তিনি একদিবস তাঁহাকে ঐসকল গ্রন্থের কিছু কিছু উপস্থিত শিষ্যবৃন্দকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে আদেশ করেন। এবং এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি ঐসকল গ্রন্থরাজীর প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তগুলির বিশুদ্ধত্ব এবং উহাদের প্রণেতা শ্রীমৎ রূপ-সনাতনাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের অসাধারণ বৈরাগ্য, একনিষ্ঠ সাধন, অগাধ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শন—ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, উহাদের প্রণীত গ্রন্থরাজীর উপর দেশের ভাবী ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অতঃপর তিনি পূর্ব্বোক্ত শিষ্যটীকে ঐসকল গ্রন্থরাজীর পুনরুদ্ধারকল্পে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে আদেশ করেন। এবং ঐ সময়ে, লঘুভাগবতামৃত, ষটসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গোস্বামী-পাদগণের যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক নিজের কাছে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐসকল গ্রন্থ এখন পুরীধামে গোস্বামী-প্রভুর সমাধি মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

এইস্থানে অবস্থানকালে একদা "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পূজ্যপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোস্বামী-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। তিনিও তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক নিকটে আহ্বান করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"শীঘ্রই আমাদের দেশে ধর্ম্মের একটী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে। নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মই আবার জাগিবে। তখন তিনি আপনার দ্বারা কিছু কার্য্য করাইবেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র আপনাকে আলোচনা করিতে হইবে। আমার কথা কয়েকটী স্মরণ রাখিবেন, সময়ে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন—ইত্যাদি।" পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সরলভাবে আমাদের নিকটে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কথায় তেমন আস্থা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন না। কারণ তিনি তখন মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বেশী ধার ধারিতেন না, মিল (Mill), স্পেনসার (Spencer) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সংশয়বাদীদিগের গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই সময় কাটাইতেন; এবং ডাক্তারী ব্যবসায় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পরে তিনি স্বীয় অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইলে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তীকালে সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া, বিদ্যাভূষণ মহাশয় "গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ," "শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ ও "নীলাচলে ব্রজ মাধুরী" প্রভৃতি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি উপাদেয় গ্রন্থসকল রচনা ও প্রকাশ করিয়া, সমগ্র বৈষ্ণবসমাজকে অত্যধিক কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এযাবৎ তিনি গোস্বামী-প্রভুর

ভবিষ্যৎবাণীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পরে দৈবাৎ এক দিবস তাঁহার জনৈক শিষ্যের সহিত তৎপ্রবর্ত্তিত নাম-ব্রহ্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গোস্বামী-প্রভুর নিকট অশেষবিধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তদবধি তিনি অধিকতর আগ্রহ সহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এইস্থানে এক দিবস জনৈক অপরিচিত বামাচারী সাধু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আপনার কাছে যে টাকা আছে তাহা আমাকে প্রদান করুন।" গোস্বামী-প্রভু কোন বাক্য-ব্যয় না করিয়া, শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী-মহোদয়কে, ভাণ্ডারে যাহা আছে সমস্তই সাধুকে প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার নিকটে তখন একশত টাকার অধিক ছিল। কিন্তু এই আদেশ পাইবামাত্রই তিনি তাহা সাধুটীকে অর্পণ করিলেন। অতঃপর সাধুটী গোস্বামী-প্রভুর আসন-গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ কম্বল, গরম কাপড়, আলখেল্লা ইত্যাদি যে স্থানে যে ভাল জিনিষটী দেখিতে লাগিলেন, নিঃসঙ্কোচে তাহাই চাহিতে লাগিলেন, এবং গোস্বামী-প্রভুও অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে একে একে সেই সকল বস্তু প্রদান করিতে লাগিলেন ; এই প্রকারে অনেক বহুমূল্য জিনিসপত্র সংগ্রহকরতঃ সাধুটী গমনোদ্যত হইয়া গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন যে, তিনি পুনরায় আগমন করিয়া তাঁহার আশ্রমে আহার করিবেন। গোস্বামী-প্রভু সানন্দচিত্তে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলে, তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং তাঁহার সহজলভ্য দ্রব্যাদির কিছু কিছু উপস্থিত ২।৩ জন ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া শকটারোহণপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন, কিন্তু আহার করিতে আর প্রত্যাগমন করিলেন না। গোস্বামী-প্রভু তাঁহার প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলেন। পরে জানা গেল যে লোকটী প্রকৃত সাধু নহেন, একজন ভণ্ড তপস্বী। কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা, গোস্বামী-প্রভু সর্ব্বদা ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরপূর্ব্বক্ কিরূপ নির্লিপ্তভাবে ও সম্পূর্ণ অনাসক্তচিত্তে কালযাপন করিতেন, তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই মর্ম্মে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করে যে, গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমে মাসিক অন্যূন ৪।৫ শত টাকা ব্যয় হয়, অথচ তাঁহার এক কপর্দ্দকও আয় বা উপার্জ্জন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে পুলিশের দিক্ হইতে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত। এইরূপ পত্র পাইয়াই পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ ডাকঘরে এবং অপরাপর স্থানে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গোস্বামী-প্রভু বিশ্বস্তসূত্রে এই ব্যাপার অবগত হইয়াও, ইহার কোন

প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঘোষ মহাশয় এক দিবস রাজপথে শতাধিক মুদ্রার একখানি চেক্ কুড়াইয়া পাইলেন। চেক পাইয়া তিনি গোস্বামী-প্রভুকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, 'কেন তিনি পরের দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন ?'—এই বলিয়া গোঁসাইজী তাহাকে তীব্র ভৎসনা করিয়া চেকখানি তখনই পুলিশ কমিশনারের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ; এবং 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় চেকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভুর এই কার্য্যে পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষের মনে তাঁহার প্রতি যে অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইল। এই প্রকারে ভগবান্ গোস্বামী-প্রভুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। দুষ্টদিগের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না।

এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর সুযোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের উপর আশ্রমের আয়-ব্যয় নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হয়। অধিকবয়স্ক শিষ্য উপস্থিত থাকিতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যোগজীবন গোস্বামীর উপর এই দায়িত্বপূর্ণ গুরু ভার প্রদত্ত হইল দেখিয়া, স্বর্গীয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"আমি কি করিব ? মহাপুরুষগণ যোগজীবনকেই এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের আদেশেই আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।"

ইদানীং গোস্বামী-প্রভু নিজে কাহারও কোন চিঠিপত্রাদি দেখিতেন না, অথবা স্বহস্তে কোন চিঠি লিখিতেন না। ঐ সকল কার্য্যের ভার পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। শত শত লোক সাধনপ্রার্থী হইয়া, গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আপন আপন জীবনের গূঢ় পাপকার্য্যের কথা বিবৃতকরতঃ দৈন্য প্রকাশ করিয়া পত্রাদি লিখিলে, পরদুঃখকাতর স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয় সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া অনেক সময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এবং নির্জ্জনে গোস্বামী-প্রভুর নিকটে উহার মর্ম্ম অবগত করাইয়া, সাধন-প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অনুকূল অনুমতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। একদিবস গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"দেখ্ যোগজীবন, তুই আর পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মার্থীদিগের সাধন-প্রাপ্তির অনুমতির জন্য আমার অপেক্ষা করিস কেন ? তুই একটু চিন্তা করিয়া যাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিবি, তিনিই সাধন পাইবেন।" কিন্তু পিতৃভক্তের শিরোমণি প্রভুপাদ যোগজীবন পিতৃদেবের অনুমতি ভিন্ন কাহারও কোনও চিঠির উত্তর প্রদান করিতেন না। "পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন"—এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ যোগজীবন গোস্বামী স্বীয় পিতৃদেবের অমানুষিক তেজস্বিতা,

জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, অনধিগম্য উদারতা, অলোকসামান্য পরদুঃখকাতরতা, অপরিসীম দয়া, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে সমলঙ্কৃত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পিতাপুত্র একস্থানে বসিয়া যখন দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ক কথোপকথন করিতেন, তখন পুরাকালের নর-নারায়ণ ঋষির কথাই স্বতঃ মনে উদিত হইত। ইনি গোস্বামী-প্রভুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার, দান, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। এমন পিতৃভক্ত পুত্র বঙ্গদেশে অতীব দুর্লভ।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম সাধারণ মনুষ্য হইতে ভিন্নরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতু বন্ধ থাকে, কিন্তু পূজনীয় যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের জন্মের সময়ে ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রে এই লক্ষণকে মহাপুরুষের জন্মলক্ষণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১২৭৬ সনের ২৯ অগ্রাহায়ণ সোমবার, শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে, ঢাকা সহরের পাতলাখাঁর গলিস্থিত ৩নং ভবনে যোগজীবন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বালসুলভ চপলতার সঙ্গে সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, দয়া, তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ মিশ্রিত থাকাতে, ইঁনি মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও গোস্বামী-প্রভুর অপরাপর শিষ্যমণ্ডলীর অতীব প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে দয়াবৃত্তি কিরূপ পরিস্ফুট হইতেছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে। অনুমান ৫।৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একবার জনৈক গরীব লোক শাকসব্জী বিক্রয় করিতে আশ্রমে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি ২।১ পয়সার শাক ক্রয় করিয়া, ফাওস্বরূপ পুনরায় কিঞ্চিৎ শাক লইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শ্রীমান্ যোগজীবন তীব্রভাবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"ইহারা গরীব লোক, এই শাক বিক্রয় করিয়া ইহারা সকলে খাইবে। ইহাদের ঠকাচ্ছ কেন?" এই অল্পবয়স্ক বালকের মুখে এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া আশ্রমস্থ সকলে অবাক্ হইলেন। সংসারের লোকসকল নিজের সুখ-সুবিধা অনুসন্ধান করিতে করিতে এতই অন্ধ হইয়া পড়ে যে, অপরের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তাহাদের অবসরই থাকে না। কিন্তু শ্রীমান্ যোগজীবনের ন্যায় যাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখানুভব করেন, সংসারে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই নমস্য।

শ্রীমান্ যোগজীবন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়েই লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদি ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপই হইয়াছিল। সন্ধ্যা-বন্দনা, উপবীত-ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। কিন্তু গোস্বামী-প্রভু তাঁহার উপবীত-সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, নিজে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে ৺কাশীধামের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীজীর

সঙ্গ করিতে আদেশ করেন। পিতৃভক্তের শিরোমণি শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী পিতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র স্বামীজীর নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মাদক দ্রব্যাদি দ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাঁহার ভাল বোধ না হওয়াতে তিনি গোস্বামী-প্রভুকে বলিলেন—"আপনি আমাকে কাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন ? ইঁহার আচরণ তো আমার মোটেই ভাল লাগে না।" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"তুই যা ব'লছিস্ সত্য, কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যে প্রকৃত গুণ আছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহা যদি তোর চক্ষে পড়ে, তবে তুই ধন্য হইয়া যা'বি।" এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। একদিবস তিনি স্বামীজীর সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে জনৈক ভক্ত সাধক একতারা বাজাইয়া তাঁহার নিকটে শ্যামাবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। গান শুনিতে শুনিতে স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিল ; অবশেষে তিনি ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর শ্বেতবর্ণাভা ধারণ করিল এবং ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশিত হইল! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পূজ্যপাদ যোগজীবন ভাবাবেশে স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। প্রণাম করিবামাত্র স্বামীজী তাঁহার গলদেশে উপবীত না দেখিয়া বলিলেন—"কি রে, তোর উপবীত কোথায় ?" যোগজীবন বলিলেন—"আমার উপবীত হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া স্বামীজী তাঁহার জনৈক সেবককে একটী উপবীত আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। উপবীত আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে উহা পরাইয়া দিলেন। স্বামীজীর দেহে জগদগুরু মহাদেবের প্রকাশ দর্শন করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মোহিত হইয়াছিলেন ; এখন তাঁহার এই প্রকার অযাচিত কৃপা প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর তিনি গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিলে, তিনি তাঁহার গলদেশে উপবীত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, তোকে যে জন্য স্বামীজীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।"*

প্রভুপাদ যোগজীবন বাল্যকাল হইতেই শুকদেবের ন্যায় তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত ছিলেন। তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অবশেষে যদিও স্বীয় মাতৃদেবীর অনুরোধে বিবাহ করেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই বিপত্নীক হন, পুনরায় বিবাহ করেন নাই।

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী মহামতি কর্ণের ন্যায় দাতা ছিলেন। দান সম্বন্ধে ইঁনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতেন না। ধনী কি দরিদ্র, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, সাধু কি অসাধু যে কেহ যে কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইনি

* প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের মুখে শ্রুত।

তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। হাতে অর্থ না থাকিলে ঋণ করিয়া পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। এই সকল ঋণের জন্য তাঁহাকে লোকসমাজে সময়ে সময়ে অপদস্থ হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি সে দিকে কখনও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মসংস্থাপনকারীদিগের অগ্রগণ্য গোস্বামী-প্রভুপাদের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্যই ইঁনি আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি সানন্দচিত্তে শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। ১৩১২ সনের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিবস, ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, রুগ্ন দেহ লইয়া কলিকাতা হইতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আগমনকালে, ঢাকার নিকটবর্ত্তী তালতলা নামক স্থানে তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। অনুগত শিষ্য ও সতীর্থগণ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ সৎকারপূর্ব্বক, সেই স্থানে তাঁহার নামে একটী মন্দির উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।

কার্ত্তিক মাসে এইস্থানে গোস্বামী-প্রভুর আদেশে আকাশ-প্রদীপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন--"কার্ত্তিক মাসে অনেক মহাপুরুষ সূক্ষ্ম-শরীরে শূন্যপথে গমনাগমন করেন। তখন তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকই পবিত্র হইয়া যায়। এই সকল মহাপুরুষদিগের দৃষ্টি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি আকর্ষণ করা আকাশ-প্রদীপ প্রদানের একটী উদ্দেশ্য।"* এতদ্ভিন্ন আকাশ-প্রদীপ প্রদানের মাহাত্ম্য "হরিভক্তিবিলাসে" উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা ঃ—

উচ্চৈঃ প্রদীপমকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

পদ্মপুরাণ-ধৃত শ্লোক, ১৬ বিলাস।

অর্থাৎ—যে মানব কার্ত্তিক মাসে উচ্চ আকাশে প্রদীপ দান করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।"

মাঘ মাসে এইস্থানে ৺সরস্বতী পূজা হয়। গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহকে পুষ্প-চন্দনের দ্বারা পূজা করিয়া আবির ও মালা প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর ফাল্গুন মাস আগমন করিলে, গোস্বামী-প্রভু স্বীয় গুরুদেবের আদেশে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পুরীধামে গমন করেন।

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পুরীধাম যাত্রা, শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান ও লীলা সংবরণ।

১৩০৪ সনের ২৪শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে, কলিকাতা কয়লাঘাটা হইতে একখানি ষ্টীমলঞ্চ সংযুক্ত বজরাতে আরোহণ করিয়া গোস্বামী-প্রভু প্রায় পঞ্চাশ জন শিষ্য-সমভিব্যাহারে কেনেলের পথে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন; কারণ, পুরীর রেলপথ তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ষ্টীমলঞ্চের সহিত দুইখানি বজ্‌রা সংবন্ধ করা হইয়াছিল। একখানিতে পতিপুত্রসহ শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবী, গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য সস্ত্রীক শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ও কতিপয় আত্মীয়সহ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন মজুমদার এবং অপরখানিতে সশিষ্য গোস্বামী-প্রভু অরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ষ্টীমারের স্বত্বাধিকারী সাহেব কোম্পানির বড়বাবু এবং গোস্বামী-প্রভুর প্রিয়ভক্ত সোমরা-নিবাসী সাধনশীল সৎধর্ম্মপরায়ণ শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় হরিনারায়ণ রায় মহাশয় সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুর সাহায্যার্থে পথ-প্রদর্শকরূপে ষ্টীমলঞ্চে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় সুরেন্দ্র-চন্দ্র বসু, স্বর্গীয় রাধারমণ গুহ, ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ভুতনাথ ঘোষ প্রভৃতি বহু শিষ্য এবং হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মধর্ম্মালম্বী শ্রদ্ধেয় উমাপদবাবু প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। বিদায়কালে শ্রদ্ধেয় চারুবাবু গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা কিভাবে দিন যাপন করিব?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর শ্রীক্ষেত্র যাইবার সময়ে তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন। উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—'ঘরে কর নামসংকীর্ত্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন।" অতঃপর গোস্বামী-প্রভু স্বর্গীয় মনোরঞ্জনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" তিনি সাশ্রুনয়নে উত্তর করিলেন—"আমরা আপনাকে কি আশীর্ব্বাদ করিব?" গোস্বামী-প্রভু বলিলেন, "এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জগন্নাথদেব আমাকে গ্রহণ করেন।" গোস্বামী-প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। একজন ভক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতি কষ্টে তাঁহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে গোস্বামী-প্রভু ষ্টীমার খুলিতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ষ্টীমলঞ্চ সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে বহন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইল। যতদূর দৃষ্টি চলে তীরস্থিত ভক্তবৃন্দ সতৃষ্ণনয়নে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; অবশেষে ষ্টীমার অদৃশ্য

হইলে, না জানি কি গভীর মর্ম্মবেদনা হৃদয়ে বহন করিয়া সকলে ধীরে ধীরে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে গোস্বামী-প্রভু সহযাত্রী শিষ্যদিগের সহিত শ্রীক্ষেত্রের মহিমা, মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণাব্যঞ্জক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শিষ্যবৃন্দের উৎসাহ, আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা গুরুদেবকে বেষ্টন করিয়া গোবিন্দদর্শনে চলিয়াছেন, যে স্থানে সংকীর্ত্তনের শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব একাদিক্রমে ১৮ বৎসর বাস করিয়া ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইতেছেন, এই আনন্দেই তাঁহারা বিভোর। কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহাদের প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জগমনমোহন লীলারস-সায়রে চিরবিসর্জ্জন দিতে লইয়া চলিয়াছেন, এ কথা তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। সে যাহা হউক, এইরূপে শিষ্যদলসহ গোস্বামী-প্রভু সপার্ষদ মহাপ্রভুর ন্যায় মনের আনন্দে হরিনাম করিতে করিতে নীলাচল-চন্দ্র দর্শন করিতে চলিয়াছেন। পাঠ, পূজা, কীর্ত্তনাদি গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যসমূহ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে দিবস যে স্থানে ষ্টীমার লাগান হইত, সেই দিনই তথায় যেন একটী আনন্দের বাজার বসিয়া যাইত। স্থানীয় বহু লোক শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত এই অপরূপ সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিত। কলিকাতা হইতে হরিবোলানন্দ (গাড়ুদাস বাবাজী) নামক একজন নিষ্ঠাবান্ সাধু গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গ ধরিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সন্নিকটে বসিয়া একতারা সংযোগে নাম-সাধন করিতেন। দোলপূর্ণিমার দিবস পথিমধ্যে কেনেলের একটী ব্লকে ষ্টীমার লাগিলে, তথাকার ডাকবাঙ্গলায় মহানন্দে দোলোৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছিল। আবিরাদি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য শিষ্যগণ কলিকাতা হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপে মহানন্দে ভাসিতে ভাসিতে পুরুষোত্তমযাত্রীর দল পঞ্চম দিবসে কটক সহরে উপনীত হইলেন। বরিশাল, নারায়ণপুর-নিবাসী শ্রদ্ধেয় দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী (পণ্ডিত), বানরিপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় ললিত-মোহন গুহ প্রভৃতি অপর একদল শিষ্য ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে সমুদ্র-পথে চাঁদবলী হইয়া কটক আগমনপূর্ব্বক গোস্বামী-প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অদ্য অপরাহ্নে অনুমান ৫ ঘটিকার সময়ে দুই দল একত্র মিলিত হইলে একটী অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। নিকটস্থ দোকানে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে আনন্দ-সহকারে ভোজন করিলেন; গোস্বামী-প্রভুকে আহার্য্য বস্তু বজ্‌রাতে আনাইয়া দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তথায় তাঁহার প্রসাদ পাইলেন।

পরদিবস প্রাতে চা পান করিয়া অনুমান আট ঘটিকার সময়ে সশিষ্য গোস্বামী-প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্মরণ করিয়া কটক হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তি বারং ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। বারং হইতে পুরী পর্য্যন্ত তখন রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোস্বামী-প্রভু অশ্ব-যানে, স্ত্রীলোকেরা গো-যানে ও অপরাপর শিষ্যগণ পদব্রজেই গমন করিয়াছিলেন। বারং হইতে ১২টার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে পুরুষোত্তমযাত্রীর দল নির্ব্বিঘ্নে পুরীর পুরাতন ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। এইস্থান হইতে পুরী সহর ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত।

গোস্বামী-প্রভুকে কেহ কেহ অশ্ব-যানে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি পুরী-ধামের পঞ্চক্রোশের মধ্যে যানারোহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং যতদিন পুরীতে ছিলেন, কখনও কোন প্রকার যানে আরোহণ করেন নাই। সে যাহা হউক, গোস্বামী-প্রভুর গমন বিষয়ে সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কারণ তিনি ইদানীং একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যষ্টি কিংবা মানুষের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। শিষ্যদিগকে চিন্তাকুল দেখিয়া তিনি বলিলেন—"যিনি আমাকে কলিকাতা হইতে এতদূর আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই এখন হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন, তজ্জন্য তোমরা ভাবিও না।" এই বলিয়া তিনি দুইটী শিষ্যের স্কন্ধে ভর করতঃ হস্তে যষ্টিধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, বড় রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী একখানি ঘরের বারাণ্ডায় বিশ্রাম করিতে বসিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ কয়েকজন পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকটে কিছু প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক দুই এক টাকা করিয়া প্রণামী দিলে, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার পর হইতেই তিনি স্বীয় দেহে অমানুষিক বল অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সহরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শিষ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। এই প্রকারে আঠারনালার পুলের নিকট উপনীত হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। গোস্বামী-প্রভু ধ্বজা দর্শনপূর্ব্বক মহাভাবে বিভোর হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং গাত্রোত্থান করিয়াই হরিনামের সিংহনাদে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব তাড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইল। শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ভাবাবেশে গান ধরিলেন—

"যাঁদের হরি ব'লতে নয়ন ঝরে,
ঐ দেখ্ তাঁরা দু'ভাই এসেছে রে।
গৌর-নিতাই ভক্ত সঙ্গে এসেছে রে।"—ইত্যাদি।

অপরাপর শিষ্যগণ সাগ্রহে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। গোস্বামী-প্রভুর

অন্যতম শিষ্য, অনুরাগী ভক্ত স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সুমধুর মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। শ্রবণমঙ্গল হরিনাম কীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে লাগিল। এইভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা নরেন্দ্র সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভু জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক সরোবর হইতে জল আনয়নপূর্ব্বক, মহাভাবে মাতোয়ারা শিষ্যদিগের চোখে মুখে, কি জানি কিভাবে বিভাবিত হইয়া ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় বিধুবাবুর চক্ষে জল দিবামাত্র তিনি ভাবে এতদূর উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার কিছুই বাহ্য লক্ষ্য রহিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বুক পাতিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রাণ গোস্বামী-প্রভুর পথ চলিতে পায়ে কঙ্করাদি বিদ্ধ হইতেছে, ইহা যেন তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেছেন না ; তাঁহার মনোগত ভাব এই যে, গোস্বামী-প্রভু তাঁহার বুকের উপর দিয়াই গমন করেন, তাই বক্ষ পাতিয়া দিতেছেন ! এমন সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে 'কালিয়া পাগলা' নামক একজন উড়িষ্যাবাসী ছদ্মবেশী সাধু কীর্ত্তনে যোগদানপূর্ব্বক উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে, যেন এই নবাগত যাত্রীদিগকে পথ দেখাইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী লোকসমূহ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলের দৃষ্টিই বিশেষ-ভাবে গোস্বামী-প্রভুর উপর নিপতিত হইল। তাঁহারা এই ক্ষেত্রে অনেক সাধু, অনেক দীর্ঘ জটাধারী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর ন্যায় এমন অপরূপ রূপ, এমন সুশোভন জটাবিমণ্ডিত লম্বোদর পুরুষ যেন আর কখনও দর্শন করেন নাই। গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গীয় লোকদিগের ভাবাবেশ দর্শন করিয়াও উপস্থিত জনমণ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ! চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই পথ দিয়াই অনেকবার শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-সীতানাথ ভক্তসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। অদ্যকার এই দৃশ্য অবলোকন করিয়াও, সকলের মনে যুগপৎ সেই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। নাম-মদিরায় মাতোয়ারা শ্রীধামযাত্রীর দল এইভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে যেন অজ্ঞাতসারেই সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পাণ্ডা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বড়দণ্ডস্থিত একটী দোতালা বাটীতে উপনীত হইলেন।

গোস্বামী-প্রভু তীর্থগুরু হরেকৃষ্ণ খুটিয়ার পদ-পূজা করিলেন। ইঁনি, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাণ্ডা ঠাকুর কানাই খুটিয়ার বংশধর। অপরাপর শিষ্যগণও গোস্বামী-প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, তীর্থ-গুরুর পদ পূজাকরতঃ অপার শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর, পাণ্ডাদিগের অনুরোধে শিষ্যগণ গোস্বামী-প্রভুকে পরিবেষ্টন করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াই তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে

লাগিলেন। হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীক্ষেত্রে ৺জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতি, বর্ণ কিংবা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর শিষ্যদিগের মধ্যে উচ্ছিষ্ট-সংস্কার অতীব প্রবল। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন কি না বলিয়া ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। গোস্বামী-প্রভুর শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী শ্রীক্ষেত্রের পথে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা, অপর জাতীয় লোকের ভুক্তাবশিষ্টের কথা দূরে থাকুক, তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদিও কখনও ভোজন করিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং যতকাল পুরীতে থাকিবেন, ততকাল তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়াই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই প্রসাদ সম্বন্ধে উচ্ছিষ্ট-সংস্কার তিরোহিত হইল। তিনি সকলের ভোজনপাত্র হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। কোথায় গেল তাঁহার বর্ণ বিচার। কোথায় গেল উচ্ছিষ্ট-সংস্কার! ক্রমে ক্রমে অপরাপর শিষ্যগণও পরস্পর পরস্পরের পাতা হইতে ভোজন করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু ইতঃপূর্ব্বেই পাণ্ডার মুখনিঃসৃত কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভোজন করিয়া সকলকে পথ দেখাইয়াছিলেন। এখন তিনি শিষ্যমণ্ডলীর ভোজন-পাত্র হইতে কিছু কিছু প্রসাদ সংগ্রহপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া মহাপ্রসাদের অপার মহিমা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামের রজের (ধূলির) প্রভাব ও শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অতিশয় প্রত্যক্ষ। যিনি যতই অবিশ্বাসী নাস্তিক হউন না কেন, বৃন্দাবনের রজে একবার 'জয়রাধে শ্রীরাধে' বলিয়া গড়াগড়ি দিতে পারিলেই যে তাঁহার নাস্তিকতা দূর হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীক্ষেত্রে অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ, বহু যতী সন্ন্যাসী, যাঁহারা জীবনে কখনও অপরের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন নাই, তাঁহারাও মহাপ্রসাদের নিকট হার মানিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই গোস্বামী-প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পান্ডারা বলিলেন, আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অদ্য বিশ্রাম করুন, কল্য দর্শন করিবেন। গোস্বামী-প্রভু তদুত্তরে বলিলেন— "কি জানি, মৃত্যুর কোন স্থিরতা নাই, সুতরাং অদ্যই দর্শন করিতে হইবে।" এই বলিয়া রাত্রি অনুমান ৭॥ ঘটিকার সময়ে ৺জগন্নাথদেব দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবামাত্রই তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং স্থিরনেত্রে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া, যেন কত কালের পরিচিতের ন্যায় হাত ঘুরাইয়া, মুখ নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে কত কি বলিলেন, কতই মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইতে লাগিলেন; অবিরলধারে তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গোস্বামী-

প্রভুর শিষ্যবৃন্দ, মন্দিরের পাণ্ডা-প্রহরী ও অপরাপর যাত্রিগণ অবাক্ হইয়া তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, গোস্বামী-প্রভু ভাব সংবরণপূর্ব্বক পাণ্ডাদিগকে তাঁহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া, শিষ্যগণসহ স্বীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই বাটীতে নানারূপ অসুবিধা বোধ হওয়াতে, পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বড়দণ্ডস্থিত ৺নীলমণি বর্ম্মণের বাটিতে আগমন করেন। এই বাটিতেই অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু যখনই যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহই পাঠ, পূজা, কীর্ত্তন, ধর্ম্মালোচনা, অতিথিসেবা, ভিখারীদিগকে ভিক্ষাদান, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদিকে তাহাদের উপযুক্ত আহার্য্য ও বৃক্ষলতাদিকে জলদান ইত্যাদি কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। একটি দিনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই। পুরীতেও এই সকল নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। আশ্রম হইতে ভিখারীগণকে ভিক্ষা, কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ, বানরদিগকে কলা, আম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, পক্ষীদিগকে চাউল, গো মেষ ইত্যাদিকে তাহাদের আহার্য্য প্রদান করা হইত। পাঠ-পূজাদি যথাসময়ে সম্পন্ন হইত এবং সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন ও হরির লুট হইত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার দৃষ্টি গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

পুরী আগমন করিবার কিয়দ্দিন পরে তিনি শিষ্যদিগকে কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"এই স্থানে সুস্থ শরীরে থাকিতে হইলে প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে তৈল মাখিয়া স্নান করা উচিত, পুরাতন তেঁতুল সহযোগে কিঞ্চিৎ পাকাল প্রসাদ ভোজন করা উচিত, এবং প্রখর রৌদ্রের সময়ে ভ্রমণ বন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন।"

অতঃপর গোস্বামী-প্রভু ক্রমে ক্রমে মার্কণ্ডেয় সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, চক্রতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডিচা মন্দির, মহাপ্রভুর গম্ভীরা, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাটী, সিদ্ধ-বকুল, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, গোবর্দ্ধন মঠ প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের দ্রষ্টব্য স্থান সকল দর্শন এবং তীর্থকৃত্যসকল যথাশাস্ত্র তীর্থগুরুর অনুগত হইয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ৺জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, চন্দনযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বগুলিও যথাসময়ে শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুর আদেশে শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকে মহাপ্রসাদের দ্বারা যথাশাস্ত্র পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভু পুরী আগমন করিবার কয়েকদিন পরে তিনি তদীয় অন্যতম সেবক যুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দিরসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ আনয়নপূর্ব্বক

সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রত্যহ তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিতেন। পুরীধামে গোস্বামী-প্রভুর সমাধি-মন্দিরে এই বিগ্রহত্রয় এখনও পূজিত হইতেছেন।

কালের কুটিল আবর্ত্তনে সকল তীর্থেরই তীর্থাধিষ্ঠিত দেবতাদিগের সেবার কার্য্যে অল্পাধিক পরিমাণ উচ্ছৃংখলতা ও অনিয়ম আরম্ভ হইয়াছে। শাস্ত্রমতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঠাকুর দেবতার মঙ্গল আরতি ও পূর্ব্বদিনের নির্ম্মাল্য (পুষ্পাদি) অপসারিত করা কর্ত্তব্য।* কিন্তু আজকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে এ নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে না। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃকালের ভোগ মধ্যাহ্নে দেওয়া হইতেছে, মধ্যাহ্নের ভোগ সন্ধ্যায় দেওয়া হইতেছে ইত্যাদি। এই বৎসর রথযাত্রার দিনও ঠাকুরকে তিথি নক্ষত্র অনুসারে যথাসময়ে রথস্থ করা হয় নাই। ইহাতে গোস্বামী-প্রভু অতীব দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "শাস্ত্রে আছে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে রথে জগন্নাথ দর্শন করিলে, 'রথস্থ বামনং দৃষ্টবা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে—ইত্যাদি' —শাস্ত্রবর্ণিত জগন্নাথদেব-দর্শনের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই দর্শনটী ঠিক সময় মত হওয়া চাই। নক্ষত্র না হইলে অন্ততঃ দ্বিতীয়া তিথিটী হওয়া চাই-ই।" এই বলিয়া তিনি আর রথযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিলেন না, গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়াই ঠাকুর দর্শন করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু পুরীর মন্দিরের সেবার এই প্রকার বিশৃঙ্খলা ও সেবকদিগের অবহেলা সন্দর্শনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিবিধানকল্পে শাস্ত্রযুক্তির সহায়তায় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে পরবর্ত্তীকালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে অনেক বিষয়ের সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

পুরীধামে অবস্থানকালে সাধারণতঃ যে কয়েকটী কার্য্যের জন্য গোস্বামী-প্রভু সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বানর বধ নিবারণ, ৺জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন পায়খানার উচ্ছেদ সাধন ও তাঁহার দান-যজ্ঞ ব্যাপার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মর্কটদিগের ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে বধ করিতে আরম্ভ করেন। পুরীবাসীর এইরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহারে গোস্বামী-প্রভু এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, তিনি অনেক সময়ে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন

---

* তথৈব রাত্রিশেষান্ত কালং সূর্য্যোদয়াবধি।
কর্ত্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধকেন বৈ। বৈহায়সপঞ্চরাত্রং।
অরুণোদয় বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ।
প্রাতস্তস্যাম্মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ।
অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্রপ্রহারবৎ। নরসিংহ পুরাণ।
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৩য় বিলাস, ৬৬, ৮১ শ্লোক।

এবং একদিন ইহার প্রতিবিধানকল্পে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানস্থিত ৺মহাবীরের মন্দিরে যথাসাধ্য ভোগ মানস করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মর্কটদিগের প্রতি গোস্বামী-প্রভুর ও তদীয় শিষ্যদিগের সহানুভূতির বিষয় জানি না কি প্রভাবে অবগত হইয়া, তাহারা দলে দলে গোস্বামী-প্রভুর বাসভবনে আগমনকরতঃ বিবিধ প্রকার হাব-ভাব দ্বারা তাহাদের ঘোর বিপদের কথা প্রকাশ করিত; এবং এক দিবস বড়দণ্ড নামক রাস্তায় জনৈক শিকারীকে দেখিয়া একটী বানর দৌড়িয়া আসিয়া দীন গ্রন্থকারের পদধারণপূর্ব্বক্ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিল। অতঃপর শিকারীর সন্ধান পাইলেই বানরগণ সন্তানসন্ততিসহ গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হইত; এবং তিনিও তাহাদিগকে অতিশয় আদরের সহিত আম্র, কলা—ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্য সকল খাইতে দিতেন। বানরগণও নির্ভয়চিত্তে তাঁহার আসনের নিকটে বসিয়া আহার করিত।

অতঃপর গোস্বামী-প্রভুর আদেশে শিষ্যগণ বানর বধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুক্তির সহায়তায় প্রকাশ্য পত্রিকায় তীব্র আন্দোলন করিতে থাকিলে, তদানীন্তন সহৃদয় ছোটলাট উডবরণ্ সাহেব বানর বধ রহিত করিয়া দেন। বানর বধের অবৈধতা ও অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ক ব্যবস্থাপত্রে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ., রিপন কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কটক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় নীলকণ্ঠ মজুমদার এম. এ, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম. এ., মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পূজ্যপাদ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বঙ্গ, উৎকল ও বারাণসীবাসী প্রায় ৫০।৬০ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মর্কট বধ বন্ধ হইলে, গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্বোক্ত ৺মহাবীর ঠাকুরকে ষোড়শোপচারে পূজা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় মিউনিসিপালিটী মন্দিরের সেবকদিগের সুবিধার জন্য মন্দিরের প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন করিয়া একটী পায়খানা প্রস্তুত করেন। ইহাতে গোস্বামী-প্রভু আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, শাস্ত্রমতে প্রাচীরাদি সমন্বিত সমগ্র মন্দিরটাই ভগবানের দেহস্বরূপ এবং তন্মধ্যস্থিত বিগ্রহ ঐ দেহের আত্মাস্বরূপ,* সুতরাং শাস্ত্রমতে কিছুতেই মন্দিরের গাত্রে পায়খানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে

* প্রাসাদং বাসুদেবস্য মূর্ত্তিভূতং নিবোধ মে।
মুখং দ্বারং ভবেদস্য প্রতিমা জীব উচ্যতে।
এতচ্ছক্তিং পিণ্ডিকাং বিদ্ধি প্রকৃতিঞ্চ তদাকৃতিং॥
নিশ্চলত্বং গর্ভোঽস্য অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ॥
এবমেষ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রসাদত্বেন সংস্থিতঃ॥
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১৯ বিলাস ১৯৭ শ্লোক।

না। অতঃপর তদীয় শিষ্যবর্গ ও বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই বিষয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলে, পূর্ব্বোক্ত মহামতি উডবরণ সাহেবের আদেশে মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ পায়খানা ভগ্ন করিয়া ফেলেন।

গোস্বামী-প্রভুর তৃতীয় কার্য্য দান-যজ্ঞ। তিনি পুরীতে পদার্পণ করিয়াই যে দানসত্র খুলিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া একটী বিরাট দানসাগরে পরিণত হইয়াছিল। এই দান ব্যাপারে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, জাতিবর্ণ বিচার ছিল না, সাধু-অসাধু বিচার ছিল না। যিনি যে অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহার তাহাই মোচন করা হইয়াছে। কেহ আসিয়া বলিলেন, অর্থাভাবে তাঁহার পুত্রের উপনয়ন কার্য্যে সমাধা হইতেছে না, দাও উঁহাকে ১০্ টাকা; কেহ বলিলেন তাঁহার ঘর মেরামত করিতে পারিতেছে না, দাও উঁহাকে ২০্ টাকা; কেহ বলিলেন তাঁহার দেশে যাইবার রেলভাড়া জুটিতেছে না, দাও যাহা প্রয়োজন। ভাণ্ডারে একটি পয়সা থাকিতেও দিবানিশি এইভাবেই দানকার্য্য চলিয়াছিল। টাকার অভাব হইলে ঋণ করিয়াও দান কবা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এমার-মঠে দুই হাজার ব্রাহ্মণকে বস্ত্রদান, বড় আখড়ায় চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ৫ হাজার সাধুদিগকে ভোজন ও তাঁহাদের প্রত্যেককে এক একটী করিয়া লোটা ও ৮ হস্ত পরিমিত বস্ত্র দান, বড় দণ্ডের প্রায এক হাজার কাঙ্গালীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারা ভোজন এবং বহু পূজারী পাণ্ডাকে গরদের বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান, গোস্বামী-প্রভুর দান-যজ্ঞের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বড় আখড়ার চারি সম্প্রদায়ের সাধু-সেবার দিবস জনৈক প্রসাদ-বহনকারী মুটে এক আটিকা (ভাড়) কানিকা (মিষ্ট পলান্ন) প্রসাদ অপহরণ করিয়াছিল। ঘটনাটী গোস্বামী-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি লোকটীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন যে গোস্বামী-প্রভু ঐ ব্যক্তিকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবেন, তিনি অন্ততঃপক্ষে তীব্র ভৎর্সনা করিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে আরও চারি আটিকা প্রসাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্যই আনা হইয়াছে। তোমরাও উহা আহার করিবার জন্যই লইয়াছ, এক আটিকায় কি হইবে? আরও চারি আটিকা লও, এবং ঘরে গিয়া দশজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাও।" সাধুসেবার জন্য আনীত দ্রব্যের অপহরণকারীর প্রতি গোস্বামী-প্রভুর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া উপস্থিত সকলে একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সংসারক্ষেত্রে দোষের মধ্যেও এইরূপ গুণ দর্শন করিতে কয়টী লোক সমর্থ?

ঐ দিবস সাধু-সেবা হইয়া গেলে প্রায় এক সহস্র টাকা মূল্যের বস্ত্র ও লোটা (ঘটি) উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহা আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ঐ সকল দ্রব্য সাধু-সেবার জন্য আনা হইয়াছিল, সুতরাং

উহা আর আশ্রমে ফিরাইয়া লওয়া হইবে না।” এই বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহারের সম্পূর্ণ ভার আখড়ার মহান্তজীর উপরে অর্পণপূর্ব্বক তিনি রিক্তহস্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সাধুদিগের মধ্যেও ত্যাগের এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়ে অতীব বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

এই দানসাগর ব্যাপারে ৩ মাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই কার্য্যে পুরীনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা (কাপুড়িয়া), শ্রীযুক্ত মাধী সোয়ার (৺জগন্নাথদেবের ভোগ রন্ধনকারী ব্রাহ্মণ) ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ গুড়িয়া (মুদি) গোস্বামী-প্রভুকে ধারে জিনিষপত্র দিয়া সেবার বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক ঋণ শোধ না হইতে পুনরায় সহস্র সহস্র টাকার দ্রব্যাদি বাকিতে দিয়াছেন। গোস্বামী-প্রভুর কোন সংস্থান নাই, টাকা বাকি পড়িলে তাহা আদায় হইবারও কোন উপায় নাই, ইহা বিশেষরূপ জানা সত্বেও এই সকল বিষয়ী লোক কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের শোণিততুল্য রাশি রাশি অর্থ এই কপর্দ্দকশূন্য বিদেশী সন্ন্যাসীর পায়ে হাসিমুখে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বিষয়াসক্ত লোকের বুদ্ধির অগোচর। তবে যাঁহার আদেশে গোস্বামী-প্রভু এই দানসত্র খুলিয়াছিলেন, যাঁহার ইঙ্গিত ভিন্ন তিনি এই দান-যজ্ঞের একটী সামান্য বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতেন না, সেই দাতার শিরোমণি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা হইলে যে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই দান সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে গোস্বামী-প্রভু বলিতেন—“আমি স্বেচ্ছায় এই দানকার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, স্বয়ং জগন্নাথদেবের আদেশে দান করিতেছি। গঙ্গাস্রোত বহিয়া যাইতেছে, আমরা তাহাতে হাত ধুইয়া পবিত্র হইতেছি মাত্র।”

গোস্বামী-প্রভু যখন সমুদ্রস্নান অথবা শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে বাহির হইতেন, তখন শত শত যাচক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিত এবং তাঁহার নিকট অর্থাদি যাঞা করিত। গোস্বামী-প্রভুর ইঙ্গিতে শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রম হইতে সিকি, দুয়ানি, আধুলি, পয়সা টাকা প্রভৃতি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রই মুদ্রামুষ্টি ধূলিমুষ্টির ন্যায় দান করিতেন। অর্থ ফুরাইয়া গেলে, গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য সরল-বিশ্বাসী শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ মহাশয় ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাভাজন গোবিন্দ গুড়িয়ার নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। রাশি রাশি অর্থ এই প্রকারে জলের মত দান করিতেন দেখিয়া কত বিষয়াসক্ত লোকের বিষয়াসক্তি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কত ধনীর অর্থাভিমান চূর্ণ হইয়াছে, কত কৃপণ লোকের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? গোস্বামী-প্রভু একদিন ঠাকুরদর্শনে বহির্গত হইলে, তাঁহার দানে মুগ্ধ হইয়া জনৈক পাণ্ডা বলিলেন—“গোসাই-প্রভু বড় নাম

করিলেন।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"নাম অতলজলে ডুবে যাক্, নাম দিয়ে কি হবে?"

*একদিবস গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতে চলিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরের বয়স কত?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"অনন্তকালের মধ্যে আমরা একটী বুদ্‌বুদ্ মাত্র, ৭২ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, কেবল গুরুপাদপদ্মে যাঁহার মতি তিনিই জীবিত।"

অপর একদিবস সমুদ্র-স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়, স্বর্গদ্বারের ঘাটের পথে ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা, আলুলায়িতকেশা, পাগলিনী-প্রায়া জনৈক ভিখারিণীকে দেখিয়া গোস্বামী-প্রভু সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "যাহার নিকটে যাহা আছে সমস্তই ইঁহাকে দাও। এমন সুযোগ আর নাও মিলিতে পারে।" বলা বাহুল্য, তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার হস্তস্থিত ধৌত বস্ত্রখানিই তাঁহাকে দিয়া দিলেন। স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গোস্বামী-প্রভু পূর্ব্বোক্ত পাগলিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"অদ্য বিমলা দেবী (পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) কৃপাপূর্ব্বক তোমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য এইভাবে রাস্তার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, কিন্তু সমস্ত সহর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর দর্শন পাইলেন না।

পুরীতীর্থে কত স্থানে কত মহাপুরুষ কিভাবে বিরাজ করেন, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সাধুরা নিজেরা ধরা না দিলে অপরের পক্ষে তাঁহাদের চেনা অসাধ্য। এই স্থানের একটী গুপ্ত সাধুর বৃত্তান্ত গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাভাজন ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক জনৈক সতীর্থের নিকটে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা :—

"একদিন সমুদ্র-স্নান হইতে ফিরিবার সময়ে, ঠাকুর (গোস্বামী-প্রভু) একটী মহাপ্রসাদ ফেলাইবার গর্ত্ত হইতে ন্যাংটিসার একজন সাধুকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলেন; আমাকে (সতীশকে) বলিলেন—চারিটি পয়সা দাও এবং নিজের গায়ের মূল্যবান্ কাপড় দিলেন; সাধুটী পয়সা নিলেন না, কাপড় লইয়া গেলেন। পয়সা দিতে গেলে তৃণগুচ্ছ হাতে আরতি! কিছু দূরে গিয়া গান ধরিলেন—'নীলচক্র জগন্নাথ, মন ভজনা চৈতন্য, মন ভজনা চৈতন্য'। পরে বলিলেন—'আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, সেস্থান খালি দেখিলাম, এখানে তুমি দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া বিরাজ করিতেছ'। আবার পয়সা দিতে গেলে বলিলেন—'আমার প্রারব্ধ কর্ম্মে যাহা আছে, তাহা হইবে। একশত বৎসরের উপর

কাটাইলাম। এখন আবার জগদ্বন্ধু এসব দিতেছ কেন?' আবার গান গাইতে লাগিলেন, যেন দর্শন হইতেছে। কোনমতে কিছু নিলেন না। ঠাকুর বলিলেন, 'কাপড় কিনে রে'খে এস, যে নে'য়।' ইঁনি শুনিলাম এই দেশী লোক। ইঁনি লেখাপড়া জানিতেন। কেবল পড়িতে পড়িতে ধ্যান করিয়া অজ্ঞান হইতেন। পর হইতে এই দশা। ঠাকুর বলিলেন—'পঞ্চম পুরুষার্থ একেই বলে। অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। পরে, আমি কে? কি করিতেছি? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব?—ইত্যাদি চিন্তা আসে। এই সময়ে গুরু লাভ হয়। ৩ জন্ম সূর্য্য, ৩ জন্ম গণেশ, পরে ১০০ জন্ম শক্তি উপাসনা করিয়া ৩ জন্ম শিবের আরাধনা করিতে হয়। ইহা চতুর্ব্বর্গের সাধনা, ইহা বেদাধীন। তারপর পঞ্চম পুরুষার্থ।' আমি (সতীশ) বলিলাম, 'মাথা টুক্‌রা করিয়াও যদি এ জিনিষ পাওয়া যায় ত ভাল।' ঠাকুর—'তাও কি হয়? রাবণ তপস্যা করিলেন, তমো ধর্ম্ম পাইলেন। তাঁহার ভাই বিভীষণ ধর্ম্ম চাহিলেন, সত্ত্ব ধর্ম্ম পাইলেন, ইহার গন্ধও পাইলেন না।' শ্রুতিরা বলিল— 'আমরা চতুর্ব্বর্গ পর্য্যন্ত তোমার স্তুতি করিতে পারি, কিন্তু তারপর পঞ্চম-পুরুষার্থ—তাহাতে আমাদের অধিকার দাও।' ঠাকুর (শ্রীভগবান) বলিলেন —'বৈবস্বত মন্বন্তরে অমুক দ্বাপরে হবে।' তাই তাঁহারা গোপী হইলেন। ব্রাহ্মণী হইলেও জাতির গৌরব থাকিত। দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তাঁহারা রামচন্দ্রকে বলিলেন 'তোমার নবজলধরস্বরূপ দেখিয়া আপনার করিয়া তোমাকে ভজিতে চাই।' তিনি বলিলেন, 'দ্বাপরে হবে!' তাই তাঁহারা পান।

"পুনঃ সেই সাধুটী উপস্থিত হইয়া গাইলেন—'চৈতন্য ভজনা মন, চৈতন্য ভজনা, নাচ্ছে দেখ মোর কেলে সোনা। ··· এত চন্দ্রবদন আমি দেখিয়াছি, এইবার আমার সাধ পূর্ণ হইল',—এই বলিয়া আরতি! মেয়েরা ছাদে ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আরতি। ঠাকুরকে দেখিয়া হাসিয়া আটখানা—কোথায় বা রহিল ন্যাকড়ার টুপি! আবার গান—'কত রোজ দেখি নাই তোর চন্দ্রবদন, এমন প্রেম দেখি নাই।' পুনরায় আর একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া বলিলেন— "আজ অবলা বলিমু, অচেনা চিনামু", এই বলিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তখন মহেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—'ও কি বলে?' ঠাকুর— 'বড়ই আশ্চর্য্য লোক,' বলে—'দণ্ডকমণ্ডলুধর জটাধারীর চাঁদমুখ দেখিলাম। কত চাঁদমুখ দেখিলাম, কোন চাঁদমুখই এমন নয়।"

এই সময়ে পুরীতে একটী জাতিস্মর বালক অবস্থান করিতেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন অনুমান ১৩।১৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা মৌনী অবস্থায় থাকিলেও কোন কোন সময়ে স্বীয় অজ্ঞাতসারে আনন্দাধিক্যে তাঁহার মুখ দিয়া দুই একটী কথা বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহাকে বোবা

বলিয়াই জানিত। ইনি কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন, কেহ কোন কৌশলে গাত্রাবরণ প্রদান করিলেও, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইতেন। ইনি সর্ব্বদাই 'জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ' বিচরণ করিতেন। অপরাহ্ণ ৪।৫ ঘটিকার সময়ে সত্রে যখন প্রসাদ বিতরণ করা হইত, তখন ইনি তথায় গিয়া দাঁড়াইতেন, কেহ কিছু দিলে খাইতেন, না দিলে উপবাসী থাকিতেন। সাধারণ ভিক্ষুকদিগের ন্যায় তাঁহাকে কেহ কখনও লোককে উদ্বেগ দিতে দেখে নাই। গোস্বামী-প্রভু পুরী গমন করিবার পর, ইনি প্রায়ই একটী ভিখারী বালকের সহিত মিলিয়া তাঁহার আলয়ে আগমন করিতেন, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্য ব্যতীত কেহ কিছু দিতে উদ্যত হইলেই দৌড়িয়া অদৃশ্য হইতেন। গোস্বামী-প্রভু যখন দর্শনে বহির্গত হইতেন, তখন এই স্বভাব-সাধুটী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে যেন অজ্ঞাতসারে হঠাৎ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। বালকটীর এইরূপ অনেক ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া, একদিন জনৈক শিষ্য তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"ইনি জড় ভরতের ন্যায় জাতিস্মর। ইঁহার পূর্ব্ব-জন্মের সমস্ত স্মৃতিই আছে। এই দেশের বিশেষ কোন কল্যাণ সাধন করিবার জন্য ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" গোস্বামী-প্রভু ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিবার পর হইতে তদীয় শিষ্যমণ্ডলী ইঁহাকে অতিশয় আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গোস্বামী-প্রভুর অন্তর্দ্ধানের কয়েক বৎসর পরে ইনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারে না।

৺পুরীধামে এই সময়ে ভুতানন্দ স্বামী নামক একজন হঠযোগসিদ্ধ মহাত্মা অবস্থান করিতেন; ইনি পুরীধামস্থ প্রসিদ্ধ জগন্নাথবল্লভ মঠের মোহান্ত ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইঁহার বয়ঃক্রম চারিশত বৎসরের অধিক বলিয়া লোকে বলিত। তাঁহার কথাবার্ত্তা, আকার-ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইত যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সমস্ত জীবনে ইঁহার কখনও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গ হয় নাই এবং ইনি অত্যন্ত তেজস্বী মহাপুরুষ ছিলেন। লোকে ইঁহার প্রকৃত ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ইঁহাকে একটি নরহত্যার মোকদ্দমার অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জেলে প্রেরণ করিয়াছিল। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে যদিও স্বামীজী মুক্তিলাভ করেন, তথাপি স্থানীয় লোকে তাঁহাকে মোহান্তের পদ হইতে বিচ্যুত করে। এই সকল কারণে শেষজীবনে ইনি অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময়ে গোস্বামী-প্রভু পুরীতে আগমন করেন; এবং তিনিই তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব ও মহত্ত্বের কথা লোকসমাজে প্রচারপূর্ব্বক পরনিন্দাজনিত অন্তরের কালিমা বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে নব-জীবন প্রদান করিয়াছিলেন। গোস্বামী-প্রভু একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,

স্বামীজীর সঙ্গ করা তাঁহার পুরী আগমনের অন্যতম কারণ। স্বামীজী গোস্বামী-প্রভুর নিকটে সর্ব্বদা আগমন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। একদিবস তিনি গোস্বামী-প্রভুর সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার দিকে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিয়া ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "শ্রীসূর্য্য, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ সাক্ষাৎ ভগবান্।" এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ যোগনেত্র দ্বারা গোস্বামী-প্রভুর ভিতর কি দেখিয়া এইরূপ স্তব করিলেন, তাহা সাধনহীন মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর। গোস্বামী-প্রভুর তিরোভাবের কিয়দ্দিন পরে স্বামীজী তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-মহোদয়ের নিকট বলিয়াছিলেন—"গোঁসাইজী মানুষ নন, অবতার। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই এবং কেহ তাঁহার কিছু করিতেও পারে না। তাঁহার ইচ্ছাই সব। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের বাহির। তিনি যে শ্রীক্ষেত্রে দেহ রাখিবেন তাহা তিনি জানিতেন, তাঁহার মা জানিতেন ও আমি জানিতাম। যত অবতার সকলেই অল্পবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমি ঋষি, তাই এতদিন বাঁচিয়া আছি। গোঁসাইজী জগন্নাথদেবের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন, যেমন চৈতন্য-প্রভু টোটাগোপীনাথে মিলিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রসাদ দ্বারা উঁহার ভোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ উঁহার প্রসাদই মহাপ্রসাদতুল্য।"* দুঃখের বিষয় এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ গোস্বামী-প্রভুর তিরোভাবের পর অল্পকালের মধ্যেই শ্রীক্ষেত্রধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

কোন একদিন ৺জগন্নাথদেবের পূজারী পাণ্ডাদিগের গোলযোগে সমস্ত দিবস ঠাকুরের ভোগ হইয়াছিল না। বড়দণ্ডস্থিত প্রসাদোপজীবী শত শত কাঙ্গালিগণ সারাদিন ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; কারণ পুরীধামস্থ কয়েকটি সত্র হইতে প্রদত্ত মহাপ্রসাদের উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী গোস্বামী-প্রভুর আশ্রমের দ্বারে উপনীত হইয়া, 'মৈঁয় ভুখা হুঁ, মৈঁয় ভুখা হুঁ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। দ্বারে তখন কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার কাতর প্রার্থনা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। গোস্বামী-প্রভু স্বীয় আসনে ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি এই শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং "কে কোথায় আছ, শীঘ্র এই ভিক্ষুককে অন্ন প্রদান কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সেবকগণ নিকটে আগমন করিলে, তিনি অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন —"আজ সমস্ত দিন ৺জগন্নাথদেবের ভোগ না হওয়াতে তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। যদিও তিনি নিজে ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতীত, তথাপি যে সকল ভক্ত ও কাঙ্গালিগণ একমাত্র মহাপ্রসাদের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ক্ষুধা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে।" ইহার কিয়ৎকাল পরে

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র বসু বি. এল. মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।

পাণ্ডাদিগের গোলযোগ মীমাংসা হইলে ঠাকুরের ভোগ হইল। ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন, গোস্বামী-প্রভুরও অন্তরের জ্বালা দূরীভূত হইল।

গভীর রাত্রিতে একটী শ্বেতকায় বৃহৎ সর্প প্রায়ই গোস্বামী-প্রভুর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। সর্পটী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বড়দণ্ডের উপর দিয়া জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে গমন করিত। এই অদ্ভুত সর্পের কথাপ্রসঙ্গে একদিবস গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, "ইনি সাক্ষাৎ অনন্তদেব। ইনি প্রত্যহ রাত্রে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বিহার করিতে গমন করেন, তখন কচিৎ কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পান।"* এই কথা শুনিয়া উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী-প্রভু পুরী গমন করিবার পর ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রত্যুষে শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্র-স্নান করিতেন। পুরীতে সমুদ্র-স্নান করা বড়ই বিষম ব্যাপার। সমুদ্র-গর্ভ হইতে অনবরত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা আগমনপূর্ব্বক তীরে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইলে হাত পা ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। একদিন শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ ঘোষ, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেবকগণ গোস্বামী-প্রভুকে স্নান করাইতেছিলেন, এমন সময় অতর্কিতাবস্থায় একটি তরঙ্গ আসিয়া প্রভুপাদের হাঁটুতে লাগিলে হাঁটুর সন্ধি খসিয়া গেল ; এবং অব্যবহিত পরেই আর একটি তরঙ্গ আসিয়া সন্ধিস্থলে লাগিলে পুনরায় তাহা যথাস্থানে সংযুক্ত হইল। কিন্তু কেহই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। গোস্বামী-প্রভু তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্রদ্ধেয় বিধুবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর স্কন্ধে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সকলের পথশ্রান্তি দূর হইলে, তিনি উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া একটী প্রলেপের ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে করিতে প্রায় এক মাসে গোস্বামী-প্রভু সম্পূর্ণ সুস্থ হন। ইতি-মধ্যে একদিবস কীর্ত্তনের মধ্যে অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি দিব্যকান্তি পুরুষ আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ ডমরু বাজাইয়া গোস্বামী-প্রভুকে বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন ; এবং কীর্ত্তনান্তে কিয়ৎকাল তাহার আঘাত-প্রাপ্ত পদ ধীরে ধীরে টিপিয়া দিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গোস্বামী-প্রভুকে এই অপরিচিত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, "ইনি সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে আমার হাঁটুর সন্ধি স্খলিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ইনি নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অদ্য আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে যে, যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, ব্রহ্মাদি দেবতারাও

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত

তাঁহাদের সেবায় তৎপর থাকেন। তোমরা সাক্ষাৎ বরুণদেবের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ।"*

অপর একদিন পুরীধামের প্রসিদ্ধ লোকনাথ মহাদেব জনৈক ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তনের মধ্যে গোস্বামী-প্রভুর গলদেশ ধারণপূর্ব্বক অদ্ভুত নৃত্য করিয়া উপস্থিত সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

শিবচতুর্দ্দশীর দিবস গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্য-সমভিব্যাহারে ৺লোকনাথ মহাদেব দর্শন করিতে লোকনাথ গমন করেন। ঐ দিন এই স্থানে একটি মহামেলার অধিবেশন হয়, এবং ইহাতে প্রায় ২০।২৫ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গোস্বামী-প্রভু শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, এই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন; এবং ক্ষণকাল পরেই ভাবে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর মুহুর্মুহু 'হরিহর', 'হরিহর' 'জয় 'লোকনাথদেব', 'জয় লোকনাথদেব' বলিয়া উচ্চধ্বনিতে দশদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ দুইজন লোকনাথদেবের পাণ্ডা তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই 'তুই ত নন্দী, আর তুই ত ভৃঙ্গি, এই বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে, যিনি কৃষ্ণকে পূজা করেন, আর শিবকে মানেন না, তিনি নরকে গমন করেন; আবার যিনি শিবকে পূজা করেন অথচ কৃষ্ণকে মানেন না, তিনিও নরকে গমন করেন।** 'ওঁ নমো শিবায়', 'ওঁ নমো শিবায়' এই নাম জপ করো। যিনি এই নাম জপ করিবেন, তিনিই সিদ্ধ হইবেন। স্বয়ং দ্বারকানাথ এই নাম জপ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন।"† এই কথা শুনিয়া একজন পাণ্ডা তখনই 'ওঁ নমো শিবায়' এই নাম জপ করিতে লাগিলেন।

---

* কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ ব্রাহ্মণ স্বপচোপিবা।
ব্রহ্মলোকং সমুলঙ্ঘ্য যাতি গোলোকমুত্তমং॥
ব্রহ্মণা পূজিতঃ সোঽপি মধুপর্কাদিনা চ বৈ।
স্তুতঃ সুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ পরমানন্দভাজনঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৩৬ অ ৮০, ৮১ শ্লোক।

** 'শিবরাত্রি ব্রতং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যান্তু ফাল্গুনে।
বৈষ্ণবৈরপি তৎকার্য্যং শ্রীকৃষ্ণ প্রীতয়ে সদা॥
মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্কর প্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণু বিষ্ণোস্তু হৃদয়ং শিবঃ॥"

হরিভক্তিবিলাস, ১৪ অধ্যায়॥

† মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষণকাল পরে গোস্বামী-প্রভু ভাব সংবরণ করিয়া, পাণ্ডা পূজারীদিগকে তাঁহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরীতে পর্ব্বাদি উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার বেশ হইয়া থাকে। এই বেশ-নির্ম্মাণকার্য্যে পূজারীদিগের নৈপুণ্য অতীব প্রশংসার্হ। একদিবস গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'রাজরাজেশ্বর' বেশ (পদ্মবেশ) দর্শন করিতে গমন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভাবাবেশে ভগবানের বিরাট রূপের বর্ণনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এই যে আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া জগন্নাথদেব বিরাজ করিতেছেন! তাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হইয়াছে! এই জ্যোতির কাছে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতি, অতিশয় তুচ্ছ! দেব-দানব, যক্ষ-কিন্নর, পর্ব্বত-সমুদ্র, স্থাবর-জঙ্গম, নদ-নদী সমস্তই ইঁহার মধ্যে দেখা যাইতেছে। তেত্রিশ কোটী দেবতা লক্ষ শালগ্রাম নির্ম্মিত জগন্নাথদেবের সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর করজোড়ে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন! মণিকোঠার একটী পরমাণুও জড়ীয় নয়, সমস্তই চৈতন্যময়! লোকে কি করিয়া ঐ স্থানে পদার্পণ করে? জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য—ইত্যাদি।" এইরূপ স্তুতি করিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উপস্থিত পাণ্ডা, পূজারী, শিষ্য, দর্শক প্রভৃতি গোস্বামী-প্রভুর এবম্প্রকার ভাব দর্শনকরতঃ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভুত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর হইতে গোস্বামী-প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে আর কখনও মণি-কোঠায় গমন করেন নাই, দূর হইতে দর্শন করিতেন।

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ জগন্নাথদেবের ললাট-সংলগ্ন স্বর্ণালঙ্কারের কতকাংশ কোন দুর্বৃত্ত উৎপাটিত করিয়া লয়। এই আকস্মিক ব্যাপার গোস্বামী-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বীয় ললাটের চর্ম্ম ছিন্ন করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, সেইরূপভাবে ক্লেশ প্রকাশপূর্ব্বক বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—"উহারা জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে একটী জড়ীয় পদার্থ ভাবিয়াছে না কি? উহা যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সৎ-চিৎ-আনন্দ—এই জড়াতীত চৈতন্যময় পদার্থ জমাট বাঁধিয়া ঐ বিগ্রহ হইয়াছে।"* শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের অনাচারে অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া গোস্বামী-প্রভু অপর একদিন বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মার ৫০ বৎসর এখানে থাকিবেন, তাই আছেন, নচেৎ এতদিন এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন।"

* "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিনি একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

একদিবস জনৈক নীতিপরায়ণ সাধু গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে কতকগুলি অশ্লীলতাব্যঞ্জক মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কিছুই বাদ দিয়া লেখেন নাই। জীবপ্রকৃতির নিম্নস্তরে যত প্রকারের কুৎসিত ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহাই দেখান হইয়াছে মাত্র। আবার ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে, জীব ক্রমশঃ কি প্রকার সুন্দর উচ্চাবস্থা লাভ করিতে পারে, রূপকভাবে তাহাও দেখান হইয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে নিম্নস্তরেই ঐ সকল মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কয়েক স্তর উপরেই নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি, তারপর ভগবানের বিভিন্ন অবতার ও লীলাব্যঞ্জক মূর্ত্তি, সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রকটিত করা হইয়াছে, এবং মন্দিরের অভ্যন্তরের কোথাও ঐ প্রকার চিত্রের স্থান দেওয়া হয় নাই।"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহের আকৃতি এইরূপ অস্বাভাবিক কেন—ইত্যাদি কথা-প্রসঙ্গে গোস্বামী-প্রভু এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ অন্যান্য দেবতার বিগ্রহের ন্যায় নহে। উঁহার বিগ্রহ একটী প্রণব (ওঁ)। জগন্নাথদেবের মস্তকটি ঐ প্রণবের বিন্দু। হস্ত দুইখানি ঐ বিন্দুর নিম্নস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখা এবং উদরের উপরে গোলাকারও অঙ্কিত আছে। উঁহাই কালক্রমে বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। ইনিই আদি নাম-ব্রহ্ম। ইহার নিকটে নিবেদিত অন্নাদি মহাপ্রসাদ, তাহাতে জাতিবর্ণ অথবা উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই—ইত্যাদি।" শাস্ত্রে ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা সে বিষয়ে তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা আবশ্যক বোধ হয় নাই। সম্প্রতি আমরা ইহার সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ঃ—

পদ্মপুরাণান্তর্গত উৎকল খণ্ড, ৮ম অধ্যায়, ৩২ শ্লোক—

জৈমিনিরুবাচ—

"ইতিস্তুত্বা সুরেশং দেবং প্রণবরূপিনং।
প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো হরেঃ॥"

অর্থাৎ—"জৈমিনি বলিলেন, এই প্রকারে প্রণবরূপী দেবাদিদেবকে (জগন্নাথকে) স্তুতিপূর্ব্বক হরির অগ্রে প্রণাম করিয়া প্রণবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।"

নিলাদ্রি-মহোদয় নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মস্তুতি, যথা—

"মদীয়স্য পরার্দ্ধস্য প্রমাণপূরণকারিণে।
দারুব্রহ্ম স্বরূপায় নমো ওঁকাররূপিণে॥

* * *

বেদান্ত প্রতিপাদ্যস্থং পণ্ডিতে র্জ্ঞানমণ্ডিতৈঃ।
নীলাচলেঽস্মিন বিমলে নমঃ প্রণবরূপিণে॥"

অর্থাৎ—"ব্রহ্মা বলিলেন, আমার শেষ পরার্দ্ধ-প্রমাণ কাল পূর্ণ করিয়া যিনি এই ধরাধামে লীলা করিবেন, সেই দারুব্রহ্মস্বরূপ ওঁকাররূপধারী তোমাকে নমস্কার।

পূর্ণ জ্ঞান-সমন্বিত পণ্ডিতদিগের দ্বারা তুমি বেদবেদান্তে পুরাণ-পুরুষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছ, সেই তুমি এই কলুষরহিত নীলাচল-ক্ষেত্রে প্রণবরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।"

উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বলভদ্রদেব শেষনাগরূপী ও সুভদ্রাদেবী পদ্মরূপিণী বলিয়া বর্ণিত আছে, যথা :—

"বলঃ শেষস্বরূপেণ যচ্ছিরস্থলতঃ স্থিতঃ।

*   *   *   *

যৎ করাব্জেঽপি সা ভদ্রা পদ্মরূপেণ সংস্থিতা॥"

অর্থাৎ—"যাঁহার (জগন্নাথদেবের) শিরোদেশে শেষনাগরূপী বলভদ্র বিরাজ করিতেছেন এবং যাহার করাব্জে পদ্মরূপিণী সুভদ্রাদেবী শোভা পাইতেছেন।"

শ্রীশ্রীবলদেবের বর্ত্তমান মূর্ত্তির মস্তকটী সর্পফণার ন্যায় এবং চক্ষু দুইটী জগন্নাথদেবের চক্ষুর তুলনায় সর্পের ন্যায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। প্রস্ফুটিত কমল সদৃশ সুভদ্রাদেবীর একমাত্র মুখখানিই আছে, তাঁহার কোন হস্ত নাই। পদ ত তিন মূর্ত্তির কোন মূর্ত্তিরই নাই। বস্তুতঃ ঐ যুগে শিল্প-কলার কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা মন্দির-নির্ম্মাণ-কৌশল ও দ্বারকানাথ, বটকৃষ্ণ, বিমলাদেবী প্রভৃতি অপরাপর বিগ্রহের কারুকার্য্য দেখিলেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এতদবস্থায় মন্দিরস্থ সর্ব্বপ্রধান বিগ্রহত্রয়ের নির্ম্মাণকার্য্যে এতদূর অপটুতা প্রকাশ পাইবে, তাহা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং উক্ত নিলাদ্রি-মহোদয়-ধৃত শ্লোকবর্ণিত মূর্ত্তিই এবং তাহাই যে কালক্রমে, পরবর্ত্তী ভক্তদিগের মনের ভাব ও রুচি অনুসারে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। ভক্তের ভাবানুসারে যে বিগ্রহের পরিবর্ত্তন সাধন হয়, তাহা কোন কোন স্থলে শিবলিঙ্গের এবং কোন কোন স্থলে গোবর্দ্ধন-শীলার চক্ষুকর্ণাদির অঙ্কন হইতে বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে আধুনিক একদল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে বুদ্ধদেবের মন্দির বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে বৌদ্ধ-মন্দিরে রথযাত্রার উৎসব হইয়া থাকে, ইহাই বোধ হয় তাহাদের স্বপক্ষের প্রধান যুক্তি। ৺জগন্নাথদেবের মন্দির যে বুদ্ধদেবের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহামতি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ গোস্বামী-প্রভু একদিন সমাগত কতিপয় শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোককে পদ্মপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ড হইতে নিজে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তবে বৌদ্ধমন্দিরে রথযাত্রা হইবার কারণ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অপর এক সময়ে বলিয়া-

ছিলেন—"রথ মনুষ্য-দেহ, তিনতালা। উপরতালায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন ; বামনাবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জগন্নাথ। এই রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। মধ্যতালায় সমস্ত দেবদেবী এক পদ্মে ও কুটিরে বিরাজ করেন। সমস্ত অবতার ও তাঁহাদের কার্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের তালায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুগণ তাঁহাদের পরিবারগণের সহিত বিরাজ করেন। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে থাকে, নীচের তালায় সিঁড়ি পড়ে, চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করিলে কামক্রোধগণ পরিবার লইয়া পলায়ন করেন। তখন সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ রূপ প্রকাণ্ড তিন গাছা কাছি রথে বাঁধিয়া টানিতে থাকে। দুঃখ-সুখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর-মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে কাছি খসাইয়া লয়।

"বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া কাহার নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন, ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বের পঞ্চ শিষ্যের কথা মনে হইল। বুদ্ধদেব তাহাদের নিকট সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া, নিজের শরীর রথ, তাহাতে দেবতা ও কন্দর্পের প্রকাশ, পরে ব্রহ্মলাভ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন ; তাহাই রথ। সেই হইতে বৌদ্ধমন্দির মাত্রেই রথযাত্রা হইয়া থাকে।"

এই বৎসর মাদ্রাজ সহরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়। গোস্বামীপ্রভুর অন্যতম শিষ্য বরিশালের স্বনামধন্য দেশনায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করিয়া, ফিরিবার পথে গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে অতীব সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ এবং মহাপ্রভুর গম্ভীরা, সিদ্ধবকুল, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী প্রভৃতি কতিপয় স্থান দর্শন করাইবার জন্য জনৈক শিষ্যকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু উক্ত শিষ্যটীর সহিত সিদ্ধবকুল প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন করিয়া অবশেষে জগন্নাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহে এক মহাশক্তির অপূর্ব্ব আকর্ষণ স্বীয় প্রাণে উপলব্ধিকরতঃ তাঁহার সঙ্গীয় শিষ্যটীর নিকটে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক আনন্দাধিক্যহেতু বাখরগঞ্জের ভাষায় বলিতে লাগিলেন—"দেখ্‌রে, একটা কথানি কইথে পারিস্? জগন্নাথদেবের যে চেয়ারার চটক, এ দেখ্যা যে ভক্তি হয়, হেয়া তুইও বোঝস্, আমিও বুঝি ; কিন্তু মন্দিরের মধ্যেও ফ্যাল্লা আমারে যে তিন চারটা ঘেডীঘুল্লা মাল্লো হেডা কি, তুই নি কইতে পারিস্।" শিষ্যটী কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হ'য়েছে প্রকাশ ক'রে বলুন।" শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু উত্তর করিলেন—"পঞ্জিকা ইত্যাদিতে জগন্নাথের যেরূপ চিত্র দর্শন করিয়াছিলাম, এখানেও দেখি তদ্রূপই, সুতরাং আর বেশী দেখিব কি, এই ভাবিয়া ফিরিলাম।

দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া মনে হইল—না আর একটু দর্শন করিনা কেন ? এই মনে করিয়া পুনরায় দর্শন করিলাম। দর্শন করিয়াই মনে হইল, কি আর দেখিব, সেই চেহারাইত ? এই ভাবিয়া পুনরায় পশ্চাৎপদ হইলাম। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার মনে হইল, আর একটু দেখিয়া যাইনা কেন ? এইরূপ ভূতগ্রস্তের ন্যায় আমাকে তিন চারিবার ঘাড় ধাক্কা মারিয়া ছাড়িয়া দিল। ইহার কারণ কি, আমায় বলিতে পার ?" বস্তুতঃ পরমাত্মা পরমেশ্বর চুম্বকের ন্যায় এক মহা আকর্ষণী শক্তি, তাই লৌহরূপী জীবাত্মা সকল তাঁহার দিকে অনবরত আকৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু সমল লৌহ যেমন চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পাপ-মলে আচ্ছন্ন জীবও পরমাত্মার আকর্ষণ টের পায় না। এবং ভগবৎ-কৃপায় সাধন বলে সাধকের যে পরিমাণে বাসনা কামনারূপ পাপ-মল নিরাকৃত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে পরমাত্মা ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এইরূপ আকর্ষণী-শক্তির পরিচায়ক অনেক ঘটনা শ্রবণ করা যায়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে কুলবধূগণ কলসী কাকে করিয়া জল আনিতে নদীতে চলিয়াছেন, পথিমধ্যে জগন্নাথ-ধামের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হইল। অমনি কি এক শক্তির প্রভাবে কলসী ফেলিয়া, পতিপুত্রাদির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাদের সঙ্গেই জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন।

মহাসৌভাগ্যশালী অশ্বিনীবাবু আজি সেই আকর্ষণ প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু ৺কাশীধামে অবস্থানকালে দীন গ্রন্থকারের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি ইহার পূর্বেও অনেক তীর্থাদিতে অনেক দেবতার বিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন এবং এই ঘটনার পরেও অনেক তীর্থে অনেক দেবতার বিগ্রহাদি দর্শন-স্পর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় ঐরূপ অপূর্ব আকর্ষণ আর কুত্রাপি উপলব্ধি করেন নাই।

সে যাহা হউক, শ্রদ্ধাভাজন অশ্বিনীবাবু গোস্বামী-প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে প্রণাম করিবার কালে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হাত চাপড়াইয়া বলিলেন—"কর্ম্ম করিতেছেন, খুব করুন।" অশ্বিনীবাবু বিনীত-ভাবে উত্তর করিলেন—"আশীর্বাদ ত করিতেছেনই, করিতে থাকুন যেন দেশের জন্য খাটিতে পারি।"

একদিবস রাত্রি অনুমান ৭ ঘটিকার সময়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদার স্বর্গীয় রূপলাল দাস মহাশয়ের পুত্র এবং গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য স্বর্গীয় রাধা-দাস মহাশয় গোস্বামী-প্রভুকে এই মর্ম্মে তারের সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তাঁহার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী (ইনিও গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য) প্রসববেদনায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেন, বড় বড় ডাক্তারগণ অস্ত্রপ্রয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন, এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, কৃপাপূর্ব্বক তারযোগে যেন তাহার প্রদান করেন। গোস্বামী

প্রভু রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকার সময়ে জরুরী তারে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, "অদ্য রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে এক সহস্র ব্রাহ্মণের পাদোদক রোগিণীকে পান করাইতে পারিলে সুপ্রসব হইবে।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন—"প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন —"এত বিচার করিবার আমাদের দরকার নাই। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম ও উপবীতধারী হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ।" সে যাহা হউক, দৈবদুর্ব্বি-পাকবশতঃ তারবার্ত্তা যথাসময়ে না পহুঁছিয়া পরদিন ১০ ঘটিকায় ঢাকায় পহুঁছিল। তখন তাড়াতাড়ি করিয়া সহস্র ব্রাহ্মণের পাদোদক সংগ্রহপূর্ব্বক রোগিণীকে পান করান হইলে, অল্পক্ষণের মধ্যে প্রসব হইল বটে, কিন্তু সন্তানটী মৃতাবস্থায় প্রসূত হইয়াছিল। সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন কিছুতেই রোগিণীর প্রাণরক্ষা করা যাইবে না। এখন মৃত-সন্তান এই প্রকার অনায়াসে প্রসূত হইতে দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। উক্ত মহিলাটী পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রসব হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্গোলকের মধ্যে প্রণব-বেষ্টিত গোস্বামী-প্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র তাঁহার রোগ-জনিত ক্লেশ দূরীভুত হইয়াছিল।*

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত পুরীধামস্থ নরেন্দ্র-সরোবরে (চন্দনতালাও) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জল-বিহার হইয়া থাকে। প্রতিদিন অপরাহ্ণে পূজারী পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি-স্বরূপ লক্ষ্মী-সরস্বতী সহ মদনমোহন-দেবকে চন্দনে চর্চ্চিত ও বিবিধ ভুষণে ভুষিত করিয়া খট্টায় আরোপণপূর্ব্বক নানাবিধ বাদ্যসহকারে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে আনয়ন করেন। ৺মদনমোহনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষেত্র-রক্ষক পঞ্চ মহাদেবকেও বিবিধ সাজে সজ্জিত করিয়া পৃথক খট্টায় আরোহণ করাইয়া তথায় আনয়ন করা হয়। পথিমধ্যে বিভিন্ন দেবালয় হইতে ৺মদনমোহনদেবকে ভোগ দেওয়া হয়। ঠাকুর খট্টায় থাকিয়াই ভোগ গ্রহণ করেন। এইজন্যই বোধ হয় এই ভোগকে পংক্তিভোগ বলা হইয়া থাকে। ৺ঠাকুরদের জন্য নরেন্দ্র-সরোবরের মধ্যে দুইখানি নৌকা সজ্জিত করিয়া রাখা হয়, এবং ঠাকুরগণ আগমন করিলেই উহার একখানিতে মদনমোহনদেবকে ও অপর-খানিতে পঞ্চ শিবকে আরোহণ করাইয়া সরোবর পরিক্রমণ করান হয়। ঐ সময়ে ৺মদনমোহনের নৌকায় দেবদাসীদিগের নৃত্য-গীত, এবং পঞ্চশিবের নৌকায় বালক সঙ্গীত হয়। এই বালক সঙ্গীত "আখড়া-পিলার কীর্ত্তন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরিক্রমণ শেষ হইলে ঠাকুরদিগকে সরোবরের মধ্যস্থিত মন্দিরে লইয়া গিয়া ভোগ পূজা দেওয়া হয় এবং মন্দিরের অঙ্গনে আখড়া-পিলার কীর্ত্তন

* মহিলাটির নিজের মুখে শ্রুত।

হয়। ভোগ-পূজা ও কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরদিগকে পুনরায় স্ব স্ব মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। এই উৎসব দর্শন করিবার জন্য প্রতি বৎসর পুরীধামে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

গোস্বামী-প্রভু প্রতিদিন অপরাহ্ণে শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সরোবরের তীরে আগমনপূর্ব্বক উৎসব দর্শন করিতেন এবং কোন কোন দিন ঠাকুরদিগের সঙ্গে সরোবর পরিক্রমণ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, "স্বয়ং জগন্নাথদেব নরেন্দ্র-সরোবরে বিহার করেন বলিয়া এই সময়ে এইস্থানে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ আগমন করেন। এই সময়ে নরেন্দ্রের জলে স্নান করিলে গঙ্গাযমুনা স্নানের ফল লাভ হয়।"

একদিবস তিনি সরোবরের দক্ষিণতীরে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ উত্তর তীরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন—"দেখ, দেখ, সুবর্ণ-মণ্ডিত কেমন সুন্দর একটি মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে!" কিন্তু শিষ্যগণ সেইদিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এদিকে ত্রিকালজ্ঞ গোস্বামী-প্রভু যে তাঁহার ভাবী সমাধির উপরে প্রতিষ্ঠিত মন্দির দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া উহার পূর্ব্বাভাষ প্রদান করিলেন, তাহা তখন কেহ বুঝিতে সমর্থ হন নাই।

চন্দনযাত্রার পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্নানের দিন যথাসময়ে গোস্বামী-প্রভু স্নানযাত্রা দর্শন করিবাব জন্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে স্নান-বেদীর সমীপস্থ হইলে, শবর বংশীয় দয়িতা পাণ্ডাগণ অধিক অর্থের প্রার্থী হইয়া তাঁহাদিগকে স্নানবেদীতে গমন করিতে বাধা প্রদান করিল। গোস্বামী-প্রভু পাণ্ডাদিগের এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শিষ্যগণসহ মন্দিরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর অপ্রাকৃত স্নানযাত্রা দর্শন হইল। এই দর্শন সম্বন্ধে তিনি শিষ্যদিগকে এইরূপ বলিলেন যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দয়া করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্নানযাত্রা দর্শন করাইলেন। সমস্ত দেবগণ অন্তরীক্ষে সমবেত হইয়া রত্নময় দিব্য সিংহাসনে জগন্নাথদেবকে উপবেশন করাইয়া মন্দাকিনীর সুবিমল বারি দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। সুতরাং পাণ্ডাদিগের অনুষ্ঠিত স্নানযাত্রা দর্শন করিবার তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর পাণ্ডাগণ তাহাদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমনপূর্ব্বক করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিল, এবং সশিষ্য গোস্বামী-প্রভুকে স্নানবেদীতে লইয়া গিয়া স্নানযাত্রা দর্শন করাইল। তখন তিনিও তাহাদিগকে যথোচিত অর্থ প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুরীতে গোস্বামী-প্রভুর দুইটী শিষ্য কলেবর পরিত্যাগ করেন। ১ম। স্বামী দেবপ্রসাদ। ইনি ৺কাশীধামে জনৈক মহাত্মার নিকটে বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জন্মস্থান

চন্দননগর। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. উপাধিকারী এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বানর বধ নিবারণকল্পে শাস্ত্রের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া যে ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিনা আপত্তিতে তাহাতে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের ২১শে ভাদ্র প্রাতে পুরীর স্বর্গদ্বারের ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ইঁনি দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে গোস্বামী-প্রভু শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা বিশেষ সাবধান হইয়া সমুদ্রস্নান করিবে, এবং স্নানের সময় সমুদ্রতীরে উপস্থিত থাকিতে কয়েকজন ধীবর নিযুক্ত রাখিবে, কারণ আমার চক্ষে পড়িতেছে যে তোমাদের মধে ২।১ জনকে সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।" কিন্তু তাঁহার এই কথায় তখন কেহ বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ঘটনার দিবস স্নানের পূর্ব্বে স্বামীজী সমুদ্রতীরে উপবেশন-পূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকটে কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি ধ্যানাবস্থায় অন্তরীক্ষে বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্ত অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার দেহান্তে এই কথা অশ্বিনীকুমার গোস্বামী-প্রভুর নিকটে ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে যে মুক্তপুরুষদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীগণ নৃত্য-গীত করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনা আকস্মিক নহে! ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, স্বামীজী পরমপদ লাভ করিয়াছেন।" স্বামীজীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বানর-বধের স্বপক্ষ দল উল্লাস প্রকাশ করাতে, গোস্বামী-প্রভু বলিলেন যে, "পুরীধামের পঞ্চক্রোশের মধ্যে এবং তীর হইতে এক ক্রোশের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে মৃত্যু হইলে তাহাকে অপমৃত্যু বলে না; এবং মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি থাকিলে তাহাও অপমৃত্যু নয়। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী একখণ্ড কাগজে লিখিয়া নিজের ঘরের দেয়ালে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লোক যথা :—

১। "সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎ পরমং মহৎ।
পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্টবা সাগরস্ত সকৃৎ মৃতঃ॥ পদ্মপুরাণ।

২। "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রজাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥" গীতা।

২য়। ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহার পিতার নাম ৺জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জন্মস্থান ঢাকা বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার অন্তর্গত বাঘড়া গ্রাম। ইনি মৈমনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর হাইস্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই কারণে গোস্বামী-প্রভু তাঁহাকে আদর করিয়া সময়ে সময়ে তত্ত্ববাগীশ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দুই একদিনের সামান্য জ্বরেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত

হন। দেহত্যাগ করিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই, জানি না কি প্রভাবে, ইনি পুরীধামে গোস্বামী-প্রভুর ভাবী তিরোভাবের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বেই যেন তাঁহার নিজের মৃত্যু হয়। ৺মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রার্থনা অবগত হইয়া এক দিবস গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"সতীশ, জগন্নাথদেব তোমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।" সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার মৃত্যুতে কাহারও কোন শোক উপস্থিত হয় নাই; এবং পরিত্যক্ত দেহ দাহকালে চিতা হইতে চন্দনের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার সুগন্ধ নির্গত হইয়াছিল। এই দুইটী বিষয় অবগত হইয়া গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছিলেন—"শাস্ত্রে আছে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা সদ্গতি লাভ করিলে তাঁহার জন্য কাহারও শোক হয় না; এবং ভগবান্ যাঁহাদের দেহ স্পর্শ করেন, দাহকালে তাঁহাদের দেহ হইতে ঐ প্রকার সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। পুতনার শবদাহকালে চতুঃসোমের গন্ধ বাহির হইয়াছিল। সতীশ হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মুক্তাত্মা ছিলেন। দেহান্তে ইনি শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত মধুর লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন—ইত্যাদি।"

পুরী আগমনাবধি গোস্বামী-প্রভু নিজে করতাল বাজাইয়া, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে—ইত্যাদি', ভোর কীর্ত্তন করিতেন। পরে করতালের ধ্বনির সংযোগে সুর করিয়া তিনি যখন নিম্নলিখিত স্তুতি পাঠ করিতেন, তখন নিতান্ত পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত। স্তুতি যথা:—"বদরিকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; রামেশ্বর-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; দ্বারকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; শ্রীবৃন্দাবন-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; ইহকাল-বাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার; স্বর্গবাসী, নরকবাসী পাপী-পুণ্যাত্মা সকলের চরণে নমস্কার; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলের চরণে নমস্কার—ইত্যাদি।"

একদিবস বরাহনগর-নিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ কথক গোস্বামী-প্রভুর নিকটে কথকতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি সানন্দচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। এতদুপলক্ষে পুরীসহরবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। যথাসময়ে কথক মহাশয় অতিশয় সুললিত ভাষায় রুক্মিণী-বিবাহ-লীলা ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে অতিশয় তৃপ্তি প্রদান করেন। পাঠান্তে গোস্বামী-প্রভু কথক মহাশয়কে বিদায়ের স্বরূপ নূতন বস্ত্র, পিত্তলের কলসী, থালা, বাসন ইত্যাদি এবং তাঁহার স্ত্রীর জন্য ৩০।৩৫ টাকা মূল্যের একখানি দক্ষিণ দেশীয় রেশমী শাড়ী প্রদান করিয়াছিলেন।

অপর এক দিবস গোস্বামী-প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন মহাশয় তাঁহার স্বরচিত 'জগাই-মাধাই উদ্ধার-লীলা' কথকতা ও কীর্ত্তন করেন। শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবুর সুমধুর কীর্ত্তন-গানের সুখ্যাতি ইতিপূর্ব্বেই

সহরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং এই দিন সহরস্থিত বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি তাঁহার গান শুনিতে আগমন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন খুব জমাট হইয়াছিল, এবং উপস্থিত সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। অপর একদিন সন্ধ্যা-কীর্ত্তনের সময়ে শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবু গান ধরিলেন—

"(কবে) গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥···ইত্যাদি।"

এই শেষোক্ত পদটী গান করিতেই গোস্বামী-প্রভু ভাবাবেশে স্বীয় বহির্ব্বাস ছিন্ন করিয়া একখণ্ড তাঁহাকে প্রদান করিলেন, এবং একখানি লুই বস্ত্র দিবার জন্য যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়কে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই কৃপাদেশ যথাসময়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

সমাজে যে সকল জাতির 'জলচল' নাই, তাহাদের পক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করা নিষেধ। ঐ সকল জাতীয় লোকের ৺ঠাকুরদর্শন-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য মন্দিরের সিংহদ্বারে ৺জগন্নাথদেবের পতিতপাবন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু ৺রথযাত্রার সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যখন মন্দিরের বাহিরে আগমন করেন, তখন আপামর আচণ্ডাল সকলেই তাঁহাকে দর্শন, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী হন। এই প্রকারে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর সকল প্রকার ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে একদিবস জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,—"সাহা জাতির ত সমাজে 'জলচল' নাই, তবে তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করেন কেন?" উত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"উহারা বৈশ্য বর্ণ সম্ভূত। উহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"*

এই বৎসর জনৈক চণ্ডালজাতীয় লোক পূর্ব্বোক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সাধুর বেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠাকুরের সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়াও তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয় নাই। হতভাগ্য লোকটি ক্রমাগত তিন দিন পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দর্শন না পাইয়া অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে ঘটনাটি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করে। একদিবস সিংহদ্বারের সম্মুখে উক্ত লোকটির সহিত গোস্বামী-প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পতিতপাবন মূর্ত্তি দর্শন করিতে বলেন, এবং মন্দিরের প্রহরীদিগকে ভবিষ্যতে যাহাতে ঐ সকল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন।

---

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাত শ্রুত।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত হইতেছিল। এই সময়ে কলিকাতা সিমলা-নিবাসী প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উক্ত মত খণ্ডন করিয়া "বঙ্গবাসী" পত্রিকাতে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহাতে গোস্বামী-প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া একখানি পত্র লিখেন। পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

"নমোস্তু নিত্যানন্দবংশধরচরণসরোজেষু,

অদ্য বঙ্গবাসীতে "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক প্রবন্ধটি শুনিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, প্রায়ই দেখিতাম যে লোকেরা আসিয়া বলিতেছে যে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকাতে মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন, তাহাই লিখা হইতেছে। সেই পর্য্যন্ত আমার মনে সর্ব্বদা হইত যে, আমাদেব কোন গোস্বামী বংশে কি এমন কেহ নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে। অদ্য আপনার প্রতিবাদ শুনিয়া যে কি পরিমাণ আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না। যদি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ও সমুদ্র শুকাইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র ছিলেন একথা কখনও সত্য হইতে পারে না। আপনি যেরূপ যুক্তিযুক্তভাবে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা খুব সুন্দর হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুব অকাট্য হইয়াছে, তথাপি আমি দুই একটি কথা বলি। আপনি যাহা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, তবে সব দিকেই ঈশ্বরপুরী যে শূদ্র হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

৺মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্ববপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া তিনি যে শূদ্রের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, এ মোটেই সম্ভব হইতে পারে না। গয়াধামে গিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী ব্রাহ্মণ না হইলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেনই বা কেন? তাছাড়া গুরুপরম্পরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বর-পুরী বলিয়া লিখা আছে। ঈশ্বরপুরী শূদ্র হইলে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিবেন কেন?

আপনি যে সব যুক্তি দেখাইয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ সব অসার ও অন্যায় মত খুব খণ্ডন করা হইয়াছে। এইরূপ ভয়ানক মত যাহাতে প্রশ্রয় না পাইতে পারে, তাহার জন্য আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম না দাঁড়ালে সাধারণের কখনই মঙ্গল হ'বে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হইলে যথার্থ সকলের কল্যাণ হইবে। শেষে ৺মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী

করেন ও যেন তাঁহার সত্যধর্ম্ম এইরূপ রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন।

৺শ্রীক্ষেত্রধাম। শাস্ত্র ও সদাচার-রক্ষাকারী সর্ব্ব
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ সজ্জনগণের দাসানুদাস
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।"

এই সময়ে ফরিদপুরের অন্তর্গত পলিতা-নিবাসী গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বর্গীয় ব্রজনাথ অধিকারী মহাশয় গুরুদর্শনার্থ পুরীধামে আগমন করেন। নমঃশূদ্রাদি হীনবর্ণের লোকদিগকে দীক্ষা প্রদান করা ইঁহাদিগের পুরুষানুক্রমিক প্রথা, অথচ ইহারা ব্রাহ্মণ নহেন। এই সকল কারণে জনৈক উচ্চবর্ণের শিষ্য এই বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন যে, ব্রাহ্মণ না হইয়া অপর বর্ণকে মন্ত্র প্রদান করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে? বিশেষতঃ তিনি নমঃ-শূদ্রদিগকে দীক্ষা দিয়া পতিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি উচ্চবর্ণের আহার করা উচিত নয়—ইত্যাদি। এই সকল কথা গোস্বামী প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি উক্ত শিষ্যটীকে, "কাহার কি অধিকার আছে না আছে, তাহা তুমি কি বুঝ? ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া বুঝি অভিমান হইয়াছে?—ইত্যাদি" তীব্র ভৎর্সনা করিয়া এইরূপ বলিলেন যে, "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হীনবর্ণের পতিত জাতির উদ্ধারকল্পে উৎকল দেশ হইতে কতিপয় ধর্ম্ম-প্রাণকরণ কায়স্থকে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। শ্রীমান্ ব্রজনাথ তাঁহাদিগেরই বংশধর, সুতরাং তাঁহার দীক্ষাদানের অধিকার নাই কে বলিল? গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে তারতম্য করিলে গুরুস্থানে অপরাধ হয়।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কোন কোন আহার্য্য দ্রব্য শ্রীমান্ ব্রজনাথের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে তাহাকে আদেশ করিলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে হীনবর্ণের লোকদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি উচ্চবর্ণের লোকের আহার করা উচিত কিনা, এসম্বন্ধে গোস্বামী-প্রভু অপর এক সময়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "ধর্ম্ম ও সমাজ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে একে অন্যের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি খাইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, তবে সামাজিক ব্যাপারে ঐরূপ না করাই ভাল। তাহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের কোন আচরণের দ্বারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, ইহা গুরুজীর অভিপ্রায় নয়। সুতরাং যিনি যে সমাজে আছেন, তিনি সেই সমাজের বিধিনিষেধ পালন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মযাজন করিবেন। তবে গুরু-গৃহে পংক্তি-বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই। ইহা সদাচারসম্মত।'*

একদিবস গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ স্বপ্নে

* স্বর্গীয় ব্রজনাথ অধিকারী মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ

দেখিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখ মলিন, চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতেছে, এবং তিনি কত কি অসংলগ্ন কথা উচ্চারণ করিতেছেন। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া শ্রদ্ধেয় পান্নাবাবু গোস্বামী-প্রভুর নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি যথার্থ স্বপ্নাবস্থায় মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছ।" পান্নাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তাঁহার মুখ মলিন ও চক্ষে জল দেখিলাম কেন ? এবং তিনি কতকগুলি অসংলগ্ন কথাই বা বলিলেন কেন ?" গোস্বামী-প্রভু কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন —"মহাপ্রভু যে শক্তি মাত্র ৩॥ জনকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবার তিনি তোমাদিগকে তাহাই দিয়াছেন, কিন্তু এই দেবদুর্ল্লভ জিনিষের কেহই তেমন মর্য্যাদা দিতে পারিতেছে না, এইজন্যই তাঁহাকে ঐরূপভাবে দেখিয়াছ।"

গোস্বামী-প্রভু-প্রদত্ত সাধনের উচ্চতা ও গভীরতা সম্বন্ধে তিনি অপর একদিন বলিয়াছিলেন যে, "এই সাধনে সিদ্ধাবস্থা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হ'চ্ছে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম অভ্যস্ত হওয়া। এই অবস্থায় সাধক নিদ্রাই যাউনঅথবা জাগিয়াই থাকুন, তাঁহার গুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত চলিতে থাকে। তখন তাঁহার রক্ত-মাংসের প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে ঐ নাম উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতে থাকে, দেহটী নাম-ব্রহ্মের মন্দির হইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে একপ্রকার নাম-সুধারস ক্ষরিত হয়। সাধক উহা পান করিয়া একেবারে বিভোর ও তন্ময় হইয়া পড়েন। এই নামামৃত চুষিতে চুষিতে আত্মা নিষ্পাপ হইলে তবে 'সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' কি বস্তু তাহা বুঝা যায। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরাপদ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। ইহার পূর্ব্বে সাময়িকভাবে যিনি যে অবস্থা লাভ করুন না কেন, তাহার স্থায়িত্ব নাই। কারণ যে মুহূর্ত্তে নাম ছুটিয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই পাপ প্রবেশ করিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। আমার গুরুদেব আমাকে দয়া করিয়া ইহার উপরের আরও দুইটী অবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমি তাহা কাহাকেও দিয়া যাইতে পারিলাম না, কারণ প্রথম অবস্থার লোকই আমার চক্ষে পড়িতেছে না।"

গোস্বামী-প্রভুর সাধনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি পুরীধামে অবস্থানকালে দীন গ্রন্থকারের নিকটে বলিয়াছিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনধামের মধুর লীলা সম্ভোগ করাই এই সাধনের প্রধানতম লক্ষ্য। ইহাকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এই বস্তুই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন পান নাই। পরে তাঁহারা তাঁহারই কৃপায় গোপীরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া, লীলারসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে এই বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা বেদাধীন নহে। বেদে ইহার উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু সাধনপ্রণালী নাই।

এই দেবদুর্ল্লভ মুনিজনবাঞ্ছিত বস্তু কলির জীবকে দান ও তাহার সাধনপ্রণালী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই অবতারের শিরোমণি শ্রীগৌরচন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" অতঃপর একদিবস শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী-মহোদয়, গোস্বামী-প্রভুকে প্রকারান্তরে প্রশ্ন করিলেন—"ইহার পরে এই সাধন লোকে কি প্রকারে পাইবে ?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"যাঁহারা সাধন পাইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই এই সাধন দিতে পারেন। তবে কথা এই যে যদি কেহ নিজকে সম্পূর্ণ ছে'ড়ে, শিষ্যের কল্যাণ কামনা ক'রে সাধন দিতে পারেন, তাহা হইলেই সাধনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হইবে। কিন্তু এই শক্তি আর মাথা কুটিলেও কেহ পাইতে পারেন না। এই শক্তি সে'বার মহাপ্রভু মাত্র ৩। জনকে দান করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে ইহার ছিটাফোঁটা অপরাপর যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এবার এই শক্তি পাইলেন।"

একদিবস গোস্বামী-প্রভুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি সাধন দিতে পারেন কি না ? উত্তরে গোস্বামী-প্রভু অসম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করিলে তিনি স্বকার্য্যে চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকের দীক্ষাদানের অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এইরূপ,—"স্ত্রীদেহ কখনই আচার্য্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে যে গুরুর দেহ শুদ্ধ, তাহা দর্শন স্পর্শ করিয়া শিষ্যগণ পবিত্র হইবেন ; কিন্তু কোন প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে শাস্ত্রকর্ত্তারা স্ত্রীদেহ সর্ব্বদাই অশুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণে যে যে স্থলে স্ত্রীলোকেরা দীক্ষা দিয়া থাকেন, তথায় সেই বংশের একজন সদাচারসম্পন্ন পণ্ডিত লোককে উপগুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সাধনপ্রণালী ও অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু ইহা দেশ-প্রচলিত প্রথা মাত্র, শাস্ত্রের শাসন নহে।" এ সম্বন্ধে অপর এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "অনুরাগ মার্গের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে জাতিবর্ণ কিংবা স্ত্রী-পুরুষ বিচার থাকে না। তবে ঐরূপ অনুরাগ বড়ই দুর্ল্লভ।"

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে জনৈক উদাসীন শিষ্য গোস্বামী-প্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর দলে মিশিয়া, স্বীয় গুরুদেব বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহারা বিনা অনুমতিতেই গুরু সাজিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন ; এবং সাধনের অপরাপর নিয়মাদিও ভঙ্গ করিয়া খামখেয়ালিভাবে চলিতেছিলেন। একদিবস জনৈক শিষ্য তাঁহার ঐ সকল অন্যায় আচরণের কথা প্রভুপাদের কর্ণগোচর করিলে, তিনি নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক উক্ত শিষ্যটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"উনি ত গুরুদ্রোহী। উনি আমাদের সাধন ত ছাড়িয়া দিয়াছেনই, অধিকন্তু ভিতরে ভিতরে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করেন। ওনার এজন্মে এই পর্য্যন্তই।" গোস্বামী-প্রভুর মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় শিষ্য উক্ত শিষ্যটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি পরে

বলিলেন—ধর্ম্ম লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ক্ষুরের ধারের ন্যায় উহার পন্থা অতিশয় দুর্গম। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই খ্যাচ্ করিয়া কাটিয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রে আছে যে, সৎগুরুর আশ্রয় লাভ হওয়ার পরেও একটি সাধকে পূর্ণকাম হইতে তিনটি জন্মের আবশ্যক হয়। এই সাধন যাহারা পাইয়াছেন, তিন জন্মে তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে সকলকেই যে তিন জন্ম ভোগ করিতে হইবে, তাহাও নয়। গুরু অনুগত হইয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিলে এক জন্মেই অনেকে মুক্তি পাইতে পারেন।" উক্ত শিষ্যটির কথাপ্রসঙ্গে তিনি অপর একদিন বলিয়াছিলেন—"প্রত্যেক সাধকেরই এক একটি মা'রের ঘাট আছে। ভগবানের যখন কাহাকেও শাসন করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তিনি ঐ সকল ঘাট ধরিয়া শাসন করেন। উহার মা'রের ঘাট হ'চ্ছে কল্পনা। এই কল্পনার ঘাটেই উহার পতন হইয়া গিয়াছে।"

পুরীতে গোস্বামী-প্রভুর অভুতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া আপামর সাধারণ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 'এমন দাতা আর হবে না,' 'এমন দয়ালু আর নাই,' 'সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় এমন শোভন মূর্ত্তি আর কখনও দর্শন করি নাই'—ইত্যাদি প্রশংসাসূচক বাক্য রাস্তায় বহির্গত হইলে অনেকের মুখেই শুনা যাইত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, সাধু-অসাধু, যুবক-বৃদ্ধ, স্বদেশী-বিদেশী সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই গোস্বামী-প্রভুকে দর্শন করিতে, তাঁহার মুখনিঃসৃত দুইটি কথা শুনিতে সদাসর্ব্বদা তাহার আশ্রমে যাতায়াত করিত। দূরদূরান্তর হইতে যাত্রীর দল তীর্থ দর্শন করিতে আগমন করিয়া, তীর্থস্থানের অপরাপর দ্রষ্টব্য বস্তুর সহিত গোস্বামী প্রভুকে দর্শন না করিলে যেন তাহাদের তীর্থযাত্রা সফল হইত না; তাহারা দলে দলে আসিয়া অন্ততঃ একবারও তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাইত। গোস্বামী-প্রভুর এইরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি দর্শন করিয়া কতিপয় ধর্ম্মাভিমানী মাৎসর্য্যপরায়ণ লোকের হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকারে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

পুরীধামে আগমন করিয়া গোস্বামী-প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন—"যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান্ একই তত্ত্ব, তদ্রূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও মহাপ্রসাদও একই তত্ত্ব, ইঁহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই। ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু। জগন্নাথ দর্শনেও যে ফল, মহাপ্রসাদ সেবনেও সেই ফল।" এই কথা শুনিয়া জনৈক শিষ্য বলিলেন—"তবে মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রই ফল পাওয়া যায় না কেন?" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"সকলেই প্রাপ্তিমাত্র ফল পাইতে পারিবে না, কারণ মানব-মাত্রেরই সাধরণতঃ শরীর-মন অশুদ্ধ থাকে। অশুদ্ধ শরীরে মহাপ্রসাদের ফল অনুভুত হইতে পারে না, যেমন সকল দর্পণে প্রতিবিম্ব

দেখা যায় না। তবে দীর্ঘকাল মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে সকলেই যে তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে করিতে বস্তুগুণে শরীর-মন শুদ্ধ হইতে থাকে এবং প্রকৃতিভেদে যাহার দেহ মন যত শীঘ্র, যে পরিমাণে পরিশুদ্ধি লাভ করিতে থাকে, তিনি তত শীঘ্র সেই পরিমাণে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে থাকেন। অবশেষে ভগবৎকৃপায় মহাপ্রসাদের গুণে শরীর মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে, তিনি উহার পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন। তখন সেই বিশুদ্ধাত্মা ভক্ত মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রই —

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইত্যাদি ভগবদ্দর্শনের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা স্বীয় প্রাণে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন"

শ্রীক্ষেত্রে আগমনাবধি নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে গোস্বামী-প্রভু মহাপ্রসাদ প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই ভোজন করিতেন না, এবং মহাপ্রসাদ বলিয়া কেহ কিছু প্রদান করিলে তাহা কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রসাদের প্রতি এইরূপ গভীর শ্রদ্ধার সুযোগ অবলম্বন করিয়া একদিনস পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বোক্ত দুর্বৃত্তগণ দ্বারা প্ররিত হইয়া, জনৈক সাধুবেশধারা খল-প্রকৃতির লোক তীব্র বিষমিশ্রিত একটী লাড্ডু তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহা প্রাপ্তিমাত্র ভোজনের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল। আগন্তুকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মুহূর্ত্তে সেবকগণের মধ্যে কেহ নিকটে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মহামতি প্রহ্লাদের ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া মহাপ্রসাদরূপে প্রদত্ত বস্তুর সম্যক আদর ও সম্মান দেখাইবার অভিপ্রায়ে অম্লানবদনে অবিচলিতচিত্তে উক্ত বস্তু সেবন করিলেন। তীব্র হলাহলের ক্রিয়া তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইল, তিনি ক্ষণকালের মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ মহাদেব লোকনাথ প্রভুর কৃপাতে অত্যল্পকালের মধ্যে পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। বিষের প্রাণহারী শক্তি দুই এক দিনের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যেন বিশেষ কিছু হয় নাই, এইরূপভাবে তিনি পুনরায় পাঠ, পূজা, কীর্ত্তনাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা-সংসৃষ্ট লোকদিগকে জানিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু গোস্বামী-প্রভুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কতিপয় সাধুর কার্য্যকলাপে ভক্তি-ভাজন যোগজীবন গোস্বামীর সন্দেহ হওয়াতে তিনি গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার আকস্মিক ভয়ানক অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোস্বামী-প্রভু প্রথমতঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পরে প্রভুপাদ যোগজীবন ও

অপরাপর শিষ্যগণ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর করিলেন—

"গতকল্য যখন তোমরা সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলে তখন ঘরে কেহই ছিল না। ইত্যবসরে মহাপ্রসাদের নাম করিয়া এক ব্যক্তি আমাকে তীব্র বিষমিশ্রিত লাড্ডু খাওয়াইয়াছিল। ইহা এক বিষম ষড়যন্ত্রের ফল। প্রায় ২৫ জন ব্যক্তি ইহাতে সংশ্লিষ্ট। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমাকে ঐ সকল লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের পুরী আগমনের পর ঐ সকল লোকের প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া ইহারা এই অমানুষিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে।" এই সকল ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানিতে চাহিলে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। এইরূপ ঘটনা আমার জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে। সমাজ, সম্প্রদায়, কি ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠার হানি কল্পনা করিয়া আমার প্রাণ-বিনাশের বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ভগবৎকৃপায় প্রত্যেকবারেই আমি রক্ষা পাইয়াছি।"* এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার আশ্রিত অনুগত ভদ্রসন্তানগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর প্রতিবিধিৎসা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইল। তখন গোস্বামী-প্রভু অতি সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এক বিষম ব্যাপার। ইহার হানি হইলে লোকে না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই। সাধকশ্রেণীর মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি অন্যান্য কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও এই প্রতিষ্ঠার ঘাটে, অর্জ্জিত সাধন সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়া নিরয়গামী হন। তোমরা শান্ত হও। ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা বড়ই কৃপার পাত্র।"

শাসনবিভাগের কতিপয় উচ্চ কর্ম্মচারী এই ঘটনা অবগত হইয়া গোস্বামী-প্রভুর নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন—"পুরীধামে অনেক দুষ্ট লোকের আড্ডা হইয়াছে; ইহারা ভাল মানুষের প্রতি বড়ই অত্যাচার করে। ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই বিষপ্রয়োগের কথা একটু লিখিয়া জানান। দুষ্টদিগের শাসনের এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন -"আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আশ্রয়ে বাস করিতেছি। তিনি সমস্ত দেখিয়াছেন, ইচ্ছা হইলে তিনিই প্রতিবিধান করিবেন, নতুবা লোকের নিকটে আমি কোনরূপ প্রতিকারের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব না।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

এই ঘটনার পর প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী ও অপরাপর শিষ্যগণ গোস্বামী-প্রভুর শরীর রক্ষার জন্য অতীব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কি জানি, দুর্বৃত্তগণের মনে আরও কি আছে, তাহারা পুনরায় কি নূতন বিপদ ঘটায়, এই আশঙ্কা করিয়া শিষ্যগণ তাঁহাদের প্রাণের প্রিয়তম দেবতা গোস্বামী-প্রভুকে

* গোস্বামী-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত।

তাড়াতাড়ি কলিকাতায় গমন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভু শিষ্যদিগকে এইরূপ বিচলিত হইতে দেখিয়া একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী-মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোরা এত ভাবছিস্ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব তিনবার করিয়া আমার খবর নিচ্ছেন। ইনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, আমার ভয় কি? অন্য স্থানে গেলে কি ত্রাণ পাইব? একটা কাঁটা ফুটিলেও মৃত্যু হইতে পারে। আর তাঁহার ইচ্ছা না হইলে ধরিয়া আছড়াইলেও কিছুই হইবার যো নাই। অন্যদিকে তোমরা তাকাও কেন? যাইবার ইচ্ছা হইলে তোমরা চলিয়া যাও। আমি কেবলমাত্র লাঠিগাছা অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কদাচ কিছু করিব না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঠিক হইয়া যাইবে। ঠাকুর ঘরের ছেলে ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি সময় বুঝিয়া আদেশ করিবেন।" পরে বলিলেন—"এখানে আমি যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এই-স্থানে আমার আর কোন কর্ম্ম নাই। এখন আদেশ হইলেই যাইতে পারি। কিন্তু এক কপর্দ্দক ঋণ থাকিতেও নড়িব না।" এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ শীঘ্র শীঘ্র ঋণ-শোধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অনুগত শিষ্য শ্রীমান্ পান্নালাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ঋণশোধের চেষ্টায় কলিকাতা অঞ্চলে আগমন করিলেন। শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই ঐ কার্য্যের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে গোস্বামী-প্রভুর মফঃস্বলস্থ শিষ্যগণ তাঁহাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের দানকার্য্যের সহায়তার জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর শরীর ইদানীং একেবারেই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। উঠিতে বসিতে হাঁটিতে চলিতে, সর্ব্বদা তাঁহাকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত, তথাপি একটী দিনের জন্যও, তাঁহার পাঠ পূজা, কীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তাঁহাকে বেদানা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হইত। কিন্তু কলিকাতায় এই সময়ে বেদানা দুর্ল্লভ হওয়াতে জনৈক শিষ্য প্রস্তাব করিলেন যে, উইল্‌সনের হোটেলে এক প্রকার বেদানার রস বিক্রয় হয়, তাহা তিনি খাইতে পারেন কি না। তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন—"সে কি? আমি অপরের নিকট শাস্ত্র-সদাচারের মহিমা প্রচার করিতেছি, আর আমি সদাচার-বহির্ভুত কার্য্য করিব, তাহা কখনই হইতে পারে না।" এই কথা শুনিয়া গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন—"উইল্‌সনের হোটেলের পাঁউরুটী ত আপনি পূর্ব্বে খাইয়াছেন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা করিয়াছি এখনও কি তাহাই করিতে হইবে? দেখিতে পাইতেছ না, আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি?"

গোস্বামী-প্রভু শেষজীবনে বহু বৎসর পর্য্যন্ত একেবারেই নিদ্রা যান নাই, সমস্ত রাত্রি আসনে বসিয়া ভগবৎধ্যানে অতিবাহিত করিতেন, কখনও বা জাগ্রত শিষ্যগণের সহিত নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। বর্ত্তমান ঈদৃশ ভগ্ন শরীর লইয়াও তিনি এই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার স্নেহশীলা শ্বশ্রূঠাকুরাণী একদিন বলিলেন—"তুমি এখন কিছুদিন শয়ন করিলেও ত পার।" তদুত্তরে গোস্বামী-প্রভু বলিলেন -"আমি যেদিন শয়ন করিব সেদিন আর থাকিব না, যেদিন আসন ত্যাগ করিব, সেদিন আমি থাকিব না।" শ্বশ্রূঠাকুরাণী এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

এক দিবস গোস্বামী-প্রভু কতিপয় শিষ্যের নিকট বলিলেন "দেখ, তোমাদের সম্মুখে বর্ষাকাল উপস্থিত। বর্ষাকালে যেমন আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে, পথ-ঘাট কর্দ্দমময় হয়, নদী-নালার জল অপরিষ্কার হয়, যেখানে সেখানে পোক-জোক কিল্‌বিল্‌ করে, প্রকৃতিকে যেন নিরানন্দের ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলে, তখন মনে হয় না যে এই দিন চলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে বর্ষাকালের পরই শরৎকালের ব্যবস্থা। শরতের আগমনে আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হয়, রাস্তা-ঘাট শুকাইয়া যায়, আবার মেদিনী হাসিতে থাকে। সেইরূপ এখন তোমাদের সাধনমণ্ডলীর প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের সময় উপস্থিত। এই সময়ে নানা প্রকার রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান-নির্য্যাতন, পরস্পরে অবিশ্বাস প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় আগমন করিবে। সময়ে সময়ে ইহা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে যে, অনেকে সাধন-পন্থায় অবিশ্বাসী হইয়া সাধন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ভয়ানক অবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় ধৈর্য্য ধরিয়া গুরুদত্ত নাম গ্রহণ করা। যিনি তাহা করিতে পারিবেন, তাঁহার কর্ম্ম শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া শান্তির অবস্থা উপস্থিত হইবে। আর যিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিপথে গমন করিবেন, তিনি আরও ঘোর বিপাকে পতিত হইবেন। বর্ষাকালের পরেই যেমন শরৎকাল আগমন করে, সেইরূপ তোমাদেরও এই অবস্থার পরেই চির শান্তির অবস্থা উপনীত হইবে।" ইদানীং এইরূপে মধ্যে মধ্যে তিনি যেন বিদায়সূচক কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিবস বলিলেন—"দেখ, মাতাঠাকুরাণীর কথাই বুঝিবা সত্য হয়।" (তাঁহার মাতৃদেবী কোন সময়ে শিষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বিজয় পুরী গেলে আর ফিরিবে না।") অপর একদিবস তিনি ধ্যানাবস্থায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম", "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।" এই কথা শুনিয়া জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এ কথা বলিলেন কেন?" গোস্বামী-প্রভু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমার অন্তর্জ্জলী হইল, দেবতারা আমার অন্তর্জ্জলী করিলেন।" গোস্বামী-প্রভুর মুখে পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহাকে

কলিকাতা নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্রতার সহিত আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সে চিন্তা তখনও তাঁহাদিগকে তাদৃশ চিন্তিত করিয়া তোলে নাই।

কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই গোস্বামী-প্রভুর শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না, প্রায়ই ধ্যানস্থ থাকিতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক গান শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রায়ই শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ও বরিশাল, বাইশারি নিবাসী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় সুমধুর গান করিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেন। এই সময়ে তিনি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গান কয়েকটী শ্রবণ করিতে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ; যথা—

বাহার মিশ্র —তেওট্।

১। লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন্ গুণে।
ও কেউ চন্দন দানে, বস্‌লো রাজ-সিংহাসনে,
আমরা প্রাণদানেও স্থান পেলেম না চরণে।
ছিল প্রবীণে, হ'লো নবীনে, হায়গো সে যে তোমা বিনে,
যেমন শ্রীরাম বিনে জানকী অসুখী অশোকবনে।
হ'ল রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
হরি সকলি তোমারই কৃপায় ;
তুমি যারে না রাখ পায়, তার বিপদ ঘটে পায় পায়,
(আর) তুমি যারে রাখ পায়, সে সকলই পায়,
লজ্জা পায় হে হরি, তোমার পায় ধরা দিন প'লে মনে ॥

২। খাম্বাজ—মধ্যমান।

দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না।
দিন যাবে সুখে না হয় দুঃখে, রবে কেবল ঘোষণা ॥
(লোকে বলে) তুমি দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় প্রেমসিন্ধু,
ওহে করুণার সিন্ধু, এক বিন্দু দানে শুকাবে না ॥
তুমি বাম করে ধর্‌লে শৈল, সে ভার ত তোমার সৈ'ল,
(এই) ত্রিজগতের ভার সৈ'ল, (বুঝি) অধমের ভার সৈ'ল না ॥

৩। খাম্বাজ—যৎ।

আমার শ্যামের ঐ কালো রূপ ভুল্‌তে নার্‌বো কোন কালে।
লোকের কথায় কি কর্‌বো সই, বলুক্ লোকে যে যা বলে ॥
কালো কেশে কালো বাসে লোটন বাঁধিব, যখন শ্যামকে পড়বে মনে
(কালো কেশ) এলায়ে দেখিব ;

কালো কালিন্দীতে যাবো, কালো জল যতনে খাবো, কালো বঁধুর গুণ
গাবো, বস্‌বো কালো তমাল তলে।
কালো ময়ূর, কালো ভৃঙ্গ কর্‌বো দরশন, দন্তে নেত্রে দিবো কালো
মঞ্জন অঞ্জন,
কালো রূপ নয়নে হের্‌বো, কালো রূপ ধেয়ানে ধর্‌বো,
নীলকণ্ঠ কয় কাল হর্‌বো, তর্‌বো, মর্‌বো কালো সখার কোলে ॥

সারঙ্গ—একতালা।

সখি, আমায় দে গো মোহন চূড়া বেন্ধে।
আর কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি, দাঁড়াবো চরণ ছেঁদে।
আমি কৃষ্ণ, তারে রাধিকা সাজাবো, এমনি ক'রে একদিন মথুরাতে যাবো,
দুঃখ জানে না, জানে না, জানাবো জানাবো, কি যাতনা শ্যাম-বিচ্ছেদে।
তিনি যবে এই রাধারূপ ধরি, মনের জ্বালায় যাবেন ধূলায় গড়াগড়ি,
দিবা বিভাবরী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি বেড়াইবেন কেন্দে কেন্দে ॥
এমনি লুকান আমি লুকাবো গোপনে, ভুলেও একদিন দেখা
দিব না স্বপনে,
দিবানিশি যেন মদনমোহনে মদন-শরেতে বিঁধে।
ব্রজ বিলাস আমি করবো যতদিন, চন্দ্রাবলার প্রিয় হব ততদিন,
তার বদন-নলিন হইবে মলিন, কৃষ্ণ অদর্শন খেদে ;
মান ভরে যেদিন ঘটাবেন প্রমাদ, বসনে ঝাঁপিয়ে রাখ্‌বেন বদনচাঁদ
নীলকণ্ঠ কয মেগে লব অপরাধ, ধরিয়ে যুগল পদে ॥

গোস্বামী-প্রভু যে সুমধুর গান করিতে পারিতেন তাহার পরিচয় সহৃদয় পাঠকবর্গ একাধিক বার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরের এমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাহাতে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইত। শরীর সুস্থ বোধ করিলে ইদানীং তিনি কখনো কখনো আপন মনে গান করিতেন। একদিবস মাধ্যাহ্নিক আহারের পরে তিনি গান ধরিলেন—

সুরট মল্লার—একতালা।

ধনি, আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক, আমারই সৃষ্টি করা চতুর্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি, হরিবারে দুঃখ, ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়,
(ওসে) গঙ্গাধর-চূর্ণ আমারই আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে।
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, তোমা জিনি আমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
(ওসে) জয় মঙ্গলাদি কোথা পাবে নর, সে সব মম স্থানে।

সংসার কুপথ্য, ত্যজে যে বৈরাগ্য, জন্মের মত তায় করি আরোগ্য,
বাসনা বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক ঘুচাই তার যতনে।
দৃষ্টি মাত্র দেহে রাখিনা বিকার, তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার, থাকে কি অধিকার, আমায় ডাকে যে জনে॥

তাঁহার এই গানে আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীর যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তিনিও ভাবে ভরপুর হইয়া গান করিতে লাগিলেন। গান গাইতে গাইতে তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি একবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। শিষ্যগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া জানি না কি ভাব হৃদয়ে বহন করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিলেন। গোস্বামী-প্রভুর মুখে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এই শেষ গান শ্রবণ করিলেন।

অতঃপর এক দিবস অপরাহ্নে অনুমান ৪ ঘটিকার সময়ে গোস্বামী-প্রভু মাধ্যাহ্নিক আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে পার্শ্বের গৃহে দুইজন শিষ্য কোন কারণে উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে থাকেন। ইহাতে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিলেও তখন কিছু বলিলেন না। সন্ধ্যা কীর্ত্তনান্তে তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন—"দেখ, আজ যখন তোমরা বাদানুবাদ করিতেছিলে, তখন স্বয়ং জগন্নাথদেব এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার এখন কি করা কর্ত্তব্য?" তিনি বলিলেন—"তুমি উঁহাদের নিকট ক্ষমা চাও।" অতঃপর তিনি উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া করজোড়ে বলিলেন—"তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, এই ক্ষমা করো যে, তোমরা পরস্পর পরস্পকে ক্ষমা করো, তা'হলেই আমাকে ক্ষমা করা হইবে।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত শিষ্যদ্বয়ের বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্যটীর নাম ধরিয়া বলিলেন—"তুমি উহার (প্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্য) অপেক্ষা বয়সে ছোট, অতএব তুমি উহাকে প্রণাম করো।" এবং বয়োঃজ্যেষ্ঠ শিষ্যটীকে বলিলেন—"উনি তোমার ছোট ভাই, অতএব তুমি উহাকে আলিঙ্গন কর, আমি দেখিয়া চক্ষু জুড়াই।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত শিষ্য দুইটী সাশ্রুনয়নে প্রফুল্লচিত্তে পরস্পর পরস্পরকে প্রণামালিঙ্গনাদি করিয়া পূর্ব্বাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন। গোস্বামী-প্রভু উপস্থিত শিষ্যাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আজ জগন্নাথদেব তোমাদিগকে একটী সঙ্কেতের কথা বলিতে আদেশ করিয়াছেন। সঙ্কেত এই যে, যখন তোমাদের কাহারও প্রতি কামক্রোধাদির উদ্রেক হইবে, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিবে।" কিয়ৎকাল পরে বলিলেন—"আজ হইতে স্বয়ং জগন্নাথদেব তোমাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি

বলিতেছি, আমারকথা বিশ্বাস করো, নিশ্চয়ই তোমাদের শান্তি আসিবে, কিন্তু কিছু সময়-সাপেক্ষ।" এই কথা বলিয়া তিনি হঠাৎ কিঞ্চিদূর্ধ্বে দৃষ্টি করতঃ বলিলেন—"এই যে! এখানে জগন্নাথদেব উপস্থিত! এসব কথা আমি বলিতেছি না, তিনিই আমার মুখ দিয়া বলাইতেছেন।" শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি গোস্বামী-প্রভুর এই শেষ উপদেশ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গেল। ঋণ শোধ হইলেই আত্মীয়-স্বজন ও অনুগত শিষ্যগণ কলিকাতা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট ষ্টীমার ভাড়ার বাবত ষোল শত টাকা তারযোগে কলিকাতায় পাঠান হইল। কিন্তু এদিকে গোস্বামী-প্রভু যে ইহলোকে কার্য্য সমাধা করিয়া অনন্ত লীলাময়ের লীলারস-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা সকলেরই অবিদিত রহিল। ২২শে জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তিনি এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, স্বীয় আসনে গিয়া আর উপবেশন করিতে সমর্থ হইলেন না, একেবারে শয়ন করিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সমাধিস্থ হইলেন। অতঃপর ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে সমাধি-ভঙ্গ না হওয়াতে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রমুখ শিষ্যগণ চিন্তিত হইয়া তাঁহার নিকটে ধীরে ধীরে কীর্ত্তন করিয়া ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। অনুগত শিষ্যগণের মুখকমলে ঘোর বিষাদের চিহ্ন দেখা দিল। তাঁহারা দুইচারি জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন এইভাবে অতীত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত হইলে রজনীর ঘোর অন্ধকারে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অতঃপর প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়কে দুই তিন বার ডাকিলেন। তিনি নিকটে আসিলে বলিলেন—"আজ আমার শরীর বড় খারাপ, তুমি নিকটে থাকিও।" তৎপর তিনি শৌচাগার যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দুইজন শিষ্য তাহাকে ধরিয়া শৌচাগারে লইয়া গেলেন। তথা হইতে আগমন করিয়া আর আসনে গেলেন না। আসনের নিকটবর্ত্তী টবে রোপিত স্বীয় নিত্যপূজার তুলসীবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে আসনে গিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। ইতঃপূর্ব্বে একদিবস তিনি স্বীয় শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নিকট, 'যে দিন আসন ছাড়িব সে দিন আর আমি থাকিব না' ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাহা কাহারও স্মৃতিপটে উদিত হইল না। সে যাহা হউক, সমস্ত দিন পরে গোস্বামী-প্রভুকে স্বাভাবিক-

ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া শিষ্যদিগের মনে আশার সঞ্চার হইল। শ্রদ্ধেয় জগদ্বন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার এখন কি অসুখ বোধ হইতেছে?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"দুর্ব্বলতা ভিন্ন আমার আর কোন অসুখ নাই।" এই সময়ে তিনি কিছু ছানা ও ডাবের জল পান করিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় কিশোরীলাল সেন মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত সাবরডিনেট জজ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া গোস্বামী-প্রভুকে পান করাইতে অনেকদিন হইতেই তাঁহার অন্তরে একটী বাসনা ছিল। তিনি গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার চা পান করিবার অভ্যাস। সমস্ত দিন চা খান নাই, কিছু চা খাইবেন নি?" গোস্বামী-প্রভু উত্তর করিলেন—"আচ্ছা, ভাল ক'রে, খুব ঘন ক'রে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে এস।" এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধেয় কিশোরীবাবু তাড়াতাড়ি চা প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ মহাশয় চায়ের পাত্রটী সম্মুখে ধরিয়া রাখিলেন এবং গোস্বামী-প্রভু স্বহস্তে ছোট একটি পাথরের বাটীতে করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে চা পান করিতে করিতে গোস্বামী-প্রভু ক্ষণকাল উর্দ্ধে দৃষ্টিকরতঃ মস্তক নত করিয়া কাহাকে যেন প্রণাম করিলেন এবং তম্মুহূর্ত্তে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ভগ্নদেহের সঙ্গে তাঁহার অমর আত্মার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। (১৩০৬ সন, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, সায়াহ্ন, ৯ ঘটিকা ২০ মিনিট, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি।)

শান্তিপুর-শৈলের সমুজ্জ্বল ভাস্কর, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্ম-বিপ্লবের ঘোর ঘনঘটাপূর্ণ ভারতাকাশে অনন্ত শান্তিময় সুবিমল সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-কিরণ বিকীরণপূর্ব্বক, ভারতের সর্ব্বদুঃখাপহ লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মবিদ্যা পুনঃস্থাপনকরতঃ, যুগাবতার নদীয়াবিহারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কলিকলুষনাশন নামসংকীর্ত্তনধর্ম্মকে শাস্ত্র ও সদাচারভ্রষ্ট উপধর্ম্ম যাজকদিগের করাল কবল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া, সজ্ঞানে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অসীম অতলস্পর্শ নীলাম্বু-রাশির সমীপবর্ত্তী নীলাচলে চিরদিনের তরে অস্তমিত হইলেন।

এই মহাপ্রস্থানে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অনুগত শিষ্যগণের মর্ম্মস্থলে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন, জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতার পার্থিব সংসর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে গভীর মর্ম্মবেদনা, যে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভাবে তাঁহার ভক্তবৃন্দের যে হৃদয় বিদারক মহা শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল, গোস্বামী-প্রভুর অভাবেও তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও যে কত শত শত নরনারী সজনে-নির্জ্জনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কত ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ের কোন্ গভীরতম

প্রদেশ হইতে ঘন ঘন উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস উত্থিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে কি প্রকার জনতা সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। গোস্বামী-প্রভুর পুরীধামস্থ নীলমণি বর্ম্মনের বাটীতে অবস্থানকালে এই প্রকার জনস্রোত সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। সাধু, সজ্জন, ভিক্ষুক, কাঙ্গাল প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর লোক তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া বাটীর সম্মুখস্থ স্থান সর্ব্বদাই পূর্ণ রাখিত। বানরগণ দলে দলে তাঁহার আসনপ্রকোষ্ঠে এবং সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিত। ইহাদের আকৃতিপ্রকৃতি ও হাবভাব দেখিয়া স্বতঃই মনে হইত প্রভুপাদের সহিত যেন ইহাদের বাক্যালাপ ও ভাববিনিময় সর্ব্বদা চলিতেছে। তিরোধানের পরদিবস প্রভুজীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেচ্ছু লোকসমূহ আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলে সকলের কণ্ঠ হইতে গভীর শোকোচ্ছ্বাসব্যঞ্জক হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। এমন কি, বানরগণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে প্রভুর বিচ্ছেদসূচক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। পশু-পক্ষীদিগকে যথারীতি আহার্য্য বস্তু প্রদান করিলে, তাহারা তাহার একটী কণাও স্পর্শ করিল না। সমস্ত পুরীধাম যেন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ ভক্তচূড়ামণি প্রভুপাদ আনন্দ-কিশোর গোস্বামী তপস্যা এবং অলৌকিক ভক্তিদ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে অবশেষে এই অলোক-সামান্য পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষপ্রবর আজ পুনঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হইলেন। তিরোধানের পূর্ব্ব রজনীতে তিনি সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে সোৎসাহে বলিয়াছিলেন—"আজ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তোমাদের সকলের ভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই সময়ে যথার্থ শান্তি লাভ করিবে।" এই বাক্যদ্বারা ভক্তমণ্ডলী বুঝিয়াছিলেন প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অভেদাত্মা ; যাহা হইতে আবির্ভূত হইয়া তিনি শ্রীমদানন্দ-কিশোর গোস্বামী-প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, আবার তাঁহাতেই নিত্যাবস্থায় প্রবেশ করিলেন।

পরদিবস দেহ সৎকারের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় প্রভুপাদের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমদ্ যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, বহুকাল পূর্ব্বে গোস্বামী-প্রভু তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে সৎকারের বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হইল। অতি আশ্চর্য্যভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরতীরস্থ বিস্তীর্ণ স্থানটী প্রভুপাদের সমাধির জন্য বায়না-পত্র করা হইল, এবং মহাসমারোহে শিষ্যবৃন্দ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত

হইয়া সেই ভাগবতী তনু সুসজ্জিত বিমানে স্থাপিত করিয়া যথাস্থানে লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিয়ৎকালের জন্য সকলের বিষাদ-কালিমা দূরীভূত হইল। প্রভুপাদের পূজনীয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূঠাকুরাণীরও অভাবনীয়রূপে শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। মহোৎসাহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে প্রভুপাদ একদিন এই সরোবরের অপর পাড়ে দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন—"ওপারে একটী স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াবিশিষ্ট মন্দির দেখা যাইতেছে!" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন যথার্থই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই সমাধিক্ষেত্রে সেবাধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে একটী অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শ্রীমন্দিরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং ইহার দুই পার্শ্বে সাধকবৃন্দের ভজনস্থান ও বাসগৃহ প্রভৃতি ইতঃপূর্ব্বেই প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দিরের বামপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে গোস্বামী-প্রভুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি সযত্নে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছে। উহার একটী তালিকা যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।

প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য ও সুহৃদ স্বর্গীয় নবকুমার বাক্‌চী মহাশয়ের সোৎসাহ পরিশ্রমে এই স্থান ফল-ফুল-শোভিত অপূর্ব্ব রম্য কাননে পরিণত হইয়াছে। আগন্তুক দর্শকমাত্রেই এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রভুপাদের নিত্য-বর্ত্তমানতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই নিত্য মহাপুরুষ অদ্যাপি ত্রিতাপক্লিষ্ট ধর্ম্মপিপাসু মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রত্যক্ষভাবে কৃপা করিয়া চিরশান্তি লাভের পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

সংসারে প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করা তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ সেই শুভ কার্য্য এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিরোধানের পরেও ধর্ম্মপ্রাণ বহু সংখ্যক সৎ ব্যক্তির অলৌকিক দীক্ষা ও তাহাদের জীবনে সংঘটিত অদ্ভুত ঘটনা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ প্রভু-পাদের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। তিরোধানের পূর্ব্বে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমার এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা এই স্থূলদেহ বর্ত্তমান থাকিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যথাসময়ে ঐ কার্য্য আরম্ভ হইবে।"

প্রেম-ভক্তি লাভই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। সেই পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিলে জীব পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়। প্রভুপাদ সেই পরমপদ লাভের একমাত্র উপায় ও কলিকালের একমাত্র উপাস্য দেবতা "৺নাম-ব্রহ্ম" ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়া ভজন করিবার জন্য জীবকে উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন।

তাঁহার সাধনাশ্রম গেণ্ডারিয়াতে তিনি স্বহস্তে ঐ "নাম-ব্রহ্ম" প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন ; এবং তাঁহার প্রত্যাদেশে তদীয় ভক্তিমান পুত্র যোগজীবন গোস্বামী-মহাশয় পুরীধামস্থ সমাধিক্ষেত্রেও উহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।*

এই স্থানটি এখন "জটিয়া বাবার সমাধি" নামে পরিচিত। প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-মহোদয়ের জীবিতাবস্থায় তিনি উক্ত সম্পত্তি রেজেষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা ৺নাম-ব্রহ্ম দেবতাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেবোত্তর সম্পত্তি শাসন-সংরক্ষণ এবং ঠাকুরের সেবাদি কার্য্য চালাইবার জন্য পাঁচ জন মেম্বরযুক্ত একটী কমিটি এবং একজন সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। গোস্বামী-প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয় বর্ত্তমান সেবায়েত এবং রায়বাহাদুর কিশোরীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়গণ (ইঁহারা সকলেই গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য) উক্ত কমিটির মেম্বর নিযুক্ত আছেন।

প্রভুপাদ যোগজীবন গোস্বামী-লিখিত দেবোত্তরপত্র হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—"যেহেতু উক্ত স্থান (সমাধিস্থান) প্রথমাবধি এই পর্য্যন্ত দেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল উহাতে অবিচ্ছেদে দেবকার্য্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত ; অতএব এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্যরূপে দেবতাকে অর্পণ করিয়া, তাহা নির্ব্বিবাদে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। তদনুসারে এই দলিল দ্বারা অদ্য উক্ত সম্পত্তি তন্মধ্যে স্থাপিত ৺নাম-ব্রহ্ম দেবতাকে অর্পণ করিয়া, আমি নিজে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হইলাম। অদ্যাবধি উক্ত সম্পত্তিতে আমার সর্ব্বপ্রকারের স্বত্ব ৺নাম-ব্রহ্ম দেবতাতে বর্ত্তিল ; অদ্যাবধি আমার সর্ব্বপ্রকার মালিকী-স্বত্ব উক্ত নাম-ব্রহ্ম দেবতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নাম উক্ত সম্পত্তির মালিক স্বরূপ জারী হইয়া তাঁহার মালিকীয়তে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে ; এবং উক্ত সম্পত্তির সমুদয় আয় উক্ত ঠাকুরের সেবা-অর্চ্চনাদিতে ব্যয়িত হইবে।

"সেবায়েত নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া সেবার পরিচালন-কার্য্য করিবেন।—

১। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভাব ও উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ না হইতে পারে, এই বিষয়ে সেবায়েত কমিটী, সমাধিবাসী, অতিথি, আগন্তুক ও অন্যান্যের যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

(ক) এই স্থানে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই সমানভাবে আদৃত হইবে। (খ) এই স্থানে জীবহিংসা করা নিষেধ। মৎস্য-মাংস পাক বা ভোজন হইবে না কেবলমাত্র চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে রোগীকে অন্যত্র পাক করিয়া মৎস্য দেওয়া যাইতে পারে। আত্মরক্ষার্থে হিংস্র জন্তু বধে নিষেধ নাই। প্রয়োজনবশতঃ বৃক্ষাদি

ভজনশীল সাধুমাত্রেই তাঁহার প্রিয়জন। প্রকটাবস্থায় কেহ তাঁহার সেবা-প্রার্থী হইলে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"যাঁহারা ভক্তিসহকারে শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্বীয় গুরুদত্ত নাম সাধন করেন, তাঁহারাই আমার যথার্থ সেবা করেন, অন্য

ছেদনে নিষেধ নাই। কিন্তু রাত্রিকালে উহা একেবার নিষিদ্ধ। দিবসেও বিনা প্রয়োজনে নিষিদ্ধ। (গ) তামাক ভিন্ন অন্য কোনও মাদক দ্রব্য সেবন করা নিষেধ। চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে। সাধু কিম্বা অতিথি আসিলে তাঁহাদের প্রয়োজন মত গাঁজা, আফিং আদি দেওয়া যাইতে পারে। (ঘ) পরনিন্দা, কলহ, লোকের সহিত মর্য্যাদাভঙ্গ, লোকের প্রতি কু-ব্যবহার এবং ধর্ম্মসাধনের বিঘ্নকর, সমাধির মর্য্যাদাহানিকর ও অশান্তিপ্রদ এবং সদাচার-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য হইতে পারিবে না। (ঙ) সমাধি গৃহস্থালীর আড্ডা হইতে পারিবে না। (চ) স্ত্রী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক খণ্ড আছে ও থাকিবে। পতি-পত্নীও একই খণ্ডে বা একই গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন না। সেবায়েতের পক্ষেও এই নিয়ম।

২। দান, ভিক্ষা কি অন্য কোন সূত্রে সমাধির জন্য যাহা কিছু আমদানী হয়, তদ্দ্বারা ঋণ না করিয়া ঠাকুরের নিত্যসেবা, পূজা, ভোগ, আরতি, অতিথি-সেবা, প্রাণিসেবা, ঝুলন পূর্ণিমাতে ও সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বে কৃষ্ণা দ্বাদশীতে সম্পাদনীয় উৎসব যথাসম্ভব নির্ব্বাহ হইবে। ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদি গুরুদেবের প্রিয় সৎকার্য্যও ঋণ না করিয়া যথাসম্ভব সম্পাদিত হইবে।

৩। সমাধির জন্য লব্ধ ও সংগৃহীত অর্থ সমাধির কার্য্য ভিন্ন অপর কোন বাবদে ব্যয় হইতে পারিবে না।

৪। সমাধিস্থলের কোন অংশেও দোকানঘর, লজিং হাউস, এবং অন্যপ্রকার ভাড়াটিয়া বাড়ী করা হইবে না। এই স্থানে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রীত হইবে না।"

উক্ত দেবোত্তরপত্রে তিনজন ট্রষ্টির (Trustee) ব্যবস্থা থাকিলেও সেবায়েতের উপরেই অত্যধিক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। সেই সকল ক্ষমতায় অল্লাধিক পরিমাণে অপব্যবহার করাতে পরবর্ত্তীকালে সেবায়েতের সহিত অধিকাংশ শিষ্যদের দারুণ মতান্তর উপস্থিত হয় এবং উহা ক্রমে মামলাতে পরিণত হয়। অবশেষে ভগবৎকৃপাতে ঐ মামলা সালিসী বিচারে নিষ্পত্তি হয়। সালিসগণের মধ্যে কটকের প্রসিদ্ধ উকিল এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু (বর্ত্তমান দেশপূজ্য নেতা সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক চেষ্টায় ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এইজন্য গোস্বামী-প্রভুর শিষ্য ও প্রশিষ্যবর্গ তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। মহামান্য সালিসগণ একবাক্যে যে রায় প্রদান করিয়াছেন এবং কটকের জেলা জজ সাহেব যাহা অনুমোদন করিয়া ডিক্রি প্রদান-করিয়াছেন, তাহা হইতে কতিপয় ধারা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি :—

সেবায় আমার প্রয়োজন নাই এবং তাহাতে আমার তাদৃশ প্রীতিও জন্মে না।" নদীয়াবিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের পরম কল্যাণ সাধন মানসে তাহাদিগকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তারকব্রহ্ম হরিনাম গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিতেন। প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ কলিহতজীবকে শ্রীহরিনাম লওয়াইবার জন্য কাঙ্গালের বেশে, কাতরপ্রাণে, দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মূল কারণ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু কলিকলুষনাশনমানসে হুঙ্কারপূর্ব্বক ঐ নাম জীবকে শুনাইতেন। জীবোদ্ধারের ইহাই একমাত্র উপায়, এই সত্য প্রাণে লাভ করিয়া শ্রীহরিদাস প্রমুখ গৌরভক্তগণ সাগ্রহে ও সোৎসাহে কর্ণরসায়ণ, সর্ব্ব-ক্ষেমপ্রদ সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। সনক, সনাতন, সনৎকুমার

Issue no 2 :—After the death of Mahapravu Bijoy Krishna Goswami some of his disciples agreed to have his samadhi in this holy city and to establish a religious institution to perpetuate his memory. The object as will appear from the deed of Trust was the worship of *Nama Brahma* preached by the said Saint. Subsequently a model *Guru Sheva* and *Gurusthan* were the objects added to the same by the consent of all the disciples expressly or tacitly and acted upon all along. All the disciples of the Saint were made members of the *Asram* or Institution.

The sevait and members of the Institution have all along allowed the Hindu public free access to pay their respects to the Samadhi and to attend religious and moral institutions delivered at the Samadhi or also to attend the sankirtans held there. We, therefore, hold that the endowment is a public trust, subject to the limitations as laid down in the deed of Trust executed by Jogjiban Goswami above named.

There should be a committee known as the Managing Committee consisting of five members, there shall be no trustees.

The members of the Managing Committee shall exercise general control and supervision over the shavait and shall be entitled to take accounts and to realise any money found due from the Sevait :—They shall not, however, interfere with the

প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের বংশোদ্ভব যে মহাপুরুষের লীলা এই গ্রন্থে প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তিনিও প্রেমোল্লাসে মত্ত হইয়া সুমধুর 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতেন, এবং জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সকলকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সপ্রেম হুঙ্কারে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীব পুলকিত হইত, বৃক্ষ-লতাদি পুষ্পও মধু বর্ষণ করিত এবং আসন বসন, গ্রন্থাদি সঞ্জীবিত ও হরিনামাঙ্কিত হইত।

শাস্ত্র ও সদাচারের প্রতিষ্ঠাতা, তারকব্রহ্ম হরিনামের উপদেষ্টা, পাপক্লিষ্ট জীবের চিরসুহৃদ, শরণাগতবৎসল শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীগোস্বামী-প্রভু জয়যুক্ত হউন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্ম জয়যুক্ত হউক, তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর জয় হউক, জগতে সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হউক। গৃহে গৃহে তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনামের জয়পতাকা

ordinary Routine work of the sevait unless in case of grave misdemeanour or neglect of duty. No sevait can be removed from his office by the Managing Committee unless grave abuse of power or serious neglect of duty on his part is proved at a General Meeting of the sishyas of Mahatma B. K. Goswami.

That he (sevait) should treat all the disciples of the Saint and members of the Institution with proper respect and should not interfere with their just rights of worship, subject, however, to rules laid down in Sched. A.

That the sevait may nominate his successor and submit his name to the Managing Committee for approval ; without their approval no one can be appointed a sevait. If the sevait for the time being fails to do so, the members of the Managing Committee at a meeting will be competent to appoint the suceeding sevait.

Schedule (A) may be incorporated as the scheme for worship of the Deity ane the Saint as prayed for in the plaint : —The concluding portion purporting to be the oral instructions of Jogjiban Goswami be omitted from the document.

That the members of the Managing Committee shall elect their own President who will represent them in all matters with the sevait and third person. The such member may meet

উড্ডীয়মান হইয়া, চিরপরাধীনা দুঃখিনী ভারতমাতার সর্ব্বপ্রকারের অমঙ্গলরাশি বিদূরিত হউক। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ ॥

---

in any place to suit the convenience of the majority excepting those regarding the appointment, suspension and dismissal of sevaits, which will be held at Puri.

পরিশিষ্ট

গোস্বামী-প্রভুর দেহাশ্রিতাবস্থার শেষ ২৫।৩০ বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যান ধারণা এবং শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করিতেন। এইজন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজের কাছে রক্ষা করিয়াছিলেন ; এবং ঐ সকল গ্রন্থকে তিনি প্রত্যহ যথারীতি ফুল-চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিতেন। তাঁহার বহু শাস্ত্রগ্রন্থের গাত্রে সেই সকল চন্দনের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি বলিতেন যে "ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র কাগজ নয়, কালী নয়, অক্ষরও নয়। উহা জীবন্ত, জাগ্রত এবং স্বপ্রকাশ। ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে উহা উড্ডীয়মান পক্ষীর ঝাকের ন্যায় যথাসময়ে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হয়।" পুরীধামে অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভু একদিবস জনৈক সেবককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার পা উপরের দিক্ করিয়া মাথা নীচের দিকে রাখিলে কিরূপ বোধ কর ?" সেবকটী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ কথার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি পৃথক ঘরের আলমারিতে রক্ষিত তাঁহার দেড় শতাধিক শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে একখানির নাম করিয়া বলিলেন যে, ঐ গ্রন্থখানি বিপরীতভাবে রাখা হইয়াছে। সেবকটী যখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, বস্তুতই উক্ত গ্রন্থখানি বিপরীত-ভাবে রক্ষা করা হইয়াছিল, তখন তিনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোস্বামী-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ত ঐ ঘরে কখনও যান না, তবে কেমন করিয়া ঐ সংবাদ পাইলেন ?" তিনি উত্তর করিলেন—"ঐ সকল গ্রন্থ আমার নিকটে জাগ্রত হইয়াছেন। উঁহারা আমার সঙ্গে কথা বলিয়া থাকেন।" গোস্বামী-প্রভুর ঐ সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

পুরাণ

১। শ্রীমদ্ভাগবত (মূল)
২। শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)
৩। ভবিষ্যপুরাণ
৪। পদ্মপুরাণ
৫। বরাহপুরাণ
৬। গরুড়পুরাণ
৭। শিবপুরাণ
৮। মার্কণ্ডেয়পুরাণ
৯। বামনপুরাণ
১০। বিষ্ণুপুরাণ
১১। বায়ুপুরাণ
১২। কূর্ম্মপুরাণ
১৩। বৃহন্নারদীয় পুরাণ
১৪। বৃহৎসয়ম্ভূপুরাণ
১৫। মৎস্যপুরাণ
১৬। অগ্নিপুরাণ
১৭। লিঙ্গপুরাণ
১৮। নৃসিংহপুরাণ
১৯। কল্কীপুরাণ
২০। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র

২১। আদিপুরাণ

২২। দেবীপুরাণ
২৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ
২৪। সূর্য্যপুরাণ
২৫। কালিকাপুরাণ
২৬। বামনপুরাণ
২৭। স্কন্দপুরাণ
২৮। গণেশপুরাণ
২৯। আত্মপুরাণ

ইতিহাস।

৩০। মহাভারত (মূল)
৩১। হরিবংশ
৩২। রামায়ণ (বাল্মিকী)
৩৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
৩৪। অধ্যাত্ম রামায়ণ
৩৫। তুলসীদাসের রামায়ণ
৩৬। অদ্ভুত রামায়ণ

উপনিষদ্

৩৭। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
৩৮। ঈশাদ্যাষ্টক উপনিষৎ
৩৯। ছান্দোগ্য উপনিষৎ
৪০। মণ্ডুক্যোপনিষৎ
৪১। ঐতরেয় উপনিষৎ
৪২। শ্বেতাশ্বরোপনিষৎ
৪৩। ষট্‌চক্রোপনিষৎ

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র

৪৪। গোপালতাপণী
৪৫। নৃসিংহতাপণী
৪৬। ঈশান সংহিতা
৪৭। উর্ধ্বাম্নায় সংহিতা
৪৮। সুতসংহিতা
৪৯। মধ্যান্দিন প্রয়োজন মন্ত্র সংহিতা
৫০। যজুর্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়শ্রুতি
৫১। বৃহৎ সংহিতা
৫২। গোরক্ষ সংহিতা
৫৩। শাণ্ডিল্য সূত্র
৫৪। নারদ পঞ্চরাত্র
৫৫। আপস্তম্ব সংহিতা
৫৬। বাভট (অষ্টাদশসংহিতা)
৫৭। মনুসংহিতা
৫৮। রঘুনন্দনের স্মৃতি
৫৯। অষ্টাবিংশ স্মৃতি
৬০। নারদ স্মৃতি
৬১। শাস্ত্র শতক
৬২। অষ্টাবক্র সংহিতা

তন্ত্রশাস্ত্র

৬৩। বৃহৎতন্ত্রসার
৬৪। মহানির্বাণতন্ত্র
৬৫। গৌতমীয় তন্ত্র
৬৬। তন্ত্রসার
৬৭। ভূতডামর
৬৮। বৃহৎ ভূতডামর
৬৯। তলবকারোপনিষৎ
৭০। তৈত্তিরিয় উপনিষৎ
৭১। রুদ্রাযামল
৭২। নারদ সূত্র
৭৩। নিরুত্তর তন্ত্র
৭৪। মাত্রিকাভেদ তন্ত্র
৭৫। যোগিনী তন্ত্র
৭৬। পিচ্ছিল তন্ত্র
৭৭। পবন বিজয়
৭৮। স্বরোদয়

বৈষ্ণব শাস্ত্র

৭৯। হরিভক্তি বিলাস
৮০। ষট-সন্দর্ভ
৮১। চৈতন্য-চন্দ্রামৃত
৮২। অদ্বৈত-প্রকাশ
৮৩। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত
৮৪। ভক্তি-রত্নাকর

৮৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
৮৬। চৈতন্য ভাগবত
৮৭। ভক্তমাল
৮৮। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শিক্ষা
৮৯। পদকল্পতরু
৯০। ব্রজবিহার
৯১। বিহার বৃন্দাবন
৯২। লঘু ভাগবতামৃত
৯৩। শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণের একত্র স্মরণ মনন
৯৪। বৃন্দাবন দর্পণ
৯৫। গীতগোবিন্দ
৯৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
৯৭। প্রেম-সাগর
৯৮। ভজন রত্নাকর
৯৯। মনোশিক্ষা
১০০। ভাগবত-কৌস্তুভ

অপরাপর গ্রন্থ

১০১। কাব্য সংগ্রহ
১০২। অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা
১০৩। পরমার্থসার
১০৪। রুদ্র্যাধ্যায়
১০৫। অর্জ্জুনগীতা
১০৬। আত্মবোধ
১০৭। শাস্ত্রশতক
১০৮। গুরুপাদুকাস্তোস্ত্র
১০৯। জীবন্মুক্তি বিবেক
১১০। বিজয়পত্রিকা
১১১। বিচারসাগর
১১২। প্রেম-কাপ্যালা
১১৩। পরমার্থসার
১১৪। শ্যামসাগর
১১৫। ভজনরত্নাকর
১১৬। নরসিংজকা দোহা
১১৭। বীজক কবিরদাস
১১৮। নীতিপয়োধি
১১৯। বৃত্তরত্নাবলী
১২০। সভাবিলাস
১২১। বস্তুবিচার
১২২। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ
১২৩। সুন্দর বিলাস
১২৪। গুরুপীযূষ লহরী
১২৫। পুরুষ সূক্ত
১২৬। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধবিধি
১২৭। প্রয়াগ মাহাত্ম্য
১২৮। সর্ব্বদেবদেবী পূজাপদ্ধতি
১২৯। মহাকাবাক্য প্রারম্ভ
১৩০। হনুমানাষ্ঠক
১৩১। শিবতাণ্ডব স্তোত্রং
১৩২। গোপুকার চালিনী
১৩৩। দণ্ডক

হাতে লেখা পুথি

১৩৪। পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য
১৩৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
১৩৬। চিদ্ঘনানন্দের গীতা
১৩৭। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত দর্শন
১৩৮। রাসপঞ্চাধ্যায়
১৩৯। জৈমিনী ভারত
১৪০। সনৎ পূজা নিয়ম
১৪১। সনৎ কুমার কার্ত্তিক মাহাত্ম্য
১৪২। রাম পদ্ধতি
১৪৩। সুদামা চরিত
১৪৪। সেবকের নিবেদন

মুসলমানী গ্রন্থ

১৪৫। কোরাণ সরিফ (অনুবাদ)
১৪৬। হেদায়েতল এছলাম
১৪৭। সহিদেকার বালা
১৪৮। আমছেপারা

১৪৯। আছরার ছালাত

১৫০। বড় জঙ্গনামা

১৫১। আকলা কলআটলির

১৫২। ছিছিরদরবেশনামা

গোস্বামী-প্রভুর নিত্য-পাঠ্য আসনের গ্রন্থ

১। ভক্তমাল
২। রাগ রত্নাকর
৩। মৎস্য পুরাণ
৪। ভবিষ্য পুরাণ
৫। শ্রীমদ্ভাগবত, ভাষা
৬। শ্রীমদ্ভাগবত (মূল)
৭। পদ্মপুরাণ
৮। অধ্যাত্ম রামায়ণ
৯। ব্রহ্মসংহিতা
১০। গোপাল-তাপনী
১১। সূর্য্যপুরাণ
১২। বৃন্দাবন দর্পণ।
১৩। আরতি সংগ্রহ
১৪। ঘেরণ্ড সংহিতা
১৫। হঠযোগ প্রদীপিকা
১৬। কালিকা পুরাণ
১৭। ঈশাদি দশোপনিষৎ সংগ্রহ
১৮। বৃহৎ রাগকল্পদ্রুম
১৯। দোহাবলী
২০। নানক বিনয় ও মহা নাটক
২১। অথর্ব্বোপনিষৎ
২২। শব্দ-আবাংমহল
২৩। বৃহৎ স্তোত্ররত্নাকার
২৪। পঞ্চরত্ন গীতা
২৫। সনেহ লীলা
২৬। গীতগোবিন্দ
২৭। তুলসীদাসের রামায়ণ
২৮। গ্রন্থসাহেব।

ওঁ হরিঃ।

উপদেশ-সংগ্রহ

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ॥
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্ব-প্রকাশ, সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আদি কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যে সাক্ষীস্বরূপ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মাদিরও বুদ্ধি-শক্তির অতীত তত্ত্বসমূহ অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার শক্তিতে মিথ্যাভূত সত্ত্বাদি গুণসমূহ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, এবং যাঁহার জ্যোতিতে সর্ব্বমায়ান্ধকার দূরীভূত হয়, আমরা সেই পরম সত্যকে ধ্যান করি।

প্রথম অধ্যায়

[শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহোদয় ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে সাধারণতঃ যে সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, তৎপ্রণীত "ধর্ম্মশিক্ষা", "ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর", "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাহার সার সংগ্রহপূর্ব্বক এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইল।]

প্রশ্ন—ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উত্তর—স্বভাবের নামই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—তাহার তাৎপর্য্য কি ?

উত্তর—যেমন অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকাশক্তি, জলের ধর্ম্ম শৈত্যগুণ, সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক ও উত্তাপ প্রদান করা, বৃক্ষের ধর্ম্ম ফল পুষ্প প্রদান করা। অসীম জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক বস্তুকে এক একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য সকলকেই এক একটী প্রকৃতি বা স্বভাব দান করিয়াছেন। এই স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। অতএব অগ্নি, জল, সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্যেরও স্বভাব আছে। সেই স্বভাবই মনুষ্যের ধর্ম্ম। পরমেশ্বর ফল পুষ্প প্রদান করিবার জন্য নানাপ্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল পুষ্প উৎপন্ন করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে নিহিত আছে। বীজটী মৃত্তিকায় রোপিত হইলে, রস, আলোক, উত্তাপ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বাহ্য উপকরণের সাহায্যে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ মানবের আত্মাতে সমস্ত ভাব নিহিত করিয়া ঈশ্বর

মনুষ্যকে সৃজন করেন। শিক্ষা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায়ে আত্মা প্রস্ফুটিত হয়।

প্রশ্ন—ঈশ্বর কে? এবং তাঁহার অস্তিত্ব কি প্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

উত্তর—যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিতেছেন, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। ঈশ্বরজ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। যুক্তি-তর্ক দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে হয় না, প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তরে এই জ্ঞান আছে। এ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। কারণ যিনি সন্দেহ করেন, ঈশ্বরজ্ঞান তাঁহারও প্রকৃতি-সিদ্ধ। তিনি যদি সরলভাবে অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি ঈশ্বরজ্ঞান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, এবং তাহা যদি যুক্ত-তর্ক দ্বারা লাভ করিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কোন মনুষ্যই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে পারিত না। পৃথিবীস্থ সকল প্রদেশের সভ্য অসভ্য সকল প্রকার মনুষ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছে, কিন্তু কেহই যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করে নাই; যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, সেই উত্তর করিবে যে, 'ঈশ্বর আছেন' কেহ আমাকে শিখাইয়া দেয় নাই, আমি আপনা হইতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একজন ধার্ম্মিক মনুষ্য কোন অসভ্য দেশে গমন করিয়া তত্রত্য মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় উপদেশ দিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া সেখানকার অসভ্য লোকেরা বলিয়া উঠিল, "এ বিষয় আমাদের নিকটে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে না, ইহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে; বিশেষতঃ একথা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না, আমরা ত আপনা হইতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, আমরা কাহারও উপদেশ পাই নাই।" সেই সাধু ব্যক্তি অসভ্য লোকদিগের ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া আনন্দচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ধন্য পরমেশ্বর! তুমিই ধন্য! তুমি সকল মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিবার জন্য সকলেরই হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছ; তোমার অপার মহিমা কে বুঝিতে পারে?" এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, ঈশ্বরজ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

প্রশ্ন—ঈশ্বর যে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? যদি প্রমাণ না থাকে, তবে ঈশ্বর অছেন কে বলিল?

উত্তর—ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, জগৎ আছে, এই তিনটী জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এজন্য অসভ্য, সভ্য সর্ব্বপ্রকার মানব জাতির মধ্যেই ঈশ্বরজ্ঞান বিদ্যমান দেখা যায়। বিশেষতঃ মানব-হৃদয়ে কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান করিবার

জন্য একটি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি দ্বারা মানুষ কার্য্য দেখিলেই কারণের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। মনে কর, তুমি কোন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ যদি প্রস্তর খণ্ড দর্শন কর, তুমি মনে করিবে যে এ সমস্ত চিরকালই পড়িয়া আছে। কিন্তু যদি একটা ঘড়ি অথবা একখানি বস্ত্র পড়িয়া থাকিতে দেখ, তাহা হইলে মনে করিবে যে, কোন ব্যক্তি এখানে ফেলিয়া গিয়াছে, কারণ ঘড়ি বস্ত্র দেখিয়া তোমার মনে হইবে যে, কেহ নিৰ্ম্মাণ না করিলে ইহা আপনাআপনি প্রস্তুত হইতে পারে না; কারণ ইহাতে নানাপ্রকার কল-কৌশল দেখিতেছি। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নানা কল কৌশল রহিয়াছে। ইহাও আপনাআপনি হয় নাই। যেখানে কল-কৌশল আছে, সেখানেই একজন কর্ত্তা আছেন। কর্ত্তা না থাকিলে চিন্তা করিবে কে? চিন্তা না করিলে কৌশল হইবে কিরূপে? মনে কর এই ঘড়িতে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহারা কি পরামর্শ করিয়া এই যন্ত্র হইয়াছে? তাহা নহে। একজন বুদ্ধিমান লোকে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘড়িটী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। কারণ জড় পদার্থের চিন্তা করিবার শক্তি নাই। যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনিই চিন্তা করিতে পারেন। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থেই নানাপ্রকার কৌশল রহিয়াছে, এ সমস্ত কৌশল ঘড়ির কল অপেক্ষাও সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। আকাশের প্রতি দৃষ্টি কর, কত প্রকাণ্ড নক্ষত্র রহিয়াছে, ইহাদের বিষয় আলোচনা করিলে অবাক্ হইয়া যাইবে। এক সূর্য্যের বিষয় চিন্তা কর, তাহাতে কত প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাইবে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে আলোক উত্তাপ দান করিতেছে। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তদ্দ্বারা বর্ষ, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, মুহূর্ত্ত হইতেছে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে, সেই সমস্ত রস আকাশে একত্রিত হইয়া মেঘ হইতেছে, পুনর্ব্বার তাহা পৃথিবীর আকর্ষণে জল হইয়া পড়িতেছে, এ সমস্ত কৌশল কি আপনাআপনি হইতে পারে? ইহা কি ঘড়ির কল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? যদি ঘড়ির কর্ত্তা স্বীকার কর, তবে সূর্য্য প্রভৃতির কর্ত্তা স্বীকার করিবে না কেন? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অধিক দূরে যাইতে হইবে না, তোমার শরীরটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে কত আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাইবে। নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু, অগ্নি ইহার যে কোন পদার্থ লইয়া আলোচনা করিবে, তাহাতেই নানাপ্রকার কৌশল দেখিতে পাইবে। যিনি চিন্তা করিয়া এই সকল কৌশলের রচনা করিয়াছেন, তিনিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর।

প্রশ্ন—এ জগতের যে একজন কর্ত্তা আছেন, তাহা বুঝিলাম। তিনি কি প্রকার?

উত্তর—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, অসীম, আনন্দ, শান্তি, মঙ্গলের আধার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, পরিপূর্ণ, স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত

তাঁহার তুলনা হয় না। তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্তুতে এক একটী অভিপ্রায় স্থাপন করিয়াছেন। সেই স্বভাবই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মধর্ম্মে ও অন্য ধর্ম্মে পার্থক্য কি ?

উত্তর—ধর্ম্ম নানাবিধ নাই। ধর্ম্ম এক, নিত্য, সত্য। পরমেশ্বর একমাত্র সত্য ধর্ম্মকে মনুষ্যগণের ত্রাণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সত্য ধর্ম্মকেই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম কহি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাল্পনিকধর্ম্ম সকলের ন্যায় বিশেষ একটি ধর্ম্ম নহে। যাহা সত্য ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মই অসীম বিশ্বরাজ্যের একমাত্র ধর্ম্ম। এমন মনুষ্য নাই, যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ কিছু না কিছু প্রতিপালন করেন না। যিনি সত্য কথা কহেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যিনি পরোপকার করেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। যিনি ঈশ্বরের পূজা করেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এইরূপ যিনি যে পরিমাণে ধর্ম্ম পালন করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কারণ "ধর্ম্ম" কথাটা উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম যুক্তি ও তর্কের অধীন নহে, ইহা মনুষ্যের স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। মনুষ্য যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে, ততক্ষণ কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধপথে পদ নিক্ষেপ করিতে পারে না মনুষ্য যখন বিকৃতিস্থ হয়, তখন সে স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনাপূর্ব্বক্ ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, এবং কাল্পনিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করে কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া যায়। এই কারণেই কাল্পনিক ধর্ম্মের ও নাস্তিকতার সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রশ্ন—মনুষ্য কে এবং তাহার স্বভাব কি ?

উত্তর—হস্ত-পদবিশিষ্ট শরীরকেই অনেকে মনুষ্য বলে, বাস্তবিক শরীর মনুষ্য নহে। শরীর জড় পদার্থ, পরমাণু সমষ্টি। জড় ও চেতন ভিন্ন বস্তু। জড় চেতন হইতে পারে না। চেতনও জড় হইতে পারে না। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, শরীর পাঞ্চভৌতিক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই মহাভুতের বিকাশেই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে।

শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, চেতনা আছে, তাহাই মনুষ্য। শরীর গৃহ, আত্মা গৃহী। শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। শরীর জড় পদার্থ, সুতরাং তাহার ইচ্ছা নাই, স্বীয় ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। আত্মার ইচ্ছাতে কার্য্য করিয়া থাকে। ঘট ও জল পৃথক বস্তু অথবা ঘট ও আকাশ পৃথক বস্তু, এজন্য ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও জল আকাশ নষ্ট হয় না, পৃথক্ হইয়া যায়। শরীর ও আত্মাও সেইরূপ। যাহাকে আমি বলি, তাহাকে আত্মা বলি। ঘট ও জলের ন্যায় শরীর ও আত্মা পৃথক্। শরীরের এক প্রকার স্বভাব আছে, আত্মার এক

প্রকা স্বভাব আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস, প্রশ্বাস, শোণিত সঞ্চারণ, অন্ন-পরিপাক, পুষ্টিসাধন, বর্দ্ধিত হওয়া, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসাস্বাদন, স্পর্শ, এই সমস্ত শারীরিক স্বভাব। এ স্বভাব স্থির থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিবে। ইহার সামান্য ব্যতিক্রমেও নানা প্রকার রোগ-যন্ত্রণায় শরীর জর্জ্জরিত হয়। শারীরিক প্রকৃতিই শরীরের ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মের লঙ্ঘনে শারীরিক পাপের উৎপত্তি, তাহার শাস্তিরোগ। প্রায়শ্চিত্ত ঔষধ সেবন। আত্মা চেতন, নিরাকার, তাহার স্বভাবও নিরাকার। জ্ঞান, প্রেম ইচ্ছা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, দয়া, প্রণয়, সদ্ভাব, অনুরাগ, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের কার্য্য দ্বারা প্রেমের কার্য্য সম্পন্ন হয়; সত্য বাক্য, সত্য অনুষ্ঠান, সত্য নিষ্ঠা, সত্য চিন্তা, পবিত্র ব্যবহার সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, ধৈর্য্য, বীর্য্য, তেজ, ক্ষমা, বিনয়, মহত্ত্ব, উদারতা, নিরহঙ্কারিতা, নিঃস্বার্থতা, সৎকার্য্যশীলতা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা ইচ্ছার কার্য্য সম্পন্ন হয়। জ্ঞানে বিশ্বাস, প্রেমে ভক্তি, ইচ্ছায় কার্য্য। বিশ্বাস, ভক্তি ও কার্য্য—এই তিনটী মানবীয় ধর্ম্মের মূল। পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করা, তাঁহাকে ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা, ইহারই নাম ধর্ম্ম। সুতরাং স্বভাবের নামই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর কিছুই নহে। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই গুণত্রয়ের সমতাই মনুষ্যের স্বভাব। এই স্বভাব ও আত্মা পৃথক্ নহে। অগ্নি ও দাহিকা শক্তি পৃথক্ নহে। মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর—ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন। মনুষ্য যতক্ষণ ধর্ম্মপথে বিচরণ করে, ততক্ষণই তাহার যথার্থ জীবন। যে মনুষ্য একশত বৎসর সংসারে থাকিয়া বিংশতি বৎসর মাত্র ধর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহার জীবন বিংশতি বৎসর। অবশিষ্ট অশীতি বৎসর তাহার জীবনের মধ্যে গণ্য হয় না। গর্ভস্থ বালকের দশমাসকাল যেমন তাহার জীবনের মধ্যে গণ্য হয় না, সেইরূপ অধার্ম্মিকের জীবিত কাল, গর্ভস্থ বালকের অবস্থিতিকালের ন্যায় কোন ফলদায়ী হয় না। কার্য্যের দ্বারা কাল নিরূপণ হইয়া থাকে। মনুষ্যের কার্য্য ধর্ম্ম, সুতরাং যিনি সেই প্রকৃত কার্য্য না করেন, তাহার জীবিতকাল জীবনের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অপিচ যে ভৃত্য যে কয়েক দিন কার্য্য করে না, প্রভু তাহাকে সে কয়েক দিনের বেতন দেন না; কারণ, প্রভু ভৃত্যের অনুপস্থিতি কালকে গণ্য করেন না। তদ্রূপ অধার্ম্মিকের জীবিতকাল জীবনের মধ্যে গণ্য হয় না। ধার্ম্মিকের জীবিত কালই জীবনের মধ্যে গণ্য হয়। অতএব ধর্ম্ম মনুষ্যের জীবন। প্রতিনিয়ত ধর্ম্মপথে বিচরণ করাই মনুষ্যের এক মাত্র কার্য্য। ধর্ম্মপথে গমন করিতে গেলে যদি দুষ্ট লোকেরা খড়্গ-হস্ত হয়, অনায়াসে তাহাদের নিকটে মস্তক দান করিবে, তথাপি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে না। এই অনিত্য শরীর দিয়া যদি ধর্ম্ম লাভ করিতে পারা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা লাভের বিষয় আর কি আছে?

ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট হওয়া উচিত নহে। অতএব প্রাণপণে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবে, কিছুতেই ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবে না।

প্রশ্ন—মনুষ্যের প্রকৃত ভূষণ কি?

উত্তর—ধর্ম্মই মনুষ্যের প্রকৃত ভূষণ। করুণাময় পরমপিতা সন্তানদিগকে অমূল্য ধর্ম্ম-ভূষণে অধিকার দিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কার যেমন মণি দ্বারা খচিত থাকে, অমূল্য ধর্ম্মরত্নও সেইরূপ বিশ্বাস, প্রীতি, অনুষ্ঠান এই তিন উজ্জ্বল মণি দ্বারা খচিত। যত্নপূর্ব্বক মণিময় ধর্ম্মরত্ন পরিধান কর। সংসারের বৃথা সুখে আর বিমুগ্ধ হইও না। ধর্ম্মকে প্রাণপণে পালন কর।

প্রশ্ন—কেহ কেহ বলেন যে, নিজে সুখী হওয়া বা অন্যকে সুখী করা মনুষ্যের ধর্ম্ম। ইহার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর—এইরূপ লক্ষণকে ধর্ম্ম বলা যায় না, কারণ অনেক লোক অধর্ম্ম করিয়া সুখী হইয়া থাকে। কেহ চুরি করিয়া সুখী হইতেছে, কেহ ব্যভিচার করিয়া সুখী হইতেছে, কেহ নরহত্যা করিয়া সুখী হইতেছে, কেহ সুরাপান করিয়া সুখী হইতেছে। যদি চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, নরহত্যা, সুরাপান প্রভৃতিকে পাপ বল, তাহা হইলে সে সকল কার্য্য করিয়া লোকে সুখী হয় কেন? যদি সুখই ধর্ম্মের লক্ষণ হইত, তাহা হইলে পাপ করিয়া লোকে সুখী হইতে পারিত না। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা মানবাত্মার স্বভাব। এই তিনের সম্যক্ উন্নতি হইলেই ধর্ম্ম হয়। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধন করাই ধর্ম্ম। নিজে ভাল হওয়া এবং অন্যের ভাল করাই ধর্ম্ম। এই সকল কার্য্য করিলে সুখ হইয়া থাকে। দয়াময় পরমেশ্বর এইরূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, লোকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে সুখী হইবে। ক্ষুধা হইলে লোকে আহার করিয়া থাকে, এবং আহারের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার সুখ লাভ করা যায়। কিন্তু স্বভাবতঃ কেবল সুখের জন্য লোকে আহার করিতে ব্যস্ত হয় না। স্বীয় সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করিলে অপূর্ব্ব সুখ লাভ হয়, অথচ কোন পিতা মাতা সুখ প্রত্যাশায় সন্তান পালন করেন না। পরমেশ্বর পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলে অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু লোকে যখন আপন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া জলে ঝম্প দিয়া জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে যায়, তখন তাহার মনে আত্মপ্রসাদের কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকে না। তাহার স্বাভাবিক দয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক্ জলে নিক্ষেপ করে। এইজন্যই স্বভাব ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—প্রকৃত সুখ কি? প্রকৃত দুঃখই বা কি?

উত্তর—আত্মপ্রসাদকেই সুখ কহে, আত্মগ্লানিকেই দুঃখ কহে। বিষয়-সুখকে সুখ কহা যায় না, তাহা কেবল দুঃখেরই কারণ। যাঁহারা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহাদের নিকটে সাংসারিক সুখ প্রকৃত সুখে পরিণত হয়, আর যাঁহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া সাংসারিক সুখ ভোগ করেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত দুঃখ। সাংসারিক দুঃখকে দুঃখ কহা যায় না। অন্নাভাবে দুঃখ, বস্ত্রাভাবে দুঃখ, অর্থাভাবে দুঃখ, এ সকল বাস্তবিক দুঃখ নহে। পাপ-যন্ত্রণাই যথার্থ দুঃখ। ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে যে আত্মপ্রসাদ হয়, তাহাই যথার্থ সুখ। এইরূপে যিনি সুখদুঃখের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি আর সংসারের সুখদুঃখে বিমুগ্ধ হন না।

প্রশ্ন—আত্মোন্নতি কিসে হয়?

উত্তর—জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছাকে সমভাবে প্রতিনিয়ত উন্নতি করলেই আত্মোন্নতি হয়। যাহার কেবল জ্ঞানের বা প্রীতির বা ইচ্ছার উন্নতি হইয়াছে তাঁহার আত্মোন্নতি হয় নাই। এইজন্য উক্ত হইয়াছে, যে জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছাকে সমভাবে প্রতিনিয়ত উন্নত করিলে আত্মোন্নতি হয়। কিন্তু এই উন্নতি কিছুদিন করিয়া যদি স্থির থাকা যায়, তাহা হইলেও আত্মোন্নতি হয় না। আত্মোন্নতি একদিনেরও নহে, দুই দিনেরও নহে। ইহা অনন্তকাল অবিশ্রান্ত করিতে হইবে। এই উন্নতিকেই প্রকৃত ধর্ম্ম ও জীবন কহে। অতএব প্রাণ-পণে আত্মোন্নতি লাভ কর। ঈশ্বর-সহবাসই আত্মোন্নতির সুমধুর ফল।

প্রশ্ন—উপাসনা কাহাকে বলে?

উত্তর—পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই উপাসনা।

প্রশ্ন—কি উপায়ে ঈশ্বরকে প্রীতি করিব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব?

উত্তর—প্রীতি ও ভক্তিভরে ঈশ্বরকে পূজা করিবে। আরাধনা, ধ্যান, স্তুতি, প্রার্থনা, কৃতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণ, এই সমস্ত উপচারে ঈশ্বর পূজা করিবে।

ঈশ্বর-স্বরূপ পূজাই আরাধনা। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, আনন্দ-শক্তি-অমৃতের আকর, মঙ্গলস্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, নিরাকার, নিরঞ্জন, স্বতন্ত্র, অনুপম, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা পাপের দণ্ডদাতা, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিপালক। সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, একমাত্র তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন রাত্রি ছিল না, দিবা ছিল না, পৃথিবী ছিল না, আকাশ, অন্তরীক্ষ, অগ্নি, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কোন পদার্থই ছিল না। পরমেশ্বর ইচ্ছা-পূর্ব্বক সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। তিনি মূল সত্য, তাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থ

সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রাণরূপে সর্ব্বপদার্থেই ওতপ্রোতরূপে বাস করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী, সমস্ত দেখিতেছেন। তাঁহাকে কিছুই গোপন করা যায় না। তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি অসীম, অনন্ত, বাক্যমনের অগোচর। তিনি স্বপ্রকাশ স্বয়ম্ভু, তিনি মনুষ্যের অন্তরে দর্শন না দিলে মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ। তিনি মঙ্গলদাতা, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, সর্ব্বত্র জীবন্ত জাগ্রতভাবে অবস্থিত করিতেছেন। এইরূপে প্রত্যেক স্বরূপ চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা করিলেই আরাধনা করা হয়। বিশ্বসংসারে তাঁহার মহিমা দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহার আরাধনা হয়।

অন্তরে ঈশ্বরকে চিন্তা করাই ধ্যান। পরমেশ্বর আমার অন্তরে বর্ত্তমান আছেন চিন্তা করিতে করিতে অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা যায়। তখন অনিমেষ নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকাই প্রকৃত ধ্যান।

অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করিলেই আপনা হইতেই স্তব করিতে ইচ্ছা হইবে। তাঁহার গুণকীর্ত্তন, মহিমাগানই স্তব, স্তব করিয়া শেষ করা যায় না। স্তব করিতে করিতে মন যখন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিবে, সেই সময়ে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকা যায় না।

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়া সর্ব্বদাই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি শরীর মন আত্মার প্রতিপালক। পৃথিবীতে কোন দয়ালু মনুষ্য আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিলে আমি তাঁহার প্রতি কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তবে যাঁহার সাহায্য ভিন্ন আমি এক মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারি না, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম না করিয়া কিরূপে স্থির থাকিব ? আমি মহাপাতকী অপরাধী, আমাকে লোকে ঘৃণা করে, স্পর্শ করিতে চায় না। আহা ! ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বর আমাকে ঘৃণা করেন না, তিনি আমাকে স্পর্শ করেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার মনে আত্মগ্লানি প্রেরণ করিয়া আমার পাপপ্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত করিলেন। ধন্য পরমেশ্বর ! তুমিই ধন্য, পাপীর প্রতি তোমার এত দয়া !

আত্মসমর্পণের পরই তাঁহার সহবাসে চিরকাল থাকিতে অভিলাষ হয়। ঈশ্বরের সহবাসে চিরকালই যোগের অবস্থা। একদিনও যদি এইরূপে পূজা করা যায়, হৃদয় ভক্তিতে প্লাবিত হয়। তখন তাঁহার নাম স্মরণ মাত্র, গান মাত্র, প্রেমাশ্রুতে শরীর ভাসিয়া যায়।

প্রশ্ন—পরমেশ্বর পাপীকে শাস্তি দেন কেন ?

উত্তর—পরমেশ্বর পাপীর মঙ্গলের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। পিতামাতা সন্তানের শাসন করে মঙ্গলের জন্য। পরমেশ্বর পিতামাতা," তিনি মঙ্গলের জন্যই শাসন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—খৃষ্টানেরা বলেন পাপীর জন্য অনন্ত নরক। তবে আর মঙ্গলের জন্য শাসন কোথায় ?

উত্তর—খৃষ্টানদের কথায় তাঁহারা কি অর্থ করেন জানি না। কিন্তু অনন্ত নরক একথা ঠিক নহে। পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহাতে অমঙ্গলের লেশ মাত্র নাই। সুতরাং তাঁহাদ্বারা কখনও অমঙ্গল হইতে পারে না। মনুষ্য পরিমিত ক্ষুদ্র জীব, মনুষ্য যত পাপ করুক না কেন, তাহার সীমা থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং পরিমিত পাপের অসীম দণ্ড হইতে পারে না।

প্রশ্ন—কেহ কেহ বলেন, "মনুষ্যের কোন স্বাধীনতা নাই। ঈশ্বর যাহা করান মনুষ্য তাহাই করে।" একথা সত্য কি ?

উত্তর—একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঈশ্বর যাহা করান, মনুষ্য যদি তাহাই করিত, তাহা হইলে কেহ পুণ্যবান, কেহ পাপী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী—এরূপ হইত না। ঈশ্বর নিরপেক্ষ মঙ্গলস্বরূপ। তিনি যাহা করান তাহাই যদি মনুষ্য করিত, তাহা হইলে সকলেরই একই প্রকার অবস্থা হইত। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহারা মনুষ্যের স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। মনুষ্য স্বাধীন, সুতরাং যেরূপ কার্য্য করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে।

প্রশ্ন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয় ?

উত্তর—আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া পাপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞার সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উদ্ধারের জন্য সরল প্রার্থনা করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। মনুসংহিতাতেও লিখিত আছে, 'কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥ (মনু, ১১ অধ্যায়, ১৩১ শ্লোক।) পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর পাপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে মন পবিত্র হয়।

প্রশ্ন—মুক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—প্রায়শ্চিত্তের পর নির্ম্মল হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হইয়া নিত্যকাল অজস্ররূপে তাঁহার সহবাস সুখ উপভোগ করাকেই মুক্তি কহে। এই মুক্তির অবস্থা অনন্তকাল স্থায়ী। যিনি এখানে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে নিত্যকাল অজস্ররূপে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সহবাসে কি অপার আনন্দ উপস্থিত হইবে। সে আনন্দ বাক্য মনের অতীত। যদি এই বিশুদ্ধ অবস্থা পাইতে ইচ্ছা কর, তবে প্রতিক্ষণই ঈশ্বরকে প্রীতি কর, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর।

প্রশ্ন—উপাসনার এক অঙ্গ প্রীতির বিষয় শুনিয়াছি। এখন প্রিয়-কার্য্য কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর—পরমেশ্বর মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহাই প্রিয় কার্য্য।

কর্ত্তব্য দুই প্রকার; বিধি ও নিষেধ। সত্য বাক্য বলিবে, সত্য ব্যবহার করিবে, পরোপকার করিবে, মাতা পিতা গুরুজনকে ভক্তি করিবে, ইন্দ্রিয় দমন করিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, ক্ষমা করিবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে,—হিংসা করিবে না, দ্বেষ করিবে না, পরস্ত্রী ও পরপুরুষের প্রতি কু-দৃষ্টিপাত করিবে না, মনে মনে ব্যভিচার করাও পাপ। অতএব মনে মনে কাম রিপুকে প্রশ্রয় দিবে না, আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করিবে না, পরিশোধের উপায় না থাকিলে ঋণ করিবে না, ঋণ করিয়া পরিশোধ না করাই চুরি, চুরি করিবে না, পরদ্রব্যে লোভ করিবে না, বৃথা ঈশ্বরের নাম করিবে না, কু-সংসর্গে বাস করিবে না—ইত্যাদি নিষেধ। এইরূপে কর্ত্তব্য পালন করিলেই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন হইবে।

প্রশ্ন—মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর—জ্ঞানবান, ঈশ্বরপরায়ণ, উপাসনাশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পূতচরিত্র, সমদর্শী, সৎকর্ম্মশীল, উৎসাহী, ধীর, বীর, ক্ষমাবান, প্রিয়ভাষী, সর্ব্বজীব-হিতৈষী, ধার্ম্মিক পুরুষই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

প্রশ্ন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপ, উপাসনাপ্রণালী ইত্যাদি যেরূপ ভাবে চলিতেছে, প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট? এই সম্বন্ধে আপনার মত ও অভিজ্ঞতা কি?

উত্তর—আমি জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজ কোন দল কিংবা সম্প্রদায় নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, য়িহুদি সকল সম্প্রদায়েরই সেই এক পরব্রহ্মের পূজা করা লক্ষ্য। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা যেখানে, সেখানেই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম উদ্দেশ্য, দল উদ্দেশ্য নহে। নিজের অন্তরে কতদূর ধর্ম্মলাভ হইল, তাহারই প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দলাদলি না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় না।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে একদিন নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতেছি, হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটি জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল, এবং কে যেন বলিল "তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্ না। গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ধর্ম্ম হয় না।" ভাদ্র মাসে বাগআচড়ায় ব্রহ্মোৎসব হইল। তাহাতে স্বর্গ হইতে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হইল। এমন অবস্থা জীবনে কখনও লাভ করি নাই।

এদিকে কলিকাতা হইতে প্রচারক ভ্রাতারা পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, তুমি শুষ্ক হইয়া মরিবে। মাতৃস্তন্য পান না করিলে অর্থাৎ কেশববাবুর নিকটে না থাকিলে বাঁচিবে কিরূপে? এই পত্র পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমি নিজে আছি ভাল, তাঁহারা গালি দেন ইহার কারণ কি?

আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'যদি ধর্ম্ম'-জীবন চাও আর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিও না।" আমি পিঞ্জর-মুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িতে গিয়া পাখায় বল পাই নাই। তখন বুঝিলাম ইহা গণ্ডির পরিণাম।

বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে উপাসনা সাধনভজন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশ পরোক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, উপাসনা সাধনভজনও প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া যথার্থ ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে দুঃখীর কথা বাসী হইলে লাগিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অবস্থানকালে গোস্বামী-প্রভু পশ্চিমদেশীয় জনৈক ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসীর সহবাসে গুরুকরণের আবশ্যকতা উপলব্ধিকরতঃ, সৎ-গুরুর অন্বেষণে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গয়াধামে আকাশগঙ্গা নামক পাহাড়ে, মানস সরোবরবাসী ভগবান্ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং অতিশয় নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে সাধন ভজন করিয়া ঈশ্বর কৃপায় সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার পর স্বীয় গুরুদেবের আদেশে পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ-পূর্ব্বক সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে যোগদীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গালা ও কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান-প্রধান ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া গোস্বামী-প্রভুকে তাঁহার সাধন প্রণালী ও যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিলে, তিনি যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা 'যোগ-সাধন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই 'যোগ-সাধন' হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপদেশগুলি যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল।]

প্রশ্ন—আপনি ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ উপাসনা-প্রণালীর অতিরিক্ত সাধন গ্রহণ করিলেন কেন? এবং কোথায় কিরূপে যোগ শিক্ষা করিয়াছেন?

উত্তর—পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি। তথায় করুণাময়ের কৃপায় অনেক সত্য ও প্রভুত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার অল্পশক্তিতে যে পরিমাণে সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়াও লইলেন। তাঁহার ও তাঁহার সন্তান-গণের সেবায় জীবন ধন্য হইল। ক্রমে অনেক বিপদআপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্য লাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান-ধারণাদি করিতে শিখিলাম; এককথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না। কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় তাঁহার জাগ্রত আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, আশা ও শান্তি উপভোগ করিতাম, কিন্তু কেন জানি না, এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। অনেক সময়ে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইত এবং তখন অত্যন্ত ক্লেশ হইত।

শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন মহশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু পূর্ব্বে আমি যখন বাগআঁচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্মদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ন হয় এবং তাহাতে দেখি যে, জীবনের প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার

পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মূলে জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল। এতকাল ধর্ম্ম চিন্তা, আলোচনা ধ্যানধারণাদি এবং নানা দেশ-বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এত হীন ও শোচনীয়? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইল। বুঝিলাম যে, ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মহাব্যাধির অন্য ঔষধ নাই। তখন নানা দেশে ঐ ঔষধের অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম ও তাহাদের নিকট বিস্তর ধর্ম্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিল না। আমার অন্তরের বস্তু সেখানেও পাইলাম না। তখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোরপন্থীদিগের কাছে গেলাম। তাঁহারা সাধক বটেন, কিন্তু তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটেই গেলাম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়া তীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না। কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে, আমার সে অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রশ্ন—মানুষের সাহায্য ভিন্ন এই সাধন সম্ভব কি না?

উত্তর—অসম্ভব নহে। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন আমাদের সাধনের লক্ষ্য এবং কেন্দ্র, সিদ্ধি এবং উপায়, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে মানবের যোগ-শক্তি স্বয়ং বিকশিত করিয়া দিতে পারেন—ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এরূপ অনুকূল অবস্থা অতি বিরল। এজন্য স্বয়ংসিদ্ধ লোক জগতে অধিক দেখা যায় না। যোগশক্তি প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই আছে, কিন্তু ঐ শক্তি জাগ্রত না হইলে, জাগ্রত প্রার্থনা জন্মিতে পারে না। এবং ঐ নিদ্রিত বা অস্ফুট (latent or potential) শক্তির জাগরণ বা বিকাশ করিতে হইলে অপর কোন জাগ্রত বা বিকাশপ্রাপ্ত শক্তির অর্থাৎ ঐরূপ শক্তিশালী মানবাত্মার সাহায্য আবশ্যক।

আদিগুরু পরমেশ্বর আমাদিগকে জল, অগ্নি, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া নানা উপায়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্য দিয়াও শিক্ষা দেন। এইরূপে বিশ্বসংসারের যাবতীয় পদার্থ এবং মনুষ্য সকলেরই সাহায্য আবশ্যক; কিন্তু জাগ্রত শক্তিশালী মহাত্মাদিগের বিশেষ সাহায্য সাধারণতঃ নিতান্ত আব্যশ্যক। ইহাকে দীক্ষা বলে। আধ্যাত্মিক অবস্থানিচয় বিশেষ অনুকূল থাকিলে ভগবৎ কৃপায় বিনা দীক্ষায়ও কোথাও কোথাও শক্তি লাভ দেখা যায়। মহাত্মা শাক্যসিংহ যখন প্রথমে ব্রাহ্মণ গুরুদিগের নিকট সাধন-প্রণালী শিক্ষা করেন, তৎপরে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করাতেও তাঁহার শক্তিস্ফূর্ত্তি হয় নাই। অবশেষে তীব্র ব্যাকুলতা হওয়ায় বোধিদ্রুমতলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত বসিলেন। সেই সময় ঈশ্বরের কৃপায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহারই দ্বারা বুদ্ধের যোগ-শক্তি খুলিয়া গেল, এবং তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। এইরূপ ভয়ানক ব্যাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া মহম্মদও ঈশ্বরের নিকট এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা যিশুকে ব্যাপটিষ্ট জনের (**John the Baptist**) এবং শ্রীচৈতন্যদেবকেও গয়া-ধামে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল।

প্রশ্ন—এই সাধন দিবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ কি না?

উত্তর—এরূপ কখনই সম্ভব না। ভগবানের সত্য ধর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে প্রাণে লাভ করিবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে পরোপকার করিবার শক্তি জন্মে। কিন্তু অন্যের ধর্ম্মচক্ষু খুলিয়া দিতে, অন্যের যোগ-শক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে যে শক্তি আবশ্যক, সেই শক্তি যিনি লাভ করেন নাই, তিনি কখনও এই সাধনে অপরকে দীক্ষিত করিতে অধিকারী নহেন। যোগের চারিটি অবস্থা—(১) প্রবর্ত্তক। (২) সাধক। (৩) যুঞ্জন-সিদ্ধ। (৪) যুক্ত-সিদ্ধ। প্রবর্ত্তক অবস্থার মধ্যে ধর্ম্মের প্রাথমিক কয়েকটী ভাব মাত্র উন্মেষিত হয়। যথাঃ—দীনতা, বৈরাগ্য, প্রেম, পবিত্রতা। তৎপরে সাধক অবস্থায় ভগবানের আবির্ভাব অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সেই অবস্থার শেষভাগে সুস্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তাহার পর যুঞ্জন-যোগীদিগের অবস্থা। তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বর-সহবাসে থাকেন ও বিবিধ সত্য লাভে জীবন কৃতার্থ করেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইঁহাদেরও বিচ্ছেদ হয়। সেই সময়ে অত্যন্ত ক্লেশে থাকেন। ইঁহাদেরও মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্ত্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় যাঁহারা অবিচ্ছিন্ন যোগের অবস্থায় থাকিয়া সেই পূর্ণ পরমেশ্বরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে যুক্তযোগী কহে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। যোগ শিক্ষা করিতে হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধ যোগীর নিকটেই দীক্ষা লাভ করা উচিত। কিন্তু যে সকল যোগীর সহিত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ যোগ আছে, তাঁহাদিগকে যদি ঐ মহাত্মারা অপরের মধ্যে

শক্তি সঞ্চারের শক্তি দিয়া দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন, তাহা হইলেও সেইরূপ ফল লাভ করা যায়। নতুবা যার তার কাছে দীক্ষিত হওয়া যৎপরনাস্তি অকর্ত্তব্য। যে অন্ধ সে অপরকে পথ দেখাইবে কি? যে একশত টাকার অধিকারী, সে দানসত্র খুলিলে চলিবে কেন? যাঁহার শক্তি অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে, তিনিই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও যোগ দীক্ষা দিবার অধিকার নাই। এইরূপ হীনাবস্থার লোকের নিকট দীক্ষা লওয়াতেই আমাদের দেশে গুরুবাদের ভয়াবহ অত্যাচার ও ঘৃণিত পাশবাচার সমূহ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—সাধন সম্বন্ধে নিয়মগুলি কি?

উত্তর—সাধনের নিয়ম দুই জাতীয়—বিশেষ ও সাধারণ। বিশেষ নিয়ম এই যে, (১) ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, নানকপন্থী ইত্যাদি পৃথিবীতে যত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে সত্যধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, সেই সত্য সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু সত্য পাইবে, তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। জগতের সমস্ত সাধু মহাত্মাদিগকেই সত্যের প্রচারক জ্ঞানে সরল ও অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করা চাই। যিনি যাহা নিজের প্রাণে সত্য বুঝিবেন, কোন দলের বা লোকের অনুরোধে বা ভয়ে তাহা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। অথবা এই সাধন অবলম্বীরা কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়িতে পারিবেন না। (২) ইহাতে মানুষ বা অন্য কিছু অবলম্বন নহে। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার একমাত্র গুরু এবং সমস্ত পদার্থ এবং মনুষ্য সাধারণভাবে গুরু বা উপদেষ্টা। যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ঈশ্বরপ্রদত্ত, কিন্তু কোন কারণে ঐ শক্তি অবরুদ্ধ হইলে মনুষ্যের সাহায্য আবশ্যক হয়, এখানেও সেইরূপ। স্বয়ং পরব্রহ্মই ইহার একমাত্র অদ্বিতীয় লক্ষ্য ও গম্যস্থল এবং সত্যই ইহার একমাত্র পথ। (৩) দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ বিবিধ উপায়ে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা না করিলে সাধন হয় না এবং কোনও প্রকার পাপ কার্য্য বা কু-চিন্তা, এমন কি মন্দ কল্পনা পর্য্যন্ত মনে উদয় হইলে সাধনের বিশেষ ক্ষতি হয়। (৪) দিবানিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করা আবশ্যক। জীবনের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সময় সাধনে ব্যাপৃত থাকা আবশ্যক। এইগুলি সকলের অবশ্য প্রতিপালনীয় বিশেষ নিয়ম। তদ্ভিন্ন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, যথাঃ—(১) মাংস ভক্ষণ নিষেধ। তবে শরীর রুগ্ন হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থামত নিতান্ত আবশ্যক যদি হয়, তবে খাইতে পারেন। মাংসের উগ্রকারিতা শক্তি-বশতঃ উহা চিত্ত সংযমের বিরোধী, এজন্য যোগসাধকেরা চিরকাল মাংস ভোজন নিষেধ করেন। কিন্তু মৎস্যের সে দোষ নাই বলিয়া উহা নিষিদ্ধ নহে। যাহারা

জীবহিংসা অবৈধ মনে করেন, তাঁহারা দুইই ত্যাগ করিতে পারেন (২) অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ। কেন না ইহা দ্বারা নানাবিধ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। তবে পিতামাতা গুরুজনের কিম্বা কোন বন্ধু আদর করিয়া কিছু দিলে তাহা এবং ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের ভুক্তাবশেষ ভোজনে শ্রদ্ধা হইলে তাহা গ্রহণে অনিষ্ট নাই, বরং উপকার হয়। এরূপ স্থলে প্রেমের প্রবল স্বাভাবিকী শক্তিতে রোগাদি নিবারণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কোথায় খাওয়া উচিত, কোথায় নয় ইহা স্থির করা কঠিন বলিয়া উক্ত নিয়ম অবধারিত হইয়াছে। আর ইহাতে যখন বিবেকের কোন হানি নাই, তখন ঋগ্বেদের সময় হইতে যে সাধন চলিয়া আসিতেছে তাহার বহু শতাব্দীর পরীক্ষিত নিয়ম বলপূর্ব্বক্ বৃথা ভঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? (৩) যাহাদের শরীর শুদ্ধ নয়, তাহাদের পক্ষে শরীর সংশোধনের জন্য প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রত্যহ দুইবার প্রাণায়াম অর্থাৎ ভুতশুদ্ধি আবশ্যক। অন্যত্র যে সকল স্থলে শরীর সুস্থ আছে তাহাদের তাহা আবশ্যক নাই। (৪) স্ত্রীলোক ও পুরুষে স্বতন্ত্র গৃহে সাধন করা আবশ্যক। তবে যেখানে সেরূপ সুবিধা নাই তথায় অতি সতর্ক হওয়া উচিত যেন পরস্পর স্পর্শ না হয়। ইহা ঋষি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের পবিত্র সাধন। কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিত্রতার লেশ মাত্র প্রবেশ না করে। যতদিন সাধক পবিত্র-স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া আপনার প্রবৃত্তিনিচয়কে সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনিতে না পারেন, ততদিন চরিত্র স্খলনের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনার মধ্যেও থাকা বিধেয় নহে।

প্রশ্ন—বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই যোগসাধন লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উত্তর—তাহা আমি খুব ভাল মনে করি। আমি নিশ্চিত জানি যে, এই আন্দোলনের মূলে অতি উচ্চ ভাব বর্ত্তমান আছে এবং ইহার ফলে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের সাধারণ লোকের মঙ্গলই হইবে। যেমন ব্রাহ্মসমাজ শৈশবাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে এক এক পদ অগ্রসর হইয়া এপর্য্যন্ত অনেক অমূল্য সত্য লাভ করিয়াছে, এই সাধনও সেইরূপ ভগবানের প্রেরিত একটী মহামূল্য সত্যরত্ন, ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন একটী ভূষণ এবং সকল লোকের সাধারণ সম্পত্তি। তথাপি যেমন অন্যান্য সত্য লওয়ার সময় ব্রাহ্মসমাজ ঘোরতর আন্দোলন করিয়া তবে নূতন সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছিল, এবারেও যদি সেইরূপ আন্দোলন না উঠিত, তবে ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তির হানি হইয়াছে বিবেচনা করিতাম।

উন্নতিশীলতা প্রকৃতির নিয়ম বটে, কিন্তু স্থিতিশীলতাও স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত উপকারী। কোন নূতন সত্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, যে সমাজে তুমুল কোলাহল না উঠে, অবিচারিত চিত্তে যাহার লোক সকল উহার অনুসরণ করে, স্থিতিশীল বন্ধুদের ন্যায় পুরাতন ও প্রচলিত সত্যসমূহের প্রতি যথেষ্ট আদর দেখাইয়া যদি নূতনের মধ্যস্থ সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান না

করিয়াই উহা অবলম্বন করে, তাহা হইলে বস্তুতঃই ঐ সমাজের স্বাস্থ্যের বা জীবনীশক্তির হীনতাই সপ্রমাণ হয়। এইজন্য যে নূতন সাধন করুণাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর এক্ষণে সুসময় বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজের এবং দেশের সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য পাঠাইতেছেন, তৎসম্বন্ধে সকলের এইরূপ সতর্কতা দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।

কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, মনুষ্য তখনই স্থিতিশীলতার ঘোরতর পক্ষপাতী হয়, যখন তাহার আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আমার আশঙ্কা হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের পাছে বা এইরূপ ঘটে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা সংসারের খাতিরে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিতে চান, তাঁহারাই ধর্ম্ম ও সংসার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া প্রচার করেন এবং সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয় না বলেন। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শও যদি সঙ্কীর্ণ না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা বলিবেন না যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও যোগ স্বতন্ত্র। আমি যতটুকু বুঝি তাহাতে বলিতে পারি যে, যত প্রকার সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াও ইহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব বা মত বা কার্য্য কিছুমাত্রও পাই নাই। তথাপি তাহাদের সকলেরই স্বাধীনভাবে তৎসমুদয় পরীক্ষা করিবার অধিকার আছে। এজন্য সকলের সম্মুখে আমার সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম। এস্থলে একটী কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক যে, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এক কথা নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শে জীবন গঠন করণোদ্দেশে যে সকল লোক একত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মিলিত নাম ব্রাহ্মসমাজ, নতুবা ইতিমধ্যেই তিনটী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে বলিতে হইত। ঐই তিন সমাজের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান; তবে ব্যক্তিগত রুচি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও যদি আমার মতে কেহ কোন দোষ দেখেন, অবনত মস্তকে তাহা সংশোধন করিব। আর যদি ইহাকে বিশুদ্ধ ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছাসঙ্গত দেখিয়াও ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন, তবে জানিব যে বর্ত্তমান স্থিতিশীল বন্ধুদিগের ন্যায় তাঁহারাও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বিশ্বাস করি ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের বিধান, এজন্য এরূপ দুঃখের ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা দেখি না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমি কীটানুকীট, তাঁহার দাস, আমি আর কিছু জানি না।

প্রশ্ন—এই পথ ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ কি নাই?

উত্তর—এমন ভয়ানক কথা আমি বলিতে পারি না। ইহাতেই যত দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে পাইবার সাধন ও উপায়। যে কেহ সরলভাবে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিবে ও মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহারই নিকট প্রার্থনা করিবে, সেই মুক্তিলাভ করিবে। আর ধর্ম্ম লাভের জন্য যে উপায় শ্রেয়ঃ তাহা তিনিই তাহার সম্মুখে আনিয়া দিবেন। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলা

আবশ্যক। এমন কি, আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর পাপী-তাপী যাবতীয় নরনারীই মুক্তির অধিকারী। ইহলোকে যদি না হয়, পরলোকে অনন্তকালে প্রত্যেক মানবাত্মা পূর্ণতার দিকে চলিবেই চলিবে। ইহলোকেও পাপ প্রভৃতি সমস্তই তাহার আত্মার মধ্যে চরম মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই প্রসব করে না।

প্রশ্ন—বহুকাল তপস্যা করিয়া ঋষিরা যে ধন প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া আমরা কিরূপে তাহার আশা করিতে পারি ?

উত্তর—যদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যোগপথে চলিতে হইত, তাহা হইলে যুগযুগান্তরেও হয়ত কোন গৃহস্থ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন সিদ্ধ মহাত্মা পৃথিবীর বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবনতি দেখিয়া তাহা দূর করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহারাই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগকে এই সাধন শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনাদের দীর্ঘকালবদ্ধ বহুদর্শিতাবলে যথাসাধ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য করিতেছেন। যেমন যদি কেহ স্বীয় প্রযত্নে ও গবেষণাবলে আজ মহাত্মা ইউক্লিডের জ্যামিতির সত্যসমূহ পুনরায় আবিষ্কাব করিতে চাহেন, তবে সহস্র বৎসরেও পারেন কিনা সন্দেহ। অথচ এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উপযুক্ত শিক্ষকের উপদেশানুসারে অতি অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতেছে ; সেইরূপ সংসারের বিবিধ উৎপাত ও ব্যাঘাত সত্ত্বেও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই কয়েকজন গৃহস্থ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং অনেকেই হইবেন সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—ধর্ম্ম লাভের প্রতিকুল অবস্থাগুলি কি কি ?

উত্তর—প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রকার পাপ ধর্ম্ম লাভেব বিবোধী। তৎপর অহঙ্কার ও সংসারে আসক্তি। এইগুলি চলিয়া না গেলে প্রকৃত ব্যাকুলতা আসে না। ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা না আসিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না।

প্রশ্ন—আপনার সাধন প্রণালী কি ?

উত্তর—ইহাতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই। ইহা কোনরূপ প্রক্রিয়াও নহে। কেবল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত শক্তিশালী প্রার্থনা ; অনেকে ইহাকে অজপা সাধন বলিয়া থাকেন। কারণ ইহাতে অবিশ্রাম সাধন করিতে হয়।

প্রশ্ন—প্রাণায়াম সাধন কি না ?

উত্তর—প্রাণায়ামকে সাধন বলে না। ইহাকে ভুত-শুদ্ধি বলিয়া থাকে। কারণ ইহার দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় এবং তাহার সহিত মনও কিঞ্চিৎ একাগ্রতা লাভ করিয়া থাকে। ইহা বাহিরের অবলম্বন মাত্র। যেমন খোল, করতাল, সঙ্গীত, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি বাহিরের অবলম্বন দ্বারা সাধনের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়,

প্রাণায়ামেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে সাধকের শরীর সুস্থ ও নিষ্পাপ আছে সেখানে প্রাণায়ামের প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন—সাধন গ্রহণের উপযুক্ততা কি?

উত্তর—ইহাতে পাণ্ডিত্য বিদ্যাবুদ্ধি চাহি না; ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে কেহ বর্ত্তমান অবস্থায় তৃপ্ত না হইয়া যোগপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হন, এবং যতদিন প্রকৃত অবস্থা লাভ না করেন, ততদিনের জন্য সাধন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি তাহার বিবেক-বিরুদ্ধ না হইলে প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তিনিই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রশ্ন—কেহ ব্যাকুলভাবে প্রার্থী কিনা তাহা কিরূপে স্থির হয়? মহাত্মাদিগের নাকি অন্যের আত্মা দর্শনের শক্তি আছে?

উত্তর—মানুষ অপূর্ণ, সুতরাং তাহার শক্তিও অপূর্ণ। যতই ঈশ্বরের দিকে আমরা অগ্রসর হইব, ততই আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত শক্তি বিকশিত হইয়া ক্রমে পূর্ণতার দিকে ধাবমান হইবে। প্রত্যেক লোকেরই অপরের ন্যায় আত্মদর্শনের শক্তি আছে। কিন্তু যাহার জ্ঞানের জড়তা যত অধিক, তাহার এই শক্তি অল্প এবং যাহার যে পরিমাণে আত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এইরূপে মহাত্মারা সাধারণ লোক অপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে সকল তত্ত্ব অবগত হন ও মানুষের আত্মার অবস্থা, এমন কি বহুদূর হইতেও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে সমস্ত বিষয়ে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না।

প্রশ্ন—যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবপ্রিয় ও কার্য্যবিমুখ, একথা সত্য কি না?

উত্তর—ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। যোগীদিগের সংবাদ-পত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্নের দ্বারা তাঁহাদের সংবাদ প্রকাশিত হয় না। তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জ্জন কাননে কিংবা গিরি-কন্দরে বাস করেন, যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের সহিত দুই চারিটা কথা বলিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি কেহ মনে করেন যে তাঁহারা অলসপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ, সংসারবিমুখ ভিক্ষুক মাত্র, তাহা হইলে তাঁহাদের ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। যদি একটী সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করেন ও কিরূপ ভয়ানক ত্যাগ স্বীকার করিয়া জনসমাজের দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত নিয়ম-বশে ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা জীবনে কখনও কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখনও

কোন মহাত্মার সঙ্গ লাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলো ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া যোগী-দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগী-চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবারই অধিকার নাই। যে দেশের ঋষিরা কবি, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্য লেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কারকর্ত্তা, ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্য লেখক, ঋষিরা বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্বিদ, ঋষিরা গণিতশাস্ত্রের উদ্ভাবক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থাপক ও রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই সংসারযাত্রা নির্বাহোপযোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি মধ্য অন্ত, সেই দেশে যে আজ যোগ তপস্যা ও আলস্য এক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক, বশিষ্ট প্রভৃতি মহাযোগিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু, এই মহাসত্যের পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, যে দেশের তপস্যাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, গুরু নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি যে দেশের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পাশবাচার দূর করিবার জন্য কত শত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অরণ্যের বা পর্ব্বত গুহার নির্জ্জন সাধন ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং বিধিমতে ধর্ম্মপিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে প্রেম পবিত্রতা ও সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ সমুদিত করিয়া, জল-কষ্ট-পীড়িত লোকদিগের ক্লেশ বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের সাহায্যার্থে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্ত সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান, হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া চক্ষু থাকিতে আমরা অন্ধের ন্যায় চীৎকার করিতেছি যোগে আলস্য ও কর্ম্ম-বিমুখতা আনিয়া দেয়। লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা! যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বীরত্বের কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটি কথার প্রতিধ্বনি Emerson, Carlyle প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগিগণের নিকট পাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দী তাঁহাদের উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা Jesus Christ এবং মহম্মদ এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া অন্ধ যে আমরা, ইংরাজদিগের যৌবনসুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত

হইয়াছি ও যোগকে আলস্য মনে করিতেছি, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে ?

বস্তুতঃ যোগে আলস্য আনে না, বরং ঠিক তার বিপরীত। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম এই তিনের এককালীন সামঞ্জসীভূত উন্নতিই যোগের ফল। পরমেশ্বর রসের স্বরূপ, রস যেমন উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এককালে তাহার মূলে, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা ও পত্র সর্ব্বত্র সমভাবে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে, মানবাত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব একসঙ্গে সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আংশিক উন্নতি ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ, সেই পূর্ণ আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণ হইলে, অপূর্ণতা কি সঙ্কীর্ণতা তথায় স্থান পায় না। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কার্য্য সকলের একরূপ কখনই হইতে পারে না। সকলেই প্রচার কি বক্তৃতা বা সংবাদপত্র প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন করিবে, নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিব না, ইহা অজ্ঞের কথা। সকলকেই ধর্ম্মপরায়ণ যোগী হওয়া চাই, অথচ সাংসারিক নানা কর্ম্মে বিভক্ত হইতে হইবে। বক্তৃতা করা কাহারও কার্য্য, পুস্তক লেখা অপরের কার্য্য, কেহ বা কৃষিকার্য্য করিবে, কেহ বিচারপতি হইবে, কাহাকে জমিদারী দেখিতে হইবে, কাহাকেও স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে, অন্য কেহ বা কেবল নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করিবেন ও অপর সকলকে আপনার ধর্ম্ম জীবনের অমূল্য সত্যসমূহ বিরলে শিক্ষা দিবেন। সুতরাং দেখা গেল যে, যোগ সকলের সাধারণ ভিত্তিভূমি। তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাহার যেরূপ সুবিধা তিনি সেইরূপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

প্রশ্ন—সত্যজ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না, তবে কুসংস্কার পৌত্তলিকতা প্রভৃতি থাকিতে কিরূপে যোগ লাভ সম্ভব ?

উত্তর—তাহা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ধর্ম্ম পরে নয়, আগে। অর্থাৎ কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া তবে ধর্ম্ম হইবে ইহা নহে, বরং প্রাণে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম অবতীর্ণ হইলে পর ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। সত্যজ্ঞান উদিত হইলে তবে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি ভ্রম দূর হয়। যেমন আলোক আনিবার পূর্ব্বে সহস্র চেষ্টা করিয়াও গৃহের অন্ধকার দূর করা যায় না, তবে যে পরিমাণে আলোকরশ্মি গৃহে প্রবেশ করে, সেই পরিমাণে গৃহ আলোকিত হইতে পারে, তদ্রূপ যে পরিমাণে প্রকৃত তত্ত্ব মানবের প্রাণে সমুদিত হয়, সেই পরিমাণেই তাহার অবস্থা উন্নত হইতে থাকে। পাপ ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কেহ কখনও নিজের চেষ্টায় দূর করিতে পারে না। কোন ধর্ম্মসাধন অবলম্বন করিবামাত্রই কেহ উদ্ধার হয় না। সাধনের পরিণত অবস্থার নাম মুক্তি।

প্রশ্ন—প্রকৃত প্রার্থনা কাহাকে বলে ?

উত্তর—প্রার্থনা বচন-বিন্যাস নহে, মনের ভাবও নহে। কোনরূপ প্রক্রিয়াও নহে। প্রার্থনা আত্মার একটী স্বভাব। যদি মানুষ নিজের আত্মার একটী বা অনেক প্রকার অভাব অনুভব করে, পরে সেই অভাব মোচনের জন্য তাহার প্রাণে নিতান্ত ব্যাকুলতা জন্মে ; তখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও সে যদি দেখে ঐ অভাব দূর করিবার তাহার নিজের তিল মাত্র ক্ষমতা নাই, অপর কোন সর্ব্বশক্তিমান ও করুণাময় পুরুষের সেই শক্তি আছে, তখন তাহার আত্মার যে অবস্থা হয় সেই অবস্থার নাম প্রার্থনার অবস্থা। সে তখন কথা বলুক, অথবা রোদন করুক, অস্থির হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হউক বা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করুক, অথবা সম্পূর্ণ ধীরভাবে প্রাণের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ করুক, সে প্রার্থনা করিতেছে।

প্রশ্ন—সাধনের ভিতরের তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা যদি অসম্ভব হয় তবে আপনি আর একজনকে কিরূপে সেই সাধন দিয়া থাকেন ?

উত্তর—কথায় সাধনের বাহিরের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ভিতরকারতত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জাগ্রত প্রার্থনা উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেমন শরীরে শরীরে, মনে মনে স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সহানুভূতি আছে, তদ্রূপ আত্মায় আত্মায়ও সহানুভূতি লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই পাওয়া গিয়া থাকে। আচার্য্য যখন বেদী হইতে উপাসনা করেন, তখন যদি কোন দিন তাঁহার সত্যভাবে উপাসনা হয়, সেই দিন উপাসক-দিগের প্রাণ স্পর্শ করে, নতুবা অন্যদিন নীরস ও প্রাণবিহীন কথা মাত্র শুনিয়া তাঁহারা উঠিয়া যান। ইহার কারণ কি ? ঐ আধ্যাত্মিক সহানুভূতি ইহার মূল। যেরূপ আচার্য্যের সত্য প্রার্থনা উপাসকদিগের প্রাণ স্পর্শ করে ও তাঁহাদের প্রাণেও জাগ্রত প্রার্থনার উদয় করিয়া দেয়, সেইরূপ অপরদিকে উপাসকদিগের মধ্যে যদি কাহারও প্রাণে বাস্তবিক সত্য প্রার্থনা জাগ্রত হয়, তাহা হইলেও ঐরূপ হইয়া থাকে। হয়ত, আচার্য্য নীরস ভাবে শুষ্ক কতকগুলি কথা মাত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কাহারও প্রাণ ভিজিতেছিল না, হঠাৎ ঐ সৌভাগ্যবান্ উপাসকের জীবন্ত প্রার্থনার ভাব আধ্যাত্মিক সহানুভূতিবশতঃ আচার্য্যের এবং অনেক উপাসকের প্রাণে সংক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকে একেবারে বিহ্বল করিয়া তোলে। এই নিয়মানুসারেই প্রতি বৎসর উৎসবাদিতে এইরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়।

এখন বুঝা যাইবে যে, কেহ প্রকৃত ব্যাকুলতার সহিত ঐ প্রার্থনার অবস্থা আপনার প্রাণে অবতীর্ণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলে, কোন জাগ্রত শক্তিশালী পুরুষ নিজের ইচ্ছা-শক্তিতে ভগবানের কৃপা-সম্ভূত নিয়মানুসারে নিজের আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার অবস্থা তাঁহার প্রাণে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন।

বস্তুতও তাহাই হয় ; যিনি নিতান্ত ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থী হন, আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সম্মুখে প্রার্থনা করি। এবং এই সময়ে আমার পূজনীয় গুরু শ্রীযুক্ত পরমহংস বাবাজী সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে সেইরূপ প্রার্থনা জাগ্রত হয় এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগশক্তি প্রস্ফুটিত হয়। তাহা তিনি ভিন্ন বাহিরের অন্য কেহই বুঝিতে পারে না। এই অবস্থাকে যোগীরা সঞ্চারের অবস্থা কহেন। তাহার পর হইতে যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠার সহিত এই সাধন করিতে থাকেন, তিনি ততই গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হন। ক্রমশঃই নূতন নূতন রাজ্য সকল তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর হইতে থাকে। সে সকল অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। অবশেষে সকল আশা চরিতার্থ হয়, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, অনন্ত উৎস খুলিয়া যায় এবং ব্রহ্মকৃপায় সাধনের উচ্চ অবস্থায় যোগ আরম্ভ হয় ও অনন্তকাল চলিতে থাকে।

প্রশ্ন আপনি যোগের যে সকল নিগূঢ় কথা এস্থলে প্রকাশ করিলেন, তদ্দ্বারা জনসমাজের অনিষ্ট হইতে পারে কিনা ?

উত্তর—ধর্ম্ম মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। ইহার মধ্যে গোপনীয় কিছু থাকিতে পারে আমি মনে করি না। তবে যে স্থলে যে কথা বলিলে লোকের অপকার হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে সে কথা বলা উচিত নহে। এইজন্য যোগতত্ত্ব চিরকাল গোপন হইয়া আসিয়াছে। আমার এই পুস্তিকায় কেহ যোগের ভিতরকার কথা কিছু পাইবেন না। বাহিরের কথাই বুঝাইয়াছি, এবং তৎসম্বন্ধে সকলের যে নানাবিধ ভ্রম ও আশঙ্কা আছে তাহা দূর হইবার সম্ভাবনা, ততটুকুই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যোগ-সাধন সমস্তই প্রত্যক্ষ বিষয়। এখানে মতামত বা প্রণালী কিছুই নাই। এজন্য ইহার কিছুই ভাবিয়া প্রকাশ করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না। সংগুরুর কৃপাদৃষ্টি হইলে ঈশ্বরের করুণায় যাঁহার অন্তরে এই সাধন খুলিয়া যায়, তিনিই বুঝেন ইহা কি বস্তু। নতুবা নিজে নিজে প্রাণায়াম প্রভৃতি বাহিরের প্রক্রিয়া যাঁহারা করিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, ঐরূপ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। শত শত লোক ঐরূপ করিতে গিয়া কুষ্ঠ, হার্ণিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা যেন অতি ব্যস্ত না হন। ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকটে নিয়ত প্রার্থনা এবং সাধ্যানুসারে সুপথ অন্বেষণ করুন, সময় হইলে তিনি আপনিই সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

[গোস্বামী-প্রভু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীর অতিরিক্ত যোগ-সাধন গ্রহণ করিবার পর কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, কিয়ৎকাল পর্যন্ত ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে উৎসবাদিতে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার কতকগুলি সংগৃহীত হইয়া "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে কতিপয় উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।]

১২৯৩ সন, ২৪শে অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব-বিদ্যালয়ের উৎসবে বক্তৃতা।

বিষয়—মানব জীবনের লক্ষ্য কি ?

"মানব জীবনের লক্ষ্য"— এ বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আমার শরীর দুর্ব্বল, তথাপি যতদূর সাধ্য আমি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

বিশ্ববিধাতা, জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বর যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন— জড়, উদ্ভিদ্, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, মনুষ্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকলের মধ্যেই তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে বস্তুই কেন আমরা দর্শন করি না, তাহার বিষয় আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই, উহার প্রত্যেকের মধ্যেই উদ্দেশ্য আছে। মনুষ্যে দুইটি দেখিতে পাই—একটি উদ্দেশ্য, আর একটি লক্ষ্য। করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা প্রত্যেক পদার্থে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল উপায় কৌশল রাখিয়াছেন, মনুষ্য তাহা অবগত হইয়া তাঁহাকে জানিতে পারে। যদি এই বিশ্বসংসার বিশৃঙ্খল হইত, তবে ইহা দেখিয়া কেহই বিশ্বপতিকে বুঝিতে পারিত না। অরণ্যের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর রহিয়াছে দেখিলে, তাহাতে মনোযোগ দেই না; কিন্তু যদি তাহাতে কোন কারুকার্য্য দেখিতে পাই, কিংবা কোন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দর্শন করি, তখন আমাদের কার্য্যকারণানুসন্ধিৎসাবৃত্তি কার্য্য করিতে থাকে। ইহা কোথা হইতে আসিল, অবশ্যই কোন ভাল শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এরূপ ভাব মনে উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি একটি ফুল দেখি বা কতকগুলি ফুল ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাই, সেদিকে মন আকৃষ্ট না হইতেও পারে, কিন্তু এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথা দেখিলে সেই দিকে মন যাইতে থাকে।—তখন আমরা মনে করি অবশ্য কোন মালাকার

ইহা গাঁথিয়াছে, ইহা আপনাআপনি হয় নাই। যে কারণানুসন্ধিৎসাবৃত্তির দ্বারা প্রস্তরে কারুকার্য্য এবং মালাতে কৌশল দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতার জ্ঞান জন্মে, সেই কারণানুসন্ধিৎসা দ্বারাই আমরা এই জগৎ দেখিয়া জগৎকর্ত্তাকে জানিতে পাই। তিনি এই জগতে যে সকল কৌশল রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা একদিকে আমরা নানাপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, অপর দিকে এতদ্দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতেছি। একটি তৃণ লইয়া দেখিলে, অজ্ঞ ব্যক্তি কিছু বুঝিতে পারে না; কিন্তু যিনি উদ্ভিদ্‌বেত্তা, তিনি উহার মধ্যে কত কৌশলই দেখিতে পান। এই যে চারিদিকে কত তরু, লতা, গুল্ম রহিয়াছে, এ সকলের মধ্যে কত কৌশল বর্ত্তমান রহিয়াছে; ঔষধাদি কত প্রয়োজনে লাগিতেছে। কোন স্থানে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর সকল পদার্থের মধ্যেই, সদুদ্দেশ্য-সাধনের উপায় সকল রাখিয়া দিয়াছেন। একটি আম্রবৃক্ষের বীজ উত্তমক্ষেত্রে রোপিত না করিয়া, টবে রোপণ করিলে গাছটি বাড়িবে বটে, দুই চারি মাস জীবিতও থাকিবে বটে, কিন্তু উপযুক্তমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না, তাহার উদ্দেশ্য-পথে সে চলিতে পারিবে না; কেননা পরমেশ্বর সেই বৃক্ষকে যে উপায়ে, যে ভাবে বর্দ্ধিত করিতেন তাহার বাধা ঘটিয়াছে। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য যাহা সৃষ্ট এবং তাহার মধ্যে তজ্জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা যে সকল উপায় রাখিয়াছেন, চারিদিকের বস্তু হইতে যে সাহায্য পাওয়ার বিধান করিয়াছেন, তাহার বাধা ঘটিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। বৃক্ষ-বীজের উদ্দেশ্য ফল প্রদান করা; যে সকল উপায়ে সেই ফল জন্মিবে, তাহা ঐ বীজের মধ্যেই রহিয়াছে এবং আলোক, প্রশস্ত ক্ষেত্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সকল পদার্থের সাহায্য প্রয়োজন তাহাও বর্ত্তমান আছে। যদি কোন প্রকারে ঐ সকল উপায় ও সাহায্যের বাধা জন্মে, তবে বৃক্ষবীজ ফল প্রদান করিতে পারে না। সকল বৃক্ষের সম্বন্ধেই এই প্রকার। প্রত্যেক বৃক্ষের দ্বারাই এক একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। উদ্ভিদ হইতে কত ফল, কত শস্য জন্মিতেছে, কত ঔষধ হইতেছে। এই উদ্ভিদের সঙ্গে আমাদের কত যে শারীরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।

আবার জগতের প্রত্যেক জীবেও উদ্দেশ্য আছে; পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, সকলেই উদ্দেশ্য পথে চালিত হইতেছে। যাহারা ভূয়োদর্শন করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানিয়াছেন কত জীব আমাদের কত উপকারী; হিংস্র জন্তু, এমন কি সর্প পর্য্যন্তও আমাদিগের উপকার করিয়া থাকে; অনেক পণ্ডিতের মতে সর্প না থাকিলে পৃথিবীর অনিষ্ট হইত। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমেশ্বর সৃষ্ট জীবমাত্রেই উদ্দেশ্য রাখিয়া দিয়াছেন।

মনুষ্য-জীবনে কেবল উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্যও রহিয়াছে; অন্য পদার্থে লক্ষ্য নাই। আম গাছ জানে না সে কেন ফল প্রদান করে, সূর্য্য জানে না

সে কেন কিরণ প্রদান করিয়া থাকে—তথাচ করিতেছে, উদ্দেশ্যসাধন করিতেছে, কিন্তু জানিতে পারিতেছে না। তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই, স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু মনুষ্যের লক্ষ্য আছে। মনুষ্যের দুইটি ভাগ—একটি শরীর, আর একটি আত্মা। মনুষ্যে জড়, উদ্ভিদ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির ভাব আছে, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনুষ্যের শরীরে জড় ও উদ্ভিদের ভাব আছে; আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে পশু প্রকৃতি রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন যে উচ্চ প্রকৃতি আছে, যাহাকে মনুষ্যত্ব বলা যায়, তদ্দ্বারাই বিশ্বস্রষ্টাকে জানিয়া মানুষ ধন্য হইয়া থাকে। শরীরের যে প্রকার উদ্দেশ্য আছে, আত্মারও সেইরূপ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য উভয়ই রহিয়াছে। শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী;—এই শরীর আমার বাস করিবার একখানা ঘর; পক্ষীর যেমন পিঞ্জর, আত্মার পক্ষে সেইরূপ শরীর। চক্ষুতে দেখা যায়, হাতে কার্য্য হয়; চক্ষু কি দেখে? হাতে কি কাজ করে? যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির চক্ষু, হস্ত ত বর্ত্তমান থাকে, সে দেখে না কেন—কাজ করে না কেন? না, চক্ষু দেখিতে পারে না, হাতেও কাজ করিতে পারে না, আত্মাই উহা দ্বারা দেখিয়া থাকে ও কার্য্য করিয়া থাকে।

এই শরীরকে সুস্থ না রাখিলে, উপযুক্তরূপ আহার-বিহার দ্বারা রক্ষা না করিলে, শরীর রুগ্ন হইয়া যায়; তখন আর এই শরীরের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। শরীরই-ধর্ম্মসাধনের আদি। অনেকে ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া শরীরকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু ইহা কোনক্রমেই উচিত নহে। শরীরটি ঈশ্বরদত্ত ধন, যাঁহারা ইহার প্রতি অবজ্ঞা অথবা অযত্ন করেন, তাঁহারা ইহার স্রষ্টার প্রতিই অবমাননা করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে না বুঝিয়া শরীরকে রুগ্ন করি, তাহাতে উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাঘাত হইয়া থাকে। যাহাদের অল্প বয়স, তাহাদের যাহাতে শরীর রক্ষা হয়, এরূপ নিয়ম অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে যত্ন করা একান্ত আবশ্যক। একবার যদি শরীর ভগ্ন হয়, তবে চিরকাল যন্ত্রণা পাইতে হইবে, সংসার এবং ধর্ম্মক্ষেত্র উভয়স্থলেই কষ্ট পাইবেন। পরমেশ্বর অন্যান্য যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্যকে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহা বুঝিবার অধিকারী করিয়াছেন। মনুষ্য যখন জ্ঞান দ্বারা শরীরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তখন যেন শরীরের প্রতি অবজ্ঞা না করেন।

পরমেশ্বর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা রাখিয়া দিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে তাহার সমস্তই প্রদান করিয়াছেন, কেননা মানুষ আপনার মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা যেমন অন্য পদার্থের উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকি, সেই প্রকার নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝিতে হইবে। আমার শরীরের উদ্দেশ্য

সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার আত্মার উদ্দেশ্য বুঝা কঠিন, কেননা শরীর বাহিরের, আত্মা ভিতরের। "আমি কি", ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যদি "শরীরই আমি" বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে আর আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না। আমি যে শরীর হইতে পৃথক্ তাহা জানিতে পারিলে উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হই। পণ্ডিতেরা শরীরকে 'আপনি' বলা অর্থাৎ দেহকে আত্মা জ্ঞান করাকে 'সংসার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ যদি আহার, পান করিয়া এবং উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া মনে করেন, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ও লজ্জার কার্য্য সম্পন্ন হইল, তবে তিনি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এজন্য পূর্ব্বাচার্য্যেরা, "শরীর আমি নই—আমি ও শরীর পৃথক্" এই বিচার করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। মানুষ যখন "দেহ আমি নই" বুঝেন, তখনই আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন দেখেন, প্রত্যেক মনুষ্য এক একটি কার্য্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন একটি বড় কল, প্রত্যেক মানব যেন তাহার অঙ্গীভূত এক একটী ক্ষুদ্র কল। যদি কেহ কোন কলের কারখানায় যাইয়া দেখেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের সমষ্টি ও একটি বৃহৎ কল লইয়া সমস্ত বড় কলটি চালিত হইতেছে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র আলপিন্‌ও আছে, খণ্ড খণ্ড ফিতাও রহিয়াছে। এ সকলের একটিকে বাদ দিলেও কল চলিতে পারে না। মনুষ্য-সমাজ একটি বৃহৎ যন্ত্র; প্রত্যেক মানুষ তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল। আমরা যেন মনে না করি যে, আমরা যেমন জগতের হিতজনক গুরুতর কার্য্য করিতেছি, অন্য সকলে সেই প্রকার বড় কার্য্য করিতেছে না। প্রত্যেক ব্যক্তি জগতের কার্য্য করিতেছেন। রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন কার্য্যে নল, নীল, হনুমান প্রভৃতি মহাবীরসকলও সাহায্য করিয়াছিলেন, আবার সেই প্রকারে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল; সেইরূপ এই ভব সাগর—যাহা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে বড় বড় লোকও যেমন কাজ করিতেছেন, সাধারণ লোকও সেই প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

যতদিন "শরীরই আমি" এই মোহ না কাটে, ততদিন মানুষ নিজেকে বুঝে না, আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না; তাই মানুষ, এ কাজে ও কাজে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই সুস্থির হইতে পারে না। যতদিন মনুষ্য নিজের উদ্দেশ্য স্থলে না যান, ততদিন আর তাঁহার সুস্থিরতা নাই। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাহারা এরূপে এ কাজে ও কাজে যাইয়া, ঠেকিয়া আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা আপনাকে "শরীর" বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা আপনার উদ্দেশ্য কখনও বুঝিতে পারেন না।

এক মনুষ্যের উদ্দেশ্য অন্যে সাধন করিতে পারে না। যেরূপ লেবু, আম প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বৃক্ষ আছে, উহার এক শ্রেণীর বৃক্ষদ্বারা অন্য শ্রেণীর

প্রয়োজন সাধিত হয় না ; আবার এক এক শ্রেণীর মধ্যেও নানা বিভাগ আছে ; এক আম বা লেবুজাতীয় ফলই কতপ্রকার বর্ত্তমান আছে, উহার একটির দ্বারা যে কাজ হয় অপরটির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না—সেই প্রকার মনুষ্যের মধ্যেও নানা শ্রেণী আছে, আবার প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ; ইহার এক শ্রেণীর বা একজনের উদ্দেশ্য অপরের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। যে কার্য্য করিলে মনুষ্য সুখ পান, উৎসাহ পান, দিন দিন আত্মার বিকাশ হইতে থাকে, সেই কাজই তাঁহার জীবনের ব্রত। সেই কাজ করিবার সময় যদি শত সহস্র লোকেও বাধা দেয়, হিমালয়ের মত পর্ব্বতও যদি সম্মুখে পতিত হয়, এ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া "পরমেশ্বর আমাকে এই কার্য্য করিতে বলিতেছেন", ইহা বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। যে ব্যক্তি এই প্রকারে নিজের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকেন, সেই ব্যক্তি যৌবনেও যেরূপ উৎসাহ বার্দ্ধক্যেও তিনি সেইপ্রকার উৎসাহে অটলভাবে চলিতে থাকেন। তিনি তাঁহার জীবনে সেই কার্য্য করিবার জন্য কোন সময়েই দুর্ব্বল হন না। সেই কার্য্যই আমার উদ্দেশ্য—যাহা করিতে করিতে প্রাণ উৎসাহে, আনন্দে, আত্মপ্রসাদে ভাসমান হইতে থাকে। আবার যাহা আমার জীবনের কার্য্য নহে, তাহা করিতে গেলে, প্রাণ নিরুৎসাহে, নিরানন্দে, গ্লানিতে মৃতপ্রায় হইয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য সামান্য হইতে পারে, তাহাতে কি ? তাহা মুটেগিরি, কেরাণীগিরি, পুস্তক লেখা, ধর্ম্মপ্রচার, শিক্ষকতা, কৃষিকার্য্য, শিক্ষা, বাণিজ্যও হইতে পারে। কেবল ধর্ম্ম-প্রচার করাই মানুষের উদ্দেশ্য, মুটেগিরি নহে,—ইহা কে বলিতে পারে ? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এই মানবসমাজরূপ যন্ত্রের প্রত্যেক মানুষই এক এক অংশ। যে যাহার জন্য সৃষ্ট, সে সেই কার্য্যই করিবে। যিনি যাহা করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, তিনি যেমন সেই কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্যে কখনও সেই প্রকার করিতে সমর্থ হইবে না। মুটের কাজ মুটে করিবে, ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ ধর্ম্মপ্রচারক করিবেন, কোন কাজই ছোট নহে।

কাজ মানবের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু লক্ষ্য নহে। উদ্দেশ্যের মতন, মানবের লক্ষ্যও বুঝিবার উপায় রহিয়াছে। শিশুকাল হইতেই আমরা বৃহৎ পদার্থ ভালবাসিয়া থাকি, দুটি সন্দেশ সম্মুখে ধরিলে বালক বড়টি লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। আর কি ? না, সুন্দর পদার্থের প্রতি ভালবাসাও ছোটকাল হইতেই মানবপ্রাণে বর্ত্তমান। শিশু ঐ সুন্দর চাঁদ, ঐ সুন্দর ফুল, ঐ লাল কাপড় চাহিতেছে। যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহার দিকেও শিশুকাল হইতেই প্রাণের আকর্ষণ রহিয়াছে। যে শিশুকে ভালবাসে, শিশুরও তাহাকেই ভাল লাগিতেছে। এরূপ কতকগুলি অবস্থা আমাদিগকে কেহ শিক্ষা দেয় না, ছোটকাল হইতেই প্রাণের মধ্যে আপনাআপনি উদিত হইয়া থাকে। ছোটকাল হইতেই মানবের প্রাণে নির্ভরের ভাবও দেখিতে পাই ; শিশুকালে

মনে হয়, মা সব পারেন; শিশু মা'র কোলে উঠিয়া সিংহ ব্যাঘ্রকেও পা দেখাইতেছে, ঝড়ে সকলে ব্যাকুল, শিশু মা'র কোলে থাকিয়া হাসিতেছে। "মা'র কোলে আছি, আর ভয় কি?" এ সকল ভাব বাল্যকাল হইতেই কাজ করিতে থাকে; কেন করে, জানি না। যত বয়স বাড়ে, আর আমরা জীবনে যত প্রবেশ করিতে থাকি, ততই পদার্থতত্ত্ব আলোচনা করি, কিন্তু চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সমুদ্র যত বৃহৎ পদার্থ সন্দর্শন করি, কিছুতেই আমাদের মন উঠে না; এ সকল বড় হইতে আরও বৃহত্তরের দিকে—অনন্তের দিকে প্রাণ ছুটিতে থাকে। এজন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুন্দর পদার্থ দেখিলাম, তাহাতেও তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। অনন্ত-সৌন্দর্য্যের পানে ধাবিত হইলাম। সেই প্রকার পৃথিবীর সীমাবদ্ধ ভালবাসায়ও প্রাণ তৃপ্ত হইল না, অনন্ত প্রেমের দিকে ছুটিল—সেই চিরমঙ্গলের নিকট প্রাণ যাইতে চাহিল। সেই বৃহৎ, অনন্ত, সুন্দর, প্রেমময়, মঙ্গলময়, নির্ভরের স্থল কে? না আমার ব্রহ্ম। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"। যাঁহাকে জানিলে প্রাণ নিত্যানন্দ লাভ করে, ভয় একেবারে দূরে পলায়ন করে; যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিতেছে, রক্ষিত হইতেছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা ভিন্ন অপর যাহার উপাসনা করি, তাহা ব্রহ্ম নহে। সেই ব্রহ্মকেই চাই; তিনি "ব্রহ্ম"—বড়, তিনি "সত্যং শিবং সুন্দর", তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর। যেমন নদী নিম্নদিকে দৌড়িতে থাকে, সেইপ্রকার প্রাণের গতিও সেই অনন্তের দিকে, সেই মঙ্গলের দিকে, সেই সুন্দরের দিকে। যখন প্রাণে এই অবস্থা হয়, তখন মানুষ আপন লক্ষ্য বঝিতে পারে। মানবের লক্ষ্য কি?—না, সেই অনন্ত, সুন্দর, মঙ্গলময়, চিরনির্ভরের স্থল সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। যিনি এইরূপে নিজের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই লক্ষ্য যতদিন না প্রাপ্ত হন, ততদিন জীবন বৃথা মনে করেন।

যে প্রকার কোন মাঝি নঙ্গরবাঁধা নৌকা পুনঃ পুনঃ বাহিলেও নৌকা এক পাও অগ্রসর হয় না, যেখানে প্রথমে ছিল সমস্ত সময় পরেও সেখানে থাকে, সেইপ্রকার অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইয়া যত কেন পরিশ্রম করিয়া কাজ কর না, সেই কাজে কোনই ফল লাভ করিতে পারিবে না, বিন্দুমাত্রও কার্য্যের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবে না। মনুষ্য যখন লক্ষ্যস্থলে যায়—আপনার মা'র কাছে যায়, তখনই আপন শক্তি কি, বুঝিতে পারে; যতদিন পরমাত্মা আত্মাতে প্রবেশ না করেন, ততদিন আত্মার শোভা কোথায়? যতদিন চন্দ্রে সূর্য্যের কিরণ না পৌঁছে, ততদিন চন্দ্রের শোভা কৈ? সূর্য্যে আলো দিলে চন্দ্র আলোকিত

হইয়া পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করে; তেমনি আত্মাতে পরমাত্মার আলোক পঁহুছিলে সে পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকে।

লক্ষ্য স্থির না হইলে, লোক কেবল নানা পদার্থে আকৃষ্ট হইয়া জীবন বৃথা কর্ত্তন করিয়া থাকে। যতক্ষণ লোকের লক্ষ্য বোধ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি কখনও ধর্ম্মসাধন করিতে পারে না। যতদিন ধর্ম্ম লক্ষ্য না হয়, ততদিন আজ আমি ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, কাল আবার তাহার বিরুদ্ধে বলিব, আজও আমার প্রাণের যে অবস্থা কালও তাহাই থাকিবে। নঙ্গর-বন্ধ নৌকাতে দশখানা দাঁড় বাহিলেও বিন্দুমাত্র চলিবে না; সেই প্রকার পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে আসক্ত হইয়া দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত কোন কার্য্য করি না, জীবনপথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিব না। যাহার নৌকা চলে, সে চিড়ে খায়, তামাক খায়; আবার যাঁহার জীবন ভগবানের দিকে চলিতেছে, তিনিও ভগবানের কাজ করিতে করিতে বিমল আনন্দ-সুধা সম্ভোগ করিতে থাকেন। কলিকাতা হইতে শান্তিপুর যাওয়ার সময়ে নৌকা চলিতেছে কিনা কিরূপে জানিতে পারি?—না, পথের স্থানসকল, গ্রামসকল পথে পড়িবে, নৌকাখানা তাহার একটি একটি করিয়া ছাড়িয়া যাইবে, এরূপ করিতে করিতে শান্তিপুরে পঁহুছিবে। আর যদি পথের গ্রামসকল না দেখা যায়, কেবল কলিকাতাই পুনঃ পুনঃ দেখা যাইতেছে, এরূপ ঘটিলে নৌকা চলিতেছে না মনে করি; সেই প্রকার যাঁহার জীবন ধর্ম্মপথে চলিতেছে, তিনি নিত্য নূতন অবস্থা সম্ভোগ করিতেছেন—জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা লাভ করিতেছেন। আর তাহা না হইয়া যদি পূর্ব্বের মত প্রাণের একপ্রকার অবস্থাই থাকে, আমি পূর্ব্বেও যে প্রকার মিথ্যা কথা বলিতাম, এখনও তাহাই বলি, পূর্ব্বে যে প্রকার লোকের প্রতি বিদ্বেষ করিতাম, এখনও সেই প্রকারই করিয়া থাকি, পূর্ব্বেও যে প্রকার পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিতাম, এখনও সেইপ্রকার করি, তাহা হইলে আমি বিন্দুমাত্রও জীবনের লক্ষ্যের দিকে চলিতেছি না—কিছুমাত্র ধর্ম্ম হইতেছে না। উপাসনা করিতেছি, সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেছি, সৎকার্য্য করিতেছি, তাহাতে আনন্দও পাইতেছি, অথচ জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া অসত্য হইতে সত্যের দিকে, বিদ্বেষ হইতে প্রেমেতে পাপ হইতে পবিত্রতাতে যাইতেছে না, তাহা হইলে সে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ নহে' কাব্যাদিপাঠের আনন্দের ন্যায় সাময়িক ভাবুকতা মাত্র। এ অবস্থায় মনে করিতে হইবে আজিও আমার লক্ষ্য স্থির হয় নাই। যদি দেখি আমার ছেলেপিলেকে যেমন ভালবাসিতে পারিতেছি, অন্যকে তেমন পারি না, তাহা হইলেই জানিতে হইবে আমার জীবন-নৌকা কোথায়ও আবদ্ধ হইয়াছে, লক্ষ্য-পথে চলিতেছে না। আমি পথে হাজার চাকচিক্য দেখি, তবু আমি ভুলিব না, আমি আমার মার কাছে যাব—বাড়ীতে যাব। যাহার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে সেই যাবে।

পূর্ব্বকার আচার্য্যের লক্ষ্য স্থির না হইলে, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন না যীশুখৃষ্টের নিকটে দুইটী জেলে ধর্ম্মদীক্ষা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্দর জাল ভালবাসিতেন ; খ্রীষ্ট বলিলেন, "যদি তোমরা ঐ সুন্দর সুন্দর বোনা জাল জলে ফেলিয়া দিতে পার, তবে তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারি। আর একজন সম্ভ্রান্ত অভিমানী লোক খ্রীষ্টের নিকটে আসিলে সম্ভ্রান্ত-সমাজে হেয় হইতে হইবে বলিয়া, গোপনে রাত্রিতে আসিতেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ চাহিলে খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, "তোমার হইবে না।" সনাতন গোস্বামীর নিকটে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিলেন ; তিনি ব্রাহ্মণকে এক পরশমণি প্রদান করিলেন ; ব্রাহ্মণ ইহাতে বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি পরশমণি অপেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ লাভ না করিয়া থাকিলে কখনও এই মণি প্রদান করিতে সক্ষম হইতেন না। তখন ব্রাহ্মণ সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন, "প্রভো, এমন কি রত্ন আপনি পাইয়াছেন, যাহাতে এই পরশমণি আপনার নিকট অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে ? আপনি আমাকে সেই রত্ন প্রদান করুন"। সনাতন গোস্বামী বলিলেন, "ঠাকুর, যদি তুমি তোমার হস্তস্থিত এই পরশমণি যমুনার জলে ফেলিয়া দিতে পার, তবে সেই রত্ন দিতে পারি।" বলিবামাত্র ব্রাহ্মণ হস্তস্থিত রত্ন জলে নিক্ষেপ করিলেন, তিনিও তাঁহাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, লক্ষ্য স্থির না হইলে মানুষ কখনও ধর্ম্মপথে চলিতে পারে না। লক্ষ্যস্থানে যাইবার জন্য পিপাসা না হইলে, ধর্ম্ম-কার্য্য করিয়া কখনও ধর্ম্মের গৌরব বুঝিতে পারিবে না। এইজন্যই আচার্য্যগণ আগে জমি ঠিক করিয়া পরে বীজ বপন করিতেন।

আমি এ সংসারে চিরকাল থাকিবনা, সংসার আমার চিরদিনের অবলম্বন নহে। পরলোকে অনন্তকাল আমি কি অবলম্বন করিয়া বাস করিব, ইহা মনে না হইলে বৈরাগ্য আসিবে না। যদি বাস্তবিক পরমেশ্বর—সত্য, সুন্দর, মঙ্গলময় দেবতা—আমার লক্ষ্য হন, তবে আমি তাঁহাকে না পাইয়া স্থির থাকিতে পারি না। সংসারের ধন-রত্ন সমস্ত পাইলেও পরিতৃপ্ত নহি। সকল সংসার দিয়াও যদি তাঁহাকে পাই, এই অনিত্য দিয়া যদি সেই নিত্য সারাৎসারকে লাভ করিতে পারি, তবে আমার মত চতুর বণিক আর কে আছে ?

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ"। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের, মানবজীবনের লক্ষ্য বুঝিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ শরীর ও মনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া শরীরকে তদুপযোগী কর, পরে আত্মার উদ্দেশ্য—জ্ঞানের উন্নতি ও সকল পদার্থের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ—সম্পাদন করিয়া সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবানের কার্য্য সাধন করিতে করিতে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইবে। সংসার যেমন নদী, জীবন নৌকা, প্রত্যেক কার্য্য দাঁড়, ভগবান্ গম্যস্থল।

যেরূপ কলিকাতা হইতে শান্তিপুরে পঁহুছিলে দেখা যায়, যেসকল লোক কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিল, কেহ ষ্টীমারে, কেহ বজরাতে, কেহ ডিঙ্গি নৌকায়, কেহ গহনার নৌকায় চড়িযাছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র মুটে মজুর ছিল, তাহারা সকলেই শান্তিপুরে পঁহুছিযাছে। সেই প্রকার মানবের লক্ষ্য পরমেশ্বর লাভ করিলে দেখা যায় যে, সকল মনুষ্যই নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া, কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার, কেহ বা মুটেগিরি করিতে করিতে, নানা উপায়ে আসল সেই লক্ষ্য পরমেশ্বরকে লাভ করিযাছেন। যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি দেখিবেন মহাত্মা প্রভৃতির ন্যায় লোকই হউন, আর মুটে মজুরই হউন, সকলেই সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে রহিয়াছেন। ইহলোক তাঁহার ক্রোড়েই দেখিবেন, পরলোকও তাঁহার ক্রোড়েই দর্শন করিবেন। ইহলোক হইতে লক্ষ্যস্থলে গেলেও পরলোক দেখা যায়, পরলোক হইতেও লক্ষ্যস্থলে গেলে ইহলোক দৃষ্ট হইযা থাকে। সেখানে "পরিপূর্ণমানন্দং"। ইংরাজ, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, সব তাঁর ক্রোড়ে। কত মুনি, কত ঋষি, কত ফকির, যিশুখ্রীষ্ট, নানক, সব তাঁর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর আমাদের লক্ষ্য নাই। এই লক্ষ্যে যাইতে হইবে। প্রতিদিন অগ্রসর হইতে হইবে। যদি প্রতিদিন এগুতে পারি, তবেই লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিব "পরিপূর্ণমানদং" ধ্বনি উত্থিত হইবে, আমাদের জীবন মধুময় হইবে।

ঢাকা—পূর্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির

১২৯৩ সন, ৪ঠা মাঘ।

রাজর্ষি জনকের কাছে কতিপয় ঋষি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রজাপালন ও যোগসাধন এই উভয় কার্য্য একত্রে কিরূপে করেন ? যোগীরা বলেন, চিত্তের সংযম সমাধি না হইলে যোগ সাধন হয় না। আপনি গৃহী হইয়া, রাজা হইয়া, কিরূপে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করেন ? কত শত প্রজা লইয়া কার্য্য করিতে হয় ; এই রাজকার্য্যের মধ্যে কিরূপে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া ভগবানে অর্পণ করেন, জানিতে আমাদের বড় কুতুহল জন্মিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "আপনারা ঋষি, সকলই জানেন, তবু দয়া করিয়া যখন আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তখন আমি যাহা জানি তাহা অবশ্য বলিব। এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ সকলই তাঁহার,—প্রভু পরমেশ্বরের। এই গৃহ, অট্টালিকা, দাস দাসী, অশ্ব, গজ, নানাপ্রকার ঐশ্বর্য, যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ কিছুই আমার নয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কার্য্য সম্পন্ন করি। সমস্তই পরমেশ্বরের, তাঁহারই মহিমার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। আমি তাঁহারই কার্য্য করিতেছি, তিনিই আমার দ্বারা কার্য্য করাইতেছেন। আমি দাস মাত্র, প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা তদনুসারে চলি, এই ভাবে তাঁহার কাজ করিয়া থাকি। যাহা কিছু সবই তাঁহার ;—এটী কথা নয়, বাস্তবিক আমার জ্ঞান, বিশ্বাস। যাঁহার রাজ্য এ বিশ্বসংসার, তাঁহাকে অন্বেষণ করি, তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া, সদাই তাঁহার নিকটে থাকিয়া দর্শন করি, এই মাত্র অভিলাষ। যে একবার আমার প্রভুর স্বরূপ দেখিয়াছে, সে আর কোন বস্তুতে আমোদ পায় না। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন এতে ওতে তাতে আমোদ করিতে পারে, কিন্তু একবার সেই অনন্ত আনন্দ দর্শন করিলে আর পৃথিবীর কিছুতেই লোক সুখ পায় না। যাহা কিছু করে, তাহাতেই তাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে। তিনি অনন্ত বিশ্বসংসারের প্রভু, তিনি সমস্ত আনন্দের মূল, তাঁহাকে যতদিন চিনিতে না পারি, ততদিন সংসারে থাকিয়া যোগসাধন করা কঠিন। তাঁহারই কৃপাতে সব হয়। আমার বোধ হয়, সংসারে প্রকৃত উপাসনা ব্যতীত কেবল "আমি" "আমি" বলিয়া, মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না। যখন একবার তাঁহাকে দেখে তখনই নিশ্চিন্ত হয় ; নতুবা পৃথিবীর সুখ, ধর্ম্ম কিছুই লাভ করিতে পারে না ; কেবল কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ-জরা-শোক-দুঃখে জীবন পরিপূর্ণ হয়। যদি সুখী হইতে চাও তবে সমস্ত তাঁহার, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া সংসারে থাক। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, বিধাতা, একমাত্র প্রভু কোথায় এইরূপ অন্বেষণ কর ; তাঁহারই যোগ, ধ্যান, তপস্যা, ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাক। তিনি কোথায় ? কোথায়

তিনি ? কেবল কথায় নয়, প্রাণের সহিত সরলমনে অন্বেষণ কর। যতদিন না সেই সত্যদেবতার দর্শন পাও, ততদিন প্রাণ অস্থির থাকিবে, বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় অস্থির হইবে। যে তাঁহার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, তিনি তাহাকে দর্শন দেন। তখন আর অন্য বিষয়ে আসক্ত হওয়া অসম্ভব। এই অবস্থা হইলে তবে সংসারে ধর্ম্মাচরণ হইতে পারে, না নইলে কেবল ধর্ম্মকথা শুনিয়া, পড়িয়া, বলিয়া হয় না।"

জনক যাহা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক সার কথা। যত দিন পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন ধর্ম্ম হয়ই না, ততদিন কেবল ভাবের কথা, অনুমানের কথা লইয়া থাকি। যদি যথার্থই তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা হয়—কেবল মুখে নয় ; এই বলিলাম, একবার দুইবার হায় হায় করিলাম, আবার আহার, পান ও নিদ্রায় সুখে কাটাইলাম, তাহা হইলে হয় না—বাস্তবিক যদি বিকারী রোগীর পিপাসার ন্যায় মনের ব্যাকুলতা হয়, "দাও জল, দাও জল, একবিন্দু দাও, আরও দাও" এই রকম করিয়া ডাকিতে পারি, শুধু "জল" এ কথায় তৃপ্ত না হই ; রোগী কি কল্পনার জলে, কথার জলে, "জল" শব্দে শীতল হয় ? কথাতে কি তৃষ্ণা দূর হয় ? সত্য জল চাই, আবার আমার রসনায় তাহার যোগ হওয়া চাই—এইরূপ ব্যাকুলভাবে যদি চাহিতে পারি, তবেই পাব, নইলে ডাকামাত্র সার। আমি ডাকি তাঁকে, চাই অন্য জিনিষ, তাতে হ'বে কেন ? দাও পরমেশ্বর, দাও আমাকে ; আমি তোমায় চাই, তোমাকে আমায় দাও ; আর কিছুই কিছু নয়, বন্ধু-বান্ধব আপনার কেহই নয় ; একাকী জন্মিয়াছি, একাকী রহিয়াছি, একাকী যাইব ; তুমি আমার, আমি তোমার। এতদিন মনে করিতাম আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সব আছে, কিন্তু কৈ ? প্রাণের মর্ম্মকথা, অন্তরের গূঢ় বিষয়, হৃদয়ের ব্যথা ত কেহই বুঝে না—কেউ না। বরং লোকে আরও আঘাত দেয় ; ব্যথার উপর ব্যথা, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেয়। এই অবস্থাতে তোমা ভিন্ন আমার ব্যথার ব্যথী আর কোথায় পাই ?

আমার প্রভু, আমার প্রভু দীনবন্ধু দয়াল হরি ; যখন যা ব'লে ডাকি, তখন "এই যে আমি, সন্তান—এই যে, বল কি, ডাকছ কেন ?" এই বলিয়া উপস্থিত হন। যত ব্যাকুল হ'য়ে, যতই অসহায় হ'য়ে তাঁকে ডাক্‌তে পারব, ততই তিনি সম্মুখে স্পষ্ট দেখা দিবেন। অখন আমার সর্ব্বস্বধন হৃদয়রতনকে নিকটে, প্রাণের মধ্যে, অপূর্ব্বভাবে প্রকাশিত দেখিয়া ধন্য হই। "এই যে, এই যে, এই যে, এই সম্মুখে, আমার প্রাণের ভিতর, অপূর্ব্ব! সত্য! সত্য! সত্য!! দেখেছি, ধ'রেছি ; আর ফাঁকি দিয়ে ছাড়াবার যো নাই,—সত্য, যথার্থ। ছেলেরা যেমন বলে "এই ভাই, খেলাবার নয়—সত্যিকের জিনিষ"—তেমনি বাস্তবিক। আগে ভাবিতাম, ধর্ম্ম পুস্তকের লেখা, এখন দেখি সত্য কথা। একবার এই সত্যের রেখামাত্র ধরিতে পারিলে হয় ; আর কিছুতে সংসারে

সুখী ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবার উপায় নাই। হাজার ভজন সাধন করি, হাজার বলি, হাজার উপদেশ দিই, প্রার্থনা করি, উপাসনা করি, অন্তরের মধ্যে কিন্তু অন্য একটি দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়া থাকি। এইরূপে যতক্ষণ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে না পারি, ততক্ষণ অন্য বস্তুর আসক্তি ঘুচিবে না। এইজন্য তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হয় কিনা ভাল করিয়া দেখা উচিত। একটু কিছু ধর্ম্ম লাভ করিলাম, দুটা কথা বলিতে শিখিলাম, তাহাতে কিছু হইবে না।

সংসার এইজন্যই আমাদের পক্ষে ক্লেশের কারণ হয়। এই ধনজনে পূর্ণ হইয়া কত আমোদ করিতেছি, আবার তাহাদের বিচ্ছেদে শোক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এই সুখ এই দুঃখ, এই সুস্থতা এই রোগ, আজি শান্তি, কালি ঘোর অশান্তি, এইরূপে সংসারে কেবল কষ্টেই দিন কাটাইতে হয়। আর তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে, সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে এ সংসারই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র হয়। জনকের মত প্রত্যেকেই আমরা সংসারী হইয়া যোগ সাধন করিতে পারি। ধর্ম্মকে আমরা পোষাকী কথা মনে করি, এভাবে হয় না। সময়ে সময়ে ধর্ম্মের কথা কহিলাম, ধর্মের পোষাক পরিলাম, আবার পরক্ষণেই যেই অধার্ম্মিক, সেই অধার্ম্মিক, যেই সাংসারিক সেই সাংসারিক ; তাহা হইলে হইবে না। যেমন শোণিত আমার সর্ব্ব শরীরে বহিতেছে, তেমনি ধর্ম্ম যদি সমস্ত হৃদয়কে, আমাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার না করে তাহা হইলে শুধু পোষাকীভাবে অন্বেষণ করিয়া কি শান্তি পাওয়া যায় ? লোককে দেখাইবার জন্য, লোকের নিকট সাধু ভক্ত বলিয়া প্রশংসা লইবার জন্য যাহা করি, তাহাতে কি ধর্ম্ম হয় ? এইরূপেই কপটতা আসে। প্রাণের মধ্যে, অন্ধকারে ব'সে যেন চিন্তা ক'রে দেখি, আমার প্রার্থনা কি কবি-কল্পনা, না সত্য ? চাই কি ? কি অন্বেষণ করি ? এই মুহূর্ত্তেই যদি মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে কি বলি—সংসারের কোন বস্তু চাই না, ঈশ্বরকেই চাই।"—এই কথা বলিতে পারি কি ? তা' যদি পারি, তবে নিশ্চয় রাজর্ষি জনকের মত প্রত্যেকেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। বাস্তবিক অনেক সময় লজ্জা বোধ হয়। আমি চাই টাকা, মান, সম্ভ্রম, যশ ইত্যাদি, আর মুখে বলি "ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম"। লজ্জা বোধ হয়, ঘৃণা বোধ হয়। ধর্ম্মের নামে লোকের নিন্দা, ঘৃণা ও অবিশ্বাস আনিতেছি। আমাকে দেখিয়া লোকে বলে, ধর্ম্মেতে কিছু নাই, এ ব্যক্তি পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, কিন্তু আপনার জীবনকে পরিবর্ত্তন করে না—আপনার ষোল আনা বজায় রে'খে ধর্ম্ম ক'রতে চায়। এইরূপে আমার কাজে কেবল ধর্ম্মের উপর কলঙ্ক আসছে। নাস্তিকেরা গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "দেখাও তোমাদের ও আমাদের জীবনে কি কি প্রভেদ ? আমরাই বা কি জীবন কাটাই, তোমরাই বা কি জীবন কাটাও ? কেবল বৃথা উচ্চৈঃস্বরে

'ধর্ম্ম' ধর্ম্ম'" করিতেছ। বাস্তবিক বরং নাস্তিক হব সেও ভাল, তবু মিথ্যা "ধর্ম্ম' ধর্ম্ম'" করব না। আপনার নামে ডুবে যাই সেও ভাল, কিন্তু আমার কথায় ধর্ম্মে' কলঙ্ক আস্‌বে, আমার জীবন দেখে লোকের ধর্ম্মে' অবিশ্বাস হবে, এ অপেক্ষা অপরাধ আর কিছুই নাই। তাই বলি বড় কঠিন সংসারে ধার্ম্মি'ক হওয়া, ধর্ম্ম' করা বড় কঠিন, বড় কঠিন। একটু যশ বা প্রতিপত্তির ইচ্ছা, একটু অবিশ্বাস, একটু প্রদর্শ'নের ভাব যদি থাকে, তবে হ'ল না, কিছু হবে না, বরং ভয়ানক ফল ফল্‌বে। তার চেয়ে ডুবে' মরা সেও ভাল, তথাপি এরকম ক'রে ধর্ম্মে'র অনিষ্ট কর্‌ব না। "পরমেশ্বর সত্য" একথা প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক ভাবে, শরীরে, মনে, সর্ব্বাঙ্গে, সমস্ত জীবনে বল্‌বে ; নইলে হস্তপদ স্তব্ধ হউক, জিহ্বা নীরব থাকুক ; পরমেশ্বরের নাম যেন বৃথা উচ্চারণ না করি। যে নামে পাতকীর উদ্ধার হয়, সেই নাম যেন সত্যভাবে উচ্চারণ করিতে পারি। রসনা যেন সত্যভাবে তাঁহাকে ডাকিতে পারে, এই প্রাণের কামনা।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

১২৯৩ সাল, ৭ই মাঘ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের উৎসবে বক্তৃতা।

অতি পূর্ব্বকালে পূজার পূর্ব্বে বোধনের অনুষ্ঠান হইত। তখনকার যেসকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, তৎকালের পূজাকারীরা যখন বিশেষরূপে অথবা কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন, সর্ব্বদাই পূজার পূর্ব্বে সকলে একত্রে মহাশক্তির, মহাবিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বোধন করিতেন। এক মহাশক্তি সমস্ত চরাচরের স্রষ্টা, সকলের কর্ত্তা, সকলের কারণ, সকলের প্রাণ, জীবন ও আশ্রয়। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন কিন্তু তাঁহার প্রকাশ কোথায়? কল্পনা নয়, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ আবির্ভাব কোথায়? যাঁহার শাসনে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, সেই এক, অদ্বিতীয় পুরুষ; তাঁহার বোধন না হইলে, প্রত্যক্ষ দর্শন না হইলে, তাঁহার পূজা করিতেন না। শস্যে, বৃক্ষে, লতায় সকল পদার্থেই অগ্নি আছে সত্য, কিন্তু প্রকাশ না হইলে, ঐ অগ্নির বোধন না হইলে, তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। সর্ব্বত্র বায়ুতে জল আছে, কিন্তু ঐ জলের বোধন না হইলে, সুধু বায়ুস্থিত জলে কোন কাজ হয় না। মৃত্তিকাতে রস আছে, কিন্তু ঐ রসের প্রকাশ না হইলে বৃক্ষলতাদি কিছুই হয় না। এইরূপে সকল স্থানেই সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে, জীবনরূপে একমাত্র স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, পরব্রহ্ম রহিয়াছেন। তিনি আদিশক্তি, পরাশক্তি, কোথায় না বিরাজ করিতেছেন? কিন্তু তাঁহার বোধন কোথায়? এখানে আছেন বলিলেই হয় না, বোধন চাই। এইজন্য তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া সমস্বরে বোধন করিতেন। যতক্ষণ প্রকাশিত না দেখিতেন, বাণী শ্রবণ না করিতেন, ইষ্টদেবতা আসিয়াছেন প্রত্যক্ষ না করিতেন, ততক্ষণ পূজা করিতেন না। এই বোধন সে সময়ে একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। প্রতিগৃহে প্রতিদিন কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এই বোধন করা হইত। এক্ষণে কেবল দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই ইহার কথা শুনা যায়।

আমরা যাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি, সেই মহাশক্তি বাস্তবিক চরাচরে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন। সত্যই এখানে, জলে, স্থলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, চরাচরে, সর্ব্বস্থানে—আমার রসনায়, অস্থিতে, মাংসে, শোণিতে—আমার চারিদিকে ভিতর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু বোধন কৈ? শোনা কথা, পাঠকরা কথা, একটা সংস্কারমাত্র বলিতেছি। বোধন—সত্য বোধ করা। পরিস্কাররূপে তাঁহার ভাব, জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম না হইলে পূজা হয় না। যে পূজা দ্বারা পাপ তাপ দূর হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়, মানুষ দেবতা হয়, সে

পূজা বোধন না হইলে হয় না। বাহিরের আয়োজন করি, নানা উপকরণ সংগ্রহ করি, প্রকৃত পূজা তাহাতে হয় না। সকলে যদি একপ্রাণে একভাবে তাঁহাকে চাই, তবেই হয়। প্রকাশ না হইলে পূজা হইবে না, পরোক্ষভাবে পূজা হইবে না। যদি বাস্তবিক আমাদের প্রয়োজন হয়—চাই যদি, যদি কেবল প্রণালী না হয়—বর্ষে বর্ষে উৎসবের উদ্বোধন করিয়া থাকি, অতএব করি, এরূপ যদি না হয় তাহা হইলে বোধন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ; উপাস্য ইষ্টদেবতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইব। চারিদিকে, শরীরে, অস্থি-মাংসের মধ্যে, সেই মহাশক্তি প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন ; তিনি অন্ধশক্তি নন্, তিনি পুরুষ, ব্যক্তি ; তিনি সত্য, তাঁহাকে আস্বাদন করা যায় ; হৃদয়ে ধরা যায় ; তিনি আনন্দরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানী ; তিনি সমস্ত জগতের কর্তা বিধাতা, সমস্ত শক্তিকে স্বয়ং পরিচালনা করিতেছেন, এমন পুরুষ, এমন প্রকৃতি, ব্যক্তি তাঁহাকে বোধন করি। আজ বিশেষভাবে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য, সম্ভোগ করিবার জন্য, প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা হওয়া চাই, তবে তাহা পূর্ণ হইবে, হইবেই হইবে। অতএব অতি সাবধানে এই পবিত্র কার্যে আজ আমরা প্রবৃত্ত হই। সকলের হৃদয়ে এই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হউক, ইহা লইয়া অদ্যকার উদ্বোধনে আমরা প্রবৃত্ত হই।

ঢাকা, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্র-সমাজের অধিবেশনে বক্তৃতা। ১২৯৩ সন, ২৪শে অগ্রহায়ণ।

পরকাল।

আমাদের দেশে কি অন্য দেশে, যে স্থলেই মানুষ বাস করে, তথায়ই "পরকাল" ঠিক এই শব্দটি না থাকিলেও এই পরকালের ভাব বর্ত্তমান আছে। মৃত্যুর পর মানুষ থাকে, এ ভাব সর্ব্বত্র সাধারণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ বিষয়টি সকলের মধ্যে প্রচলিত থাকার অবশ্যই বিশেষ গূঢ় কারণ আছে, সন্দেহ নাই।

আমরা যেসকল পদার্থের বিষয় শিক্ষা করি, সেই সকল পদার্থ বাহিরে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা তাহা অবগত হই, সে অন্তরের বস্তু। চন্দ্র, সূর্য্য, পাহাড়, সমুদ্র এ সকল বাহিরে স্থিত, যে জ্ঞান দ্বারা এ সকলের তত্ত্ব অবগত হই, তাহা আত্মার ভিতরে অবস্থিত। পশু-পক্ষীর মধ্যে এইরূপ জ্ঞান দৃষ্ট হয় না। তাহাদের সংজ্ঞাবোধ মাত্র আছে; কোন বস্তুর কি ব্যবহার, সেই পদার্থের সহিত অন্যান্য পদার্থের কি সম্বন্ধ, তাহা তাহারা অবগত নহে; তাহারা কেবল তাহাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য, পানীয়, ঔষধের বিষয় বুঝিয়া থাকে। সেই বোধও ভগবান্ জন্মাবধিই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; উহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে; শিক্ষাদ্বারা সেই বোধ-শক্তির উন্নতিও দেখা যায় না। মনুষ্যের জ্ঞান শিক্ষাসাপেক্ষ ও ক্রমোন্নতিশীল।

মনুষ্যের জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, একটি বহির্মুখ জ্ঞান, আর একটি অন্তর্মুখ জ্ঞান। যে জ্ঞানের দ্বারা বহির্জ্জগতের পদার্থসমূহের বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহার নাম বহির্মুখ জ্ঞান। এতদ্বারা বাহিরের পদার্থ সকল জানিয়া, তাহাদের তারতম্য বুঝিয়া পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করা যায়। যাহার বস্ত্র পরিধান করে না, এরূপ অজ্ঞ লোকেরও এই জ্ঞান লাভ করিবার অধিকার আছে। জ্ঞানের আর একটী দিক্ অন্তর্মুখ। যেমন একটী বৃক্ষের মৃত্তিকার নিম্নে এক ভাগ থাকে, আর এক ভাগ বাহিরে থাকে—ভিতরে মূল, বাহিরে শাখাপ্রশাখা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানেরও এক ভাগ বাহিরে, আর এক ভাগ অন্তরে সংস্থাপিত রহিয়াছে। অন্তরের মধ্যে যে যে সত্য নিহিত আছে সে সকল যে জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষা করি, তাহাকে অন্তর্মুখ জ্ঞান বলে। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, সুনির্ম্মাতার প্রশংসা, জগতের অস্তিত্ব, আত্মার অস্তিত্ব, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান, এ সকল অন্তর্মুখ জ্ঞানের কার্য্য। এই সকল জ্ঞান যে প্রকার স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক আত্মাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইপ্রকার পরকালের জ্ঞানও আপনাআপনি মানবপ্রাণে

বিদ্যমান রহিয়াছে। বহির্ম্মুখ জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা তাহার যে প্রকার উন্নতি হয়, অন্তর্ম্মুখ জ্ঞানের আলোচনা দ্বারাও সেই প্রকার উন্নতি হইয়া থাকে। বাহিরের পদার্থ গ্রহ-নক্ষত্রাদির জ্ঞান যেমন জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদির আলোচনাসাপেক্ষ, সেই প্রকার অন্তরের সত্য সকল জানিবার জন্য অন্তর্ম্মুখ জ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যক, তদ্দ্বারাই সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানা যায়। কৃতজ্ঞতা, দয়া ও অন্যান্য যে যে ভাব, ইহার সকলই হৃদয়ে আছে; অন্তর্ম্মুখ জ্ঞানের যত আলোচনা করিবে, ততই সেই সকল অন্তরের ভাব ভালরূপ জানিতে পারিবে। অসভ্য জাতি, যাহারা লেখাপড়া কিছুমাত্র জানে না, তাহারাও পরলোক স্বীকার করিয়া থাকে। কুকি, গারো, অন্যান্য দেশীয় অসভ্য লোকেও ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মানব প্রাণে এই পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্বাভাবিকই আছে, তবে শিক্ষাদ্বারা উহা উজ্জ্বল হয়, নতুবা আভাষমাত্র বুঝিতে পারে। পৃথিবীর সমুদয় জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই পরলোকের কথা আছে। আমাদের দেশে, মৃত-ব্যক্তির আত্মীয়গণ যে "ফেলে গেলে", "কোথায় গেলে" বলিয়া ক্রন্দন করেন, ইহার কারণ কি? মৃত-ব্যক্তির শরীর ত আছেই, তবে ক্রন্দন কেন? না, তাঁহারা মনে করেন শরীরের মধ্যে যে বর্ত্তমান ছিল, সে আর এখন ঐ শরীরে নাই। এই জন্যই শরীরকে অপবিত্র জ্ঞানে গোবর ছড়া দেয়। এই কথা দ্বারাই পরলোক সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অনেকে বলিতে পারেন, এতেই কি পরলোকেব প্রমাণ হইল? না, প্রমাণ আছে কি না দেখা যাউক।

প্রথমতঃ মৃত্যুটা কি? মৃত্যু—মরিয়া যাওয়া কি? মৃত্যুর পর শরীর ত থাকে, তবে মরণ কি? ? না, চেতনা থাকে না, জড়-শরীর মাত্র থাকে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত, চেতন ও জড়। যে সকল পদার্থের চিন্তাশক্তি আছে, স্বেচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, স্মৃতি আছে, সে সকল পদার্থ চেতন; আর যাহাদের এ সকল কিছুই নাই, সকল বিষয়ে অক্ষম, তাহারা জড়। চার্ব্বাক প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ, আধুনিকও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চেতন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, জড়পদার্থের সংযোগেই চেতনা একটি রাসায়নিক গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, যেমন হরিদ্রা পীতবর্ণ এবং চুর্ণ শ্বেতবর্ণ, উভয়ের মিশ্রণে নূতন একপ্রকার রঙ্গের উৎপত্তি হয়; পারদ ও গন্ধকে মিলিত হইয়া যে হিঙ্গুল জন্মে, তাহাতেও এক প্রকার নূতন বর্ণ উদ্ভূত হয়; সেইরূপ পূর্ব্বে জড়পদার্থে চেতনা না থাকিলেও, তাহাদের মিশ্রণে চেতনা একপ্রকার গুণ জন্মিয়া থাকে, ইহা অযৌক্তিক হইবে কেন? কিন্তু যাঁহারা এ মতের বিরোধী, তাঁহারা বলেন, যে সকল পদার্থ মিশ্রিত করিবে তাহাদের মূলে একেবারে যাহা নাই, সংযোগে নূতনরূপে তাহার কিছুই জন্মিতে পারে না। প্রথমতঃ বর্ণ জড়পদার্থের একটী গুণ; দ্বিতীয়তঃ

হরিদ্রা ও চুণ, পারদ ও গন্ধক মিলাইলে যে নূতন বর্ণ সমুৎপন্ন হয়, সংযোগের পূর্ব্বেও ঐ সকল মূল পদার্থে ঐ ঐ বর্ণের আভাষ ছিল, তাহা আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র; কিন্তু যাহা ছিল না তাহা জন্মে নাই, নূতন কিছুরও উৎপত্তি হয় নাই। শরীর জড়পদার্থের সংযোগে নির্ম্মিত। জড়পদার্থে চেতনাগুণ নাই, সুতরাং যে পদার্থে যে গুণ নাই, সংযোগে তাহা জন্মিতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত এই নিয়মানুসারে জড়পদার্থের সংযোগে চেতনা জন্মিতে পারিল না। যদি জড়পদার্থে চেতনা থাকিত বা সংযোগে উৎপন্ন হইত, তবে বৃহৎ বৃহৎ জড়পিণ্ডের—চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রের চেতনা নাই কেন? সুতরাং চেতনা জড়পদার্থের গুণ নহে; উহা জড়াতীত স্বতন্ত্র একটি পদার্থ, উহাকে আত্মা বলিয়া থাকে। মৃত্যুটা কি? না, শরীর যে সকল পদার্থে নির্ম্মিত তাহার বিয়োগ। যখন শরীরের পরমাণুসমূহ শিথিল হয়, তখন জীবাত্মা আর উহাতে থাকিতে পারে না। যেমন ঘরটী কি জানালাগুলি আমরা স্বেচ্ছামত ব্যবহার করি, আমি অর্থাৎ জীবাত্মা শরীরকেও সেই প্রকার স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মা জড় পরমাণুর সংযোগে জন্মে নাই, সুতরাং তাহার বিশ্লেষণও নাই। জড় পরমাণুও বিনষ্ট হয় না, কেবল বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই মৃত্যুর পরেও আত্মা ঠিক বর্ত্তমান সময়ের মত এই ভাবেই থাকিবে, অতএব পরকাল আছে।

দ্বিতীয়তঃ—পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য, সৃষ্টি যখন তাঁহার ইচ্ছা, তখন সৃষ্টিও নিত্য। বিনাশ সৃষ্টির বিরোধী, সুতরাং পরমেশ্বরের রাজ্যে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব। অতএব আত্মা চিরকাল থাকিবে, কাজেই পরকাল আছে।

তৃতীয়তঃ—মনুষ্যের প্রাণে কতকগুলি স্বাভাবিক সত্য আছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পরকালের ভাবও একটী; সুতরাং পরকাল আছে।

চতুর্থতঃ—পরমেশ্বর ন্যায়বান্, সুতরাং পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের দণ্ডদাতা। যদি দণ্ড ও পুরস্কারের ফল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ না হয়, তবে অবশ্যই তৎপরে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে; মৃত্যুর পরে আত্মা বর্ত্তমান না থাকিলে কর্ম্মফল কে ভোগ করিবে? সুতরাং আত্মার বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, অতএব পরকাল আছে। এই কর্ম্মফল অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ—মনুষ্যের অনন্ত জীবন, বাঁচিবার ইচ্ছা রহিয়াছে, পরমেশ্বর যে ইচ্ছা দিয়াছেন, তাহার চরিতার্থতাও বিধান করিয়াছেন। পিপাসা ক্ষুধা দিয়াছেন, পানীয় আহার্য্য বস্তুর ব্যবস্থাও আছে। অনন্ত জীবনের ইচ্ছাও যখন দিয়াছেন, তখন অনন্ত কাল বাঁচিবার ব্যবস্থা থাকাও সঙ্গত। সুতরাং মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকিবে, অতএব পরকাল আছে।

পরকাল কি? না, মৃত্যুর পরের সময়—পরবর্ত্তী কাল, যথা প্রাতের পরকাল বৈকাল। মৃত্যুর পরে আত্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যে স্থলে বাস

করে, তাহার নাম পরকাল। কেহ কেহ মনে করেন, পরকাল নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান ; কিন্তু যাঁহারা সত্যপ্রিয় তাঁহারা বলেন, যতদিন স্থানের বিষয় না জানিতে পারিব, ততদিন এ সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া কিছু অবধারণ করিতে পারি না। মৃত্যুর পরেও যে আত্মা থাকিবে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিবে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন ; স্থান সম্বন্ধে ঐকমত্য নাই। অনেক পুস্তকে পরলোক পৃথিবীর ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। আরব দেশীয় পুস্তকে পরলোক বর্ণনায় সেই দেশের প্রয়োজনীয় প্রস্রবণ ও মেওয়া প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষ কল্পিত হইয়াছে। যাঁহারা সুখাভিলাষী, তাঁহারা পরলোকে নানাপ্রকার সুখসেব্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পরে আত্মা, যত সকল নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহার প্রত্যেকটীতে ভ্রমণ করিবে ; আত্মা যেমন পৃথিবীর বিষয় শি া করে, সেইপ্রকার প্রত্যেক নক্ষত্রে নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রত্য সকল বিষয় শিক্ষা করিবে। ইহাকে লোকলোকান্তর-ভ্রমণ বলে। ইহার কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। মানুষ কি ? শরীর নয়, চেতনা। এই জীবাত্মা থাকে কোথায় ? জড় পদার্থ স্থান ভিন্ন থাকিতে পারে না, জীবাত্মা -চিৎপদার্থ, থাকে কোথায় ? না, পরমাত্মাতে থাকে। ইহকালেও তাই, পরকালেও তাই। তাহার আশ্রয় এখনও পরমেশ্বরের তখনও তিনি। তিনিই "পরলোক"। আমাদিগের মুনিঋষিরাও অনেকে এই শেষোক্ত কথা অর্থাৎ "ঈশ্বরই পরলোক" ইহা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পরলোকের সত্তা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই পরকালে বাড়ী-ঘর আছে কি না, একথা আমরা বলিতে পারি না, ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানও নহে, কেননা তাহা হইলে সকলেরই এই জ্ঞান থাকিত।

ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যখন পরমেশ্বর ন্যায়বান্ অথচ দয়ালু, তখন পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার ভোগ করিতেই হইবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই যে অমনি কর্ম্মফল আরম্ভ হয়, তাহা নহে ; যে মুহূর্ত্তে পাপবোধ ও পুণ্যবোধ হইয়া থাকে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ফলভোগ আরম্ভ হয়। আমরা পাপ দুই প্রকারে করিয়া থাকি—এক প্রকার শরীরের দ্বারা, আর এক প্রকার আত্মার দ্বারা। শারীরিক পাপে শরীরের রোগ ও যন্ত্রণা হইয়া থাকে, আত্মার পাপে প্রাণে জ্বালা জন্মে। পরমেশ্বর এই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন কেন ? না, তিনি ভাল করিবার জন্য মাতাপিতার ন্যায় শাসন করেন। মানুষের এই পরকালে ও কর্ম্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকাতে, মানুষ পাপ কর্ম্ম করিয়া ফেলে।

পরকালের বর্ণনায় অনেক পুস্তকে স্বর্গ নরকের বহুল বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে মহাভারতের একটী গল্প বলিতেছি। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাইয়া দেখিলেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। তখন যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষি, অর্জ্জুনাদি কোথায় অবস্থান করিতেছেন ?" অতঃপর নারদ যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনাদির নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথাকার

দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া যুধিষ্ঠির যখন চলিয়া যাইতেছেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার হইতে লাগিল, "মহারাজ, থাকুন, আপনার আগমনে আমাদের সুখ হইতেছে"। তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ?" উত্তর হইল, "আমি অর্জ্জুন, আমি ভীম, আমি নকুল, আমি সহদেব।" যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহারা কখনও কোন পাপ করে নাই, যুদ্ধে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়াছে, তথাপি ইহাদিগকে কেন নরকে অবস্থান করিতে হইল ?" তখন নারদ বলিলেন, "তোমার ভ্রাতারা কি কখনও নরক ভোগ করিতে পারে ?" ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যেমন 'অশ্বত্থামা হতঃ' বলিয়া ছলনা করিয়াছিলে, তোমারও সেইপ্রকার ছলে নরক দর্শন্ করিতে হইল"। নারদ বলিলেন, "স্বর্গ নরক আর কিছুই নহে, মনের অবস্থা মাত্র। তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীতে অবগাহন কর, তোমার ত্রিগুণ নষ্ট হইলে, সব চলিয়া যাইবে"। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আত্মগ্লানি নরক—আত্মপ্রসাদই স্বর্গ। আবার পুরাণেও স্বর্গ নরকের বর্ণনা আছে। পুরাণের ও কোরাণের বর্ণনা একই প্রকার। বাইবেলে, বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও স্বর্গ নরকের এক এক প্রকার বর্ণনা আছে। মনুষ্যের স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, পরকাল জ্ঞান, কর্ম্মফল ভোগের জ্ঞান, এবং বাঁচিবার ইচ্ছা তাহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু পরলোক কি প্রকার, তাহার জ্ঞান কিছুই নাই। যতদিন ভগবানের ইচ্ছা হয় আমাদিগকে এই পৃথিবীতে রাখিবেন, ততদিন এখানেই থাকিব ; পরে যেখানে যাইবার যাইব। মোট কথা—আমাদের ধ্বংস নাই। মনুষ্যের কেন, একটি পরমাণুরও ধ্বংস নাই। সুতরাং পরলোক লইয়া তর্ক বৃথা।

বহির্মুখ জ্ঞানের দ্বারা বাহিরের বিষয় জানা যায়, অন্তর্মুখ জ্ঞানের দ্বারা ভিতরের নিহিত সত্য অবগত হওয়া যায়। পরকাল, এটি একটি অন্তর্নিহিত সত্য, সকল মনুষ্যই এটী স্বীকার করিয়া থাকে। ইহা যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা অন্যের নিকট শুনিয়া কেহ স্বীকার করে, তাহা নহে ; যে সকল জাতির কোন লিখিত ভাষা নাই, কোন সভ্য জাতির সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত ও নাই, তাহাদের মধ্যেও এই পরকালের জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন একজন ফকির অনেকদিন কুকি জাতির মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগের মধ্যে পরকাল জ্ঞানের সত্তা যে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বলা যাইতেছে।—ইংরেজ রাজ্যে যে সকল কুকি বাস করে. তাহারা পক্ক মাংস আহার করে, ইহাদিগকে পাকা কুকি বলে ; আর যাহারা পাহাড়ে বাস করিয়া কাঁচা মাংস আহার করে, তাহাদিগকে কাঁচা কুকি বলে। ফকির সাহেব যখন সেই পাহাড়ের কুকিদিগের নিকট যান, তাহারা তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তিনি একজন স্ত্রী-কুকির সাহায্যে রক্ষা পান। তিনি দেখিলেন, ঐ কাঁচা কুকিদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার শবের সহিত পাকা কুকি কাটিয়া প্রদান করা হইয়া থাকে।

তাহাদের বিশ্বাস ঐ শবের সঙ্গী কর্ত্তিত পাকা কুকি সকল পরকালে তাহার দাসত্ব করিয়া থাকে। জাপানের নিকটবর্ত্তী কোন একটি দ্বীপে একজন সাহেব জাহাজ হইতে নামিয়া দেখিয়াছিলেন তত্রত্য অসভ্য জাতির মধ্যে কতকগুলি অসভ্য উলঙ্গ লোক, এক বৃদ্ধাকে লইয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। সাহেব তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "এ বৃদ্ধা মা, এর অনেক বয়স হইয়াছে, তাই একে পরলোকে পাঠাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি। ইনি যেমন আমাদিগকে দশ মাস পেটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রকার ইহাকে পেটের মধ্যে রাখিয়া দিব। তাই ইহাকে সকলে মিলিয়া কাটিয়া আহার করিব।" একথা তাহারা অতি গম্ভীরভাবে বলিল। সাহেব তাহাদিগকে একার্য্যে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেকপ্রকার বুঝাইলেন। তাহারা বলিল—"কেন ? ইহার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই এখানে কষ্ট পাইতেছে ; পরলোকে যাইয়া থাকিলে বেশ সুখে থাকিতে পারিবে।" আর একজন সাহেব পরকাল সম্বন্ধে সকল জাতির মত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, যে পরলোক সম্বন্ধে নানা জাতীয় লোকে নানা প্রকার কল্পিত মত বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন নরকে ঘোর অন্ধকার রহিয়াছে, ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, নানা প্রকার ময়লাপূর্ণ কুণ্ড সকল রহিয়াছে—ইত্যাদি। আবার ইহারা স্বর্গে নানা প্রকার সুখ-সম্ভোগের কথাও লিখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকের বর্ণনা সকল জাতির সমান নহে। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সকল জাতীয় লোকের এক প্রকার নহে, কিন্তু পরকাল আছে এবং কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, এসম্বন্ধে সকল জাতিরই এক মত। যাহা সত্য, তাহা সার্ব্বভৌমিক, কল্পনা সার্ব্বভৌমিক নহে। প্রায় দেখা যায় যে, আপনার রুচি ও মতে সকলের রুচি ও মত গঠন করিতে যাইয়া দলাদলির, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু সত্যে তাহা হয় না। বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষটী রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখা সমস্তই ঐ বীজে বর্ত্তমান আছে ; বীজের মধ্যে যাহা নাই তাহা কখনই হইবে না। যদি আমি মনে করি, নারিকেল-গাছ হইতে চাঁপাফুল বাহির করিব, সেটি হইবে না, যাহার মধ্যে যাহা নাই, তাহার মধ্য হইতে তাহা বাহির হইবে না। সেইরূপ ভগবান্ সকল মানুষের প্রাণেই সত্য দিয়াছেন, যাহা প্রাণে নাই, তাহা কিরূপে প্রকাশিত হইবে ? মানুষের মধ্যেও বৃক্ষের ন্যায় বিচিত্রতা আছে ;—সে কিসে ? না, দেশকালভেদে রুচিতে। শরীর যন্ত্র, আমরা যন্ত্রী, শরীরকে আমরা চালাই। পরমেশ্বরের কোন সৃষ্ট পদার্থেরই ধ্বংস নাই, সুতরাং আমারও বিনাশ নাই। পরকাল আছে, কর্ম্মফলও আছে, ভোগ করিতে হইবে,—এই সত্যের জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সকল জাতীয় মনুষ্যেরই সমান।

চতুর্থ অধ্যায়

[গোস্বামী-প্রভু যোগ-সাধন গ্রহণ ও সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার পরও স্বীয় গুরুদেবের আদেশে কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহিলাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত নিজের জীবন-কাহিনী-সম্ভূত যোগতত্ত্ববিষয়ক বহু উপাদেয় উপদেশাবলী তৎকালিক "বামাবোধিনী" পত্রিকাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে তাহা সংগৃহীত হইয়া "আশাবতীর উপাখ্যান" নামক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের উপদেশগুলি উদ্ধৃত করা হইল।]

আশাবতী তীর্থভ্রমণোপলক্ষে মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া কণ্টহারিণীর ঘাটে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে একদিন একজন যোগী ধ্যান-মগ্ন রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অপরূপ শোভা দেখিয়া আশাবতীর চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল। তিনি যোগীবরের চরণে প্রণতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশাবতী—যোগীবর! স্ত্রীলোক কি যোগ শিখিতে পারে না?

যোগী—পারিবে না কেন? স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগ শিক্ষা করিতে পারেন। সংসারে থাকিয়াও যোগ শিক্ষা করা যায়।

আশাবতী—আমার মত দুঃখিনীর ভাগ্যে কি সে সৌভাগ্য ঘটিতে পারে?

যোগী—মা! তোমার কে আছে?

আশাবতী—বাবা! আমার আর কেহই নাই, আমি একজন গ্রামের লোকের সঙ্গে তীর্থদর্শন করিতে আসিয়াছি।

যোগী—মা! তোমার পক্ষে যোগ শিক্ষা সহজ হইবে; কিন্তু এক অভাব দেখিতেছি। তোমার গুরু হইবে কে?

আশাবতী—কেন প্রভো! আপনিই গুরু হইবেন।

যোগী—না বাছা! আমি উদাসীন, আমার পক্ষে স্ত্রীলোক দর্শনই নিষেধ।

আশাবতী—বিধাতা স্ত্রীলোককে এত ঘৃণার পাত্র করিলেন কেন?

যোগী—না মা! স্ত্রীলোক ঘৃণার পাত্র নহেন। স্ত্রীলোক আমার গর্ভধারিণীর বংশ, স্ত্রীলোক আমার ভক্তির পাত্র। একটী স্ত্রীলোক দেখিলে আমার জননীকে মনে হয়। তথাপি আমার এই অপবিত্র দুষ্ট চক্ষু একটী স্ত্রীলোকের মুখের শোভা দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়াছিল। সেই হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন চক্ষু ভদ্র না হইবে, আমি জননীগণের পাদপদ্ম দর্শন করিব।

আশাবতী—বিধাতা চক্ষুকে এত মন্দ করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন?

যোগী—না মা! মঙ্গলময় প্রভুর প্রতি দোষারোপ করিও না। তিনি মন্দ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। এই জড় চক্ষু জড় দেহের দুইটি ক্ষুদ্র অংশ

মাত্র। শরীরে জীবাত্মা না থাকিলে শরীরে কোন শক্তি নাই। মানুষ মরিয়া গেলে মৃতদেহ দেখে না, শুনে না, গ্রহণ করে না, গমন করে না, দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যে শরীরের কোন ক্ষমতা নাই। শারীরিক মানসিক কার্য্যের দোষ-গুণ যা কিছু সমস্তই জীবাত্মার।

আশাবতী –তবে জীবাত্মাকে মন্দ করিলেন কেন?

যোগী—মঙ্গলাকর পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্য আপনার ইচ্ছামত পুণ্য বা পাপের অনুগামী হইয়া থাকে।

আশাবতী—প্রভো! আমার দোষ ক্ষমা করিবেন। একটা কথা মনে হইল, না বলিয়া থাকিতে পারি না। জীবাত্মা স্ত্রী-পুরুষের এক কি ভিন্ন ভিন্ন।

যোগী—এক একটী মানুষের এক একটী ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা। কিন্তু যেমন শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গুণাগুণ এক প্রকার – হস্ত, পদ, নখ, মুখ, নাসিকা সকল শরীরের এক—ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সকল শরীরের একপ্রকার, সেই প্রকার জীবাত্মা পৃথক পৃথক হইলেও সমস্ত জীবত্মার প্রকৃতি এক। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, সমস্ত জীবাত্মারই স্বভাব। পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বরের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্ত্রী-পুরুষের যেমন শারীরিক পার্থক্য আছে, তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষের আত্মাতে কোন ভিন্নতা আছে কি না, তাহা আত্মদর্শী যোগিগণ বলিতে পারেন।

আশাবতী—আপনি আমার অনেক মনের সংশয় দূর করিয়াছেন। আপনি আত্মদর্শী যোগীর কথা বলিলেন—যোগীরা কি আত্মাকে দর্শন করেন?

যোগী—হা বাছা! যোগের এমন একটী অবস্থা আছে, যে অবস্থায় আত্মাকে দর্শন করা যায়।

আশাবতী—আত্মা নিরাকার। নিরাকারকে কিরূপে দর্শন করা যায়?

যোগী—পরমেশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, জড় ও চেতন। জড় বস্তু দর্শনের জন্য শরীরের চক্ষু আছে; যোগবলে সেই চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। এইজন্য যোগিগণ স্ত্রী-পুরুষের আত্মা এক প্রকার, কি ভিন্ন প্রকার তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

আশাবতী—তবে কি আমার যোগ শিক্ষা হইবে না?

যোগী—হইবে না কেন? তোমার সৌভাগ্যে যদি স্ত্রীলোক যোগীর দর্শন পাও, তাহা হইলে আশা পূর্ণ হইবে।

আশাবতী—প্রভো, স্ত্রীলোক যোগী কি আছেন?

যোগী—সেকি বাছা! তুমি শুন নাই আমাদের দেশে কত শত শত স্ত্রীলোক যোগতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন? এখনও স্ত্রী-যোগীর অভাব নাই, চিত্রকূট পর্ব্বতে, নর্ম্মদা-নদীতটে, মানস সরোবরের নিকটে কয়েকজন সিদ্ধ যোগিনী জননী বাস করিয়া থাকেন। যদি

তুমি একপ্রাণে তাঁহাদিগকে ডাকিতে পার, তাঁহাদের আসন টলিবে, তাঁহারা তোমাকে কৃপা করিবেন।

বৎসে! যোগতত্ত্ব অতি পবিত্র। তীব্র বৈরাগ্য, উজ্জ্বল বিবেক, চিত্তের দীনতা, হৃদয়ের প্রগাঢ় পবিত্রতা—সেই সকল ভাব মনুষ্যের আত্মায় উপস্থিত হইলে যোগতত্ত্ব শ্রবণে ও সাধনে অধিকার হয়। তোমাকে অধিকারিণী বলিয়া বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে উপদেশ পাইবে। এখন বাসস্থানে প্রস্থান কর।

আশাবতী যোগীর নিকট বিদায় হইয়া বাসায় আসিলেন, কিন্তু সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে সেই মহাত্মার বিষয়ই আলোচনা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে কণ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যোগীবর প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। আশাবতী মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি সকালে যাইতেছেন, গিয়া হয়ত যোগীবরকে শয্যায় শয়ান দেখিবেন, এইজন্য আশাবতী যোগীর চরণে প্রণাম করিয়া কিছু আশ্চর্য্যভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, যোগী মহাশয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। আশাবতী পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি অনেক সকালে উঠিয়া আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, আপনি এখনও শয্যায় শয়ান আছেন। আসিয়া দেখি আপনি স্নান-টান করিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। রাত্রিতে কি আপনার নিদ্রা নাই?

যোগী—আশাবতি! তোমাকে দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আহা! এই অসার সংসারে যাহার মন সার-ধন ধর্ম্মের জন্য আকুল হয়, সেই ধন্য। গত রাত্রিতে তোমার ভাল নিদ্রা হইয়াছিল?

আশাবতী—আপনার নিকট উপদেশ পাইয়া অবধি আর আমার আহার নিদ্রা নাই। যে বস্তু পাইয়া আপনি এত সুখী হইয়াছেন, সে বস্তু আমি কোথায় পাইব, কেবল আমার চিন্তা।

যোগী—তবে আশাবতি! সে বস্তু ছাড়িয়া কি নিদ্রা ভাল লাগে? সেই সুন্দর বস্তু কি এক পলক চক্ষের আড় করা যায়?

আশাবতী—তবে কি আপনি নিদ্রাও ত্যাগ করিয়াছেন?

যোগী—না আশাবতী! এখনও একেবারে নিদ্রা ত্যাগ করিতে পারি নাই। শরীরের আলস্য হইলে দুই এক ঘণ্টা রাত্রিতে শয়ন প্রয়োজন হয়। নিদ্রা-জাগরণে কিছু ক্ষতি লাভ নাই; যাঁহার আত্মা ব্রহ্মসংযুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ রস আস্বাদন করেন, প্রায়ই তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখা যায় না। তুমি শুনিয়া থাকিবে যাহারা কৃপণ, তাহারা সঞ্চিত অর্থ রক্ষার জন্য রাত্রিতে নিদ্রা যায় না। কখন চোর প্রবেশ করিবে, এই ভয়ে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। তদ্রূপ যাঁহারা বহু যত্নে, বহু সাধনে সেই পরম সুন্দর করুণাময় প্রভু পরমেশ্বরকে পরমরত্ন-রূপে লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয় ভাণ্ডারে

লুকাইয়া রাখিতে চান। অহংকার, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ—পাপরূপ দস্যুগণ কখন আসিয়া আক্রমণ করে, এইজন্য সর্ব্বদা সভয়ে জাগরিত থাকেন।

আশাবতী—আমাকে কিছু কিছু সদুপায় উপদেশ করুন, যাহাতে যোগিগণের নিত্যানন্দধাম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

যোগী—করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য কু সঙ্গে কু-অভ্যাকে পবিত্র স্বভাবকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তজ্জন্য পুনর্ব্বার সেই স্বভাব লাভ করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন হয়। ইহারই নাম প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করা। আমাদের বাসগৃহ এই শরীর নশ্বর - নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে; তথাপি দয়াময় প্রভু এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকে রক্ষা করিবার জন্য কত সহজ উপায় করিয়াছেন। মাতার স্নেহ, স্তন্য দুগ্ধ, জল, বায়ু, উত্তাপ, অগ্নি, বিবিধ শস্য, ফল-মূল, যাহা কিছু শরীর রক্ষার উপযোগ। সে সকল পদার্থ অনায়াসলভ্য। সেই শরীর অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ; আত্মা অনন্তকাল স্থায়ী, তাহা ভঙ্গুর নহে। দয়াময় প্রভু সেই আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তুকে যে দুষ্প্রাপ্য করিয়াছেন, তাহা নহে। শরীরের পক্ষে যেমন মাতার স্তন্য দুগ্ধ, তদ্রূপ আত্মার পক্ষে প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমরস। শিশু সন্তান ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন করিলেই জননী সন্তানের মুখে স্তন দান করেন। আত্মা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিলেই বিশ্বজননী তাহার মুখে অমৃতরস ঢালিয়া দেন। ঈশ্বরের জন্য প্রবল ক্ষুধা অর্থাৎ অনুরাগ হইলেই অনায়াসে যোগলাভ করা যায়। সংসারাসক্তিতে সেই ধর্ম্ম-ক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে। এজন্য যোগ-সাধনের প্রয়োজন। শারীরিক ক্ষুধা নষ্ট হইলে যেমন মন্দাগ্নির ঔষধ সেবন করিতে হয় তেমনি আত্মার অনুরাগ-ক্ষুধার মান্দ্যভাব দেখিলেই তাহার চিকিৎসা—সাধন ভজন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

আশাবতী—আপনি যাহা বলিলেন তাহা সকলই সত্য; যাহাতে আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল হয়, এমন কিছু সদুপায় আমার জন্য আজ্ঞা করুন।

যোগী—যতদিন নিরাকার ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ লাভ করা না যায়, ততদিন সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে এক একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হরগৌরী-ব্রত অথবা পতি-ব্রত এবং স্ত্রী-ব্রত। স্ত্রী স্বামীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ, স্বামী স্ত্রীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা দর্শন করিবেন। শিব পার্ব্বতী এই পবিত্র দাম্পত্য-ব্রত সাধনপূর্ব্বক মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া যোগীদিগের গুরু হইয়াছিলেন। শিব পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহার মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে ব্রহ্মধ্যান করিতেন, দুর্গাও শিবের মুখে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রহ্মধ্যানে মগ্না হইতেন।

এখনও যদি কোন স্ত্রী-পুরুষ এই হরগৌরী-ব্রত সাধন করেন, তাঁহারাও দিব্যজ্ঞানে যোগীশ্বর হইতে পারেন সন্দেহ নাই।

পিতৃমাতৃ ব্রত—পিতা মাতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা দর্শন করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিভাবে পিতা-মাতার চরণ-সেবা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হয়। সধনা নামে এক ব্যাধ এইরূপে পিতা-মাতার সেবা করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

যশোদা কৃষ্ণের মুখশ্রীতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া গোপাল বলিয়া অধীরা হইতেন। এই গোপাল প্রত্যেক গৃহে বিরাজমান থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। বালক-বালিকার মুখশ্রীতে এবং ক্রীড়াতে ব্রহ্ম-দর্শন অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে বাৎসল্য ভাব উপস্থিত হয়, যে বাৎসল্য-প্রেম লাভ করিবার জন্য যোগীশ্বরগণও সর্ব্বদা কঠোর সাধন করিয়া থাকেন।

এইরূপ রাজা-প্রজা, প্রভু-ভৃত্য, গুরু-শিষ্য, চিকিৎসক-রোগী, সারথি-নাবিক প্রভৃতি যতপ্রকার সম্বন্ধ আছে, সংসারের কার্য্যে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর বর্ত্তমান। লীলাময় প্রভু অনন্ত, অসীম ভাবে লীলা করিতেছেন। ইহার মধ্যে যতগুলি পার ব্রতরূপে সাধন করিলে অতি সহজেই জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু ঐ সকল উপায় সহজ হইলেও সুকঠিন। তথাপি তোমার আগ্রহ দেখিয়া অতি নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিলাম। এই সাধনে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না, অন্য সাধনে সাহায্য ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না।

আশাবতী—আপনার উপদেশে আমার জীবনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু হায়! আমি অতি অভাগিনী, সংসারে আমার বলিতে আমার কেহই নাই। কেহ থাকিলে আমি একটী ব্রত করিতে পারিতাম।

যোগী কেন মা! এত দুঃখ করিতেছ কেন? তুমি পরোপকার ব্রত গ্রহণ কর। ঈশ্বর-প্রসাদে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আশাবতী—পরোপকার-ব্রতে টাকা চাই। আমি টাকা কোথায় পাব?

যোগী—না মা! টাকা না থাকিলেও পরোপকার-ব্রত সাধন করা যায়। টাকা, শরীর, মন, এই তিন বস্তু দ্বারা পরোপকার সাধন করা যায়। যাঁহার টাকা নাই, তিনি শরীর দ্বারা যতদূর সাধ্য পরের উপকার করিবেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশে হরিনাম প্রচার করিতে বাহির হইয়া রাঢ় দেশে একটী পল্লীগ্রামে উপস্থিত হন, তখন শ্রবণ করিলেন, সেই গ্রামে একটী বিধবা ব্রাহ্মণী জ্বর রোগে কাতর হইয়া অনাহারে পড়িয়া রহিয়াছেন। চৈতন্য প্রভুর কোমল হৃদয় এই দুঃখসূচক সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। মহাত্মা চৈতন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি খাদ্যবস্তু সংগ্রহপূর্ব্বক সেই বিধবা ব্রাহ্মণীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"মাগো, আমি তোমার পুত্র সন্তান। তোমার জন্য আমি ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি, রন্ধন করিয়া তুমি ভোজন কর"। এই সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিলেন, "বাছা! তুই কেরে! আজি আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিলি। অভাগীর আর যে ত্রিকুলে কেহ নাই"। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। এই ঘটনায় চৈতন্যদেব ও ব্রাহ্মণী উভয়েই ব্রহ্মকৃপা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব অর্থ না থাকিলেও কেবল শরীর দ্বারা পরসেবা করা যায়। যদি শরীরও দুর্ব্বল হয়, তবে দুটী মিষ্ট বাক্য বলিয়া, বিপদে সুপরামর্শ দিয়া লোকের হিতসাধন করা যায়। এই পরসেবা প্রভৃতি যে সকল সেবা-ব্রতের কথা বলা হইল, এ সকল পালন না করিলে হাজার সাধন ভজন কর, কিছুতেই পরব্রহ্মের চরণ লাভে সমর্থ হইবে না।

আশাবতী—যতই শুনিতেছি ততই কঠিন বোধ হইতেছে। আমার বড় ভয়ানক স্বার্থপরতা। দেখুন, সংসারে আমার বলিতে কেহ নাই, তথাপি কোন বস্তু যখন পরিবেশন করি, তখন পরিচিত লোককে ভাল ভাল বস্তু অনেক করিয়া দি'; অন্যকে যেমন তেমন কিছু দিয়া যেন বাঁচিলাম বোধ হয়। ভাল জিনিষটী আপনি লই, অন্যের জন্য মন্দ বস্তু রাখিয়া দি'। একবার জগন্নাথে গিয়াছিলাম, পথের মধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে চটী আছে। চটীর মধ্যে যেটী ভাল ঘর, আমি সেইটী লইতাম। এমনকি, অনেক ঘুস্‌টুস্‌ দিয়াও ভাল স্থানটী অধিকার করিতাম; লোকে কষ্ট পাইতেছে তাহা অনায়াসে দেখিতাম। কাহারও ভাল দেখিতে পারি না। অন্যের ভাল দেখিলে কষ্ট হয়। এমন স্বার্থপরতাপূর্ণ মন লইয়া কি প্রকারে পরসেবা করিতে সক্ষম হইব? আমার কিছু নাই, তথাপি এই; না জানি যাদের স্বামী-পুত্র, টাকা-কড়ি আছে তাদের স্বার্থপরতা কত অধিক! এ স্বার্থপরতা থাকিতে কি প্রকারে ব্রত গ্রহণ করিব?

যোগী—মা আশাবতি! ঠিক বলিয়াছ সন্দেহ নাই, স্বার্থপরতাই সকল পাপের মূল। সামান্য ঔষধে এ রোগ নিবারণ করা যায় না। সংসার অসার অনিত্য, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা এবং সাধু সঙ্গ করিতে করিতে যখন বাস্তবিকই সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইবে, তখনই স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত হইবে। সাধক মাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভস্ম মাখা, কৌপীন পরা বৈরাগ্য নহে, স্বার্থ নাশই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য হইতেই সাধনে অধিকার জন্মাইবে। এজন্য বলি, তুমি প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত থাক। যখনই যোগিনী জননীর আগমন হইবে তখনই তোমার গুরু-করণ হইবে। আজ তোমাকে অনেক কথা বলিলাম। যাহা শুনিলে, ঐ

সকল বিষয় চিন্তা কর। যেমন মনে মনে পরপুরুষ কামনা করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়, সেইরূপ মনে মনে অধর্ম্ম আলোচনা করিলে চরিত্র কলঙ্কিত হয়। কলঙ্কিত মনে ধর্ম্ম সাধন হয় না। চরিত্র শুদ্ধ রাখিয়া প্রস্তুত থাক। নিশ্চয়ই পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে। আজি বাসায় গমন কর, প্রয়োজন হইলে আমার নিকট আসিবে।

পরদিন আশাবতী অতি প্রত্যুষে কণ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখেন, যোগীবর হস্তে কমণ্ডলু লইয়া কোথায় যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া দ্রুতপদে যোগীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনি কোথায় যাইতেছেন?"

যোগী—আশাবতি! আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে; যাইবার সময় তোমাকে একবার দেখিলাম। ইহাতে তোমার শুভদিন নিকট বলিয়া বোধ হইতেছে।

আশাবতী—আপনি কোথায় যাইতেছেন? এখানে কি আর থাকিবেন না?

যোগী—আমি এ স্থান হইতে বিদায় লইয়াছি। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। আমার গুরুদেব আমাকে আহ্বান করিয়াছেন।

আশাবতী—আপনার গুরুদেব কোথায়?

যোগী—এই সময় তিনি গয়ায় কপিলেশ্বরের শিব মন্দিরের নিকট আছেন।

আশাবতী—এ সংবাদ কে আনিল?

যোগী—(হাস্যপূর্ব্বক) আশাবতি! মানুষের যেমন বাহিরের চক্ষু কর্ণ, সেইরূপ অন্তরে আত্মারও চক্ষু কর্ণ আছে। চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সংযুক্ত হইলে, ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি সেই চক্ষু কর্ণে প্রবেশ করে। তখন একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জানা যায়।

আশাবতী—আমি ভাল বুঝিতেছি না। এক ঘরে থেকে অন্য ঘরে কি হয় জানা, একি সম্ভব?

যোগী—আহা! আশাবতি! তোমার অপরাধ কি? দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভারতবর্ষের সেই জীবন্ত ধর্ম্মভাব নাই। ধর্ম্মের কতকগুলি প্রণালী অথবা খোসা লইয়া লোকে ব্যস্ত রহিয়াছে। যখন ভারতে যোগধর্ম্মের আলোচনা ছিল, যখন ধর্ম্ম জীবিত ছিল, তখন অন্তরের চক্ষু-কর্ণের কথা সকলেই বুঝিত। প্রাচীন ঋষিগণ উপনিষদে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বর চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন। কেবল পুস্তক পড়িয়া একথা বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা যুক্তযোগী, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন। আশাবতি! তোমাকে একটু মোটামুটি বুঝাইয়া দি'। আমাদের পৃথিবী হইতে আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র সকল কতদূরে, তথাপি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদের বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন। পৃথিবী হইতে কি প্রকারে জানিতে

পারিলেন ? জ্ঞান-যোগে চিন্তা করিতে করিতে এক একটি দূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল মনুষ্যের জ্ঞানে যদি আকাশের নক্ষত্রাদি জানা সম্ভব হয়, তবে মনুষ্যের জ্ঞান যদি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে কিছু জানা কি অসম্ভব হয় ? না, কখনই না।

আজি প্রত্যুষে আমি ধ্যানে বসির, এমন সময় আমার আসন টলিল অর্থাৎ নড়িতে লাগিল। আমি অন্তশ্চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখি, গয়ায় আমার গুরুদেব আসিয়া আমাকে আহ্বান করিতেছেন।

আশাবতী—আচ্ছা, এত শীঘ্র তারের খবরের মত শুনিলেন, কিন্তু শীঘ্র যাবেন কিরূপে ?

যোগী—আশাবতি ! যোগীদিগের সে ক্ষমতা আছে। আমি রেলের গাড়ীতেই গমন করিব।

আশাবতী—তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আমার নিকট যে টাকা আছে তাতে কোন কষ্ট হইবে না। আমি আপনার কন্যা, আমাকে সঙ্গে লইতে আপনার আপত্তি হইবে না। যতদিন যোগিনী জননীর দেখা না পাই, আপনার চরণে পড়িয়া থাকিব।

যোগীবর অনেক চিন্তা করিয়া আশাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে, উভয়ে রেল গাড়ীতে গয়ায় উপস্থিত হইয়া আকাশগঙ্গাবাসী বাবাজীর আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি নবাগত অতিথিদ্বয়ের যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক সেবা করিলেন। তাঁহারা সুস্থ হইয়া যখন বিশ্রাম করিতেছেন, তখন আলাপ আরম্ভ করিলেন ঃ—

বাবাজী—(যোগীবরকে সম্বোধনপূর্ব্বক) মহাত্মন ! আপনার সঙ্গে প্রকৃতি দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। কি আশ্চর্য্য ! আজ কি সামান্য মলয় সমীরণ স্থির, গম্ভীর, অটল হিমালয়কে স্থানভ্রষ্ট করিল ?

যোগী—বাবাজী, আপনার চরণে প্রণাম। আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি না রাখিলে কি আমরা স্থিরভাবে সাধন করিতে পারি ? পিতঃ, এ মহিলা আমার প্রকৃতি নহেন। আমার কুমার ব্রত—তবে সঙ্গে স্ত্রীলোক কেন ? ইনি আমার শিষ্যা, কন্যা এবং মাতা। যোগ শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যোগিনী জননীর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। একবার গুরুদেবের চরণ দর্শনে অভিলাষ।

বাবাজী—যোগিনাথ ! আমার অপরাধ লইবেন না। এখন ভেকধারী বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, যোগীদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা আশঙ্কা হয়। তজ্জন্য আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি। সাধন নাই, ভজন নাই, কেবল ভিক্ষা। না দিলে গৃহস্থের প্রতি গালিবর্ষণ, অত্যাচার, রাত্রিতে চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার। সেদিন কয়জন বৈষ্ণব পরমহংস একত্র হইয়া এক ভক্ত গৃহস্থের বাটিতে অতিথি হইয়া রাত্রিতে ডাকাতি করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সে গ্রামে অনেকগুলি বলবান্ লোক ছিল, তাহারা থানার দারোগার সাহায্যে সকল লোককে ধরিয়া এখানে বিচারের জন্য প্রেরণ করে। বিচারে তিন বৎসর, সাত বৎসর করিয়া ফাটক হইয়াছে। বলুন দেখি, যথার্থ ভদ্র সাধুদিগের কি লজ্জাকর অবস্থা! যথার্থ সাধুকেও লোকে চোর, ডাকাত মনে করিবে, তাহাতে অপরাধ কি?

যোগী—বাবাজী! আপনি ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, পূর্ব্বে উদাসীনদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল?

বাবাজী—পূর্ব্বে লোকে যথার্থ ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িয়া নগরে প্রবেশ করিতেন না, বিষয়ীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না। বিষয়ী এবং স্ত্রী-বশীভূত লোকের সহিত আলাপ করিতেও তাঁহাদের ভয় হইত। কোন উদাসীন একাকী নির্জ্জনে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ কি উপবেশন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন। এখনও যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উদাসীন, তাঁহারা ভ্রমেও বিষয় স্পর্শ করেন না। এখন দুই প্রকার বৈরাগ্য দেখা যায়—এক দুঃখ বৈরাগ্য, দ্বিতীয় যথার্থ বৈরাগ্য। দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া অথবা অন্য কারণে আহার মিলিতেছে না, বিদ্যা বুদ্ধি নাই, অত্যন্ত অলস, পরিশ্রম করিতেও চায় না, এইরূপ লোকেই অধিক পরিমাণে ভেক লইয়া ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহাদের মধ্যে ছোট লোকই অধিক—হাড়ী, ডোম, মুচি; ভাল জাতির মধ্যে দুই একজন গোয়ালা। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এই দুই জাতিই ভিক্ষু আশ্রমে আগমন করিতেন—এখন নিয়ম নাই, শাসন নাই। নানা সম্প্রদায়, নানা দল। সকলেই আপন আপন দল বৃদ্ধির চেষ্টা করে, পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই। এই এক গয়ায় চল্লিশটী বৈষ্ণব আশ্রম, উদাসীন সন্ন্যাসীর প্রায় ছয়ত্রিশটী, কবির-পন্থীর পাঁচটী। এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হইলে কি পবিত্রতা রক্ষা কয়া যায়? যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মার্থী, তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, সে ঘোর অবিশ্বাসী। দয়াল রাম কীট পতঙ্গকে আহার দিতেছেন, তোমাকে দিবেন না?

সূর্য্যভক্ত—বাবা, আমরা গৃহী, সন্ন্যাসী বৈষ্ণব দেখিয়া আমরা কিরূপে বিচার করিব? বিচার করিতে গেলে যে আমাদের অকল্যাণ হইবে।

বাবাজী—সূর্য! গৃহীই হও কি সন্ন্যাসী হও, প্রত্যেক নরনারীকে ভক্তি করিবে। কেবল ভেকধারীকে ভক্তি করিবে তাহা নহে। মনুষ্য মাত্রেরই দোষ গুণ আছে, এজন্য দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণে যত্ন করিবে। মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্প হইতে কেবল মধু আহরণ করে, তদ্রূপ মনুষ্যের গুণ গ্রহণ করিবে। মনুষ্যের মধ্যে যাহা পাপ দেখিবে, ঘৃণাপূর্ব্বক বিষবৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে।

শ্যামাভক্ত—আচ্ছা বাবা! অমুক ব্যক্তির কি গুণ আছে? আমি ত কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বাবাজী—শ্যামা! সেই অন্ধকার রাত্রিতে সে ব্যক্তি কি লণ্ঠন ধরিয়া আমাদের পথ দেখায় নাই? ইহাতে জানিও, তাহার মধ্যে পরোপকার গুণ আছে। সেই গুণটুকুকে ভক্তি করিবে। ভগবান্ সকলের মধ্যে আছেন। সকল তাঁহার সিংহাসন, সকলই দেবমন্দির, ইহা চিন্তা করিও—আপনা হইতে ভক্তির উদয় হইবে।

গঙ্গাদাস - তবে আমাকে ভৈরেঁা স্থানে যাইতে নিষেধ করেন কেন?

বাবাজী—ভগবান্ অগ্নিতে আছেন, তুমি তাহার মধ্যে প্রবেশ কর না কেন?

গঙ্গাদাস—তাহা হইলে যে পুড়িয়া মরিব।

বাবাজী—সেইরূপ ভগবান্ সকলের মধ্যে থাকিলেও সকল স্থানে যাইতে পারে না। কু-সঙ্গে গেলে পুড়িয়া মরিবে। যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ, কেবল তাঁহারাই সকল স্থানে যাইতে পারেন।

সাধুভক্ত কেশবদাস—বাবাজী! সিদ্ধপুরুষ হইবার উপায় কি?

বাবাজী—কেশবদাস! আমরা বৈষ্ণব, আমরা কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করি না। ভগবান্ বিষ্ণু অতি দয়ালু। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ হয়।

কেশবদাস—সংসারসক্তি কাহাকে বলে?

বাবাজী—এই নশ্বর শরীরকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে। এই দেহকে অত্যন্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। যে স্ত্রী কি পুরুষ কেবল আহার, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেই সংসারাসক্ত। অনেকে মনে করে নগর ছাড়িয়া বনে বাস করিলেই সংসার ত্যাগ করা হইল। ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আসিয়াও আহার লইয়া, কুটীর, কৌপীন, আসন, অগ্নিকুণ্ড, কমণ্ডলু লইয়া যে ব্যস্ত, সে সংসারাসক্ত। এই দেহ আমি নই। আমি নিরাকার জীবাত্মা। জগতে এই দেহের জন্যই বিবিধ আয়োজন দেখিতে পাই। কিন্তু আমি যে নিরাকার জীবাত্মা আমার জন্য কোন আয়োজন নাই। গ্রাম, নগর, হাট, বাজার যেখানে যাও, দেহের প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল রহিয়াছে, কিন্তু আমার ক্ষুধা-তৃষা নিবারণের অন্ন জল নাই। গুরুদত্ত মহামন্ত্রই আমার অন্ন জল। সংসারাসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ঐ মহামন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হয়।

আশাবতী—প্রভো! আপনাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তবে বুঝি আমার সদগতি হবে। আমার ভাগ্যে কি গুরুদত্ত, মহামন্ত্র মিলিবে? কোথায় মা যোগিনীজননী! মাগো! আর যে আমি দিন কাটাইতে পারি না।

বাবাজী—মা! তোমার ব্যাকুলতা ও অনুরাগ দেখিয়া যোগিনাথের ন্যায় আমিও ধন্য হইলাম। মা! যোগিনীজননী নিকটেই আছেন; তিনি স্ত্রী

পুরুষ উভয়েরই মধ্যে বাস করেন। তাঁহার নাম কুণ্ডলিনী। যোগিনাথ তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। বোধ হয় অপর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। অনুরাগ জন্মাইবার জন্যই পরীক্ষা; তোমাতে যেরূপ অনুরাগ দেখিলাম, তাহা অতি দুর্লভ।

আশাবতী—আমার কোন গুণ নাই। আপনারা কৃপা করিয়া যদি অভাগিনীকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি রক্ষা পাই। সংসারে আমার কেহ নাই। যাহাতে যোগিনীজননীর কৃপালাভ করিতে পারি, এমন দয়া করুন।

বাবাজী—এখন সায়ংকাল উপস্থিত, আপন আপন সাধন ভজনে রত হও। অন্য সময় আলাপ হইবে।

অতঃপর সকলে প্রস্রবণের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই প্রস্রবণের নামই আকাশগঙ্গা। অতি নির্ম্মল জল। বোধ হইতেছে যেন প্রস্তর ঘামিয়া ঘামিয়া জল পড়িতেছে।

আশাবতী—এ জল কোথা হইতে আসিতেছে?

গঙ্গাদাস—আকাশ হইতে গঙ্গা আসিতেছে, তাই ইহার নাম আকাশগঙ্গা।

বাবাজী—না মা! উহা ঠিক কথা নহে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে ভুলাইয়া অর্থ লইবার জন্য ঐরূপ বলিয়া থাকে। ইহাকে প্রস্রবণ বলে। বৃক্ষ যেমন শিকড় দিয়া জল টানিয়া সমস্ত শাখাপ্রশাখায় লইয়া যায়, সেইরূপ নীচে জল আছে, অথবা পাহাড়ের কোন স্থানে জল জমিয়া থাকে; পাথরের মধ্যে শিকড়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিরা আছে, তাহাই জল টানিয়া থাকে। ইহা ভগবানের লীলা। নতুবা জল কখন উর্দ্ধে উঠিতে পারে? জলের গতি নীচের দিকে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে লোকের বসতি, নীচ হইতে উপরে জল লইয়া যাইতে হইবে। ভগবান্ হুকুম করিলেন, আর জল প্রস্তর ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া এই পড়িতেছে। ইহাও বাস্তবিক গঙ্গা, বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ইহাও সেই প্রভুর দয়ারূপ চরণ হইতে চলিয়া আসিতেছে। যেমন পাহাড়ের জল দেখিতেছ, সেইরূপ বৃক্ষে জল আছে, লতাতে জল আছে। মরুভূমিতে নদী প্রভৃতি জলাশয় নাই, সেখানে জলের বৃক্ষ আছে; তাহার নাম পান্থ-পাদপ। তাহাতে আঘাত করিলেই নির্ম্মল জল পাওয়া যায়। সেই দয়াল প্রভু এই নশ্বর দেহ রক্ষার জন্য এত সদুপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কি জীবাত্মার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণের সদুপায় করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন। যথার্থ ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইলেই সদুপায় লাভ করা যায়। এজন্য যাঁহারা যথার্থ সৎগুরু, তাঁহারা শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করেন না। যাহার ধর্ম্ম-ক্ষুধা নাই, তাহাকে উপদেশ দিলে সে উপদেশ মান্য করিবে না। একবার ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিলে,

পুনর্ব্বার লাভ করা অতি কঠিন। এজন্য আচার্য্যগণ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মা! এই যোগীবরও তোমাকে পরীক্ষা করিতেছেন,—তুমি দুঃখ করিও না, শীঘ্রই তোমার শুভদিন উপস্থিত হইবে। এখন ভগবানের নাম-কীর্ত্তন কর, অন্য সময়ে সদালাপ হইবে।

আশাবতী—প্রভো! আপনার অনুমতি হইলে অদ্য গয়াধাম পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক দর্শন করি।

যোগী—মা আশাবতি! ইহা উত্তম সংকল্প বটে, কিন্তু তুমি একাকী ভ্রমণ করিতে পার না। গয়াতে অনেক দুষ্ট লোক আছে। তাহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বড় অত্যাচার করিয়া থাকে।

আশাবতী—আমি দুঃখিনী, আমার অর্থসম্পত্তি কিছুই নাই, দুষ্টলোকে আমার কি করিবে?

যোগী—তোমার অর্থসম্পত্তি নাই যথার্থ, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, যুবতী, সতীত্বই তোমার পরম সম্পত্তি। যে নারীর সতীত্ব-রত্ন আছে, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হইতেও তাঁহার সম্পত্তির অধিক মূল্য। এই অমূল্য রত্ন রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। তুমি যে যোগ শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সতীত্বই তাহার প্রধান উপকরণ। ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করিলে, যোগে অধিকার হয় না। চরিত্র ভাল রাখিতে হইলে, কু-সঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এইজন্য এই দুর্জ্জনপূর্ণ স্থানে তোমাকে একা যাইতে নিষেধ করিতেছি।

আশাবতী—প্রভো! আমার মনে একটা প্রশ্ন আসিতেছে। ভগবান্ সাকার কি নিরাকার?

যোগী—ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। তাঁহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাঁহার সেরূপ থাকা সম্ভব নয়।

আশাবতী—তবে লোকে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে কেন?

যোগী—অজ্ঞান লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন। দেখ, কুম্ভকারের গৃহে যখন প্রতিমা থাকে, লোকে তাহার পূজা করে না। সেই প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তবে তাহার পূজা করে। সুতরাং ঐ প্রতিমা দেবতা নহে। সেই প্রতিমায় যে প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, প্রাণই দেবতা। প্রাণ নিরাকার বই সাকার হইতে পারে না।

আশাবতী—অনেক জ্ঞানী বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারা ত অজ্ঞান নহেন।

যোগী—রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি নহে। ঈশ্বর পুরুষ এবং প্রকৃতি। পুরুষ-

প্রকৃতির পূজাই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। তুমি যখন যোগ শিক্ষা করিবে, তখন এ তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

জামবৃক্ষতলে এক প্রশস্ত প্রস্তর-খণ্ডের উপর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটী বৈষ্ণব উপবেশনপূর্ব্বক হরিনাম জপ করিতেছেন। বৈষ্ণব যোগীবর ও আশাবতীকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক অন্য প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন।

যোগী—(প্রস্তারাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) অদ্য আমার সুপ্রভাত, ভাগ্য-বশতঃ আপনার দর্শন পাইলাম।

বৈষ্ণব—আমি আপনার দাস। যেখানে ভক্ত সমাগম, সেখানেই ভগবানের প্রকাশ। ভগবান্ বলিয়াছেন, "ভক্তই আমার পিতামাতা, হে নারদ, আমি সামান্য জীবের ন্যায় নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি না। ভক্ত হৃদয়ে আমার জন্ম। ভক্তের শুদ্ধ অন্তঃকরণ বসুদেব, ভক্তি দেবকী। শুদ্ধ অন্তঃকরণ যখন ভক্তির যোগ্য হয়, তখন আমি ভক্তহৃদয়ে জন্মগ্রহণ করি। ভক্ত আমাকে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আমার নামকরণ করেন। এজন্য ভক্তই আমার পিতামাতা। আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীর হৃদয়েও থাকি না; যেখানে ভক্তগণ আমার নামকীর্ত্তন করেন, আমি সেখানে বসতি করি।" আপনার ন্যায় পরম ভক্ত দর্শনে আজি আমি কৃতার্থ হইলাম।

যোগী—আমাকে ভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিবেন না। ভগবদ্ভক্তি সহজ বস্তু নহে। অনেক সৌভাগ্য ভক্তিধনে অধিকার হয়। ভক্তি অহৈতুকী, সামান্য সাধন-ভজনে তাহা লাভ করা যায় না। ভক্তি বিষয়ে কিছু আলাপ করুন।

বৈষ্ণব—এ দাস ভক্তির কি জানে? দাসের প্রতি কৃপা করিয়া কিছু ভক্তির উপদেশ প্রদান করুন।

যোগী—আপনি একজন পরম ভক্ত, এই অসাধারণ বিনয়ই তাহার পরিচয়। আপনি দয়া করিয়া একটু ভক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করুন।

বৈষ্ণব—আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দাসের অপরাধ হয়, এজন্য যাহা জানি তাহা বলিতেছি। ভক্তি-শাস্ত্রে আছে যে প্রথমে নিষ্ঠা, পরে সাধুসঙ্গ, তাহার পর ভজন। যাহা উপদেশ পাইবে তাহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, নিষ্ঠাবান হইয়া সাধুসঙ্গ করিবে, সাধুর জীবন দেখিয়া সদাচার শিক্ষা করিবে এবং সদাচারী হইয়া ভজন করিবে। ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার সেবা-অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহার দাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করা, তাঁহাকে সখা বলিয়া মনে চিন্তা করা, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করা ইহাকেই ভজন কহে। এইরূপ নিষ্ঠা, সৎসঙ্গ ও ভজন করিতে করিতে অন্তরে ভক্তি অঙ্কুরিত হয়। যাঁহার অন্তরে ভক্তি অঙ্কুরিত হয়, তিনি ক্ষমাশীল হন, বৃথা সময় নষ্ট করেন না, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবানের নামকীর্ত্তন, শ্রবণ, মননে সময় যাপন করেন; তিনি বৈরাগী অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য হন এবং অত্যন্ত আশার সহিত প্রার্থনা করেন;

ভগবানের নাম-গানে তাঁহার রুচি হয় ; তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের গুণ বর্ণনে আসক্ত থাকেন ; ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, এজন্য সকল পদার্থ ও সর্ব্ব প্রাণীতে তাঁহার প্রীতি জন্মে।

ভক্তির অঙ্কুর হইবামাত্র যখন ঐ সকল গুণ জন্মায়, তখন আমার ন্যায় রিপুপরায়ণ লোক কি ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে ?

আশাবতী—আজ্ঞা, আপনারা সংসার ছাড়িয়া উদাসীন হইয়াছেন, তবে আপনাদের আবার রিপুর ভয় কেন ?

বৈষ্ণব—মা ! আমি ঘর, বাড়ী, আত্মীয়, স্বজন ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু অন্তরের কাম, ক্রোধ রিপুগুলিকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। বিশেষতঃ ঘর, বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিলেই যে সংসার ত্যাগ করা হইল, তাহা নহে। সংসার কোন পদার্থ নহে। ভগবানে প্রেম না করিয়া তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসকলকে ভালবাসা, তাহাতে আসক্ত হওয়ার নামই সংসার। যত দিন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ প্রেম না হয়, ততদিন সংসার ত্যাগ করা যায় না। গৃহে ভজন-সাধনে বাধা হয়, এজন্য নির্জ্জনে একাকী রহিয়াছি। তিলক, মালা প্রভৃতি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যিনি অনন্যভাবে ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রেম করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

আশাবতী—রাধাশ্যাম একজন, না দুই জন ?

বৈষ্ণব—রাধাশ্যাম, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ এ সকলই এক। যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আপনি এবং আপনার শক্তি, দুই পৃথক নাম হইলেও যেমন একই বস্তু, সেইরূপ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি. দুই একই বস্তু।

যোগী—আশাবতি ! গয়াধাম সিদ্ধ স্থান। অনেক মহাত্মা এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও গয়াধামে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। সেই সকল সিদ্ধ পুরুষগণের শ্বাসপ্রশ্বাস এখনও গয়ার বিশুদ্ধ পার্ব্বতীয় সমীরণে প্রবাহিত হইতেছে।

আশাবতী—সে কি প্রভো ! শ্বাসপ্রশ্বাস কি এক স্থানে বসিয়া থাকে ? ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

যোগী—মৃগনাভি কোন গৃহে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া কিছুদিন পরে তাহা স্থানান্তরিত করিলেও, বিশ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত যখনই বাক্স খুলিবে, তখনই গন্ধ পাইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? বিশ্বপতি জগদীশ্বরের যে কি মহিমা —কি যে কৌশল, তা কে বলিতে পারে ? দেখ, এক জমিতে খুব কাছাকাছি করিয়া নিম, তেঁতুল, আক, লঙ্কা, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ কর ; একই স্থানে এক রসে বর্দ্ধিত হইয়া নিম তিক্ত, তেঁতুল টক, আম মিষ্ট, লঙ্কা ঝাল, আম ও কাঁঠাল স্ব স্ব আস্বাদযুক্ত, ইহা কিরূপে হয় তাহা কি কেউ বলিতে পারে ? মা আশাবতী, ভগবানের অনন্ত মহিমা, মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট। ক্ষুদ্র পুঁটিমাছ

কি মহাসমুদ্র সন্তরণ দিয়া সীমা করিতে পারে? না, কখনই না। মহাসমুদ্র অপেক্ষাও জগদীশ্বর অনন্ত। কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি কৃপা করিয়া যতটুকু জানান, ততটুকু জানিতে পারে। ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যেখানে কোন মহাত্মা তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরেও যদি কেহ সেইরূপ তপস্যার ভাবে শুদ্ধ মনে সেই স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহূর্ত্তে সিদ্ধপুরুষের কুণ্ডলিনী শক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে, সন্দেহ নাই।

আশাবতী—কুণ্ডলিনী শক্তি কাহাকে বলে?

যোগী—যোগে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারিবে। তথাপি এই মাত্র বলি, ধর্ম্মসাধনের আরম্ভেই গুরুর কৃপা-দৃষ্টিতে আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, স্বীয় গৃহ-দেহকে শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে প্রয়োগ করেন, তাহাতে শরীরে এক অপূর্ব্ব তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। মেরুদণ্ড তাহার পথ, মস্তিক গম্যস্থান, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই স্নায়ুত্রয় এই তাড়িত-শক্তি চালনের রজ্জু। এই তাড়িত শক্তি যতই শরীরে চালিত হয়, ততই শরীর শুদ্ধ হয়। এজন্য এই ক্রিয়াকে ভূতশুদ্ধি কহে। যোগসাধন করিতে হইলে, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম এই তিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

আশাবতী—প্রভো! পূর্ব্বে আমি সাধুদিগের পদধূলির মাহাত্ম্য কিছু বুঝিতাম না। এখন দেখিতেছি আমার ন্যায় পাপীয়সীর পক্ষে ইহা মহৌষধ। সময়ে সময়ে আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এমন কি ভগবানের নাম স্মরণেও উৎসাহ থাকে না। প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা। এই এক শোচনীয় অবস্থা —হাসিও নাই, রোদনও নাই, অথচ গভীর অন্তর্দ্দাহ। এই সময়ে সময় সময় আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেবল পাপ ভয়ে নিবৃত্ত থাকি। এই অন্তর্জ্বালা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি নাই, কিন্তু যখনই আপনার অথবা পূজনীয় বাবাজীর চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়াছি, তখন সকল জ্বালা-যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রশান্ত ভাব এবং আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করিয়াছি। প্রভো! আর কাহারও চরণ-ধূলি লইলে কি এরূপ উপকার হয়?

যোগী—মা আশাবতি! তোমার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি যে ভক্তপদরজের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার যোগ শিক্ষার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যতদিন অহঙ্কার প্রবল থাকে, ততদিন সাধুদিগের চরণ-ধূলির প্রতি ভক্তি হয় না। যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে হৃদয়-নিহিত ধর্ম্মভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, আপনা হইতে ভগবানের নাম রসনায় উচ্চারিত হয়, এবং পাপ মতিসকল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করে, তিনিই সাধু। তাঁহার পদধূলি লইলেই উপকার। কেবল সাধুর পদধূলি বলিয়া নয়, মনুষ্য মাত্রেরই পদধূলির অনেক বল। সকলেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া

থাকে। প্রত্যেক নরনারীতে সেই দীননাথ দীনবন্ধু প্রভু বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারী এক একটি দেবমন্দির। যাহার অন্তরে দেবভক্তি আছে, সে দেবমন্দির দেখিলেই ভূমিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া থাকে। একবার প্রণাম করিলে আর সে লোভ ছাড়িতে পারে না। আশাবতি, এই প্রণামের মাহাত্ম্য না বুঝিলে কেহই গুরু লাভ করিতে পারে না। সুতরাং তাহার ধর্ম্ম-জীবনও আরম্ভ হয় না।

আশাবতী—গুরু না পাইলে কি ধর্ম্মলাভ করা যায় না ?

যোগী—না, গুরু না পাইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; অঙ্ক, ভুগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন, কৃষি বাণিজ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; রন্ধন প্রভৃতি গৃহ-কার্য্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন; কেবল ধর্ম্ম শিখিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্য্যের কথা আর নাই। যদি বল ধর্ম্ম আমার মধ্যেই আছে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা করিব ? তবে ক খ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় ত পড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়; তজ্জন্য অন্যের খোসামোদ করা হয় কেন ? বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে-খনিতে ঔষধ আছে, তাহা শিখিবার জন্য কবিরাজের শিষ্য হও কেন ? যাহার জল-পিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোদাল খন্তা লইয়া কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে প্রবৃত্ত হয় না; যেখানে জলাশয় আছে, সেখনে জলপাত্র লইয়া জল গ্রহণ করে। তদ্রূপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গুরুশক্তিরূপে সর্ব্বভুতে বিরাজ করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে স্থান হইতে সেই রূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। যেখানে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস পবিত্রতারূপ ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেস্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম একটি প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধর্ম্ম। সেই পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বাক্য নহে, শক্তি। ধর্ম্ম মত নহে, কিন্তু সম্ভোগের বস্তু। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে জাগাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি সেই বিষয়ের গুরু। সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহঙ্কার নষ্ট হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরু দর্শন হয় না।

আশাবতী—নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধর্ম্ম হয় না ?

যোগী—হইবে না কেন ? পুষ্করিণী কাটিয়া জল পান করার মত। পিপাসায় প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্করিণী, তাহাতে জল পান না করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া জল পান করিলে যেরূপ সুবুদ্ধির কার্য্য হয়, তদ্রূপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। আমি যে নাম করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পর্শ মাত্র যদি প্রেম ভক্তি

পবিত্রতা প্রাণে ভোগ না করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটি অক্ষর॥ এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর ঃ—

এক ব্রাহ্মণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক স্তব-স্তুতি করিলেন। ব্যাস বলিলেন, "হে বিপ্র! তুমি কি জন্য আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে পরাশর পুত্র! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তোমার শরণাগত, আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়া দাও যে, আমি যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারি।" ব্রাহ্মণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একটী বিল্বপত্রে কিছু লিখিয়া দিয়া বলিলেন, "হে দ্বিজ! এই বিল্বপত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে। এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার স্বৈরবিহারে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ সেই পত্র লইয়া পরমানন্দে সর্ব্বত্র গমন করিতে লাগিলেন। কখন ইন্দ্রলোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে মনের সাধে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, পত্রটী শুকাইয়া গিয়াছে। মনে করিলেন পত্রটী শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব ইহাতে যাহা লেখা আছে তাহা একটী নূতন পত্রে লিখিয়া লই। পত্রটী খুলিয়া দেখেন, "ওঁ রামঃ।" আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ও হরি! এই সঙ্কেত! ওঁ রামঃ!!! লেখারও শ্রী দেখ! দূর হউক শুষ্ক পত্রটা রাখিয়া আর লাভ কি? আমার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত।" ইহা বলিয়া একটা বিল্বপত্রে দিব্য অক্ষরে "ওঁ রামঃ" লিখিলেন, শুষ্ক পত্র কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ স্বহস্ত-লিখিত পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন,—মন, চল একবার কাশী যাই। ওঃ, একি, উঠিনা কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল। কাশী যাওয়া হইল না। তখন ঘৃণা লজ্জা দুঃখে অবসন্ন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, "হে বিপ্র! তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ট করিয়াছে। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে তাহা দেখিও না। আমি বহুকাল গুরু-সেবা-পূর্ব্বক তাঁহার কৃপালাভ করি। সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে সেই শক্তি আমার দেবতারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার কৃপায় ও বরে আমি তাহা সঞ্চারণ করিতে পারি। এজন্য আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্ত্তমান ছিল। সেই শক্তি-প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ। 'ওঁ রামঃ' এই ক'টা অক্ষরের কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই।" ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে, সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি সঞ্চারণ করিলেন না।

আশাবতী—সময় হয় নাই, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

যোগী—কৃষকেরা শস্য রোপণ করিয়া, শস্য পক্ক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। পক্ষী ডিম্ব প্রসব করিয়া তা' দিতে থাকে। সময় না হইলে ডিম ফুটায় না। অসময়ে ফুটালে ডিম কেচে যায়। সেইরূপ যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য আকুলতা হয় নাই—স্বীয় অহঙ্কার নষ্ট হয় নাই, তাহাকে ধর্ম্মের উপদেশ দিলে তাহাতে উপকার না হইয়া অপকার হয়।

আশাবতী যাইতে যাইতে পাহাড়ের নীচে একটি সুন্দর আশ্রম দেখিয়া বলিলেন, "আহা! কি সুন্দর, কি মনোরম, কি নির্জ্জন স্থান! এ আশ্রমের লোক কোথায় ?

যোগী—মা! সে দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ঐ সিন্দুরমাখা প্রস্তরের নিকট যিনি তপস্যা করিতেন, তাঁহার তপঃপ্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হইল। এক জমিদার মোকদ্দমায় পড়িয়া ঐ সাধুর শরণাপন্ন হয়। সাধু অনেক বিনয় করিয়া বলেন—আমি কিছুই জানি না। জমিদার তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাধু দয়ালু, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একটী তুলসী-পত্র জমিদারকে প্রদান করিলেন। দৈবাৎ জমিদার মোকদ্দমায় জয় লাভ করিলেন। এই ঘটনাতে সাধুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি উপস্থিত হইল। অর্থ ব্যয় করিয়া এই অট্টালিকাময় আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিলেন ও অতিথি-সেবার জন্য ঐ অতিথিশালা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দেব-সেবা, অতিথি-সেবা চলিবার জন্য তালুক লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন বড় ধুমধামে আশ্রমের কার্য চলিতে লাগিল। এদিকে সাধুর তপস্যার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কিছুদিন পরে অন্য একজন জমিদার সাধুর তালুকের কিছু অংশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। সাধুর দেব-সেবা অতিথি-সেবা, সাধন-ভজন বিলুপ্তপ্রায় হইল ; বেলা দশ ঘটিকার সময়ে দলিলের কাগজপত্র লইয়া কাছারিতে হাজির হইতে লাগিলেন। সাধুকে কাছারীতে দেখিয়া ক্রমে অন্যলোক তাঁহাকে সাক্ষী মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে সাধুর ধর্ম্মকর্ম্ম চলিয়া গেল ; তিনি একজন পাকা মোকদ্দমাবাজ হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, আশাবতি! তপস্যার ফল একেবারে নষ্ট হয় না, এক রাত্রিতে সাধুর মনে হঠাৎ উদয় হইল যে আমি কি করিতেছি ? হায়, হায়! আমি কি এইজন্য সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি ? ছি, ছি, ধিক্, ধিক্ আমাকে! অরে লোভ! অরে প্রলোভন! আমার সর্ব্বনাশ করিলি! দূর হ, দূর হ, আর না, আর না, জয় গুরু, জয় গুরু। প্রভো! রক্ষা কর—এই কথা বলিয়া সেই নিশীথ সময়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে বারাণসীর দিকে দৌড়িতে লাগিলেন। এইরূপে অনাহারে অনিদ্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে কাশীর নিকট কোন এক গ্রামে গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু শিষ্যের এই উন্মত্তবৎ অবস্থা সন্দর্শনপূর্ব্বক দুঃখ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে

শিষ্যকে কোলে গ্রহণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন। "বাবা রামদাস! তোমার এরূপ দুরবস্থা কেন?" রামদাস বাবাজী গুরুর সস্নেহ আলিঙ্গনে একটু শান্তিলাভ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বীয় অধোগতির সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। গুরু শিষ্যের এই দুর্গতির কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি পলায়ন করিয়া এখানে আসিয়াছ—আসিয়া ভাল করিয়াছ। আর সেখানে গমন করিও না, এখানেই থাক।" রামদাস বাবাজী কিছুদিন গুরুর চরণে অবস্থিতিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শক্তিলাভ করিয়া গঙ্গাতীরে একটী নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যা করেন। এবার তিনি কৃতকার্য্য হন। কারণ যতদিন ইষ্ট দেবতার দর্শন না হয়, ততদিন হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ও সংশয় নষ্ট হয় না—বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা স্বীয় হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। শাস্ত্রে আছে,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

একবারও ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করিলে আর অবিশ্বাস, সংশয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ' ধর্ম্ম' আর কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই ধর্ম্ম, যে হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন, সেই হৃদয়ে ধর্ম্ম বিকশিত হয়। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা সত্য, দয়া, ন্যায় এই সমস্ত ধর্ম্মতরুর ফল, ইহারা তরু নহে। পরমেশ্বর যদি হৃদয়ে প্রকাশ না হন, এই সকলও প্রকাশ পায় না। অন্যের উপদেশ অথবা লোকভয়ে, লোকলজ্জায় অথবা যশোলালসায় যে ধর্ম্মের আচরণ, তাহা স্থায়ী হয় না, কারণ চলিয়া গেলে কার্য্যও চলিয়া যায়। রামদাস বাবাজী তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এজন্য এবার দুটা চারিটা বাহিরের কার্য্য করিয়া প্রতারিত হইলেন না। অনেক পরিশ্রম করিয়া হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মতরু প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মা আশাবতি! যতদিন ঈশ্বর-দর্শন না হয়, ততদিন কিছুতেই সাধক নিঃসংশয় নহেন, তাঁহার পতনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ অহঙ্কার নষ্ট না হইলে পুনঃপুনঃ পতনের সম্ভাবনা।

আশাবতী—পিতঃ! এই আশ্রমবাসী সাধুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। এমন মহাপুরুষের যখন এরূপ দুর্গতি হয়, তখন আমার ন্যায় পাপীয়সীর কি গতি, তাহাই ভাবিতেছি। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন —ঈশ্বর-দর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয় হয় না। কেহ বলে, তিনি সাকার, কেহ বলে নিরাকার। তাহা প্রথমে কিরূপে স্থির করিব ?

যোগী—শাস্ত্রে আছে, তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তিদ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই সকল পদার্থ এবং তত্তদ্‌যোগে যত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই জড়। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য,—ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উভয়বিধ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র।

তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু নিজে স্বতন্ত্র। কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। এজন্য তিনি নিরাকাব। নিরাকার বলিতে শূন্য নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্যরূপ—সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞান-চক্ষু—ভক্তি-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন তাঁহাকে সাকার নিরাকার যাহা বলিয়া প্রকাশ করিবে, তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরদিন ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্ত্তা বাগানে আসিলে বাগানের মালী যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয় উদ্যানে উপস্থিত হইলে অহঙ্কার-মালী দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করে। "প্রভো! আমি দাস,"—মালীর মুখে কেবল এই কথা। প্রভুর আগমনে মালী বন্দনা করিলে শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া প্রভুর স্তব করে, নয়ন তাঁর চরণ ধৌত করে।

আশাবতী—প্রভো! দাসীর প্রতি অনেক কৃপা কবিলেন। ধর্ম্মের এ সকল গূঢ়তত্ত্ব কে আমায় দয়া করিয়া উপদেশ দিতেন?

যোগী-মা! ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব তোমাকে আমি বলি নাই। যখন যোগিনী জননী কৃপা করিবেন, তখনই তাহা অবগত হইবে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। ধর্ম্ম কথা নহে, মত নহে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ, তাহা সম্ভোগ করা যায়।

অতঃপর এক দিবস যোগীবর মহাপুরুষ দর্শনার্থ আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া বরাবর পাহাড়স্থিত মহাপুরুষদিগের একটী অতি নিভৃত আশ্রমে উপস্থিত হইলে, জনৈক সেবক এই নবাগত অতিথিদ্বয়ের সেবার জন্য নরমাংস উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যানকরতঃ মহাপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন।

যোগী—আজ্ঞা, ওরূপ বস্তু ভোজন করা কি ধর্ম্মের অঙ্গ?

মহাপুরুষ—না মহারাজ! ধর্ম্ম এক, গম্যপথও এক। লোকের রুচি অনুসারে নানা মত, নানা পথ। যে, যে-পথে গমন করে, সেই পথের অনুরূপ তাহার আচার ব্যবহার। কোন পথে অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। গম্যস্থানে উপনীত হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। দেখুন, আমরা এই চারি জন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। একজন রামাত, একজন নানকপন্থী, একজন কাপালী, আর আমি অঘোরী। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে মিল ছিল না, বরং ঘোর বিরোধ ছিল। চলিতে চলিতে যখন আমরা গম্যস্থানে অর্থাৎ সত্যগৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা চারিজনেই দেখি যে, আমরা এক স্থানে

আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে। আমরা এক গৃহে একভাবে একবস্তু দেখিতেছি, একরূপ আস্বাদন করিতেছি। ভেদজ্ঞানে হৃদয়ে যে ক্লেশ ভোগ করিতাম, এখন সে ক্লেশ নাই। যত দিন গম্যস্থানে উপনীত না হওয়া যায়, ততদিনই মতভেদ, দলাদলি, সম্প্রদায়। সুতরাং মতভেদের সঙ্গেই আহার-বিহার সমস্ত বিষয়েই ভিন্নতা থাকে।

যোগী—আপনার উপদেশে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম। এখন অনুমতি করুন, আমরা প্রস্থান করি।

অতঃপর যোগীবর আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হইলে, আশাবতী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে যোগীবরকে নিবেদন করিলেন।

আশাবতী—প্রভো! আপানার কৃপায় এই পুণ্যতীর্থ বারাণসী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। ইহা দেখিলে পাষণ্ড হৃদয়েও ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। দেশে থাকিতে শুনিয়াছিলাম যে, কাশীতে অনেক মন্দ লোক বাস করে। স্বদেশে নানারকম কুকার্য্য করিয়া কাশীতে আসিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া বসতি করে। কিন্তু আমি ত মন্দ লোক দেখিলাম না।

যোগী—মা আশাবতি! বারাণসী যে পুণ্য তীর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাগণ বাস করেন, সেই স্থানই প্রকৃত তীর্থ। কাশীতে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন। কাশীতে অনেক মন্দ লোকও আসিয়া বাস করে। অনেক সাধু লোক, ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মার্থী লোকও বাস করে।

যেখানে মনুষ্যের বাস, সেইখানেই ভাল মন্দ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা ভাল লোক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। যাহারা মন্দ, তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া মন্দ লোকের সঙ্গে মিলিত হয়। মধুমক্ষিকা পুষ্প-মধুই অনুসন্ধান করে। আবার দেখ, মলভোজী মক্ষিকা দুর্গন্ধ মলের প্রতিই ধাবিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বকার্য্য একবার অভিনিবেশ-পূর্ব্বক আলোচনা কর, দেখিয়া অবাক হইবে। একখানি ক্ষেত্রে বিবিধ বৃক্ষ লতা রোপিত হয়, একই রস, একই উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু ইক্ষুতে মিষ্ট রস, নিম্বে তিক্ত, মরীচে ঝাল প্রবিষ্ট হয়। সেইরূপ লাল ফুলে লাল বর্ণ, কাল ফুলে কাল বর্ণ, পীত ফুলে পীত বর্ণ প্রবেশ করিয়া মিলিত হয়। যাহার সঙ্গে যাহার মিল, সে তাহার সহিতই সংযুক্ত হইবে। এজন্য তুমি মন্দ লোক দেখিতে পাও নাই; চল আমরা মাতাজীকে দর্শন করিতে যাই।

আশাবতী—মাতাজী কে? তিনি কোথায় থাকেন? আহা! কাল ভাস্করানন্দ স্বামীজীকে দর্শন করিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। সদানন্দ পুরুষ, স্বভাবটী বালকের মত, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি।

যোগী—মাতাজ। মহারাষ্ট্রদেশীয় একটী সুপণ্ডিতা যোগিনী। কাশীর

ষ্টেসনের নিকটে যে কেল্লা দেখিয়াছ, তাহার উত্তরে বরুণা গঙ্গা সঙ্গমের নিকট একটী নির্জ্জন আশ্রমে মাতাজী বাস করেন। চল সেখানে যাই। পথে চলিতে চলিতে কিছুদূরে অগ্রসর হইয়া যোগীবর বলিলেন—মা আশাবতি! গঙ্গাতীর দিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টি কর, ঐ যে আশ্রম দেখিতেছ, ঐটী মা'জীর আশ্রম। চল, বরুণা পার হইয়া ঐ আশ্রমে গমন করি।

আশাবতী—ইহারা ত পারের পয়সা চাহিল না, তবে ইহাদের কিরূপে সংসার চলে?

যোগী—মা! ইহারা পারের পয়সা লইয়া থাকে। কিন্তু ফকির বৈষ্ণব, দণ্ডী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের নিকট পয়সা গ্রহণ করে না। ভারতের যে এত দুর্দ্দশা, রোগ-শোক-দারিদ্রতায় দেশে হাহাকার উঠিয়াছে, তথাপি প্রাণসম ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারিতেছে না। এখনও মুষ্টিভিক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবনধারণ করিতেছে। শুনিয়াছি ইংরেজরা এই মুষ্টিভিক্ষা দান করাকে অসভ্যতা বলেন। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, এই অসভ্য রীতির অভাবে ইংরেজদের সহর লণ্ডন নগরেই দশ সহস্রেরও অধিক দুঃখী নিরাশ্রয় ভিক্ষুক পথে পথে দিনরাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাক্ষাৎভাবে দয়া না করিয়া লোকের প্রাণ নিষ্ঠুর হইয়া যায়। সকলে চাঁদা করিয়া দুঃখীর জন্য দাতব্য-আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হইল, দুঃখী দেখিলে বলা হইল—দাতব্য আশ্রয়ে যাও। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মচারীদিগের হৃদয়হীন ব্যবহারে দুঃখী সেখানে যাইতে চায় না। সে গেল না, আর আশ্রয় পাইল না। ক্রমে পথে পথে দস্যু তস্কর হইয়া দিন যাপন করে। এরূপ প্রণালীতে লোকের প্রাণ দয়াশূন্য হয়। দুঃখীও নিরাশ্রয় হয়। তথাপি চাঁদাদান সভ্যতা, আর সাক্ষাৎভাবে মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা দুঃখীকে আশ্রয়ে রাখা অসভ্যতা!!! এ দুঃখের কথা বলি কাকে, শুনে কে? ইংরাজ আজি দেশের রাজা, গুরু আদর্শ। যাহা ইংরেজ বলিবে তাহাই সত্য, বেদ-বাক্য। এই সকল নৌকার মাঝিমাল্লারা ইংরাজী অনুকরণ শিক্ষা করে নাই, তাই আমরা বিনা পয়সায় পার হইলাম। এস মা, একটু চলে এস।

আশাবতী—বড় কেশে বন, মানুষের মাথা ঢেকে যায়। এপথে একা যেতে আমার সাহস হয় না।

যোগী—কেন মা, মানুষ কি কখনও একা থাকে? যিনি বিশ্বনাথ, তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে।

আশাবতী—একথা সত্য। কিন্তু যতদিন আমি তাঁহাকে সর্ব্বস্থানে না দেখি, ততদিন মুখের কথায়, পুস্তকের লেখায় সাহস হয় না। একজন পাঁচ বৎসরের বালক সঙ্গে থাকিলে মনে বল থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিতেছি, অথচ অন্ধকারে ঐ গাছ-তলায় যাইতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

একটী আলো সঙ্গে থাকিলে ভয় দূর হয়। জ্যোতির ঘরের মধ্যে আছি, তথাপি ভয়। অতএব মুখে পরমেশ্বর আছেন বলা না বলা সমানই।

যোগী – মা আশাবতি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য কথা। ঈশ্বরে ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করিয়া যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া আন্দোলন করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকতা বর্দ্ধিত হইতেছে। কারণ যে ব্যক্তি মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে, কিন্তু আচরণে নাস্তিক, তাহাকে দেখিয়া লোকে মনে করে যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া যাহারা গোলযোগ করে, তাহারা ভণ্ড।

আশাবতী—ইহাও তাহারা বাড়াবাড়ি করিয়া বলে। কথার সঙ্গে আচরণ না মিলিলেই যে সে ভণ্ড হইল, তাহা নহে। যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া কথা ও কার্য্য এক করিতে পারিতেছে না, কিন্তু যত্ন করিতেছে, তাহাকে ভণ্ড বলা যায় না। যে জানিয়া শুনিয়া কপট ব্যবহার করে, সেই ভণ্ড, চোর ; তাহা দ্বারা সকল পাপই সম্ভব।

যোগী—সত্য, মা, সত্য। ঠিক বলিয়াছ। এই যে আশ্রমে আসিয়াছি। কুপটীর ধার দিয়া এস।

আশাবতী—(মা'জীর চরণ ধারণপূর্ব্বক) মা! আজি আমার সুপ্রভাত, জন্ম সার্থক। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইল।

মা'জী—কেন মা! এত দৈন্য কেন মা! ভক্তিভরে ভগবানের নাম কর, সকল আশা পূর্ণ হবে। যতদিন ভগবৎপদারবিন্দসুধাস্বাদ না হয়, ততদিন বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইলে মনুষ্য সুখ-দুঃখ, রোগ-শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হয় না—বিষয় ভোগে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। ঋষিরা বলিয়াছেন 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—অনন্তেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। তবে দেখ মা! পরমেশ্বরই অনন্ত, আর সকলেই অল্প। সেই অনন্তকে না পাইলে আশার বিরাম হইবে কেন? শৈশব হইতে আমরা বড় জিনিষই ভালবাসি। কেবল যে বড় ভালবাসি তাহা নহে, বড় ভালবাসি, সুন্দর ভালবাসি, মঙ্গল ভালবাসি, পুরাতন ভালবাসি, ভালবাসা ভালবাসি। এই সমস্ত বস্তু যতদিন না পাই, আশা মিটে না। অবশেষে দুরাশার টানে পড়ে সংসার-প্রান্তরে দৌড়াদৌড়ি করে প্রাণ যায়।

যোগী—শাস্ত্রেও আছে,

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সংশয় সকল দূরীভূত হয়, কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।

মা'জী—আহা, কি সুন্দর উপদেশ! ইহা শ্রবণেও প্রাণে আশার সঞ্চার

হয়। পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে ঐরূপ অবস্থা হয়। তবে ত তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, বিশেষতঃ তাঁহাকে না দেখিলেও প্রাণ সুস্থ হয় না, আচ্ছা বাবা! ধন্য ধন্য!

আশাবতী—করিতে পারি না এই দুঃখ।

মা'জী—সকলই শনৈঃ শনৈঃ হইয়া থাকে; কিছুই এক দিনে হয় না।

আশাবতী—আপনার আশ্রমের পশ্চিম দিকে একজন বাঙ্গালী বাবুকে দেখিলাম, তিনি কে?

মা'জী—তিনি আগে ওকালতী করিতেন, এখন সব ছাড়িয়া থিয়সফিষ্ট হইয়াছেন।

আশাবতী—থিয়সফি কি মা?

মা'জী—ও সকল ইংরাজী নাম। আমার নিকট কর্ণেল অল্‌কট্ নামে একজন সাহেব এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং আর একজনের মুখে (অর্থাৎ দোভাষীর দ্বারায়) হিন্দু শাস্ত্রের প্রশংসা করিলেন। শুনিলাম, তিনি নাকি বাঙ্গালী বাবুদিগকে যোগ শিক্ষা দেন। তাঁর যোগ শিক্ষার একটী সভা আছে. তাকে থিয়সফি বলে।

আশাবতী—বাবুরা সাহেবের কাছে যোগ শিখছেন কেন? দেশে কি যোগী নাই?

মা'জী—সে কেমন জান! নির্ম্মল গঙ্গাজল পান না করিয়া নর্দ্দমার পাঁকে গঙ্গাজল ঢালিয়া সেই কাদাজল পান করিলে যেমন সুবুদ্ধির কার্য্য হয়, ইহাও তদ্রূপ। তবে এখন সাহেব যা বলে, সকলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করে। এদেশের যোগী দেখিতে অসভ্য, তার কথা শুনিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

আশাবতী—মা! ঠিক বলেছেন। সেদিন গয়ার আকাশ-গঙ্গার বাবাজী একটী বাবুকে বলিলেন, যে আমি ধ্যানে দেখিয়াছি, বৃক্ষগণ নিদ্রা যায়। বাবু খুব হাসিল। সেখানে একটি ভক্ত ছিলেন, তিনি বলিলেন, কেন বাবু, আপনি হাসিতেছেন কেন? সে দিন আমেরিকার একখানি ইংরাজী পত্রিকায় লিখিয়াছে, যে বৃক্ষেরা নিদ্রা যায়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বাবু বলিলেন, বটে, তবে ত কথা সত্য। দেশের এই দুর্গতির মধ্যে, যদি কোন সাহেব কৃপা করিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করেন,' তা সৌভাগ্যের কথা।

মা'জী—হাঁ মা! অল্‌কট্ সাহেবের দ্বারা উপকার হইতেছে। আগে বাবুরা এদেশের শাস্ত্রাদিকে ঘৃণা করিয়া পাঠ করিতেন না। অল্‌কট্ সাহেব শাস্ত্রের প্রশংসা করাতে অনেকে শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন; কেহ কেহ প্রতিদিন গীতা, ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন।

যোগী—আহা। ভারতের কল্যাণ হউক, দুর্দ্দশার দিন তিরোহিত হউক, জননী জন্মভূমি, তোমার কল্যাণ হউক।

মা'জী—গোলাপ গাছে গোলাপ ফুল হয়। মা আশাবতি! তোমাতে তোমার গুরুর রং ফলিয়াছে। জন্মভূমি জননীকে যিনি এত ভক্তি করেন, তুমি তাঁর শিষ্যা, এইজন্য আপনাকে দুঃখিনী বলিয়াছ। জন্মভূমির দুঃখ দূর করিতে, স্বার্থ ত্যাগই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মই স্বার্থনাশের একমাত্র হেতু। অতএব যে কেহ আজি এই দুর্দ্দশার দিনে ভারতে আস্তিকতার দ্বার খুলিয়া দিবেন, তিনিই ভারতের পরম বন্ধু।

যোগী—মা আশাবতি! চল মা, আমরা তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিয়া তিলভাণ্ডেশ্বরে গমন করি। (কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া) ঐ দেখ, স্বামিজী বসিয়া আছেন।

আশাবতী তৈলঙ্গস্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে বলিলেনঃ—

প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানি না; আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি মহাপুরুষ, জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইয়া আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ হইতেছে। আমার প্রশ্ন এই যে জগতে উপাস্য দেবতা কত জন? এবং তাঁহারা কে?

তৈলঙ্গস্বামী প্রস্তরখণ্ড দ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেন—"উপাস্য দেবতা এক। যে ব্যক্তি যে কোন নামে, যে ভাবে পূজা করুক, সেই একেরই পূজা করে। কারণ দেবতা এক মাত্র, অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই। তিনি শিবং অর্থাৎ মঙ্গলং।

আশাবতী—তাঁহার রূপ কি?

তৈলঙ্গস্বামী—তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, যোগিগণের হৃদয়রঞ্জন।

আশাবতী—তবে প্রতিমা-পূজা কেন?

তৈলঙ্গস্বামী—পূজা দুই প্রকার, সাবলম্বন আর নিরবলম্বন। প্রতিমা, জল, স্থল, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, এইরূপ সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে পূজা, তাহাই স্বাবলম্বন এবং নিকৃষ্ট। যতদিন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন উহার কোন একটী অবলম্বন না করিলে পূজা হয় না। ব্রহ্ম-দর্শন হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না। সাবলম্বন পূজার মন্ত্র "যে দেবতা ঘটে, প্রতিমায়, জলে, অগ্নিতে, সর্ব্বভূতে বিশ্বসংসারে সেই দেবতাকে নমস্কার।" কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্র কেবল "ত্বং হি, ত্বং হি।" সাবলম্বন পূজা সোপান, উহার কোনটীতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থা লাভে বিলম্ব হয়।

আশাবতী—প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি?

তৈলঙ্গস্বামী কোন উত্তর না লিখিয়া যোগাসনে বসিয়া সাধন-প্রণালী দেখাইলেন।

যোগী—আশাবতি! দেখ, দেখ, কি শোভা! যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে! কি উচ্চহাস! যেন রাজঘাটে হাসির তরঙ্গ আঘাত করিতেছে!

তৈলঙ্গস্বামী ভাব সংবরণ করিয়া স্থির হইলেন। যোগী ও আশাবতী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

যোগী—চল মা! এখন তিলভাণ্ডেশ্বরে যাই।

আশাবতী—ভাস্করানন্দ স্বামীজীর নিকট আর একটী উদ্যানে যে বাঙ্গালী সাধুটীকে দর্শন করিলাম, তাঁহার বিনয় দেখিলে লজ্জা হয়। আহা, কি মধুর স্বভাব! তাঁহার দয়াও আশ্চর্য।

যোগী—মহাত্মারা দয়ার সাগর। তাঁহাদের দয়ায় কত দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়। দেখিলে ত তৈলঙ্গস্বামীর নিকট আমরা যতক্ষণ ছিলাম, তাহার মধ্যে জলকষ্ট নিবারণের জন্য এবং দুঃখী ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও বিবাহ দিবার জন্য কত অর্থব্যয় করিলেন। সাধু মহাত্মারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া এরূপ অনেক কার্য্য গোপনে গোপনে করিয়া থাকেন।

আশাবতী—আপনি যে ভগবদ্দীতা পাঠ করেন, তাহাতে লেখা আছে, যে সাধক অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান্ তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন—একথা সত্য, সন্দেহ মাত্র নাই। সংসারাসক্ত মনুষ্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করে, তথাপি পরিবার ভরণপোষণে অক্ষম। অর্থের অভাব কিছুতেই যায়না। আর যাঁহারা বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের চরণে দেহমন অর্পণ করিয়া কেবল তাঁহারই পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাণ্ডার অযাচিত দানে পরিপূর্ণ। যেমন আয়, তেমন ব্যয়, স্থিতির ঘর শূণ্য। দাতা যিনি, ভাণ্ডারীও তিনি, ব্যয়কর্ত্তাও তিনি; ভক্ত কেবল লীলা দেখিয়া আনন্দলাভ করেন। এমন দয়ালু দাতা আর কে আছে?

যোগীবর ও আশাবতী তিলভাণ্ডেশ্বরে যাইয়া দেখিলেন, যে এক পাঠক মহাশয় তথায় শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন। তিনি বাহির হইয়া উভয়কে বসিতে আসন দিলেন।

আশাবতী—আপনার পাঠ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছি। দয়া করিয়া উপদেশটী আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমার উপকার হয়।

পাঠক—মা! উপদেশ কি বুঝাইব? আমি আজিও উপদেশ বুঝিতে পারি নাই। প্রথমে সত্য, যাহা আছে তাহাই সত্য। আমি আছি, কিন্তু আমি কে? শরীর কি আমি? না, কারণ শরীর জড় পদার্থ। আমি চেতন, শরীর আমার গৃহ। শরীর যন্ত্র, আমি যন্ত্রী। কিন্তু আমি কোথায়?

আমাকে দেখি নাই, চিনি নাই। তবে আমি আছি কে বলিল? জনশ্রুতি শুনিয়া যাহা বলি, তাহা আমার নিকট সত্য নাও হইতে পারে। কারণ অন্য প্রকার শুনিলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। যাহা সত্য তাহার পরিবর্ত্তন নাই ; তাহা নিত্য, ভ্রম-প্রমাদ-বর্জ্জিত এবং সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। যতদিন আমাকে আমি না জানি, না চিনি, ততদিন আমি অসত্যে পড়িয়া রহিয়াছি।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আছেন। যতদিন আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করি, কেবল শোনা কথা বলি, ততদিন আমার পক্ষে পরমেশ্বর, জগদীশ্বর বলা বিড়ম্বনা। কারণ দুদিন পরে কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গ করিলে বলিয়া উঠিব 'ঈশ্বর নাই'। যদি একবার তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলেই আমার পক্ষে তিনি সত্য হইলেন। হাজার নাস্তিক "নাই নাই" বলিলেও আর পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যতদিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন অসত্যে ডুবিয়া আছি। এজন্য প্রথমে অসত্য হইতে সত্যেতে যাইবে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতেতে যাইবে। সত্যশীল না হইলে অন্যান্য উপদেশ কেবল জনশ্রুতি মাত্র, তাহার কার্য্য হইবে না। অতএব আর উপদেশ আলোচনা না করিয়া আত্মতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যশীল হও। সত্য না জানিয়া সত্য জানি বলাই অসত্য। যে অসত্যকে পোষণ করে, সে আত্মাপহারী চোর ; তাহা দ্বারা কোন পাপই অকৃত থাকে না। অতএব সরল হও, সত্যশীল হও, জীবন ধর্ম্মময় হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

[সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত গোস্বামী-প্রভুর সংস্রব সম্পূর্ণ ছিন্ন হইবার পর, তিনি ঢাকা সহরের উপকণ্ঠ স্থিত গেণ্ডারিয়া নামক স্থানে একটী স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র ৺নাম-ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম যাজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে স্বীয় গুরুদেবের আদেশে গোস্বামী-প্রভু প্রায় এক বৎসরকাল মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদবস্থায় কেহ প্রশ্ন করিলে, তিনি কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে লিখিয়া উত্তর প্রদান করিতেন। এই সকল প্রশ্নোত্তর আশ্রমস্থ সেবকবৃন্দ অতিশয় যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গোস্বামী-প্রভুর শেষ জীবনে বহু স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু ভক্ত ও অপরাপর মহানুভব ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন; এবং তিনি তাঁহাদের প্রশ্নের যে সকল উত্তর প্রদান করিতেন, তাহা শ্রীযুক্ত কুলদা-কান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত সুবন্যচন্দ্র দাস, ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন শিষ্যের প্রশ্নে তিনি যে সকল উত্তর প্রদান করিতেন, তাহাও তাহারা স্মরণার্থে লিখিয়া রাখিতেন।

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক গোস্বামী-প্রভুর সেই সকল বিভিন্ন সময়ের কতকগুলি উপদেশ সংগ্রহ করিয়া এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইল।]

প্রশ্ন—পরমপদ লাভের অধিকারী কে? কাহাকে শোকে অভিভূত করিতে পারে না?

উত্তর—

"ব্রহ্মবিদ্ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিদ্।
রসোব্রহ্ম রসং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি নান্যথা॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমপদ লাভ করেন; আত্মবিদ্ শোক হইতে মুক্ত হন; রসস্বরূপ ব্রহ্মের রস লাভ করিয়া আনন্দ হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রমত বলা অজ্ঞানতা।

বেদ উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে পারা কঠিন। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে ধর্ম্মের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারা যায় না। আদি পর্ব্বে একটী বিষয়ের উল্লেখ, শান্তি পর্ব্বে তাহার মীমাংসা রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে একটী বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সমস্ত অংশ মার্কণ্ডেয় পুরাণে। মনুসং-

হিতায় এক বিষয়, তাহার ব্যবস্থা বৃহৎ-গৌতম-সংহিতায়। নির্বাণ-তন্ত্রে এক বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রুদ্রযামলে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায় ও সামবেদ সংহিতায় যে সকল আখ্যায়িকা, তাহার মীমাংসা শ্রীমদ্ভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে—ইত্যাদি। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্র না পড়িয়া শাস্ত্রের মত বলা বিড়ম্বনা ও অজ্ঞানতা মাত্র।

ধর্ম্মের বহির্ভাগ লইয়াই দলাদলি।

সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের বহির্ভাগ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া দলাদলি, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের পরিচয়। এই অবস্থা ভেদ করিয়া, প্রকৃত যাহা জীবনে মরণে সহায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ধর্ম্মের মতামত লইয়া বিবাদ অনেক পরিমাণে চলিয়া যাইবে।

প্রচলিত কোন ধর্ম্ম পূর্ণভাবে নহে। এক এক অংশ লইয়া এক এক সম্প্রদায় হইয়াছে ; সুতরাং সকলের সঙ্গে ঐক্য আছে, কিন্তু আংশিকভাবে।

বস্তুগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না।

নামে পাতকী উদ্ধার হয়, ইহা বস্তুগুণ। বস্তুগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না। অগ্নিতে হাত দিলে পুড়িবেই। যাঁহার একটুও ভক্তি আছে, তিনি যদি অভক্তির সহিত নাম করেন, তবে সে ভক্তিটুকু শুকাইয়া যায়। ভক্তির সহিত নাম করিবে।

মানবের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ।

মানবের যে জ্ঞান তদ্দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর বিচার করা যায়। ভগবৎ-তত্ত্ব মানবীয় জ্ঞানের অধীন নহে। ঋষিগণ অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা জ্ঞানকে দুই ভাগ করিয়াছেন।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চ চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥"

অর্থাৎ সেই পরমাত্মা বাক্য, মন ও চক্ষুর অগোচর। তিনি আছেন—এই বোধ ব্যতীত, জীবের তৎসম্বন্ধে অন্য জ্ঞান লাভ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? মন্ত্র, তন্ত্র, তীক্ষ্ম মেধা, কিংবা বহু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বরণ করেন, একমাত্র সে-ই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। ভগবান্ তাঁহার নিকট স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।

মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট, তার এত অভিমান যে, সে আত্মজ্ঞানে ভূমা ঈশ্বরকে

জানিবে ?—কখনই নহে ? আত্মজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানা দূরে থাকুক, নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকে পর্য্যন্ত জানিতে পারে না।

ভগবানে অবিশ্বাসই সমস্ত অশান্তির মূল।

ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। বিধি-ব্যবস্থা, নিয়ম-প্রণালী অব্যর্থ। প্রত্যেক পদার্থে দৃষ্টি করিলে সমস্তই অসীম বোধ হয়। যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই ব্যবস্থা আছে—নিয়ম আছে। তবে একটু ঝড় বর্ষার আধিক্য দেখিলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া বিচার করি কেন? অসন্তোষ প্রকাশ করি কেন?—মূলে অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের মূল কি? পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, আত্মস্বার্থ-চিন্তা করিতে করিতে এই দুর্গতি উপস্থিত হয়। এইজন্য ধার্ম্মিকের একটী প্রধান লক্ষণ, তিনি প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না; আত্মপ্রশংসা বিষ-তুল্য জ্ঞান করেন; হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দেন না, জীবে দয়াবান ও ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া সর্ব্বদা জীবন-পথে চলেন। ভগবানের কার্য্যে অবিশ্বাসী হইলেই অসন্তোষ। হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই-ই সমান। ইহাই ধর্ম্মজীবনের পরিচয়; ইহাতে সকলের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভগবানে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত।

ভগবান প্রথমে বামন অবতার হইয়া বলি নামক মানবাত্মা-রূপ অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। মনুষ্য সংসারের ধর্ম্ম করিতে বসিয়া অত্যন্ত অভিমান প্রকাশ করে। আমি দাতা, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত, আমি ইন্দ্রস্বরূপ সমস্ত দেবগণের রাজা। মনুষ্যের এই ধর্ম্মাভিমান দেখিয়া পরমেশ্বর বামন হইয়া, আত্মার আত্মা হইয়া মনুষ্যের নিকট ত্রিপাদ প্রার্থনা করেন। ত্রিপাদ শুনিতে সামান্য, কিন্তু ইহাই জীবের সর্ব্বস্ব। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—ভগবান এই ত্রিপাদ অধিকার করিলে, বিরাট মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জীবের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলির দ্বারী হইয়া পাতালে ছিলেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, ভগবান তাহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, জীবকে আর ভাবিতে হয় না।

প্রশ্ন—ভগবানে অচলা ভক্তি হয় কিসে? কিরূপে তাঁহাতে মন সমর্পণ করিতে পারা যায়?

উত্তর—এ সম্বন্ধে ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদে বিশেষ বিশেষ উপায় বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্র "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদগীতা, ভক্তমাল—এই সমস্ত গ্রন্থ এবং চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত

গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলে, অনেক জন্মের সুকৃতিবলে ভগবৎভজনের জন্য প্রাণগত ব্যাকুলতা জন্মে। সেই সময় সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ মত অকপটে সাধন করিলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া সাধককে আপন দাস বলিয়া মনোনীত করিয়া দর্শন দেন। সমস্ত সুন্দর বস্তুকে যিনি রচনা করিয়াছেন, সেই পরম সুন্দরের শ্রীঅঙ্গের কোন এক অংশ মাত্র দর্শন করিলে, মনুষ্য তাঁহার চরণ ছাড়া হইতে পারে না।

প্রশ্ন—কোন্ অবস্থায় জীবের ভগবদ্দর্শনের অধিকার জন্মে?

উত্তর—ঋষিগণ বলিয়াছেন, প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান—সর্ব্বভূতে তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ, আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ লাভ। তৃতীয় ভগবৎ সম্বন্ধ— পূজা অর্চ্চনা। এই অবস্থায় তাঁহার রূপ দর্শন হয়। সেইরূপ সচ্চিদানন্দময়, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে। রূপ বলা হয় এই জন্য, যে এই ভাব প্রকাশের অন্য ভাষা নাই।

লোকের সমক্ষে সাধক যতই হীন, মলিন বলিয়া পরিচিত হন, ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল।

প্রথমে যদি আমি ধার্ম্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত—এইরূপ অভিমান লাভ করি, চারিদিক হইতে লোক ঐরূপ সম্মান দান করে, তখন যদি অন্তর অসাধু, ধর্ম্মহীন, অজ্ঞান, অভক্ত হয়, তবে পূর্ব্বের সম্মান বজায় রাখিতে গিয়া, মানুষ ক্রমেই কপট হইয়া ঘোর পাপের মধ্যে ডুবিতে থাকে। এ জন্য লোকের সমক্ষে নিজে যতই হীন মলিন রূপে পরিচিত হই, ততই মঙ্গল। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ঋষিগণ প্রতিদিন চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। প্রথম স্বাধ্যায় অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ, নাম (গুরুদত্ত মন্ত্র) জপ। দ্বিতীয়—সৎসঙ্গ। তৃতীয়—বিচার; সর্ব্বদা নিজের অন্তর পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি আত্ম-প্রশংসা ভাল লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়, তবে আপনাকে নরকগামী মনে করিতে হইবে। সাধুর সাধারণ লক্ষণ এই যে, তিনি আত্ম-প্রশংসাকে বিষবৎ অপকারী জানেন, পরনিন্দা অধর্ম্মের মূল জানেন। নিজের অন্তরের ধর্ম্মভাব প্রতিদিন হ্রাস হইতেছে, না বৃদ্ধি পাইতেছে, এই বিচারের সর্ব্বদা প্রয়োজন। চতুর্থ—দান; দান শব্দে ঋষিরা দয়া বলিয়াছেন। কাহারও প্রাণে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া, শরীর, বাক্য ও অন্য কোনরূপে কাহারও প্রাণে কষ্ট দিলে দয়া থাকে না। বৃক্ষ লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য—সর্ব্বজীবে দয়া কর্ত্তব্য।

এই স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, বিচার ও দান প্রতিদিন সাধন করিতে হইবে। কেহ কেহ ইহার সঙ্গে তপস্যা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিতে অভ্যাস করা প্রয়োজন বলিয়াছেন। এই উপায়ে সহজে নিবৃত্তি লাভ হইবে।

কবীর ও গুরু নানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই।

কবীর ও গুরু নানকের ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। কবীর জোলা ছিলেন, এই জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মধ্যে তাঁহার মত গৃহীত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমে মেথর, ডোম, চামার এই সমস্ত জাতি কবীরপন্থী। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে তাহাদের পদধূলি না লইয়া থাকা যায় না। গুরু নানক ক্ষত্রিয় ছিলেন। এজন্য তাহার মত অবাধে সকলের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। তিনি বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও উপনিষৎ সকল মান্য করিয়া উপদেশ দিতেন এবং মনমুখী অর্থাৎ অশাস্ত্রীয় পন্থার অপকারিতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

নানক সম্বন্ধে দুই মত। একমতে তাঁহাকে অবতার বলা হয়, অপর মতাবলম্বীরা বলেন, তিনি রাজর্ষি জনক। জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য নানকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের মত ও বৈষ্ণবের মত একই প্রকার। নানকজী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, এজন্য তাঁহার মতাবলম্বী লোকদিগকে নানকপন্থী বলে। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" তিনি ভগবানের আদেশমত হ, ব, গ, র, (হরি, বাসুদেব, গোবিন্দ, রাম) এই আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট নাম দিতেন।

সকল দলে থাকিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না।

সকল দলে থাকিলে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয় না। অবিরত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ, সংসারে যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়, তাহা পরিত্যাগ এবং লোক-নিন্দা ও প্রশংসা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

পুরুষকার কৃপা।

কৃপা অনেক উপরের কথা। মানুষের মনুষ্যত্বকে মানবীয় ধর্ম্ম বলে; যেমন জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণত্ব ইত্যাদি। প্রত্যেক মনুষ্য সাধনা করিলে, মানবীয় ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে; এই দেবত্ব লাভে কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যদি নষ্ট হয়, তাহা সাধু উপায় দ্বারা পুনরায় লাভ করা যায়; এজন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত কহে। শরীরের মধ্যে চক্ষু একটী ইন্দ্রিয়; চক্ষুর দর্শন, যদি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, তবে ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিবে। মনুষ্যত্ব মধ্যে অনেক গুণ আছে, তন্মধ্যে দয়া প্রধান গুণ। এই দয়া যথার্থভাবে পরিচালিত হইলে অহিংসা মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য্য হইবে। এই মনুষ্যত্ব হইতে উন্নত হইলে দেবত্ব, দেবত্ব হইতে উন্নত হইলে জীবাত্মা, পরব্রহ্মের অসীম সত্তায় প্রবেশ করিয়া লীলারস সম্ভোগ করেন।

ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন তাহাতেই আনন্দ করিতে হইবে।

একজন প্রার্থনা করিল, 'প্রভো! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার বলিতে যেন কিছুই না থাকে, সমস্তই তোমার।' পরমেশ্বর উত্তর করিলেন—'হে মানব, এমন কথা বলিও না। আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দাও, অবশিষ্ট সকল তোমার থাকুক, তুমি জান না যে কি বলিতেছ।' ঐ ব্যক্তি কাতর হইয়া বলিল, 'প্রভো! তাহা হইবে না। আমার যেন কিছু না থাকে, সব তোমার হউক।' পরমেশ্বর যখন তাহার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-বন্ধু, সমস্ত নষ্ট করিয়া পুত্রটীকে লইতে যান, তখন সে কাঁদিয়া বলিল,—'প্রভো! কি করিতেছ? আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।' তখন ভগবান তাহার সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—'এই লও, আগেই বলিয়াছিলাম তোমার কর্ম্ম নয়।'

ভগবান যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাতেই আনন্দ করিতে হইবে। আমার নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই। "কাষ্ঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচায়" আমাকে সেইরূপ কর। তুমি যে জীবনের আধার!

প্রশ্ন—গৃহস্থ কাহাকে বলে এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর—গৃহে বাস করিলেই যে গৃহী হয়, তাহা নহে। কারণ উদাসীন সন্ন্যাসীরাও গৃহে অথবা ঐরূপ কোন আবরণের নীচে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে গৃহী বলে না। যাহারা পতি পত্নী একত্রে বাস করেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থ বলে।

পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। নারায়ণরূপে তিনি পুরুষে এবং লক্ষ্মীরূপে তিনি স্ত্রীতে রহিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণ-রূপে পূজা ও ভক্তি করিবেন। আবার পুরুষ স্ত্রীকে লক্ষ্মী ভাবিয়া ভক্তি, আদর যত্ন করিবেন। ভগবান যে পুরুষে নারায়ণ ও স্ত্রীতে লক্ষ্মীরূপে আছেন, এই কথা ভাবের অথবা কল্পনার কথা নহে। সত্য সত্যই তিনি স্ত্রী-পুরুষে ঐরূপ-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে এইরূপে পূজা ও ভক্তি করে এবং স্বামীও স্ত্রীর শত অপরাধ থাকিলেও তাহা ক্ষমা করিয়া এইরূপ লক্ষ্মী ভাবিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, সেই পরিবারে কখনও অশান্তি আসে না। পূর্ব্বকালে ঋষি-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই প্রকার সাধন ছিল বলিয়াই, তাঁহারা সর্ব্বদা পরমানন্দে থাকিতেন। স্ত্রী-পুরুষের এই পবিত্র ভাবটী রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অতিথি-সেবা গৃহস্থদিগের একটী প্রধান ধর্ম্ম। অতিথি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে খুব ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত আহারাদি দ্বারা সেবা করিতে না পারিলে বরং এক গ্লাস জল দিবে। তাহাও না পারিলে, অগত্যা আসন দিয়া বসিতে বলিবে এবং দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় দিবে।

গৃহস্থ পিতামাতাকে, গৃহে ঠাকুরদেবতা থাকিলে যেরূপ পূজা করা হয়,

সেই ভাবে সেবা করিবে। পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা মনে করিয়া পূজা করিলে সহজেই ভগবানকে লাভ করা যায়। লোকে ইহা বুঝে না। সে যাহা হউক, দেবতার মত তাঁহাদিগকে পূজা করিতে পারুক আর নাই পারুক, ভক্তি অবশ্যই করিবে।

শাস্ত্রে গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ-যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। পঞ্চ-যজ্ঞ যথা ঃ—

১। দেবযজ্ঞ—উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদি।

২। ঋষিযজ্ঞ—ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ।

৩। রাজযজ্ঞ—রাজ কর দেওয়া ইত্যাদি।

৪। প্রাণিযজ্ঞ—প্রত্যেক দিনই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদিগকে কিছু খাইতে দেওয়া ও বৃক্ষলতাদিগকে কিছু কিছু জল দেওয়া।

৫। আত্মযজ্ঞ অথবা মনুষ্য-যজ্ঞ—মনুষ্যমাত্রকেই কিছু না কিছু দান করা।

গৃহস্থদিগকে এইভাবে প্রত্যহ চলিতে হইবে। যে ইহা না করে, তাহার ধর্ম্মলাভ হয় না। যে গৃহে ইহা না থাকে, সেখানে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। এই পঞ্চযজ্ঞ ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। ধর্ম্ম ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

প্রশ্ন—শ্রীমন্ মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নূতন, না শাস্ত্রে আছে?

উত্তর—শ্রীচৈতন্য যে ভাব প্রচার করিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। অতি পূর্ব্বকালে সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার—এই চারিজন ও ব্রহ্মার মানস-পুত্র নারদ, ইঁহারা সর্ব্বদা একত্র হইয়া নাম-গান করিতেন। অহিংসাই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে প্রীতি, তৃণের মত নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া, সর্ব্বদা হরিনাম-স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন ইত্যাদি ভাব এই পাঁচ জন প্রচার করেন, এইজন্য ইঁহাদিগকে আদি-বৈষ্ণব বলে। সনৎকুমার সংহিতা অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব-উপাসনা অদ্যাপি প্রচলিত। কালের গতিতে এই বৈষ্ণব ভাব ম্লান হইয়া, যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড প্রচলিত হয়; ক্রমে উহা এতদূর মলিন হয় যে, মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হন, তখন মনসা পূজা, বিষহরির গান ও দুই একটী স্তোত্র মাত্রই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করাতে লোকের উহা নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সমাজে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভু যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পাঁচ সাত জন যাঁহারা আছেন দেখা যায়, তাঁহারা অধিক সময়ে নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। সময়ে সময়ে একত্রে হরিনাম করিয়াও কৃতার্থ হন।

ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত উপনিষদের ভাষ্যস্বরূপ।

ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুইখানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্যস্বরূপ।

গীতা এবং ভাগবতের প্রণালীতে সাধন করিলে, ঋষিদিগের প্রাণের কথা "সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে, কলিযুগে কি প্রকারে সহজে মানুষের পারত্রিক মঙ্গল হইতে পারে ?

উত্তর—পঞ্চদেবতা পূজা বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মীমাংসা আছে। এতদূর অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ না হইলে, প্রচলিত প্রণালী মতে চলিলেই হইতে পারে। উপাসনা দুই নিয়মে প্রচলিত—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বঙ্গদেশে বৈদিক উপাসনা প্রচলিত নাই বলিলেই হয়; কেবল গায়ত্রী সন্ধ্যা ব্রাহ্মণগণ করেন। তাহার উপর তান্ত্রিক দীক্ষা লইয়া থাকেন। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব—এই পঞ্চ উপাসনা প্রণালীর কোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রতিদিন পূজার সময় প্রথমে গুরুপূজা করিয়া ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া পরে ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়; ইহাতে নিষ্ঠা হইলে সকলই লাভ করা যায়।

নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আছে ঃ—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলির দুর্দ্দশা দেখিয়া শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কলির জীবের জন্য একমাত্র হরিনামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'হরি' এই কথাটি মাত্র হরিনাম নহে। যে নামে পাপ হরণ করে, তাহাই হরিনাম। কালী, কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা—সমস্তই হরিনাম। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী হরিনাম। নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্ত করে। মূল কথা, শাস্ত্র ও সদাচারের অনুগত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্ম লাভ হয়।

দীক্ষা বীজ বপনের ন্যায়।

দীক্ষা বীজ বপনের ন্যায়। যে জমি প্রস্তুত, তাহাতে বীজ বপন করিলে অঙ্কুর হয়। কৃষক বীজ বপনের পূর্ব্বে অনেক যত্নে জমি প্রস্তুত করে; জমি প্রস্তুত হইলেও অসময়ে বীজ বপন করে না। কারণ প্রত্যেক শস্যের সময় আছে। বীজ মাটির নীচে থাকে। সেইরূপ দীক্ষার মন্ত্র হৃদয়-ক্ষেত্রে রাখিয়া সাধন-ভজন করিলে অঙ্কুর দেখা যায়। জমি প্রস্তুত, সময় ও বীজ বপন—এই তিনের উপর অনেক নির্ভর করে।

স্বপ্নে দেবদর্শন ও তাহার উপকারিতা।

স্বপ্নে দেবদর্শন যদি প্রকৃত হয়, তবে বিষয়াসক্তি নষ্ট হইবে। ঐ দেবদর্শন বিষয়ে কখনই সন্দেহ হইবে না। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহা কখনই ভুলিবে না এবং মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস হইবে

—আমি ধন্য হইয়াছি, উদ্ধার পাইয়াছি। যাহা প্রকৃত দর্শন নহে, কেবল স্বপ্ন মাত্র, তাহাতে এরূপ অবস্থা কখনই হইবে না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ইষ্টদেবতা যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে সাধিত হন, সাধন-সিদ্ধির পূর্ব্বে সেই দেবতা স্বপ্নে দর্শন দিয়া আকর্ষণ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সাক্ষাৎ ভাবে দেখা দিতেন। কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন ও সিদ্ধিলাভ একই কথা; এজন্য স্বপ্নে দর্শন দিয়া থাকেন।

যে সকল স্বপ্ন মহাপুরুষেরা দেখান, তাহা সত্য হয়।

অনেক সময় স্বপ্নেই মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্নে যখন দেখবে, নানা প্রকার প্রলোভনে প'ড়েও চিত্ত স্থির আছে, কোনওদিকে বিচলিত হচ্ছে না, তখনই ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ'লেই বুঝিবে ভিতরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। গুরু সম্পর্কে অথবা দেবতা সম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা সত্য বলে জানবে। ওর ভিতর অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা একটা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল সাধন ভজন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে তাহা অনায়াসে লাভ হ'তে দেখা গিয়াছে। আমি যখন ডাক্তারী করিতাম, শক্ত রোগীদের চিন্তা হ'লে প্রায়ই পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার স্বপ্নে আমাকে ঔষধের কথা বলে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।

যোগ কাহাকে বলে এবং তাহার লক্ষ্য কি?

যদ্দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়, তৎসমস্তই যোগ। "সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে যোগ, তাহাকে যোগ কহে। ইহা ভিন্ন যে যোগ তাহাকে হঠযোগ কহে। কেবল নাম, পূজা, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মনন ভক্তিযোগের অঙ্গ।

শ্রীহরিনাম-জপ, ইহাও যোগ। প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের বহিরঙ্গ,—ইহা করিলেও হয়, না করিলেও হয়।

যোগের লক্ষ্য—পরমেশ্বরকে লাভ করা অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষু (অন্তশ্চক্ষু) দ্বারা তাঁহার সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন করা, এবং তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, জ্ঞান-রসনায় তাঁহাকে আস্বাদন করা, জ্ঞান-নাসিকায় তাঁহার ঘ্রাণ লওয়া, জ্ঞান-ত্বক্ দ্বারা তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্পর্শ করা। এইরূপ আমাদের সমগ্র আধ্যাত্মিক প্রকৃতির দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করাই ঈশ্বর লাভ। ইহাই মানবাত্মার অনন্ত কালের উপভোগের বিষয় এবং ইহাতেই তাহার অনন্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর-সহবাস ব্যতীত মানবের প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি অসম্ভব। এই ব্রহ্ম-সম্ভোগেই প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়া থাকে; নতুবা বিশ্বাস কেবল পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। উক্ত সম্ভোগ যতই ঘনীভূত হয়, বিশ্বাস ততই উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এবং মানব ধর্ম্মরাজ্যে ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে ঋষিদিগের পন্থার অনুসরণ হয় না।

গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তবে ফলদায়ী হইবে, ইহা শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র ও সদাচার না মানিলে ঋষিদিগের পথের অনুসরণ হয় না।

ব্রাহ্মণের উপনয়ন পূর্ব্বকালের বৈদিক দীক্ষা।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের যে উপনয়ন হয়, তাহা পূর্ব্বকালের বৈদিক দীক্ষা। গার্ভধান হইতে ব্রাহ্মণের দশকর্ম্ম বৈদিক মন্ত্রে সম্পন্ন হয়। ইহা প্রাচীন প্রথামাত্র, ইহাতে প্রাণের অভাব দূর হয় না। এজন্য সমস্ত বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সমস্ত দেশে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচলিত।

কুলগুরু অর্থ পৈত্রিক গুরু নহে।

শাস্ত্রে আছে, কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হইবে। এই কুলগুরু অর্থ পৈত্রিক গুরু নহেন। দেশের লোক অর্থ না বুঝিয়া পিতামাতার গুরুকে, বংশগত গুরুকে কুলগুরু বলেন। কুলগুরু অর্থ তন্ত্র-শাস্ত্রে আছে যিনি সাধনা দ্বারা অন্তর্নিহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়াছেন, তাঁহাকে কুলগুরু বলে। এইরূপ কুলগুরুর নিকট দীক্ষা না লইয়া, যার-তার কাছে দীক্ষা লওয়াতে দেশের ধর্ম্মের এত দুর্গতি হইয়াছে।

প্রশ্ন—কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে আজকাল তেমন ফল পাওয়া যায় না কেন ?

উত্তর—আজকাল গুরুকরণ বড়ই সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁহারা গুরু ছিলেন,—সব সিদ্ধ-পুরুষই ছিলেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হ'লেই তাঁদের কুলগুরু বলা হতো। এখন কুলগুরু বলতে লোকে বংশপরম্পরা গুরু বুঝে। এখন যাঁহারা গুরুর কার্য্য করছেন, অনুসন্ধান নিলে জানা যায় তাঁদের কেহ না কেহ সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও সিদ্ধ-পুরুষদের বংশে যাঁহারা গুরুর কার্য্য করিতেন, সিদ্ধ না হইলেও তাঁহারা বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষাদিও তাঁহারা ভাল জানতেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হইলে গুরুরা তাহার কোষ্ঠি লইয়া জন্ম লগ্ন ধরে গণনা করতেন। গণনা দ্বারা দীক্ষার্থীর প্রকৃতি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক অথবা তামসিক জে'নে নি'য়ে, ঐ প্রকৃতির সহিত কোন্ দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা স্থির ক'রে নিতেন। পরে ঐ ব্যক্তির দেহ মন ও প্রকৃতির সহিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনুকূল প্রতিকূল কি প্রকারের যোগাযোগ তাহাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তারপর যে সকল অক্ষর স্মরণে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাহার গুণানুযায়ী প্রকৃতির

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিমুখে তাহাকে অগ্রসর হইতে সাহায্য কর্‌বে, তাহা একটি একটি করিয়া গণনা দ্বারা বাহির ক'রে ফেলিতেন।

পরে সেই সকল অক্ষরের সংযোজনায় মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শিষ্যকে প্রদান করিতেন। এবং তদনুযায়ী পূজা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রণালীতে দীক্ষা হইলে গুরুর কোন সাহায্য না পেলেও, শিষ্য যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মন্ত্র-জপ ও ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং ঐ দেবতার একটা সাহায্য পাইলে ইষ্টবস্তু-প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারেন।. ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ী প্রণালী মত দীক্ষা পাইয়া সাধক যদি রীতিমত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার একটা ফল হ'তেই হবে। এজন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু সাধারণ থাকলেও শিষ্য সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই প্রণালীর দীক্ষা প্রায় হয় না। শাক্ত ঘরে একটী বৈষ্ণবপ্রকৃতি লোককে গুরু এসে বংশের প্রণালী অনুসারে, হয়ত শক্তির উপাসনাই দিলেন। আবার বৈষ্ণব-বংশের একটী শাক্ত ভাবের লোককে হয়ত বিষ্ণু-মন্ত্রই দিয়া সেইমত নিয়ম-পদ্ধতি ব'লে গেলেন। এই প্রকার প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া সাধন-ভজন করায়, কোন উপকারই হইতে দেখা যায় না। তামস ভাবের একটী লোককে সাত্ত্বিক উপাসনা করতে হ'লে, তার যেমন প্রকৃতি, মন, এমন কি, শরীরের পর্য্যন্ত, অনুপরমাণুর প্রলয় ঘটাইয়াও সকল সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত কর্‌তে হয়। তাহা না হইলে সত্ত্বগুণী দেবতার প্রসন্নতা লাভ অসম্ভব। সেই প্রকার সত্ত্বগুণীরও তামস দেবদেবীর উপাসনা করিতে হইলে ঐ প্রকার কর্‌তে হয়। এ সব সহজ নয়, এজন্যই পনর বৎসর বয়সে কেহ সাধন নিয়া আশী বৎসর পর্য্যন্ত জপতপ করিয়াও, একটা দেব-দেবীর দর্শন বা কৃপা প্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আবার কেহ বা ছেলে-বয়সেই অল্প দিন সাধন-ভজন করিয়া নিজ উপাস্য দেবতার কৃপা বিষয়ে পরিষ্কার প্রমাণ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা গুরুর কার্য্য করেন, প্রায়ই অন্য কোন বিচার না করিয়া শুধু বংশের ধারা ধ'রে তাঁহারা সাধন দেন বলিয়া অনেক অনিষ্ট হইতেছে। কারণ সাধন-ভজন করিয়া লোকে ফল না পাওয়াতে, মন্ত্রের উপর, ক্রিয়ার উপর এবং দেবদেবীর উপর একটা অবিশ্বাস এ'সে পড়েছে। তবে কৌলিক গুরুর নিকট বিধিমত দীক্ষা গ্রহণ করিলে, গুরু-শক্তির কোন সাহায্য না পেলেও অন্য কোন অনিষ্টের তেমন সম্ভাবনা নাই। এবং সাধকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকিলে উহাতে উপকারই হয়। কিন্তু অজ্ঞাত-কুলশীলের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করায় অনেক সময় বিষম বিপদ ঘটে।

প্রশ্ন—সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে কি কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে?

উত্তর—বিচার-শূন্য হইয়া 'কেহ সিদ্ধপুরুষ' শুনা মাত্রেই, তাঁহার নিকটে গিয়ে দীক্ষা নেওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধ তো কত রকম আছে! প্রেতসিদ্ধ, কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবী-সিদ্ধ, ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধ ইত্যাদি। যাঁহার যাহা সঙ্কল্প, তিনি তাহা লাভ করলেই তো সিদ্ধ হইলেন। আমি যা চাই, সে বিষয়ে যিনি সিদ্ধ নন, তিনি আমাকে সেই পথ বলে দিতে পারবেন কেন? ও বিষয়ে সাহায্যই বা কি করবেন। যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সেই পথই মাত্র বলিয়া দিতে পারেন। সিদ্ধ হলেই আর সর্ব্বজ্ঞ হ'লেন না—আর সিদ্ধ হলেই যে তিনিই ধাম্মিকও হইবেন তাহাও বলা যায় না। ধর্ম্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রাখিয়াও কত লোক কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছেন। শুধু হঠযোগ মাত্র অভ্যাস দ্বারা ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে কোন ব্যক্তি চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, নক্ষত্রলোকে সশরীরে অনায়াসে গতিবিধি কর্‌তে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক, ইহা কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ব্বে ঋষিপদবাচ্য হইয়াও কেহ কেহ নাস্তিক ছিলেন। সুতরাং কোন সিদ্ধ ব্যক্তির নিকটেও সাধন গ্রহণের পূর্ব্বে, তিনি কিসে সিদ্ধ, সেটি বেশ ক'রে জে'নে নি'তে হয়। সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি লোক সিদ্ধ নাম শুনেই যদি একজন কাপালিক বা পিশাচসিদ্ধের নিকটে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং সেই প্রণালী মত মদ্য মাংসাদি সংসৃষ্ট তামস সাধন করিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহার তার কি উপকার হইবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাধন করিয়া সিদ্ধ-গুরুর সাহায্য সত্ত্বেও উপকার কিছুই হইবে না, বরং অনিষ্টই হইবে। এজন্য দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে সিদ্ধ-পুরুষ জেনেও, রীতিমত তাঁহার সঙ্গ কিছুকাল করতে হয়। ক্রমে তাঁহার ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, সাধন-ভজন দেখে, যদি তাঁর প্রতি চিত্ত তেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধ বলে জানা যায়, তবেই তাঁর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এই প্রকার হইলে সিদ্ধ গুরুর সাহায্য এবং নিজ প্রকৃতির অনুকূল-সাধন-চেষ্টায়, সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।

প্রশ্ন—সদ্‌গুরু কি? তাঁর দীক্ষার বিশেষত্বই বা কি? আর ঐ দীক্ষা লাভ হ'লে কি অবস্থা হয়?

উত্তর—সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। তাহা সম্পূর্ণ কৃপা- সাপেক্ষ। এই দীক্ষা যে কোন অবস্থায় যথায় তথায় একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হইয়া থাকে। ভগবানই 'সদ্‌গুরু'। সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না; তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে নিজের দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই সেবা-পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁহার মন্দির। দেব মন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হইলে, সেবক যেমন তাহা দেখিয়া লজ্জিত হন, দুঃখিত হন, শিষ্যেরও কোন দুর্দ্দশা দেখ্‌লে এই গুরু তেমনিই নিজেরই সেবা পূজার ত্রুটি হ'য়েছে

মনে করিয়া মলিন হয়ে যান। সদ্‌গুরু প্রদত্ত নাম—নাম নয়, অক্ষর নয়, বা একটা শব্দ নয়—এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তি সঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা ভগবানের কৃপায় একবার কাহারও লাভ হইলে, তাহার নিজের আর কিছুই করিবার থাকে না। তাহার জীবনের সমস্ত কার্য্য, এমন কি প্রত্যেকটী শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত সেই একজনেরই ইচ্ছাধীন। কুমীরেপোকার আরসোলা ধরার মত সদ্‌গুরু, শক্তি-সঞ্চার করে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে ঃ—'দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।'

প্রশ্ন—পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন সাধু নাকি বিনা সাধন-ভজনে হাতে হাতে ভগবান দর্শন করাইয়া দিতে পারেন ?

উত্তর—ঐ সকল প্রেতাদির কার্য্য। দেবতা-সিদ্ধি, পিশাচ-সিদ্ধি, এখন এ সকল সাধন অধিক প্রচলিত। শ্রীবৃন্দাবনে একবার একটী পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তি তাহার পিশাচের দ্বারা একটী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আমাকে ভুলাইতে চাহিয়াছিল। পিশাচেরা নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি ধরিতে পারে। প্রকৃত ভগবদ্দর্শন হইলে,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥

অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বরের দর্শন হইলে হৃদয়-গ্রন্থি অর্থাৎ মায়াজাল ছিন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকারের সংশয় বিদূরিত হয় এবং জন্ম-জন্মান্তরের সকল প্রকারের কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন এক প্রকার অভুতপূর্ব্ব আনন্দরসে শরীর মন আপ্লুত হয়। এই সকল অবস্থা না হইয়া যদি প্রাণে জ্বালা আসে, অথবা কোন প্রকার ভয় উপস্থিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহা প্রেতাদির কার্য্য।

যাহারা ডাকিনী-যোগিনী ও প্রেতাদি সিদ্ধি লইয়া থাকে, তাহাদের সাত জন্ম পর্য্যন্ত ভগবদ্ভজন হয় না।

পশ্চিম দেশীয় আর এক প্রকার সাধু আছে, তাহারা স্বরোদয় সাধন-প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষের দুই চারিটী মনের কথা বলিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে বিপথে চালিত করে। আর একদল সাধু আছে, তাহারা কর্ণ-পিশাচ সিদ্ধ। এই সকল পিশাচের সাহায্যে তাহারা অপরের সাত পুরুষের নাম বলিয়া দিতে পারে। এই সকল ভণ্ড প্রতারকেরা অনেক সময় গীতা ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিয়াও সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। সাধুগিরিই ইহাদিগের চিরন্তন ব্যবসায়। এই সকল লোক হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে।

অন্তর্য্যামী রূপে ভগবানের পাপ কার্য্যে বাধা।

যখন মনুষ্য অধর্ম্ম করে, তখন নারায়ণ তাহাকে নিবারণ করেন। যখন

কিছুতেই শুনে না, তখন নারায়ণ পলায়ন করেন। নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও ধীরে ধীরে চলিয়া যান। তখন কেবল পূর্ব্ব গৌরব থাকে। পুরাতন গৌরব বহন করিতে মস্তকে ক্ষত হয়। ক্ষতের দুর্গন্ধে লোকে নিকটে যাইতে দেয় না। তাহাতে হয় বিবাদ, লোকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

প্রশ্ন—জীব কাহাকে বলে ?

উত্তর—জীব শব্দের অর্থ কেবল প্রাণী নহে, যাহা বর্দ্ধিত হয়, তাহাই জীব।

জীবে দয়া।

সৃষ্টির সমস্ত সেই ভগবানেরই, সকলের মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান। আমার মঙ্গল যেমন দেখেন, ক্ষুদ্র জীব তৃণ, তাহার মঙ্গলও সেইরূপ দেখেন। তিনি সকলেরই উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধির উপরে নির্ভর করে।

ধর্ম্ম অধর্ম্ম মনের অভিসন্ধি অনুসারে। মনুষ্য-সমাজ যাহা পাপ পুণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহা দ্বারা ভগবান বিচার করেন না। তিনি মনুষ্যের হৃদয় দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের দুর্গতির কারণ।

রামমোহন রায় মহাশয় ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করেন। সেই পন্থা হারা হওয়াতে (ব্রাহ্মসমাজের) নানা দিকে গতি। শাস্ত্র ও সদাচার ভিন্ন অন্য পথ দিয়া যদি ব্রহ্মলোকেও কেহ লইয়া যায়, তাহাও যাইবে না। কারণ দৈবাৎ দুই এক ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে অন্য পথে সৎগতি পাইতে পারেন। কিন্তু যাহাদের প্রথম আরম্ভ, তাহারা ঘোর অন্ধ তামসে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা ঋষি-বাক্য।

শাস্ত্রে ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে কেন তাহার মীমাংসা।

শিশুর আহার এক প্রকার, বালকের আহার এক প্রকার, যুবার আহার এক প্রকার, বৃদ্ধের আহার এক প্রকার, রোগীর আহার এক প্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টি-লাভ করে। এক জনের আহার আর এক জনকে দিলে তাহার জীবন নষ্ট হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে ব্যবস্থা, অধিকারী-ভেদে উপদেশ।

অদ্বৈতবাদ মত নহে।

অদ্বৈতবাদ মত নহে, আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে, তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, কেবল ব্রহ্ম-সত্তাই দেখেন। অনন্ত সাগরে একটী জলকণা প্রবেশ করিলে, সে চারিদিকে

সমুদ্রের হিল্লোল দেখে,—কখনও ডোবে, কখনও ভাসে। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে ঋষি-মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া সাধন করিতেন কেন? ইহাই পরম গতি, পরম সম্পৎ।

কর্ম্ম—প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান।

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া একবার মানুষ হয়; সেই জন্মে যে কর্ম্ম করে, তাহাকে প্রারব্ধ, সঞ্চিত, বর্ত্তমান বলে। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম শেষ করিতে অনেক জন্মমৃত্যু হয়—তাহা মানব-জন্মের ঘটনা মাত্র। এইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তখন জীব মায়া হইতে মুক্ত হয়।

মনুষ্য জন্ম পাইয়া ভগবদ্ভজন না করিলে পুনরায় অধোগতি হয়।

মনুষ্য জন্ম পাইয়া যদি ভগবানের ভজন-পূজন না করে, তবে পুনর্ব্বার অধোগতি হইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। মনুষ্য-জন্ম পাইয়া যদি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে, বলার মত বলে, ডাকার মত ডাকে অর্থাৎ শিশু যেমন মা শব্দ শুনে, মা বলিয়া ডাকে, তাহাতে মা শিশুর নিকট দৌড়িয়া আসেন, এইরূপ হইলেই কার্য্যসিদ্ধ হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি (মায়া-পাশ) ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

এই প্রতারণাময় সংসারে এক হরিনাম ভিন্ন সহজ, সুখের বস্তু আর কিছুই নাই।

মায়া—বাস্তবিক মায়া কি? যদি বল সংসারে পরম সুখে আছি—ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে? একটু বিচার করিয়া দেখ—অধিক স্থানেই প্রতারণা। কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে কৃত্রিম প্রণয় দেখাইয়া অন্যকে ভালবাসিতেছে, কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া অন্য নারীতে আসক্ত। কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে; কোন স্থানে পিতা পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছে। তবে সংসারে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে, কৃষকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও ভক্তি দেখা যায়। যেখানে অর্থের সম্বন্ধ, সেখানে ভালবাসা দুর্ল্লভ। বস্তুতঃ ধনীদিগের ন্যায় যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল। সকলেই টাকার জন্য ভালবাসিতেছে, হাসিতেছে, মুখপানে চাহিয়া আছে। রোগ-শুশ্রূষা অর্থের জন্য। এইরূপ সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে সংসারে যথার্থ সুখী কে, ইহা

বাহির করা সুকঠিন। তবে যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই, এরূপ লোক যদি সংসারে থাকে, তাহারাই সুখী। ইহাদের সংসার—সংসার নহে—স্বর্গ আর সকলই অসার—অসারের অসার।

একমাত্র হরিনাম ভিন্ন সহজ সুখের বস্তু আর কিছুই নাই। যথার্থ ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সে ভালবাসা কোথায়? বরং বিচার করিয়া দেখিলে সংসার অসারই বোধ হয়। প্রকৃত মায়া হরিনামে, সংসারের কোন্ সুখের জন্য মায়া হইবে?

কোন ধর্ম্ম পন্থা গ্রহণ করা মাত্রই কেহ মুক্ত হয় না।

রোগী হাসপাতালে গিয়া আশ্রয় লওয়া মাত্র আরাম হয় না। ঔষধ খা'বে, কুপথ্য করবে না, যথার্থ সুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকবে, নিশ্চয় আরাম হ'বে। সেইরূপে কোন সাধন-পন্থা গ্রহণ করিবামাত্রই কেহ মুক্ত হয় না। সাধনের পরিণত অবস্থার নামই মুক্তি।

নামের সঙ্গে নামের বাচ্য কে, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হয়, নচেৎ শুধু নামের দ্বারা ফল পাওয়া যায় না।

পাঁচ বৎসরের শিশু, তাহাকে ক্ষেত্রতত্ত্ব কিংবা জ্যোতিষ শিক্ষা দিলে ফল হইবে না; অথচ সাধারণ সত্যে সকলেরই অধিকার আছে। জগৎকে একমাত্র নাম উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু কাহার নাম ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে হয়। যেমন হরি শব্দে সূর্য্য, চন্দ্র, অশ্ব, সিংহ, বানর এ সমস্ত বুঝায় এবং হরিনামে পাপহরণকারী ভগবানকেও বুঝায়; এজন্য নামের সঙ্গে নামের বাচ্য কে, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে হয়। ব্রহ্মনামে জগৎ, ব্রহ্ম ও আত্মজ্ঞানবিৎ এইরূপ অনেক অর্থ আছে; এইজন্য প্রথমে বস্তুজ্ঞানের প্রয়োজন। এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন—এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহাকে কেবল নাম উপদেশ দিলেই হয়, অন্য উপদেশের প্রয়োজন হয় না। সকলেই মুখে বলে, একজন কর্ত্তা আছেন, ইহা বিশ্বাস নহে; কারণ একটু বিপদ আপদ হইলেই, আর কর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারে না।

যে আর কিছুই জানে না, কেবল শিশুর ন্যায় রোদন করে, সেই শিশুর ন্যায় অন্তরের অবস্থা হইলেই এক নামেই নামীকে পাওয়া যায়।

চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্য জন্ম লাভ করে।

শাস্ত্রে আছে জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্য জন্ম লাভ করে। নূতন মনুষ্য-জন্ম যাহাদের, তাহারা কুকী, ভীল প্রভৃতি নিরক্ষর বন্য লোকের মধ্যে দশ জন্ম পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। পরে নিকবর্ত্তী লোক-সমাজে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ অনেক জন্ম পরে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়। বিষয়-জ্ঞান প্রথম জন্ম হইতেই লাভ হইতে থাকে।

শাস্ত্র ও সাধুমহাপুরুষে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দ্বারা সভা-সমিতি হইলে তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

এখন শ্রদ্ধাবান্ লোক পাওয়া যাইতেছে না, সকলেই মহাত্মাদিগকে পরীক্ষা করিতে চায়। একবার পরীক্ষা দিলে আবার চায়। যখন শ্রদ্ধাবান্ লোকের সংখ্যা অধিক হইবে, তখন তাঁহারা যদি সভা করেন, সেই সভা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। ইহার মধ্যেই অনেক ইংরাজী শিক্ষিত লোক শাস্ত্র ও মহাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন। শাস্ত্র-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহারা যখন ক্রিয়াশীল হইবেন, তখন অপূর্ব্ব ঘটনা হইবে। ইংরাজের কথা বাবুরা শুনেন, এজন্য এখন ইংরাজ দ্বারা কার্য্য হইতেছে।

গীতা মাহাত্ম্য।

গীতার উপদেশ অতি সুন্দর। প্রথম কর্ম্ম—প্রবৃত্তি-অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে করিতে বিবেক-বৈরাগ্য সময় সময় উদিত হয়। তখন নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্ম শেষ হয়; কিন্তু বাসনা থাকে। কর্ম্ম শেষ হইলে বিষয়কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন ভগবৎ-শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনে মতি জন্মে। ইহা করিতে করিতে ভক্তি প্রকাশিত হয়। ভক্তিতে হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ অবস্থা—পরে দর্শন। পরে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ' ইত্যাদি।

গীতার এক একটী অক্ষর—এক একটী বীজমন্ত্রের ন্যায়। বীজমন্ত্র যেমন সাধনায় জাগ্রত হয়, গীতার্থেরও সেইরূপ চৈতন্য হয়। ইহা টীকা দেখিয়া কি বুঝিবার সাধ্য আছে? শ্রীধর স্বামী ও শঙ্করাচার্য্য যে টীকা করিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ টীকা হইতে পারে না, কিন্তু তাহা দ্বারাও বুঝিবার সাধ্য নাই। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন রঙ্গনাথের মন্দিরে দেখেন, একজন গীতা পাঠ করিতেছেন, কিন্তু অশুদ্ধ। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি গীতা পাঠ করিতেছেন ও কাঁদিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি গীতার অর্থ কিছুই বুঝি না; কিন্তু আমি যখন পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই রথের উপর অর্জ্জুন ধনুক হস্তে করিয়া আছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরজ্জু ধরিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া উপদেশ দিতেছেন। ইহা দেখি আর কাঁদি। তখন মহাপ্রভু বলিলেন, আপনিই গীতা-পাঠের প্রকৃত অধিকারী।

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ সাধন কি?

উত্তর—শ্বাসে-প্রশ্বাসে গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ করাই পরম সাধন।

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কার্য্যই নিয়মমত চলিতেছে।

ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই নিয়ম আছে। অনিয়মে বিশৃঙ্খলায় কোন কার্য্য হয় না। কি ধর্ম্মরাজ্যের ঘটনা, কি জড় জগতের ঘটনা, সমস্তই

নিয়মের বাধ্য। মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম যে প্রণালীতে হয় হাজার চেষ্টা করিলেও তাহার অন্যথা হইবে না। ভগবান্ নিয়ন্তা এবং দয়াময়। তিনি একদিকে পাপীকে কঠোর শাস্তি দিতেছেন, সেই সময় আবার অন্য দিক হইতে তাহার রোগের সেবা করিতেছেন।

পুরুষকার ও দৈব—উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।

পুরুষকার কৃষকের কৃষিকার্য্যের ন্যায়। কৃষক জমি প্রস্তুত করে, শস্য রোপণ করে, এই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্য। তাহার পর তাহার আর ক্ষমতা নাই। আকাশ হইতে জল-বর্ষণ না হইলে, সে জল-সেচন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আন্তরিক উদ্যম তপস্যা, ইহা প্রযুক্ত হইলেই মেঘ হইতে জল-বর্ষণের ন্যায় ভগবানের কৃপা-বর্ষণ হয়।

মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র গৃহত্যাগ অবিধেয়।

কিছুদিন সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে এবং তাপে দগ্ধ ও শুষ্ক হইলে, অগ্নিপরীক্ষিত হইলে, যেখানে যাউক, কেহ নষ্ট করিতে পারে না। মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র যদি গৃহত্যাগ করে, তবে পতনের অনেক কারণের মধ্যে পতিত হইতে হয়। সেই সময় সাবধান না হইলে সর্ব্বনাশ।

বিষয়-কর্ম্ম, ইহাও একপ্রকার সাধন। কর্ম্মেতে বদ্ধ থাকা বাস্তবিক বদ্ধ নহে। কর্ম্ম যথার্থ কর্ত্তব্যবোধে করিতে পারিলে, তাহাতে সহজে বাসনা কাটিয়া যায়।

উপাসনা—তান্ত্রিক ও পৌরাণিক।

পঞ্চ উপাসনা—এখন যাহা প্রচলিত তাহা তান্ত্রিক। পৌরাণিক উপাসনা—তাহাতে দেবতার তপস্যা করা হইত। দেবতারা প্রত্যক্ষ হইয়া বর দিতেন।

নামের নেশাই শ্রেষ্ঠ নেশা।

হরিনাম, ইষ্টনাম করিতে করিতে এক প্রকার নেশা হয়, তাহার নিকট ভাং, গাঁজা, আফিং, সুরা প্রভৃতি যতপ্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা ছোটে না, তাহা সর্ব্বদা স্থায়ী।

যুগ।

যুগের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। তপস্যার প্রাধান্যের নাম সত্যযুগ, নীতির প্রাধান্যের নাম ত্রেতাযুগ, বলের প্রাধান্যের নাম দ্বাপরযুগ এবং ধনের প্রাধান্যের নাম কলিযুগ।

যুগ-ধর্ম্ম।

সত্যযুগে ধ্যান এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার যজ্ঞ। ত্রেতায় জ্ঞান ও

যজ্ঞ। দ্বাপরে দেবতা ও মহাপুরুষদিগের অর্চ্চনা। কলিতে দান ও নাম জপ।

একাগ্রতা লাভের উপায়।

একাগ্রতা অভ্যাস অনেক প্রকার। কিন্তু যত উপায় আছে, সমস্তই সাময়িক। যতক্ষণ উপায় অবলম্বন করা যায়, ততক্ষণ অল্প অল্প মন স্থির হয়। এজন্য বাহিরের উপায় সাময়িক মাত্র। মনের সংকল্প-বিকল্প নষ্ট না হইলে চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা হয় না। এজন্য উপনিষদে আছে,—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

ভগবান আছেন—এইটী সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই সকল একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। স্মরণ—প্রথমে অস্তিত্ব স্মরণ, সর্ব্বকালে স্মরণ, সর্ব্বভুতে, সর্ব্বস্থানে সকল ঘটনায় স্মরণ। দ্বিতীয় মনন—অস্তিত্ববোধ হইলেই মন সেই দিকে আপনা হইতেই যায়—যেমন সর্প আলোক দর্শন করে ; সর্প আলো দেখিলে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না। তৃতীয় নিদিধ্যাসন—গরু যেমন জাবর কাটে, স্মরণ মননে যাহা পাইয়াছি, পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ করা। এই তিনটী একাগ্রতা লাভের বিশেষ উপায়।

প্রশ্ন—মনঃসংযমের প্রধান অন্তরায় কি ?

উত্তর—মনের সঙ্কল্প-বিকল্প সর্ব্বদাই হইতেছে। ইহাতে মন অস্থির হয়। মনের উপর কর্ত্তৃত্ব আসে না। ইহার প্রধান কারণ কারণ দুইটি—ইন্দ্রিয় প্রবল, জিহ্বা ও উপস্থ। উপস্থ অনায়াসেই লোকে দমন করিতে পারে, কিন্তু জিহ্বাকে সহজে লোকে দমন করিতে পারে না। কেহ নিন্দা করিলে, কটুবাক্য বলিলে, জিহ্বা তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করিবে। এই জিহ্বা বশীভুত হইলে, নিন্দা-প্রশংসায় চঞ্চল করিতে পারে না।

আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ যোগ আছে।

যাহার যে অভাব তাহা সেই জানে, অন্যে বুঝে না। নিজের শরীরে কি চায়, তাহা অনেক বিজ্ঞও জানেন না। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, ইহার কোন্ পদার্থের কোন্ কার্য্য, তাহা না জানিলে প্রকৃত আহার কি, তাহা জানা যায় না। বালক শৈশবে নিজে মলত্যাগ করিয়া নিজে ভক্ষণ করে এবং অতি আনন্দে হাস্য করে, কিন্তু পিতামাতা ঘৃণায় নাকে হাত দেন।

ক্রোধী যদি লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধিকর উত্তেজক বস্তু ভোজন করে, কামুক যদি মৎস্য, মাংস, ঘৃত, মধু এবং মিঠাই ইত্যাদি খায়, লোভী যদি অধিক তিক্ত খায়, অহংকারী যদি অধিক মসুরের ডাইল খায়, সংসার-মোহে আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অম্ল খায়, অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়, তাহা হইলে ঐ শিশুর ন্যায় আহার করা হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ অবাক হইয়া থাকেন।

সাংখ্য-যোগে কপিলদেব পঞ্চতত্ত্বকে বিভাগপূর্ব্বক, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদি লইয়া ঊনবিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন ও প্রত্যক তত্ত্বের সহিত শরীর মনের কি সম্বন্ধ এবং আত্মার সহিত শরীর মনের কি সম্বন্ধ, তাহা ঠিক করিয়া আহার-বিহার সকল ঠিক্ ঠিক্ দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, যোগবাশিষ্ট, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, পাতঞ্জল দর্শন, মৈত্রোপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবৎগীতা, রুদ্রযামল তন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এবিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। তাহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ আছে, কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছে। এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্কা খায় না, তাহাকে লঙ্কা খাইতে দিলে সমস্ত দিন তাহার শরীরে জ্বালা হইবে এবং তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মও রহিত হইবে।

প্রশ্ন—শাক্ত ও বৈষ্ণবে প্রভেদ কি ?

উত্তর—ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসক শৈব, সৌর, গাণপত্য ও শাক্ত। মাধুর্য্য ভাবের উপাসক বৈষ্ণব। রামসীতা, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা উপাসক যদি ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসক হন, তবে তাঁহাদিগকে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি বলিতে হইবে। কালী, দুর্গা, শিব, নারায়ণ ও গণপতির উপাসক যদি মাধুর্য্য ভাবের উপাসক হন, তবে তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। রামপ্রসাদের মত বৈষ্ণব কয় জন ?

আনন্দ প্রকৃত।

আনন্দ প্রকৃতি। সমস্ত জগতের যে বস্তু স্বভাবে আছে, তাহাই আনন্দময়। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী সমস্ত আনন্দময়। মনুষ্যও যতটুকু স্বভাবে থাকে ততটুকু আনন্দ পায়। মনুষ্যের স্বভাব যত বিকশিত হইতে থাকে, আনন্দও তত বিকশিত হয়। যাহারা পাপ-চিন্তা ও পাপ কার্য্য দ্বারা স্বভাবকে বিকৃত করিয়াছে, তাহারা নিরানন্দ ভোগ করে। পাপে শরীর রুগ্ন হয়, মন অপবিত্র হয়। পুণ্যলাভ করিয়া স্বভাব লাভ না করিলে আনন্দ পাওয়া যায় না। রোগ ও পাপযন্ত্রণায় জীবন গত হয়।

হরিনামে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কীর্ত্তনে একটু নৃত্য করিলে, একটু ভাব হইল, ইহাকেই এখন ধর্ম্ম বলে। ইহা ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের প্রথম অঙ্গ। সত্য, ন্যায়, জীবে দয়া, পিতা-মাতা গুরুজনে ভক্তি, সৎসঙ্গে স্পৃহা, পরস্ত্রী দর্শনে সাবধানতা, পরধনে অলোভ, এইগুলি প্রথম অঙ্গ। হরিনামে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে, উক্ত লক্ষণ-গুলি প্রথমে দেখা দেয়। উহা না হইলে জীবনে ধর্ম্মের আরম্ভই হইল না।

ত্রয়োদশ লক্ষণাক্রান্ত সত্য।

সত্যবাক্য—যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, তাহাই লোকের নিকট প্রকাশ করিলাম, ইহাকেই অনেক সত্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সত্য কি? যাহার লক্ষ্য সৎ। একজনকে অপদস্থ করিবার জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যদি সত্য কথাও বলা যায়, তাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এজন্য মহাভারতে সত্য বাক্যের ত্রয়োদশটী লক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা—সত্য বাক্য হইলে তাহাতে পরনিন্দা থাকিবে না, স্বার্থ থাকিবে না, আত্মপ্রশংসা থাকিবে না। ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, জীবে দয়া সেই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ, প্রতিবেশীর প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি ছলনা-রহিত প্রেম তাহাতে থাকিবে এবং বাক্যও সত্য হইবে।

সত্য (ধর্ম্ম) "অস্তীতি সত্যং"—যাহা আছে তাহাই সত্য। যাহা সত্য, তাহা আস্বাদন করা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায়। আমি যদি সত্য বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্ম আমার নিকট প্রত্যক্ষ বস্তু হইবে। যে সত্য বুঝিয়াছে, সে কখনও তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে না, কিন্তু যতদিন সত্যের উপলব্ধি না হয়, ততদিন তাহার পুনঃ পুনঃ পতন হইবে। সত্য যদি একটুকু লাভ করিতে পার, তবে সত্যের কি মহিমা বুঝিতে পারিবে। সত্যের বলে বলীয়ান হইয়াই লোকে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে। এই বলে বলীয়ান হইয়াই প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও সেই ভয়ানক পিতা হিরণ্যকশিপু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সত্যের বলে বলীয়ান হইয়াই প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"এই স্তম্ভের মধ্যে আমার ভগবান বর্ত্তমান"। যদি একমাত্র সত্য গ্রহণ করিতে পার, তবে দেখিবে সব দুর্দ্দশা দূর হইবে, দেশের উদ্ধার হইবে। এই উপদেশ বেদ, পুরাণ ইত্যাদি সকল শাস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন—যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়?

উত্তর—যথার্থ সত্য লাভ করিতে হইলে, সকল প্রকার সংস্কারবর্জ্জিত হইতে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইলে মনটী একেবারে নির্ম্মল হ'য়ে যায়। তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায় সত্যের অনুসন্ধান। মত আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হইতে একেবারে চ'লে গেলে যাহা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কার-বর্জ্জিত অন্তরে সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হইলেও তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীরা প্রণালীগত উচ্চ সাধন অবলম্বন করিবার প্রারম্ভেই এই সংস্কারটীকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে নেন। এতে—তাঁদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার-বর্জ্জিত হয় ব'লেই বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলে। যাঁরা কোন কোন মতের বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে চলেন, তাঁহারাই বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। যাঁরা কেবলমাত্র নিজের অন্তরে সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনই দল

নাই, সম্প্রদায়ও নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায় কিছু কালের জন্য আমি বাগ-আঁচড়ায় ছিলাম। ঐ সময় আমার কার্য্যপ্রণালী ও বক্তৃতা-উপদেশাদি নি'য়ে ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে খুব হুলস্থূল প'ড়েছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলাম। আমার কয়েকটী বন্ধু কলিকাতা হইতে পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত আলোচনার প্রতিবাদ করিতে আমাকে লিখিতে লাগিলেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে বলিলেন। আমি বিষম সমস্যায় প'ড়ে গেলাম। নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হইবে কিনা, প্রাণে সর্ব্বদা এই আলোচনা হইতে লাগিল। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম:—'ঠাকুর, এসময় আমার কি করা কর্ত্তব্য, বলে দাও।' এই সময় পরিষ্কাররূপে আকাশ-বাণী হ'লো, শুনলাম গণ্ডির ভিতরে থাক্‌তে জীবনে সত্য লাভ হবে না। আকাশ-বাণী শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। মানুষের দিকে চে'য়ে চলিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুক, আর প্রশংসাই করুক, সেই দিকে দৃষ্টি পড়িলেই সর্ব্বনাশ। কাহারও দিকে না তাকায়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, যদি নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, না হইলে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত,—সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্য লাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্য লাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চলিতে হইবে তাহা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক পৃথক্, তাহাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।

প্রশ্ন—আমাদের এখন কি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়া ভাল ?

উত্তর—কোন একখানা গ্রন্থ পড়িলে উপকার হইবে না। প্রথমে বাছিয়া বাছিয়া পড়া উচিত, যেমন মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল, অধ্যাত্ম রামায়ণ। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে হইতে নিজের রুচি অনুসারে পাঠ করিতে হইবে। যখন শাস্ত্রে একটু রুচি জন্মিবে, তখন বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ পাঠ করিলে উপকার হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, হিন্দি ভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ এবং গুরুমুখী ভাষায় গুরু নানকের গ্রন্থসাহেবের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তিগ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ আমি নিজে তেত্রিশ বার পড়িয়াছি। এই গ্রন্থ প্রথমে একটু কটমট বোধ হইলেও, পরে উহার মধ্যে অপূর্ব্ব তত্ত্বরত্নের সন্ধান পাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে, প্রাচীন মূল গ্রন্থ পড়িবে,

আধুনিক গ্রন্থ পড়িবে না। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত দূষিত মত সকল স্থান পাইয়াছে।

বাস্তবিক বেদ বিভিন্ন নয়, কেবল বুঝিবার ভুল।

ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব। বেদ এক, তাহার শিক্ষার জন্য তাহাকে চারি ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত চারি বেদ শিখিতে হইলে ছত্রিশ বৎসর সময় আবশ্যক। সুতরাং সকলে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। এক ভাগ কি দুই ভাগ অধ্যয়ন করে। সুতরাং যিনি যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহারই আচার্য্য হন। এজন্য বেদ বিভিন্ন। বেদ যে ভিন্ন তাহা নহে। যেমন হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন, বস্তুতঃ এক শরীর মাত্র। যিনি সাম বেদের আচার্য্য, তিনি যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন না। আবার যজুর্ব্বেদের মধ্যে সাম বেদের বিষয় নাই। যদি যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে চাও, তবে যজুর্ব্বেদীর নিকট যাইতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ বেদবেত্তা পাওয়া যায়, সেখানে বেদ বিভিন্ন নহে। মানবাত্মার মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পার, তবে সমস্ত লাভ হইবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। বেদ শব্দে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম বুঝায়।

প্রশ্ন—কর্ম্ম বিনা আর কোন উপায়ে মুক্তি হয় না?

উত্তর—তীব্র বৈরাগ্য দ্বারাও হয়। কিন্তু সেই প্রকার বৈরাগ্য কোথায়? বিষয় হইতে মনকে যখন সম্পূর্ণরূপে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া নিতে পারিবে, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম সাধন করিতে পারিবে, এইরূপ হইলে কর্ম্ম বিনাও মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম না লইলে সব গেল। একটী শ্বাস-প্রশ্বাসে যদি নাম না লওয়া হয়, তবে সেই ছিদ্র-পথে শত্রুরা আসিয়া বিঘ্ন করিতে পারে। নিষ্কাম মুক্তির পথে মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই বিরোধী। সকলেই বিঘ্ন ঘটাইয়া পরীক্ষা করিয়া লন। তাই বাসনা-বিহীন হইয়া ঐ প্রকার তীব্র সাধনা করা সহজ নহে। বৈধ বিচারের দ্বারা কর্ম্ম শেষ করিলেই অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

প্রশ্ন—কর্ম্ম কি?

উত্তর—যাহার যে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা, বিচারের দ্বারা তাহার ভোগের নামই কর্ম্ম। কর্ম্ম প্রবৃত্তির দ্বারা হইয়া থাকে। যাহার যেমন প্রবৃত্তি, তাহার তেমন কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ধর্ম্মের অনুকুল তাহাই করিবে—তাহাকেই কর্ম্ম বলে, আর যাহা ধর্ম্মের প্রতিকুল তাহাকে পাপ বলে।

মানুষের পাপ দূর করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু কর্ম্ম দূর করিবার ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মেতে আরও জড়াইয়া পড়িতে হয়।

কর্ম্ম না করিয়া কাহারও নিস্তার নাই। কর্ম্মটী ধর্ম্মের বাহিরের বিষয় নয়,

কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্ম লাভ হয়। আর ধর্ম্ম কর্ম্মের অতীত যে বস্তু, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। সে বস্তু অনেক দূরে।

বৈরাগ্যের অর্থ ইহা নয় যে, সকল ছাড়িয়া আসিলাম, ভিক্ষা করিয়া খাইলাম ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি হওয়ার নামই বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের দিক যখন আর ইন্দ্রিয় যাইবে না, তখনই বৈরাগ্য হইয়াছে বুঝিবে। কর্ম্ম না কাটিলে বৈরাগ্য হয় না।

কর্ম্ম করা বৃথা নহে।

কর্ম্মেতে বদ্ধ থাকা বাস্তবিক বদ্ধ নহে। কর্ম্ম যথার্থ কর্ত্তব্যবোধে করিতে পারিলে, তাহাতে সহজে বাসনা কাটিয়া যায়।

কর্ম্ম করিতে করিতে যদি ভগবানের নাম লয়, তাহা হইলে বাসনা নষ্ট হয়। যাহার কর্ম্ম কাটে নাই, তাহাকে সমস্ত দিন নাম করিতে দাও, সে পারিবে না। বৃথা চিন্তা কি পরনিন্দা, বৃথা গল্প, বিবাদ, তর্কবিতর্ক এবং তাস, দাবা, পাশা, এই সকলে সময় কাটায়। সন্ন্যাসী দাবা খেলে, তাস খেলে, বিবাদ বিসম্বাদ সমস্ত করিতেছে। কর্ম্ম আছে, জোর ক'রে কাটে না।

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবে। অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে, নিশ্চয়ই কর্ম্ম কাটিয়া বাসনাহীন হওয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য—ইহা অপরাধ।

মনুষ্যের নিজের ক্ষমতা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাহাকে পরিশ্রম করিতেই হইবে।

আসক্তি দ্বারা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে।

লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার হয়। তবে নিজের বিবেকমত না চলিয়া যদি অপরের মতে কর্ম্ম করে, তাহাতে হৃদয় স্ফুর্ত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয়া নিজের বিবেকমত চলিলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রশ্ন—কর্ম্মত্যাগী কাহাকে বলে ?

উত্তর—স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি কর্ম্মত্যাগী। নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করাকেই কর্ম্মত্যাগী বলে।

প্রশ্ন—সিদ্ধ কি নিঃস্বার্থ হইলে তার কি কর্ম্ম থাকে ?

উত্তর—তখনইত কর্ম্মের আরম্ভ। যতদিন স্বার্থ আছে, ততদিন আর কর্ম্ম কোথায়। স্বার্থ গেলেই প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভ হয়। তখন সমস্ত সংসারের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়, সকলের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। নিঃস্বার্থ না হইলে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভ হয় না।

কামিনী ও কাঞ্চন দুই-ই ধর্ম্ম লাভের বিরোধী।

যে স্ত্রী-সংসর্গ করে, তাহার সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব হওয়া দূরে থাকুক,

অহৈতুকী ভক্তিই হয় না। ভক্তি-শাস্ত্রে যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিতেও নিষেধ আছে।

টাকা কালকুট, উহা ঘরে কখনও পুষিয়া রাখিবে না। টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রয়োজনমত খরচ করিবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে করিবে। যদি তিনি লাক পাঠান, (অর্থাৎ কেহ বিপদে পড়িয়া আসে) অমনি তাহাকে দিয়া দিবে। যাঁহারা ধনী হইতে চান, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। যাঁহারা ধর্ম্ম চান, তাঁহাদের কোনমতে দিন কাটিয়া গেলেই হয়।

শ্রাদ্ধ ও গয়ায় পিণ্ডদানের প্রয়োজনীয়তা।

শাস্ত্রকর্ত্তারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতির কি সুন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন। গয়ায় পিণ্ড দিলে লোকের উপকার হয়। যাহার কোন সংস্কার নাই, তাহার কোন উপকার নাও হইতে পারে। কার্য্যে বিশ্বাসানুরূপ ফল লাভ হয়। গয়ায় পিণ্ডদানে যে উপকার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে। চেহারা পর্যন্ত বদল হইয়া যায়।

স্থূল দেহ আহারে পুষ্ট হয়, সূক্ষ্মদেহ দর্শনে পুষ্ট, কারণ দেহ কেবল শুভ ইচ্ছায় পুষ্টি লাভ করে। পুষ্টি অর্থ সন্তোষ। গয়ায় পিণ্ড দিলে সূক্ষ্ম-দেহের বাসনা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কেবল মনের শুভ ইচ্ছা হইতেই কারণ দেহের নাশ হয়।

প্রশ্ন—নরক প্রভৃতি স্থান আছে কি না? যম-দূত প্রভৃতি কি?

উত্তর—শাস্ত্রে নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, নরক প্রকৃতই তদ্রূপ। যমদূত, বিষ্ণুদূত সকলই সত্য। মৃত্যুর পর ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃপুরুষও মৃত্যু সময় উপস্থিত থাকেন। যাহারা নরকেই যাইবে, পিতৃপুরুষগণ তাহা-দিগকে সান্ত্বনা দেন। পিতৃপুরুষগণ মায়ার অতীত নহেন, তাহারাও ত্রিগুণের অধীন।

প্রশ্ন—ধর্ম্ম প্রকৃতিতে লাভ হইয়াছে কিনা, কখন জানা যায়?

উত্তর—আগুন যেমন সকল অবস্থায়ই একরূপ থাকে, কোন অবস্থায় উহার রূপান্তর হয় না, সেইরূপ বিপদের সময় যাহার ধৈর্য্য নষ্ট না হয়, সত্য ও ধর্ম্ম একইরূপ থাকে, এবং সাম্যের কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় না, সে প্রকৃতিতে ধর্ম্ম লাভ হইয়াছে বুঝিবে। বিপদের সময় ধৈর্য্য, বিনয়, মিত্রতা ঠিক থাকিলেই ধর্ম্ম-লাভ হইয়াছে জানিবে।

প্রশ্ন—সাধনের পর সময় অত্যন্ত নিরাশভাব ও শুষ্কতা আসে, ঐ সময় সাধন ভাল লাগে না। এইরূপ নিরাশার ভাব আসে কেন?

উত্তর—গ্রীষ্মকাল যেমন ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়, পুকুর, খাল ইত্যাদি

শুকাইয়া যায়, সূর্য্যের উত্তাপে মানুষ অস্থির হয়, সকল প্রাণী হাহাকার করে, গাছপালা আর সেরূপ থাকে না, দেখিয়া বোধ হয় যেন কিরূপ এক কষ্টকর অবস্থা। বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এরূপ ভয়ানক অবস্থা আর হয় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই গ্রীষ্মকাল না থাকিলে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূল। গ্রীষ্ম হয় বলিয়াই আমরা বর্ষার সুখ অনুভব করি। সেইরূপ সাধনের সময় বিবিধ অবস্থা হয় বলিয়াই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নানা প্রকার শুষ্কতা ও নিরাশভাব না আসিলে, ধর্ম্মের এত শোভা হইত না—ধর্ম্মে সুখ বুঝা যাইত না। নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া যখন ধর্ম্মের উচ্চতর শৃঙ্গে উঠা যায়, তখনই চির শান্তি। এই শান্তি একবার লাভ হইলে আর নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন—অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনেক সাধু-সঙ্গের দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় কি না?

উত্তর—সকল কার্য্যেরই একটী প্রণালী আছে। শাস্ত্রালোচনারও সেইরূপ প্রণালী আছে। অসময়ে অপ্রণালীতে শাস্ত্রালোচনা করিলে কোন ফল হয় না। শাস্ত্রে অনেক পথ আছে। একটী পথ ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পরে ধীরে ধীরে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়। নিজের সাধন-পন্থায় নিষ্ঠা না জন্মিলে কোন শাস্ত্র পাঠ, কি সাধু-সঙ্গ ঠিক নয়। সাধুদের সকলের এক পথ নহে। নিজের পন্থায় বিশেষ নিষ্ঠা জন্মিলে, ভিন্ন পথাবলম্বী সাধু হইতে কোন ভয় থাকে না।

প্রশ্ন—সাধুর লক্ষণ কি?

সাধু যিনি তিনি আত্মপ্রশংসা করেন না, পরনিন্দা করেন না, কাহারও বিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা বলেন না, কাকেও নিজের মতে টানিতে চেষ্টা করেন না, কোন প্রকার বুজরুকি দেখান না। সাধুরা মনগড়া কথা বলেন না, শাস্ত্র ও সদাচারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া কথা বলেন, এবং তিনি প্রাণ গেলেও কাহারও নিকট কিছু যাঞা করেন না। সাধু সর্ব্বদা সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। এতদ্ভিন্ন বাহিরের কোন প্রকার চিহ্নই সাধুর লক্ষণ নহে। তবে বাহিরের চিহ্ন দেখিলেও সেই বেশের সম্মান করা উচিত।

প্রশ্ন—রিপু-পরাজয়ের কি কোন উপায় আছে? কোন কোন রিপুকে হঠাৎ এত প্রবল হইতে দেখা যায় কেন?

উত্তর—যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হইবে, তাহার কিছু পূর্ব্বে ঐ রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়, অনেকেরই তখন সাধন বিষয়ে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে এবং নাস্তিকতার উদয় হয়। ঐ সময় বড় ভয়ানক, সাধক ঐ সময় সর্ব্বদা উন্মত্তের ন্যায় থাকে। যদি ঐ সময় গুরুদত্ত নাম ত্যাগ না করে, তবে নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতে পারে, নতুবা ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হয়।

সকল রিপুকেই নির্ব্বাণ পাইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। নাম স্মরণ করিলে কোন ভয়ই থাকে না।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ কাহাকে বলে ?

উত্তর—যে স্থানে গেলে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, অধর্ম্মভাব বিদূরিত হইয়া যায়, এবং যে স্থানে কোন প্রকার দলাদলি ও সম্প্রদায় নাই, সেই সৎসঙ্গ। যে স্থানে সৎসঙ্গ, সে স্থান সর্ব্বদা সৎকথা, সদালাপ, সদানন্দে পরিপূর্ণ। কেহ হাসিতেছেন, কেহবা আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এই সঙ্গই সৎসঙ্গ। যে ব্যক্তি সৎ তাহার নিকট সকলই সমান, তাহার আপন পর বিবেচনায় আদরের কম বেশ নাই। সংসারের লোক যাহাকে অতিশয় নারকী বলিয়া ঘৃণা করে, সৎব্যক্তি তাহাকেও অত্যন্ত সমাদর করেন, কারণ তিনি তাঁহার প্রভুকে তাহার মধ্যেও দেখিতে পাইয়া সন্তোষ হন। তাঁহার নিকট কোন প্রকার দলাদলির ভাব আসিতে পারে না।

সাধুর সঙ্গে আলাপ করাই সাধুসঙ্গ নয়। নিকটে বসিয়া তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিতে হয়। তাহা হইলে নিজের ভিতরে যে ত্রুটি আছে তাহা ধরা পড়ে।

গুরুবাক্যে নিষ্ঠার অসীম ক্ষমতা

গুরুদেব যাহার যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। নিয়মের একটী ছাড়িলেই সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটী ছাড়িতে হয়। শত শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও আপনার কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন ও পুষ্পের মত কোমল হইতে হয়। পাহাড় পর্য্যন্ত সম্মুখে পড়িলেও টলিবে না। আর ঐ বিষয়ে প্রবেশ করিতে পুষ্পের মত হইবে। অতি ধীর ও শান্তভাবে নিজ কার্য্য করিয়া যাইবে। নিজের কর্ত্তব্য-রক্ষার জন্য দৃঢ়তা থাকিলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও কিছু করিতে পারিবেন না। আর স্বয়ং ভগবানও আসিয়া যদি নানা প্রকার উচ্চ অবস্থা দিয়া, তোমাকে তোমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বলেন, তাহাও করিবে না। তিনি যদি শক্তি প্রকাশ করিয়া তোমাকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা পারিবেন না। সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ রক্ষ, পিশাচাদির নিকটও পরাস্ত হইতে হইবে না। নিশ্চয় জানিবে যে উপরোধ অনুরোধ ছাড়াইতে হইবে ; তাহা দেখিয়া চলিতে গেলে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম হবে না।

প্রশ্ন—প্রকৃত জাতিভেদ কি ?

উত্তর—এখন আমাদের দেশে যেরূপ জাতিভেদ রহিয়াছে, সেইরূপ সকল দেশেই আছে। ঋষিরা যে জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গুণ-ভেদে ; ইহা বৃক্ষলতাদিতেও দেখা যায়। প্রকৃতি-ভেদে জাতি সকলেরই আছে। প্রকৃতিগত জাতি ব্রহ্মাণ্ডে ; ইহা কেহই ছাড়িতে পারে না। ইহাই ঋষিরা স্বীকার

করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমোভেদে জাতি। এখন হইয়াছে ব্যবসায়গত জাতি। যাঁহারা সকলের মধ্যে এক অস্তিত্ব দর্শন করেন, যাঁহার নামে মহাপাতকী উদ্ধার হয় তিনি যেখানে আছেন, তাঁহাকে আর অপবিত্র মনে করিতে পারেন না। এইরূপ পরমহংসদের জাতি নাই; কিন্তু যতদিন সে অবস্থা না হয়, যতদিন ভেদ-বুদ্ধি আছে, ততদিন যার-তার হাতে খাইলে চলিবে কেন? যাহার মন হইতে জাতি গিয়াছে, সেই জাতি মানে না। বিষ্ঠা চন্দন যে সমান দেখে, তাঁহারই জাতি গিয়াছে। তাহা না হইলে যার-তার হাতে খাইলে জাতি গেল তাহা নহে, ইহা সমবুদ্ধি মাত্র। জাতি কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র নহে। স্ত্রীপুরুষ জাতি, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, ব্যোম এ সকলও জাতি। এই জাতিভেদ যখন যাবে, তখন জাতিভেদ গেল। সামাজিক জাতি এক প্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্য প্রকার। ইহা পরমহংস অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট জ্ঞান থাকিলেই জাতি থাকিবে এবং এক রকম জাতি সে অন্তরে থাকিবেই, হয় আচারগত, নয় ব্যবসায়গত, না হয় প্রকৃতিগত। হিংসা, মান, লজ্জা ইত্যাদি যতকাল থাকিবে, ততকাল মানুষ কোন প্রকারেই জাতি অতিক্রম করিতে পারে না। যার তার হাতে খাইলেই জাতিবুদ্ধি যায় না, তাহাতে বরং আরও ক্ষতি হয়। যাহার পাকান্ন ব্যবহার করা যায়, তাহার আন্তরিক ভাব আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে মনে সংক্রামিত হয়, তাহার কোন ব্যাধি থাকিলে তাহাও সংক্রামিত হয়। ইহা মানুষ দেখিতে পায় না, কিন্তু এ সকল সত্য।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটী সময় আছে। অসময়ে কিছুই হইবার যো নাই।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটী সময় আছে। অসময় কিছুই হইবার যো নাই। বৃক্ষে ফল হয় দেখিয়া কেহ যদি চারা-বৃক্ষ দেখিয়া মনে করে যে, এই বৃক্ষের মধ্যেই ফল আছে, সুতরাং বৃক্ষ চিরিয়া ফল বাহির করি, তাহা হইলে উহা বৃথা হইবে। বৃক্ষ চিরিলেও ফল পাইবে না, বরং বৃক্ষই শুষ্ক হইয়া যাইবে; ঠিক যখন সময় হইবে, তখন বিনা চেষ্টাতেই ঐ কাষ্ঠের ভিতর হইতে ফল বাহির হইবে। ধর্ম্মের সম্বন্ধেও সেইরূপ। অসময়ে কিছুই হইবার যো নাই, চেষ্টা করিলেই সব নষ্ট হইবে। আবার সময় হইলেই যেরূপেক হউক, কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। যে অসময়ে কাহাকেও বুঝাইতে যায়, সে নিজেই বুঝে নাই।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া বিশ্বাস হারাইয়াছি, মন নানাপ্রকার সন্দেহে পূর্ণ হইয়াছে, সত্য-পথের অনেক ব্যভিচার করিয়াছি, তবে সেখানে যাওয়া কি বৃথা হইয়াছে?

উত্তর—ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া অনেক উপকার হইয়াছে। নীতি-চরিত্রাদি

ব্রাহ্মসমাজে যাওয়াতেই রক্ষা পাইয়াছে। প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান চাই। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান চাই-ই ; ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে ঠিক তত্ত্ব জানিবার অধিকার জন্মে না, এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপী. সত্য, পবিত্র, নির্ব্বিকার, নিরাকার, মঙ্গলময় ভাব ধ্যান করিতে করিতে, ক্রমে যখন উহার মধ্য দিয়া রূপের ছটা বাহির হয়, তখনই সব বুঝিতে পারা যায়।

প্রশ্ন—সাধনাদির পর ব্রহ্মজ্ঞান হয় না ?

উত্তর—হইবে না কেন ? কিন্তু বড় কঠিন। প্রথমে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের তত্ত্বসকল ধরিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যাঁহাদের পরে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁহাদের অনেক কষ্ট করিতে হয়। তাঁহারা সহজে তত্ত্ব ধরিতে পারেন না ; তোমরা প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে, সমস্ত সহজ হইবে।

প্রশ্ন—ভগবানকে লাভ করিবার সহজ উপায় কি ?

উত্তর—গরু যখন এদিক ওদিক চলিয়া যায়, তখন কেহ তাহার বাছুরটী কোলে করিয়া লইয়া গেলে, সে যেমন "হাম্বা হাম্বা" করিয়া পিছনে পিছনে ছুটে, তেমনি মানুষও ভগবানকে জানে না, তাঁহাকে চিনে না, ভক্তি করিতেও পারে না, কিন্তু যদি ভগবানের ভক্তকে পূজা করে, তবে ভগবানও আপনা হইতেই তাহার বশ হন।

প্রশ্ন—সুখ কিসে হয় ?

উত্তর—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। ভূমা অর্থাৎ যাহার জন্ম মৃত্যু নাই, তাহাতেই সুখ, অন্তবিশিষ্ট বস্তুতে সুখ নাই। যার অন্ত আছে, একদিন তাহা থাকিবে না ; সুতরাং তাহাতে আসক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ পাইতে হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শ।

ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন। রামচন্দ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শ। পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিলেন। রাজ-ধর্ম্ম প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা ত্যাগ করিলেন। সত্য-রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন। এ কি মানুষের সাধ্য ? সীতাতে সম্পূর্ণ অনুরাগ। তখনকার রাজারা হাজার হাজার বিবাহ করিতেন, কিন্তু রামচন্দ্র একপত্নীক, যজ্ঞস্থানে স্বর্ণসীতা। সীতা যে সম্পূর্ণ সতী, তাহাতে রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। সমস্ত দেবতারা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই সত্য যখন জাতীয় ধর্ম্ম হয়, তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করে।

প্রশ্ন—শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়াছিলেন, ইহাতে অনেকে অনেক কথা বলে কেন ?

উত্তর—যাহারা শাস্ত্র জানে না, বুঝে না, তাহারা ঐরূপ কথা বলে। তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়। যাহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করে না,

তাহারা নানা প্রকার কু-আলোচনা ও কু-তর্ক করে। শাস্ত্রে যাহা আছে সমস্তই বিশ্বাস করিতে হইবে, আধা-আধি বিশ্বাস করিলে চলিবে না। শাস্ত্রকর্ত্তারা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই, সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বুঝেন। দুষ্টমতি বালি যে স্বীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নী হরণ করিয়াছিল—ইহা কে না জানে? শ্রীরামচন্দ্র তদীয় বন্ধু সুগ্রীবের উপকারার্থ রাজধর্ম্মানুসারে ভ্রাতৃবধূ-অপহর্ত্তা বালিকে বধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা শাস্ত্রের ঐরূপ কু-তর্ক উত্থাপন করেণ, তাঁহারা যেন ইংরাজী কুকুর ও বাঘের গল্প পড়েন।

প্রশ্ন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট না করিলে কি মুক্তি হয় না?

উত্তর—সকলকেই সম্মান করিবে। কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিবে না। কিন্তু তাঁহাদের পূজা না হইলেও চলে। তাঁহাদের পূজার দ্বারা কেবল তাঁহাদেরই লোক লাভ হয় মাত্র, কিন্তু পরা-মুক্তি লাভ হয় না।

প্রশ্ন—পূজা করিয়া সন্তুষ্ট না করিলে কোন বিরোধ হইবে না ত?

উত্তর—পরব্রহ্ম পূজার দ্বারাই সব হয়। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত ডাল ও পত্রে যায়, সেইরূপ এক পরব্রহ্মকে পূজা করিলেই সকলে পায়।

বংশ-মর্য্যাদা।

প্রথমে বটতলায় যে চৈতন্যভাগবত ছাপান হইত, তাহাতে আছে যে, একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন,—তুমি দেশে দেশে এইরূপ ঘুরিবে, আর আমি বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিব? মহাপ্রভু বলিলেন,—ইহার কারণ আছে। তুমি যতই প্রেমভক্তি বিলাও না কেন, আমাদের অন্তর্দ্ধানের পর ইহার আর মাহাত্ম্য থাকিবে না। যদি আমাদের বংশধর থাকে, তবে তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার বিশেষ আদর করিবে। তাহা হইলেই সব ঠিক থাকিবে। আমি সন্ন্যাস লইয়াছি, গৃহী হইতে পারিব না। তোমাকে ও অদ্বৈতপ্রভুকে সন্তান জন্মাইতে হইবে। এজন্য নিত্যানন্দপ্রভু বিবাহ করেন। ইহা আজকালকার চৈতন্যভাগবতে নাই। সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক বৃত্তান্ত বাদ দিয়া বর্ত্তমান বহি ছাপান হয়। নিত্যানন্দপ্রভু সন্ন্যাস নিয়াছিলেন না—সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

প্রশ্ন—মৃত্যু-সময় কাহাদের অত্যন্ত কষ্ট ও ভয় হয়?

উত্তর—যে সকল মানুষ সংসারে নিতান্ত আসক্ত, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঘর, আমার বাড়ী এইভাবে নিতান্ত মত্ত, তাহাদের মৃত্যুর সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়, প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ছটফট করে, অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহাদের ততটা আসক্তি নাই, তাহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে পরলোক-দর্শন হয়। মৃত্যুকালে ভয় হইলে পিতৃলোক মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ, তখন

তাঁহারা আসিয়া সান্ত্বনা দেন। যেখানে যে পরিমাণে বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্য, সেখানে সেই পরিমাণে মৃত্যুভয়। বৈরাগ্য না হইলে মৃত্যুভয় দূর হয় না।

ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না।

ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না। যাহার হয়, সে ধন্য। ভক্তির বিচার নাই। পিতা পুত্রকে ধূলামাখাই থাকুক অথবা পরিষ্কারই থাকুক, অমনি কোলে তুলিয়া নেন। সন্তান হইবার পূর্ব্বে অপত্য-স্নেহ কেমন, তাহা যেমন কেহ বুঝে না, সেইরূপ ভক্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে—তাহার প্রসন্ন মুখ না দেখিলে, ভক্তি কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। ভক্তি অহৈতুকী, তাহা ভাল মন্দ বিচার করে না। ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য তিন ভাই-ভগ্নী বৃদ্ধ ছিলেন। ভক্তি বৃন্দাবনে গিয়া যুবতী হইলেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বুড়াই রহিলেন।

প্রশ্ন—জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—জ্ঞান ভ্রাতা, ভক্তি ভগিনী, উভয়ের সমান মর্য্যাদা। তবে যে সাধক কেবল মোক্ষপ্রার্থী, তিনি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হন, আর যে সাধক ভগবানের দাস, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধ লাভ করিয়া সেবা করিতে চান, তিনি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই প্রয়োজন। জ্ঞান না হইলে ভক্তি প্রকাশিত হয় না, কারণ যাঁহাকে ভক্তি করিব, তাঁহার বিষয় না জানিলে কাহাকে ভক্তি করিব ?

অবতার তত্ত্ব।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ইত্যাদি।

ইহার অর্থ এমন নয় যে, একযুগে একবার মাত্রই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি তাহা দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। কোথাও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কোথাও শক্তিরূপে, কোথাও বা ভাবরূপে তিনি আবির্ভূত হন। ইহার মধ্যে আবার যাহাদের জন্য অবতীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যেই তাঁহার কার্য্য হয়। যিশুখৃষ্ট পাশ্চাত্য জাতিদিগের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার যত কার্য্য তাহাদেরই জন্য। ভারতবর্ষে তাঁহার কার্য্য হইবে না। ঐরূপ রজোগুণ-বিশিষ্ট লোকদিগের সেবা ভিন্ন আর উপায় নাই, তাই তাহাদের উদ্ধারের জন্য তিনি সেবা-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সমস্ত অবতারই পূর্ণ—প্রকাশের তারতম্য মাত্র।

কোন সময়ে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ভগবানের শক্তি ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়ে কার্য্য করে দেখা যায়। তাহাই অবতার। কার্য্যটী শেষ হ'য়ে গেলেই

ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন সে অবতার নয়। যেমন পরশুরাম বিশেষ একটা সময়ের জন্য অবতার। আবার যাবজ্জীবন অবতারও থাকে, যেমন রামচন্দ্র। অংশ, কলা, আবির্ভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে। অবতার সর্ব্বদাই পূর্ণ, কারণ ভাগবৎ-শক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান সর্ব্বদাই পূর্ণ। তবে তাঁর অংশ. অংশাংশ ইত্যাদি বলবার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য, কোথাও বীর্য্যের কার্য্য। যে কার্য্যে যতটুকু শক্তি প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝেন, ততটুকুই মাত্র করেন, তাই ব'লে অন্য শক্তি তাতে নাই বলা ঠিক নয়—পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি কোন ক্ষেত্রে ভগবৎ-শক্তির আবেশ হয়, তথায় পূর্ণ শক্তি র'য়েছে বুঝতে হ'বে। ভগবান কোথাও অপূর্ণ নন, সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতেই পূর্ণ—যতটুকু প্রকাশ ততটুকুই লোকে জানে মাত্র।

প্রশ্ন—অঘোরপন্থী, বাউল প্রভৃতিরা নরমাংস, বিষ্ঠা মূত্রাদি আহার করে কেন? উহা কি তাহাদিগের সাধনের অঙ্গ?

উত্তর—বৈষ্ণব, বাউল ও অঘোর-পন্থীরা বিষ্ঠা, মূত্র, মরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে, ইহা সাধনের অবস্থার কথা। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—"যতো বা ইমানি ভুতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যস্মিন্ প্রত্যাভিসংবিসন্তি, তদেব ব্রহ্ম, ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে।" ব্রহ্ম হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, ব্রহ্মেতেই জীবিত আছে, শেষে ব্রহ্মতেই লয় হইবে। মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে সুতা বাহির করিয়া জাল তৈয়ার করে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, তখন বিষ্ঠামূত্র খাইতে দোষ কি? এইরূপ ভাব হইয়াছে কিনা, সর্ব্বভুতে ব্রহ্ম উপলব্ধি হইয়াছে কিনা, ইহার পরীক্ষার জন্য তাঁহারা ঐরূপ করেন। উহা একটী প্রণালী মাত্র। সকলকেই যে ঐরূপ করিতে হইবে, তাহা নহে।

সাধকদের পক্ষে স্ত্রীলোক হইতে সাবধানতা সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

মহাপ্রভু স্ত্রীলোক হইতে সাবধান থাকিতে কতপ্রকার উপদেশই না দিয়াছেন। ছোট হরিদাস কেবলমাত্র একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন, এই অপরাধের জন্য তাহাকে লোকশিক্ষার জন্য বর্জ্জন করিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রয়াগ ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

(পুরীধামে) একদিন একটী স্ত্রীলোক বেগুণ তুলিবার সময় গীতগোবিন্দ গান করিতেছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু ভাবাবেশে তাহার দিকে ধাবিত হইলে, গোবিন্দ নামক মহাপ্রভুর একজন সেবক তাহাকে বাধা প্রদান

করিলেন। চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীলোক-স্পর্শ হইলে আমাকে সমুদ্রে প্রবেশ করিতে হইত।"

একটী বিধবার ছেলে মহাপ্রভুর নিকট সর্ব্বদা আসিত, তিনিও তাহাকে আদর করিতেন। দামোদর নামক মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "গোঁসাই, এইবার বুঝিব, শত হইলেও তুমি সুন্দর যুবক, আর ইহার মাতা সুন্দরী যুবতী। ইহার মধ্যেই কত লোক কত কাণাকাণি করিতেছে। তুমি লোকদিগকে এইরূপ সন্দেহ করিবার অবসর দাও কেন?" মহাপ্রভু বলিলেন, "দামোদর, তুমি আমার পরম বন্ধুর কাজ করিলে।" এবং সেই অবধি ঐ বালককে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবী রাখা ও ভেক-গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত নহে।

কামিনী-কাঞ্চন হইতে সাবধান না থাকিলে আর রক্ষা নাই। এখনকার গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা তন্ত্রের শৈবীবিবাহ ও বামাচার অনুকরণ করিয়া বৈষ্ণবী রাখেন, ইহা বিশুদ্ধ অবস্থা নহে।

মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; বাহিরে কর্ত্তা হইয়া ভিতরে অকর্ত্তা হইতে বলিয়াছিলেন। মর্কট বৈরাগ্য—যেমন আজ কৌপীন পরিলাম, সংসার ছাড়িলাম, কাপড় ত্যাগ করিলাম, কিছুদিন পরে আবার ধরিলাম। এখানকার বাবাজীরা প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে কিনা, তাহা না দেখিয়া বালক, বৃদ্ধ, যুবা, যে কেহ ভেকগ্রহণেচ্ছু হউক, তাহাকেই ভেক দেন। ইহারা ভেক গ্রহণের পর ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না, নানারূপ কুৎসিত আচরণ করে। বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে, কি অন্য কোথাও কাহার নিকট ভেক গ্রহণের কথা উল্লেখ নাই। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সে নিজ অনুরাগে তখন ভেক গ্রহণ করিবে। প্রকৃত বৈরাগ্য হইলে সে তখনই চলিয়া যাইবে, কোন দিকে চাহিবে না। যতদিন এইরূপ অবস্থা না হয় ততদিন মান-মর্য্যাদা, নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি থাকে। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ঘরে থেকে ধর্ম্মানুশীলন ও কর্ম্ম করা উচিত।

প্রশ্ন—শক্তি-সঞ্চার কাহাকে বলে?

উত্তর—ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। এক মহাপুরুষের প্রবল শক্তিদ্বারা সেই শক্তিকে (কুলকুণ্ডলিনী) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি-সঞ্চার বলে। এ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। তাকে শক্তি-সঞ্চারের দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় নিদ্রা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। যাহারা অনবরত শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করিয়া ঘুমাইতে না দেয়, তাহাদেরই শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

প্রশ্ন—অনেক সাধক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন, উহা কি সাধনের অঙ্গ ?

উত্তর—মাদক সাধনের সহায় নহে। মাদকদ্রব্য খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মাদক খাওয়ার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথাও নাই। যাঁহারা পাহাড়ে পর্ব্বতে সর্ব্বদা ঘুরিয়া সাধনাদি করেন, তাঁহাদের অনেক শারীরিক কষ্টাদি সহ্য করিতে হয়। শীত ও উত্তাপাদি সহ্য করিবার জন্য তাঁহাদের মাদকের আবশ্যক হয় ; কিন্তু তাহা শরীরের জন্যই মাত্র। উহা দ্বারা সাধকের কোনও প্রকার সাহায্য হয় না, বরং ভয়ানক অনিষ্ট হয় ; নানা প্রকার কল্পনা আসে। যাহারা শরীরের জন্য মাদক ব্যবহার করেন, কার্য্য সিদ্ধ হইলে তাঁহারা উহা ঔষধের মত পরিত্যাগ করেন।

আয়ুর্ব্বেদ এবং যোগশাস্ত্র সকলেই মাদকের মহাদোষ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রে বীরাচারীর জন্যও উহার ব্যবহার বিধি নয়, তবে পরীক্ষার জন্য বীরাচারীরা ব্যবহার করিতে পারেন। মাদকদ্রব্যের একটী গুণ এই যে, উহা খাইলে যাহার প্রকৃতিতে যে দোষগুণ থাকে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই অন্তর্নিহিত দোষগুণ পরীক্ষার জন্য বীরাচারীরা অল্প পরিমাণে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তাহা ত্যাগ করেন।

শাস্ত্রে যে সুরার ব্যবস্থা আছে, তাহা বাহিরের সুরা নহে।

শাস্ত্রে সুরার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা বাহিরের সুরা নহে—লোকে উহা বুঝে না। এই দেহের ভিতরেই ভক্তিতে ক'রে একপ্রকার সুরা জন্মে, তাহা খাইলে ভয়ানক মত্ততা জন্মে, ইহাকেই শাস্ত্রে অমৃত বলা হইয়াছে। এই অমৃত কি প্রকার ? যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ স্থানে রক্তের চালনা হয়। সেই রক্তই গরম ও অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। আনন্দের সময়ও তদ্রূপ রক্তেরই ক্রিয়া। মস্তিষ্কের কোন স্থানে ঐ রক্তের গতিতে আনন্দ হয়। কাম ইত্যাদি সকল বিষয়ই ঐ প্রকার মস্তিষ্কের কোন কোন বিশেষ স্থানের রক্ত বিশেষের ক্রিয়া মাত্র। যেমন ক্রোধের সময় মস্তিষ্ক হইতে রক্ত একপ্রকার ভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্তিতেও মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থান হইতে ঐ রক্ত ভিন্ন ভাব লাভ করিয়া শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। মস্তিষ্কে যে রক্ত ভক্তির ক্রিয়া করে, তাহা অত্যন্ত গরম হইলে (সামান্য ভক্তিতে হইবে না) ঐ রক্ত হইতে চুয়াইয়া একপ্রকার রস পড়ে। তাহার দুই চারি ফোঁটা পড়িলেই তাহা খাইয়া পাঁচ সাত দিন অনায়াসে থাকা যায়। ঐ রসের এত মাদকতা-শক্তি যে বলা যায় না। ঐ অমৃত খাইয়া লোকে চেতনাহীন হয় ; কিন্তু ভিতরে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। উহার স্বাদ আছে। ভক্তির ভাবের সহিত তাহার যোগ আছে। এক এক সময় এক এক রকম স্বাদ। কখনও লবণ, কখনও তিক্ত, কখনও কেবল মধুর। উহা শরীরের পক্ষে মহাকল্যাণকারী। ইহাকেই শাস্ত্রে অমৃত বলা হইয়াছে।

জনৈক ভুটিয়া কর্ত্তৃক জীবতত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

এই শরীর আমি নহি। এই শরীরের মধ্যে একজন আছে যে কথা বলে, শুনে ইত্যাদি। যদি শরীরই সব হইত, তবে মৃত মানুষের শরীর কেন দেখে না, শুনে না, কথা বলে না? অতএব দেহের মধ্যে দেহ ব্যতীত একজন আছেন, তিনি আত্মা।

দেহ তিন প্রকার—স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ। স্থূলদেহ চক্ষে দেখা যায়, কারণদেহ দেখা যায় না। গুটিপোকা যেমন কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেইরূপ পঞ্চকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পঞ্চকোষ যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। আত্মা যখন বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করে, তখন তাহার নিকট আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি প্রশ্ন আসে। তাহার পর আনন্দময় কোষ—এ পর্য্যন্ত আত্মা বদ্ধাবস্থায় থাকে। আত্মা পঞ্চকোষে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ জীবাত্মা নামে খ্যাত। এই অবস্থায় কখনও সুখ, কখনও দুঃখ হয়। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে, তখন উহাকে আত্মা বলে। ইহার পরও আত্মার বাসনা থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিতে আত্মা দেহ ধারণ করে। কেহ স্থূলদেহ ধারণা করিয়া, কেহ বা আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া বাসনা পূর্ণ করেন। ইঁহারা জননীজঠরে প্রবেশ করেন না, ইচ্ছামাত্র কোন একটী দেহ ধারণ করেন। বাসনা অন্তে আত্মা মুক্ত হয়। মুক্তির পরে আর কোন ক্লেশ থাকে না। সত্যলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক প্রভৃতি স্থানে তখন মুক্তাত্মা বিহার করেন।

ভগবান্ জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হন; তখন তাঁহাকে অবতার বলা হয়, যেমন আপনাদের বুদ্ধদেব; যিনি ভগবান্, তাঁহাকে মানুষ দেখিলে ভয় পায়, তাই মানুষের মত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন, আচরণ করেন, লোকশিক্ষার জন্য নিজে সমস্ত করেন। ভগবান্ ও জীবে কিরূপ সম্বন্ধ?—যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ। সূর্য্য ও তাহার কিরণ একও নয়, পৃথকও নয়; সমুদ্রতরঙ্গ ও বুদবুদ—একও নয়, পৃথকও নয়। আপনাদের শাস্ত্রে যাহা আছে, আমাদের শাস্ত্রেও তাহাই আছে। শাস্ত্রে কোন বিরোধ নাই। কেবল বুঝিবার ভুল।

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে যে, মহাপ্রভু আরও দুইবার শচীমাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আর দুই কলিযুগে শচীমাতার গর্ভে জন্মিবেন। এই কলিযুগে যেমন একবার জন্মিলেন, এইরূপ আর দুইবার জন্মিবেন। এই কলিযুগে আর দুইবার জন্মিবেন, এ অর্থ নহে; কোন ব্যক্তিতে আবেশ হওয়া, কি কোথাও প্রকাশ হওয়া, সে ভিন্ন কথা। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তাহার পর কলির প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আরও দুইবার

হইবে। আমরা ভাবি কতকাল বাকী, কিন্তু ইহা ভগবানের পক্ষে এক মুহূর্ত্তও নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেন, তাহারা গঙ্গাতীরে, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শান্তিপুরের সান্নিধ্যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এবং শচীমাতার গর্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাকে বুঝিবেন। এখন যদি শ্রীগৌরাঙ্গ চট্টগ্রামে কি অন্য কোথাও আবির্ভূত হন, তবে উহারা তাঁহাকে বুঝিবেন না। আর ঐরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের আর কোন মাহাত্ম্য থাকে না এবং এই তত্ত্বটীও নষ্ট হইয়া যায়।

ভগবান্ কোন যুগে একই কার্য্য লইয়া, একইরূপে দুইবার অবতীর্ণ হন নাই। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গও কলিতে একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কলিতে আর জন্ম লইবেন না। তিনি কি মরিয়াছেন যে আবার জন্ম লইবেন? "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলিযুগের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাবৎ কলিযুগ থাকিবে, তাবৎ তিনি জীব উদ্ধার করিবেন। তাঁহার লীলা ত শেষ হয় নাই। সেবার মাত্র উঁকি মারিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। দেখ না, এখন কেমন খৃষ্টানদের মধ্যেও খোল বাজিতেছে। এমন সময় আসিবে, যখন সমস্ত মৃদঙ্গময় হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন—জীবের প্রথমে কোন কর্ম্ম থাকে না, তবে কি প্রকারে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়?

উত্তর—মায়া দুই প্রকার—বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ অবিদ্যামায়া হইতে উৎপন্ন। জীব এই ত্রিগুণে আবদ্ধ হয়। কর্ম্ম বাস্তবিক কিছু নয়, উহা যেমন নাটক প্রভৃতিতে সাজিয়া অভিনয় করে, তদ্রূপ। শাস্ত্রকর্ত্তারা 'বালকক্রীড়াবৎ, উন্মাদনৃত্যবৎ' এইরূপ ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বালক ক্রীড়া করিতে করিতে ঘর বাঁধিতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে, ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ইচ্ছা নাই। উন্মাদ বকিয়া যাইতেছে আর একটু নৃত্য করিতেছে, ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ইচ্ছা নাই। যাহারা জগতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ইহাকে কর্ম্ম বলেন। ভগবৎভক্তেরা ইহাকে কর্ম্ম বলেন না, ভগবানের ইচ্ছা বলেন। ভগবানের ইচ্ছাই সমস্ত—কর্ম্ম কিছুই নয়। নাটকের অভিনয় করিয়া, সাজ-পোষাক ছাড়িয়া যেমন আবার তাহাই হইবে। যেমন জল ও বুদবুদ একই বস্তু, তবে বুদবুদের মধ্যে একটু বায়ু আছে, তাহাতে পৃথক দেখা যায়, সেইরূপ ত্রিগুণাধীন বলিয়া জীব কর্ম্মবদ্ধ এইরূপ মনে হয়। গুটিপোকা কোষে আবদ্ধ হইয়া যেমন উহা কাটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ ত্রিগুণাধীন জীব যখন মায়ার আবরণ ভেদ করিতে চায়, তখনই তাহার কর্ম্ম। কেহ ঈশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি

করিতে চায়, কেহ তাঁহার সঙ্গে লীলা করিতে চায়। এই দুই প্রকার প্রারব্ধকে ভক্তেরা কর্ম্ম বলেন না, ভগবানের ইচ্ছা বলেন। যাঁহারা কর্ম্ম বলেন, তাঁহারা বলেন—এই কর্ম্ম কাটিয়া গেল। নতুবা কর্ম্মপ্রবাহ-নিবারণের কারণ আর কি বলিব ?

প্রশ্ন—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ-মনন দ্বারা অন্তরে লীলা-দর্শন হয় কিনা ?

উত্তর—সৎগুরুশক্তি ভিন্ন লীলা-দর্শন কিছুতেই হয় না। বর্ত্তমান গৌড়ীয় সম্প্রদায় এই শক্তিবিহীন হইয়া শুধু লীলা স্মরণ করাতে—অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করাতে, তাহাদের স্ত্রীলোক-ঘটিত দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে।

ঈশ্বর-দর্শনের চিহ্ন।

ঈশ্বরের স্বরূপগুলি আত্মাতে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহাতেই ঈশ্বর-দর্শন হইবে। বিশেষতঃ যেমন সূর্য্য উদয় হইলে রৌদ্র হয়, তদ্রূপ আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বর হৃদয়াকাশে উদিত হইলে, আনন্দ-কিরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং নেত্রনীরে গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইতে থাকে। এই আনন্দই ঈশ্বর-দর্শনের চিহ্ন।

প্রকৃত ব্রহ্মচক্র কি ?

নদীর জল যেমন একবার সাগরে যাইতেছে, আবার তথা হইতে মেঘরূপে আসিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছে, আমরাও সেইরূপ এই স্রোতোবেগে একবার পরমেশ্বরেতে ডুবিব, আবার পৃথিবীর নরনারীকে হৃদয় ঢালিয়া দিব। আমরা কেবল সাগরে যাইব না ; সাগরে যাইব, আবার মেঘ হইয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পড়িব। প্রকৃত ব্রহ্মচক্র, যোগচক্র এইরূপে ঘুরিতেছে।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির লক্ষণ কি ?

১। যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরস্বাপহরণ ও নীচজাতি-যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহার হস্তদ্বার রক্ষিত হয়।

২। যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী, অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যা বাক্য, কুটীলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বাক্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়।

৩। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহ রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আহার ও প্রতিনিয়ত সাধুগণের সহিত বাস করেন, তিনি জিহ্বা-দ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

৪। যে ব্যক্তি একপত্নী সত্ত্বেও সম্ভোগের জন্য অন্যস্ত্রীর পাণিগ্রহণ ও অন্যস্ত্রী-গমন না করেন, এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় স্ত্রী-গমন না করেন, তিনি উপস্থদ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

যে মহাত্মা ঐরূপ চারিদ্বার রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া গণ্য করা যায়। যাঁহার ঐ চারিদ্বার রক্ষা না হয়, তাঁহার সমস্ত কার্য্য বিফল হয়।

সাধনপন্থার অগ্নিপরীক্ষা।

কোন সাধক প্রশ্ন করিলেন, "আমার প্রাণের ক্লেশ যায় না কেন?"

উত্তর—যেমন বাহিরে গ্রহাদির প্রভাব হয়, ভিতরেও সেইরূপ হয়। যাহারা সংসারে ব্যস্ত থাকে, তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অনুভব করেন। পূর্ব্বকালে সাধকগণ উহাকে ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলিতেন। ইহাদের যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে। অনেক সাধককে অতিশয় কষ্ট দিয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণ ইহাকে সয়তান বলিয়া থাকেন। ইহার হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পায় না। প্রথমে কাম-ক্রোধ রূপে আসে, তাহাতে না হইলে বাসনা কল্পনারূপে আসে। তাহাতেও না হইলে ধর্ম্মরূপে আসিয়া অহংকার হইয়া সাধকের সর্ব্বনাশ করে। কত যুগ-যুগান্তরের মধ্যে কেবল মহাদেব, বুদ্ধদেব, হরিদাস ঠাকুর, শুকদেব, এই কয়জন সাধনকালে উহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ ঋষির নিকট বিশেষ অপমানিত হয়। ইহার একমাত্র ঔষধ ধৈর্য্য ধরিয়া ভগবানের নাম গ্রহণ করা। চির-রোগীর ঔষধ খাইতে খাইতে ঔষধে শ্রদ্ধা থাকে না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, তথাপি ঔষধ খাইতে হয়। কারণ অন্য উপায় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহার ফল ভোগ করিয়া মুক্তি পাইতে হইলে অনেক জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা শেষ করিতে হয়। ভগবৎ নামের বলে মুক্তি সহজে হয়। কিন্তু এই বিঘ্ন নামে রুচি আসিতে দেয় না। দুঃখে, কষ্টে, চারিদিকে অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া নাম লইতে হইবে। প্রহ্লাদ-চরিত্র ইহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। সংসার পাপ, সয়তান হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ সাধক। তাঁহার আহারের বস্তু বিষ, অগ্নিকুণ্ডে বাস, হস্তিপদে দলন, অস্ত্রাঘাত, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ, চারিদিকে বিপদ, সহায় কেবল এক হরিনাম। এত যন্ত্রণায় প্রহ্লাদ ক্ষতবিক্ষত হইলেন। অবশেষে প্রহ্লাদ জয়লাভ করিলেন। শ্রীহরি নরসিংহ হইলেন। প্রহ্লাদ বর চাহিলেন—হিরণ্যকশিপুর মঙ্গল হউক। অতএব সাধন-পথের এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। খৃষ্টান সাধকেরা 'যাত্রিকের গতি' নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে এই বিবরণ। মুসলমান ফকিরদিগের এই ঘটনা। এই যন্ত্রণা অগ্নি-পরীক্ষা। ইহাতে যত পোড়া যাইবে, তত বিশুদ্ধি লাভ হইবে। এই যন্ত্রণা নানারূপে সাধকের হৃদয়কে দগ্ধ করে। প্রকৃতি ও সংস্কার অনুসারে যন্ত্রণার ন্যূনাধিক্য ঘটে। শ্রীশ্রীহরি-নাম, তারকব্রহ্মনামই ইহার ঔষধ। এই যন্ত্রণায় দুইবার আমি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম। অগ্নি জ্বলিত। কত জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ, তাহাকে দগ্ধ করিতে অনেক অগ্নির প্রয়োজন। এই

যন্ত্রণাই যথার্থ মুক্তির হেতু। উহা যাহার হয়, সে কৃত্রিম ধর্ম্মের ভান করিতে পারে না। যাহাতে জ্বালা নিবারিণ হয়, তাহা ভিন্ন তাহার তৃপ্তি হয় না। আমার পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্ম্মের আনন্দ হয়, তাহা বিড়ম্বনা; যেমন রোগী কুপথ্য খাইয়া সুখী হয়। প্রথমে যন্ত্রণায় শুকাইয়া নীরস হইবে। বিষয়-রস একবিন্দু থাকিতে ব্রহ্মানন্দ আসে না। এই যন্ত্রণার ভিতর অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। সময়ে সমস্তই প্রকাশ পাইবে। এখনও আমাকে পরীক্ষা করে। সোমবার রাত্রিতে (২৩শে শ্রাবণ, ১৩০০ সাল) হঠাৎ ঘরের মধ্যে চারিজন পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুতেই যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন এক কলসী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিল, তাহাতেও কিছু হইল না। তখন বলিল—"আমাদিগকে শিষ্য কর।" আমি বলিলাম, "তোমরা কে?" তাহারা উত্তর করিল, "আমরা পতিতা নারী, উদ্ধার কর"। আমি বলিলাম, "মাথার চুল মুড়াও, অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পর।" ইহা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "আমাদের চেন নাই? আমরা মায়ার দাসী, কতদিন আমাদের চরণসেবা করিয়াছ। এখন দিন পাইয়া চিনিতে পারিতেছ না। ভাল, তোমার কল্যাণ হউক। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর," এই বলিয়া চলিয়া গেল।

হিংসাবৃত্তির ভয়ানক অপকারিতা।

মারিলেই যে হিংসা হয়, তাহা নহে। হিংসা অন্তরে থাকিলে এবং ক্রোধ-পূর্ব্বক অথবা স্বীয় তৃপ্তির জন্য বধ করিলে, হিংসা হয়। অন্তরে হিংসা থাকিলে, ভগবানের লীলা-দর্শন হয় না। যদি কিছু সময়ের জন্যও হৃদয় হিংসা-শূন্য হয়, তখন লীলা-দর্শন হইতে পারে।

প্রশ্ন—মনঃসংযম হয় না কেন?

উত্তর—যাহাকে অপরাধী শত্রু বলিয়া বিশ্বাস কর, মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা কর, অকপটে তাহার সেবা কর। যাহাতে তাহার হিত হয়, এরূপ আচরণ কর। হৃদয়ের অভ্যন্তরে শত্রুতা থাকিলে কিছুতেই মন স্থির হইবে না। ভিতরে পচা ঘা রাখিয়া উপরে মলম দিলে পড়িয়া যায়।

হরিনামে প্রেম-লাভের ক্রম।

প্রথম পাপ-বোধ, দ্বিতীয় পাপকর্ম্মে অনুতাপ, তৃতীয় পাপে অপ্রবৃত্তি, চতুর্থ কুসঙ্গে ঘৃণা, পঞ্চম সাধুসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ঠ নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি, সপ্তম ভাবোদয় এবং অষ্টম প্রেম।

কি প্রণালীতে নাম করিলে নামের ফল সহজে পাওয়া যায়।

তৃণের মত নীচে হ'য়ে, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে মান্য ব্যক্তিকে মান্য ক'রে, নিজের অভিমান ত্যাগ করে নাম করিলে নামের ফল তৎক্ষণেই পাওয়া যায়।

ঐ সকল অবস্থা লাভ করিবার জন্য সৎসঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, গুরু-আজ্ঞা পালন, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং ভগবৎভক্তদিগের সেবার প্রয়োজন।

নামাপরাধ।

যাহারা নাম ক'রে পাপ করে, তাহারা ভয়ানক অপরাধী। নামাপরাধের মত পাপ আর নাই।

প্রশ্ন—নিত্য-বৃন্দাবনে আর এ বৃন্দাবনে প্রভেদ কি?

উত্তর—এক প্রকট, অপর অপ্রকট। একদিন দেখিলাম সমস্ত বৃন্দাবন অন্ধকারময় হইয়া গেল, একটু পরেই সমস্ত আবার আলোকময় হইয়া উঠিল। তখন দেখিতে পাইলাম—কত মণি, কত মুক্তা, কত গোপগোপী বিরাজ করিতেছে—একটা পরদার দ্বারা আবরণ দেওয়া রহিয়াছে মাত্র। ভগবানের কৃপায় যদি কোন দিন চক্ষু ফুটে, তখন দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

ষোল হাজার আট মহিষীর সঙ্গে একই সময় ক্রীড়া, আমোদ, কোন স্থানে যজ্ঞ, কোন স্থানে বিবাহ। প্রত্যেক স্থানে বিশেষভাবে। গোলোকে ও বৃন্দাবনে একই সময় লীলা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে বিশেষভাবে।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য।

কাম নষ্ট হউক, একথা ঠিক নয়। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণের অতীত হইয়া। শারীরিক গুণের সহিত মিশ্রিত থাকিলেই কাম ও শরীর হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িলেই তাহাকে প্রেম বলা হয়। তখন উহা আত্মার অংশ অথবা আত্মা।

"নেদং যদিদমুপাসতে বাক্যের তাৎপর্য্য।

উপনিষদের "নেদং যদিদমুপাসতে" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা লোকে যে সকল বস্তুর উপাসনা করে অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য যত বিষয় আছে, তাহা আমি (ঈশ্বর) নহি। আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনোগ্রাহ্য বস্তু হইতে অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু হইতে পৃথক।

ভগবান্ ও তাঁহার দেহ অভিন্ন।

সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই দেহ-দেহী ভিন্ন। মানুষের দেহ পাঞ্চভৌতিক। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য; এজন্য শরীরকে ক্ষেত্র বলে—মনুষ্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ভগবান্ যখন দেহ ধারণ করেন, তখন তাঁহার দেহ ও তিনি অভিন্ন। তাঁহাকে যত দর্শন করা যায়, ততই হৃদয় পরিষ্কার হয়।

প্রশ্ন—সৎগুরু কি?

উত্তর—মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের আবেশ (তিনি অবতীর্ণ)। নিজে একটী দেহ ধারণ করেন, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক নহে।

সৎগুরু—রক্তমাংসের এই দেহ সৎগুরু নন, তিনি সর্ব্বব্যাপী—যেমন অগ্নি

সর্ব্বস্থানে আছে অথচ সর্ব্বস্থানে দেখিতে পারা যায় না, যে স্থানে অগ্নির বিকাশ কেবল সেই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একটী প্রদীপ, প্রদীপে টীকে ধারণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া লওয়া যায়।

প্রশ্ন—গুরুব্রহ্ম, ইহার অর্থ কি ?

উত্তর—শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এক অবস্থা আসে, যাহাতে গুরুদর্শন হয় এবং গুরুর মধ্যে নামের চৈতন্যরূপ দর্শন হয়, তখনই গুরু ও ব্রহ্ম এক হইয়া যান। যাহাদের ঐরূপ দর্শন ও অবস্থা লাভ হয়, তাহাদের নিকটই গুরুব্রহ্ম। তা' না হইলে গুরুব্রহ্ম কল্পনা মাত্র। কল্পনা করিলে বরং ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন—গুরুতে বিশ্বাস কিসে হয় ?

উত্তর—গুরুতে বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে, গুরুতে সহজে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। আশ্চর্য্য কিছু দেখিলে বিশ্বাস হইবে মনে হইল। যখন আশ্চর্য্য দেখিলাম, তখন মনে হইল এ আর আশ্চর্য্য কি ? যদি বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য দেখিলাম, মনে হইল এ লোকটা ভেল্কি জানে, আমাকে ভেল্কি দেখাইতেছে। এইরূপ উপায়ে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হইবার একমাত্র উপায় এই যে, গুরু যাহা উপদেশ দেন তাহা আচরণ করা, আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস হইবে।

কৃপার পন্থা।

কৃপাপ্রার্থী হওয়া বড়ই পরীক্ষার পথ। ভোগ করিয়া যদি ভোগ ক্ষয় হয়, তাহা সহজ। কৃপার পথে একটু আসক্তি থাকিলে তাহা যদি ছেঁড়ে, তখন বড় লাগে।

দেশের ভবিষ্যৎ দৃশ্য।

সত্য-যুগের যেটুকু কাজে ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন ত্রেতা—কেবল মার, মার, কাট, কাট। এই সময় যাহারা কেবল নামমাত্র লইয়া থাকিবেন, তাঁহাদেরই রক্ষা। আগুন সর্ব্বব্যাপী, তাহার আঁচ হইতে কাহাকেও রক্ষা পাইতে দেখিতেছি না। বেড়া আগুন, অতি দুর্ব্বার !

প্রশ্ন—প্রকৃত পাপ বোধ হয় কখন ?

উত্তর—শুনে শুনে পাপ-বোধ এক, আর প্রকৃত পাপ-বোধ অন্য প্রকার। সাধু-কৃপাতে যখন পাপী আপন পাপ অনুভব করে, তখন তাহার জ্বালা এত প্রবল হয় যে, তাহার নিকট নরক-যন্ত্রণা অসার বোধ হয়। জগাই মাধাইর পাপ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর গৌরবর্ণ কাল হইয়া যায়, পরে জগাই মাধাইর রোদনে নবদ্বীপের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত কেঁদেছিল।

যোগসাধন সম্বন্ধে অষ্টপাশ।

১। লজ্জা। ২। ঘৃণা। ৩। ভয়। ৪। শোক। ৫। জুগুপ্সা (নিন্দা)। ৬। কুল। ৭। শীল। ৮। জাতি।

প্রশ্ন—মৃত্যুর পরে কি হয়? পরলোক বলিয়া যে সকল কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য কিনা?

উত্তর—মৃত্যুর পরে সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই এক এক জন পিতৃপুরুষ থাকেন। তিনি তাহার যে অবস্থা, তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেন। তথায় ক্রমে ক্রমে তাহার বাসনা জন্মে। বাসনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতেই হইবে, এমন নহে। সৌরজগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানি, ঐরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে, জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, কোন্ স্থানে তাহার জন্ম হইবে, তাহা পিতৃপুরুষ বলিয়া দেন। সে তদনুযায়ী প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, অবস্থা অনুসারে নানা গ্রহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে যে একজনের জন্ম না হইলে সে মুক্ত হইল, তাহা নহে, অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে। তথায় স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক এরূপ (এই পৃথিবীর স্ত্রীপুরুষের মত) নহে। কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন। সেখানেও বাসনা আছে। এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। বাসনা অনুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা একরকম নহে। সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের এক গ্রহে হয় না।

নামে রুচি না হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

প্রতিদিন কিছু অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগিলে ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছার সহিত নাম করিলেও ক্রমে রুচি জন্মে। নামে অরুচির ঔষধ নামই। যেমন পিত্তরোগে মুখ তিক্ত হইলে মিশ্রিও তিক্ত লাগে, কিন্তু ঐ রোগের ঔষধ মিশ্রি; খাইতে খাইতে মিশ্রি মিষ্ট লাগিতে থাকে। তদ্রূপ নাম করিতে করিতে নামে রুচি জন্মে।

প্রশ্ন—কোন্ অবস্থায় ভগবদ্‌লাভ হইয়া থাকে?

উত্তর—তপস্যাদ্বারা আত্মা যত নির্ম্মল হইবে, ততই নিজেকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া, আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে।

তপস্যাদ্বারা, সৎসঙ্গ দ্বারা যখন আত্মার ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তখন পাপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ভগবৎ আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

যতদিন আসক্তি থাকে, ততদিন তাপ লাগা উচিত।

যতদিন আসক্তি থাকে, ততদিন তাপ লাগা উচিত, তাহাতে অন্তরের আসক্তি

দগ্ধ হয়—যেমন স্বর্ণ অগ্নি দ্বারা নির্ম্মল হয়। আসক্তি গেলে যখন শুদ্ধ আত্মায় ভগবৎ-পূজা হয়, তখন সেখানে তাপ লাগিলে ইষ্টদেবতার অঙ্গে তাপ লাগে। ভক্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য পলায়ন করে।

মোক্ষদ্বার কি এবং তাহার ব্যাখ্যা।

মোক্ষের চারিটী দ্বার—১ম—শম ; ২য়—বিচার ; ৩য়—সন্তোষ ; ৪র্থ—সৎসঙ্গ।

শম—যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে অধীর না হওয়া। সরলতাই ইহা লাভের উপায়।

বিচার—সংসারের কোন্ বস্তু নিত্য আর কোন্ বস্তু অনিত্য ইত্যাদি বিচার।

সন্তোষ—যে দিন যাহা ঘটে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা। কাহারও মনে উদ্বেগ না দেওয়া, কাহারও নিকট প্রত্যাশা না করা এবং ভগবান্ পালনকর্ত্তা এই বিশ্বাস রাখা—ইহাই সন্তোষ লাভের উপায়। ইহাই মোক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বার—সিংহদ্বার।

সৎসঙ্গ—অর্থ সাধুলাভ। যাঁহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্ফুরণ হয়, সেই প্রকৃত সাধু।

প্রশ্ন—একজন একটু তপস্যা করিলেই চারিদিক হইতে তাঁহার দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়ে, ইহার কারণ কি ?

উত্তর—ভগবানের নিকট কত জন যাইতে পারেন ? তিনি কিছু কিছু (প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) দিয়া বিদায় করিয়া দেন।

প্রশ্ন—মহাপ্রভু কে ?

উত্তর—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান, তিনিই জ্ঞাতব্য। অন্যান্য অবতারের ন্যায় তাঁহার অসুর-সংহার প্রভৃতি কার্য্য ছিল না। কেবল অনর্পিত বস্তুদান এবং ঋণশোধ করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অবতার নয়, অবতারী।

প্রশ্ন—নিত্যানন্দ কি ?

উত্তর—অংশ-অবতার (বলরাম)।

প্রশ্ন—অদ্বৈত প্রভু ?

উত্তর—অংশ-অবতার (মহাবিষ্ণু)।

প্রশ্ন—বুদ্ধদেবও কি ভগবানের অবতার ?

উত্তর—হাঁ।

প্রশ্ন—মহম্মদ ?

উত্তর—মহাপুরুষ।

ক্রোধ ও তেজের পার্থক্য।

ক্রোধ—আত্মাভিমানজনিত হইলে ক্রোধ বলে, কিন্তু যদি ন্যায় ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য হয়, তবে তাহাকে তেজ বলিতে হইবে। সেই তেজ মনুষ্যের ধর্ম্ম।

গীতা ও ভাগবতের সাধনের লক্ষ্য।

ব্রহ্মের দুই ভাব—নিত্য এবং লীলা। নিত্যসাধন গীতার দ্বারা হয়; লীলা-সাধন ভাগবতের দ্বারা হয়।

অপরের ধর্ম্ম-মতের মর্য্যাদা করা আবশ্যক।

যিনি যেভাবে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, তিনি তাহা করুন। আমি কাহাকেও নিন্দা করিব না। বরং যদি কিছু প্রশংসার থাকে, তবে তাহাই করিব। ভগবান্ কর্ত্তা, তিনি কাহাকে কি ভাবে উদ্ধার করিবেন, তাহা আমি কি জানি, ইহা মনে করিয়া চুপ থাকাই ভাল।

কোন কার্য্যের পূর্ব্বে চিত্তের প্রসন্নতা ভগবৎ সম্মতিজ্ঞাপক।

কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে যদি চিত্তটী প্রসন্ন বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহাতে ভগবানের সম্মতি আছে।

প্রশ্ন—কি কি কারণে অভিমান জন্মে?

উত্তর—অভিমান অনেক টাকা থাকিলে হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়, অনেক ধর্ম্মেতে, তপস্যায় অভিমান হয়। এই অভিমান সহজে নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক প্রকার অভিমান ঠিক ইহার বিপরীত। নির্ধন দরিদ্র মনে করে যে, ধনী আমাকে ঘৃণা করে, অতএব আমিও ইহাকে ঘৃণা করিব, নতুবা আমার নীচতা প্রকাশ পাইবে। মূর্খ বিদ্বানের প্রতি অভিমান করে—পাপী সংসারাসক্ত মনুষ্যের প্রতি, ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর প্রতি অভিমান প্রকাশ করে। রাজা জনকের নিকট অনেক ঋষি এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করিতেন।

প্রশ্ন—কিসে অভিমান নষ্ট হয়?

উত্তর—অভিমান-গর্ব্ব নষ্ট করা বড় সহজ নয়। মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমান থাকে; যতদিন পর্য্যন্ত নিজকে কাঙ্গাল করিতে না পারিবে, ততদিন কিছুই হইল না। মুটে-মজুর, ভাল-মন্দ সকলকেই ভক্তি করিতে হইবে। এই অভিমানের ভাব একটুমাত্র আসাতেই বড় বড় যোগীর পতন হইতে দেখিয়াছি। অভিমান ভয়ানক শত্রু।

কাম ক্রোধের মত মাদক আর নাই।

বাহিরের মদ শরীরের উপর ক্রিয়া করে, যদি নেশা না হয়, তবে তাহা ধর্ম্ম-পথের বাধক নহে, কিন্তু কাম-ক্রোধের মত মাদক আর নাই। এই মাদক ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ভগবান্ হইতে বিচ্যুত করে। ইহা যিনি ত্যাগ না করেন, তিনি মাদক সেবন করেন।

সর্ব্বদা নিজেকে হীন মনে করা অনুচিত।

সর্ব্বদা নিজেকে হীন মনে করা উচিত নহে। একদিকে যেমন তৃণ হইতেও নীচ, অন্যদিকে আবার আমি ভগবৎ অংশ, আমার শক্তির সীমা নাই, পবিত্রতার সীমা নাই, ইহা বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইবে। আমি যে তৃণ হইতে নীচ, তাহা আমার উচ্চতা বোধ করিলেই বলিতে পারি।

প্রশ্ন—মুক্তি কত প্রকার এবং গোলোকধাম কাহাকে বলে?

উত্তর—জীবের দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। বাসনা লয় হইলে স্থূল দেহের লয় হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ থাকে। সূক্ষ্ম দেহ যে যে বাসনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় হইলেও কারণ-দেহ থাকে। সমস্ত বাসনার একেবারে নিষ্কৃতি না হইলে কারণ-দেহের লয় হয় না। এই কারণ-দেহের লয়ে সম্যক্ মুক্তি। কারণ-দেহের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্য নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায় পেঁছে না। মুক্তিলাভ হইলে জীব সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দের আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকিবে। সেখানে সর্ব্বদাই ভগবানের লীলাদর্শন হয়। ইহাকে গোলোকধাম, কৈলাসধাম বলে।

প্রশ্ন—কোন্ অবস্থায় আত্মদর্শন লাভ হয়?

উত্তর—চিত্ত স্থির হইলে আত্মদর্শন, গুরুদর্শন ও দেব-দর্শন হয়।

প্রশ্ন—নাদ কি?

উত্তর—অনাহত ধ্বনি। বীর্য্য স্থির না হইলে নাদ শুনিবে না। খুব শুদ্ধ পবিত্র থাকিলে বীর্য্য স্থির হয়।

প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার তুল্য মনে করিতে হইবে।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা", লোকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেই ক্ষতি। যেমন কোন বৃক্ষে ফল ধরিলে, কোন হাঁড়িতে চুণের দাগ দিয়া অথবা খড়ের মানুষ দিয়া রাখে সেই রকম সাধনের অবস্থা লাভ হইলে বালক, উম্মত্ত ও পিশাচবৎ আবরণ দিয়া রাখিতে হয়। ইহা অপেক্ষা একজনে যদি গালাগালি দেয়, তাহাতেও উপকার হয়। ভাব ইত্যাদি চেপে রাখাই ভাল। খুব চেষ্টা করিতে হইবে, না পারিলে নিরুপায়। মোটে কিছু না হ'য়, চুপ করে বসে থাকে সেও ভাল, কিন্তু কিছু হ'য়ে অহঙ্কার হইলেই সর্ব্বনাশ। কুকুর বানরকে লাই দিলেই, ঘাড়ে চড়িবে। আসা মাত্রই যদি শাসন করা যায়, তবে দূরে গিয়ে ব'সে থাকে, কিছু খাবার দিলে ত খেলে। প্রতিষ্ঠাও তদ্রূপ।

প্রশ্ন—স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া কিরূপ?

উত্তর—কখনও কখনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের মন্ত্র প্রকাশ পায় এবং কখনও কখনও মহাপুরুষেরা কৃপা করেন।

শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদে উপদেশ।

আমাদের শাস্ত্রে সমস্তই অধিকারি-ভেদে উপদেশ। শাস্ত্রের যে যে অংশ

পূর্ব্বে পরিত্যজ্য মনে হইত, এখন দেখি যে তাহার একটী অক্ষরও ছাড়িবার যো নাই। খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে অধিকারী বিচার না করিয়া, সকলের পক্ষেই এক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক দুর্ব্বল বালকের স্কন্ধে দশ মণ বোঝা চাপাইলে, সে তাহা বহন করিতে পারিবে কেন?

ভগবানের সগুণ সাকারলীলা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নহে।

ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ভগবানের লীলায় মোহিত হইয়াছিলেন। একদিন ব্রহ্মা ভাবিলেন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোকুলে প্রকট হইবেন। এই শ্রীকৃষ্ণই কি পরব্রহ্ম? এই সন্দেহ করিয়া পরীক্ষার জন্য গোষ্ঠ হইতে গাভী-বৎস ও রাখালগণকে হরণ করতঃ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের গুহায় পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এসব ব্রহ্মার কর্ম্ম জানিয়া নিজেই গাভী-বৎস ও রাখাল হইলেন। এইরূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। এক বৎসর পরে ব্রহ্মা আসিয়া দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় রাখালগণ ও গোবৎসসহ লীলা করিতেছেন। পর্ব্বতের গুহায় যাইয়া দেখেন, তিনি যাহা যে ভাবে রাখিয়াছিলন তাহা সেই ভাবেই আছে। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা একবার এখানে, একবার সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পরে সমস্ত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—"প্রভো, সন্তান জননীর উদরে থাকিয়া বুকে লাথি মারে, জননী তাহাতে ক্রোধ করেন না। হে প্রভো, তুমি ধন্য, ব্রজবাসিগণ ধন্য, কারণ তুমি যখন চলিয়া যাও, তোমার শ্রীচরণরেণু ব্রজবাসীদিগের গাত্র স্পর্শ করে। হে প্রভো, ব্রজের গুল্ম-লতা—তারাও ধন্য, কারণ তাহাদের গাত্রে ব্রজবাসীদিগের চরণ-ধূলি সর্ব্বদা পতিত হয়। হে প্রভো, আমাকে ব্রজের গুল্ম-লতা করিয়া রাখুন।" শ্রীবৃন্দাবন গেলে এ সমস্ত প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা যায়। ভক্তগণ বুঝিতে পারিবে, অভক্তগণ বুঝিবে না এমন নয়। শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণের সময় একবার দেখিলাম একটী বৃক্ষে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। অনেকেই তাহা দেখিলেন। শেষে ব্রজবাসীরা যখন উহা দ্বারা পয়সা উপায়ের ফন্দী করিলেন, তখন তাহা আপনা হইতেই লোপ পাইয়া গেল। বৃন্দাবনের সমস্ত বৃক্ষেরই মস্তক অবনত এবং অনেক বৃক্ষের গায়ের উপর 'রাধাকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি নাম লেখা আছে। কালীদহের তীরে একটী কেলীকদম্ব বৃক্ষে ঐ সকল নাম অতি স্পষ্টভাবে আছে। বৃক্ষের বাকল টানিয়া তুলিলে তাহার মধ্যেও নাম অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। পয়সার লোভে কতকগুলি লোক অন্যান্য বৃক্ষে ছুরিকার দ্বারা একপ্রকার নাম লিখিয়া রাখিয়া যাত্রীদের ভুলাইয়া থাকে। সে সকল নামের ও এই সকল স্বাভাবিক নামের অক্ষরে অনেক পার্থক্য আছে, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

প্রশ্ন—সংগুরুর নিকট সাধন নিলেও কর্ম্ম শেষ করিতে এত বিলম্ব হয় কেন? তাঁহার দীক্ষার পরেও কি নিজের চেষ্টায় কর্ম্ম শেষ করিতে হইবে?

উত্তর—সদ্গুরুর আশ্রয় পাইলেই ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম শেষ হইয়া আসিবে। সামান্য আগুনের উপর খুব বেশী পরিমাণ কাঠ রাখিলে যেমন কিয়ৎকাল ধীরে ধীরে জ্বলিবার পর একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং অল্পকাল মধ্যে সমস্ত কাঠ দগ্ধ করতঃ ভস্ম করিয়া ফেলে, তদ্রূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও বহু জন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জ্জনার নীচে ধীরে ধীরে কার্য্য করিতেছে, ঐ আবর্জ্জনায় কতক নষ্ট করিয়া যখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তখন সমস্ত কর্ম্ম মুহূর্ত্তের মধ্যে নষ্ট করিয়া প্রকৃত শান্তিময় অবস্থায় লইয়া যাইবে; গুরু-শক্তি আপনাআপনি কার্য্য করিবে।

শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্বাভাবিকভাবে নাম অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরাপদ নহেন।

যেদিন ২৪ ঘণ্টা একটী শ্বাস-প্রশ্বাস বৃথা না যাইয়া নাম চলিবে, সেই দিনই সিদ্ধি-লাভ হইবে। ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধক নিরাপদ ভূমিতে পেঁছিল না। ইহার পূর্ব্বে প্রতি মুহূর্ত্তেই পতনের আশঙ্কা থাকে।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের পরিচয়।

সকাম নিষ্কামের এক পরীক্ষা এই যে, যখন সকাম অবস্থা, তখন মন অজ্ঞাতসারে অনেক বৃথা চিন্তা করে। বাড়ী-ঘর, বাগান, হাতী-ঘোড়া, রাজত্ব এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সুখী হয়। নিষ্কাম হইলে, মন সেই অভ্যাসদোষে অজ্ঞাতসারে বৃথা চিন্তা করিতে গিয়া পারে না। যাহা চিন্তা করে, তাহাতেই ঘৃণা হয়। যেমন বিষ্ঠা দেখিয়া লোকে স্নানের পর লাফিয়ে যায়, সেইরূপ। যেমন চিন্তা আসে অমনি থু থু করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এইরূপ দুই এক বার করিয়া মন লজ্জিত হইলে বোকার মত বসিয়া থাকে।

সাধকের নিত্যানিত্য বিচার ও আত্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

তপস্যাদ্বারা আত্মা যত নির্ম্মল হইবে, ততই নিজেকে নিকৃষ্ট মনে হইবে। শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে। তপস্যাদ্বারা আপনাকে নিকৃষ্ট মনে করিলেও, শরীর মনকে শাসন করিতে করিতে একপ্রকার অহঙ্কার জন্মে; তাহাতে মনে হয়—আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। এই ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই আছে। তপস্যাদ্বারা ইহা প্রবল হয়। এ সময় আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু পারে না। মনে করিয়া গেলাম, আমার সমস্ত অর্পণ করিয়া আসিব; কিন্তু অমনি ভিতর হইতে রোদন আসে। কে যেন নিষেধ করিয়া বলে যে পারিবে না। এখন যদি বলে 'মর', তখন কি করিবে? যদি বলে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া, কৌপীন পরিধান করিয়া বনে যাও, তখন কি করিবে? এই মানসিক সংগ্রাম প্রত্যেক সাধকের অন্তরকে আন্দোলিত

করে ; এজন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘা কাটিতে কাটিতে অস্থি ভেদ করিয়া মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ, তাহা ধরিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ শুনা কথায় বা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছু স্থির না করিয়া, অতি গভীরভাবে বিচারপূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা যথার্থ আমার অবস্থা, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকাই উচিত। যদি আমার আত্মার ভাব হয়, অবস্থা হয়, তবে চুপ করিয়া তাহার গতি দেখিলে পরমানন্দ লাভ করা যায়। আর যদি পাপ ভিতরে চোরের মত লুকাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দিন সাধন-ভজন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাকে নরকে আনিল কিরূপে, ইহা দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সাধন-ভজনের উপযুক্ত স্থান

সাধন-ভজনের যথার্থ স্থান হিমালয়। তাহার পর নর্ম্মদা, গোদাবরী, গঙ্গা, যমুনা এই সকল নদী-তীরস্থ প্রস্তরময় স্থানও ভাল। পাঞ্জাবে রাভি নদীর তীরস্থ প্রস্তরময় স্থানও ভাল। গয়াও সাধন-ভজনের অনুকূল স্থান। বঙ্গদেশ নানা কারণে উপযুক্ত নহে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা সমস্তই বিরোধী।

ঋষি ও ঋষি-বাক্যের লক্ষণ।

ঋষি বাক্য—তাহাতে নিন্দা থাকিবে না, কোন পক্ষের ও কোন জাতি বা দেশের দিক্‌টানা কথা থাকিবে না। সাধারণ মানব-ধর্ম্ম যাহা, তাহাই তাহাতে স্থান পাইবে এবং তাহা বেদের তনুগত হইবে।

যিনি সমগ্র বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তপস্যাদ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এইরূপ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ ঋষিপদ-বাচ্য।

সাধনপন্থার ক্রম।

ক, খ অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম, পড়ে যে পুস্তক পড়ি তাহার মধ্যে ক, খ আছে দেখিতে পাই। ক, খ ত্যাগ করিয়া পড়িতে পারি না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। এক একটী প্রণালী ধরিয়া চলিতে হইবে। প্রথমে এই দেহই আমি—এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীর-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা ইত্যাদি করিতে হয়। যিনি তাহা না করেন, তিনি দেহ ও আত্মা যে কি, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। পরে সৃষ্টিতত্ত্ব জানিলে তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর সমস্ত কিছু নহে, এরূপ বোধ হয়। আমি এবং ব্রহ্ম এক কি ভিন্ন—ইহা জানিবার জন্য যোগ-অভ্যাস করা আবশ্যক। এ যোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে, আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন। যথার্থ যোগ-সাধন হইলে, ভগবান্ কিরূপে জগতে বিরাজ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হয়। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া এইরূপে

ক্রমে ক্রমে সাধনের অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ক্রম অনুসারে না হইলে যেটুকু সাধন করিবে, তাহারই ফল পাইবে, পরের অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। এখন সমস্তই বিশৃঙ্খল, কিছুই প্রকৃতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুর হয়, ইহা কৃষকের গুণ নহে। সাধন সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

মানুষ যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য সমস্ত জীবন ভরিয়া করে, মৃত্যুকালে তাহারই চিন্তা আসে। দৃষ্টান্ত—ভরত রাজা। মৃত্যুকালে হরিস্মৃতি সকলের ভাগ্যে হয় না। জীবনে যেমন চিন্তা, স্বপ্নেও সেইরূপ, মৃত্যুকালেও সেইরূপ। গুরুতর পাপ করিলে অথবা কোন বস্তুতে বা জন্তুতে অত্যন্ত আসক্তি হইলে অধোগতি হয়।

সাধন করিবার প্রকৃষ্ট সময়।

মহাপুরুষেরা রাত্রি ১॥• টার সময় বাহির হন এবং রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি-জাগরণ অভ্যাস করা উচিত। এই সময় সাধনার প্রশস্ত সময়। দুই একবার প্রাণায়াম করিয়া নাম করিবে। মশারির মধ্যে বসিয়া করিলেও হয়। করিবার সময় মহাপুরুষেরা কাছে আসিয়া দাঁড়ান এবং সাহায্য করেন। কোন মহাপুরুষ আসিলেই চন্দনের এবং ধূপের গন্ধ বাহির হয়। কখন কখন গাজার গন্ধও পাওয়া যায়। মহাত্মাদিগের গাত্র-গন্ধে মন অতি প্রফুল্ল হয়।

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রি চারিটার সময়, বেলা এক প্রহরের পর এক দণ্ড এবং সন্ধ্যার সময় প্রকৃত ভজনের সময়। এই চারি সময়ে দেবতারা ও সাধু মহাত্মারা বিচরণ করেন। ঐ সময় সাধন করিলে তমঃ শীঘ্র নাশ হয়।

প্রশ্ন—নাম করিতে বসি, মন এদিক্ ওদিক্ চলিয়া যায়। উপায় কি করি ?

উত্তর—নাম করিতে করিতে নামের স্বাদ পাওয়া যায়। তখন একপ্রকার শব্দ শরীরের মধ্য হইতে শোনা যায়। উহা শ্রবণ করিলে আর মন বিচলিত হয় না। যখন ঐ প্রকার হইতে থাকে, তখন মনকে পৃথক ব্যক্তি কল্পনা করতঃ লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বড় করিয়া করযোড়ে মনের নিকট "মনরে তোর পায়ে ধরি" ইত্যাদি প্রকারে করিতে পারিলে, একপ্রকার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ আদেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়।

পরমহংস কাহাকে বলে।

হংস যেমন মিশ্রিত জল ও দুধ হইতে দুধের অংশ গ্রহণ করে ও জলভাগ ত্যাগ করে, সেই প্রকার যিনি এই অনিত্য, মিথ্যা সংসার হইতে কেবল সারই সংগ্রহ করেন, তিনিই পরমহংস। তিনি কেবল গুণগ্রাহী হইবেন।

কৃপা করিয়া অবস্থা খুলিয়া দেওয়া প্রণালী নহে।

সংগুরু-কৃপায় সকলই হয়, ইহা সত্য কথা। সংগুরু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন এবং যখনই ইচ্ছা তখনই করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে লাভ কি? বস্তুর মূল্য অবগত হইবার পূর্ব্বে যদি তাহা লাভ হয়, তবে বস্তুলাভের আনন্দ হইবে না, বস্তুর জন্যও আদর হইবে না। বস্তুর অভাবজ্ঞানে যত দুঃখ-যন্ত্রণা হইবে, বস্তু-লাভে ততই আনন্দ হইবে এবং তাহার মূল্য বুঝিবে।

সাধন-সঙ্কেত।

চিত্তের স্থিরতা লাভ করাই ধর্ম্মার্থীর প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ সমস্তই এই স্থিরতা লাভের উপর নির্ভর করে।

সাধুগণ স্থিরতা লাভের নানা উপায়ের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তন, উচ্চৈঃস্বরে স্তব-পাঠ আশু ফলপ্রদ। এইজন্য সাধকদিগকে প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা, ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ও স্তবস্তুতি-পাঠ করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। চঞ্চলমতি বালককে যেমন উচ্চৈঃস্বরে আপনার পাঠ আবৃত্তি করিয়া তাহা অভ্যস্থ করিতে হয়, চঞ্চলমতি সাধককেও সেইরূপ সজনে নির্জ্জনে প্রথম অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে স্তবস্তুতি ও সঙ্গীতাদি করিয়া ভগবানের পূজা করিতে হয়। নাম-সাধন ও প্রাণায়াম প্রভৃতিও চিত্তের স্থিরতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রতিদিন একই স্তব-পাঠ, একই সংকীর্ত্তন গান, একই নাম জপ করা বিধেয়। সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে অনেকে নিত্য নূতন সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেদিন যেরূপ ভাবের উদয় হইল, সেদিন তদনুরূপ কীর্ত্তনাদি করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সাধক ভাবের অধীন হইয়া পড়েন, ভাব তাঁহার অধীন কখনও হয় না। ভাব-স্রোত বন্ধ করা কখনও উচিত নহে, সত্য, কিন্তু ভাবের বশ হওয়াও অকর্ত্তব্য। একে তো ভাব-প্রকাশের ব্যাঘাত, অপর চরিত্র-গঠনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। প্রবল ভাবাবেশ হইলে সে ভাবকে অসঙ্কুচিতভাবে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়াই উচিত, কিন্তু সর্ব্বদাই আপনাকে এরূপ ভাবের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয় যাহাতে ভাব আসিলে পূজা আরাধনা প্রভৃতি হইবে, না আসিলে হইবে না। কিন্তু যে দিন যেরূপ ভাব আসে, সে দিনে কেবল সেরূপ ভাবের সঙ্গীত পাঠাদি করিলে পরিণামে সাধক বস্তুতঃই একেবারে আত্মশক্তিহীন হইয়া ভাবের বশীভূত হইয়া পড়েন। এই কারণেই একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ঠাসহকারে একটী নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্তের স্থিরতা, ভাবের গাঢ়তা এবং চরিত্রের শক্তি সাধিত হইয়া থাকে।

যেমন পাঠ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে, তেমন আসন সম্বন্ধেও একটা স্থিরতা থাকা ভাল। প্রতিদিন সাধনের সময় একই আসনে, একই গৃহে, একই দিকাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। যেমন শয্যা বা শয়নগৃহে পরিবর্ত্তন করিলে সকলেরই প্রথম প্রথম অল্পাধিক পরিমাণে সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ আসন, স্থান বা অভিমুখ পরিবর্ত্তন করিলে সাধনের কালে চিত্ত-স্থৈর্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। প্রাচীনকালে গুরূপদেশ হইতে সাধনার্থিগণ ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই এই সকল সাধন-সঙ্কেত শিক্ষা করিতেন। বর্ত্তমানের বৈপ্লবিকভাবে সে সকল শিক্ষা-প্রণালী বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, অনেকেরই পক্ষে এই সকল সামান্য সাহায্যও দুর্ল্লভ হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা আত্মচেষ্টাতে ধর্ম্ম-সাধন করিবার প্রয়াসী, তাহারা এসকল সঙ্কেত না জানাতে যে সাধন তিন সপ্তাহে হইত, তাহা তিন বৎসরেও হইতে পারে না। এই সকল অতি সামান্য উপদেশের অভাবেই অনেক সরল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি বহুকালব্যাপী চেষ্টার পরেও স্ব স্ব ধর্ম্মজীবনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত করিতে পারে না।

অঙ্গন্যাস্ করন্যাসের উপকারিতা।

গভীরভাবে একাগ্রতা সহকারে ভক্তির সঙ্গে আরাধ্য দেবতার নামে বা ইষ্ট-মন্ত্রের সঙ্গে শরীরের ভিন্ন অঙ্গে ন্যাস করিলে, সাধকের বিবিধ অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া পরম বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে। যাহার যে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা বা অবিশুদ্ধতা যত বেশী, তিনি বিশেষভাবে সেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ করিয়া ভগবানের নাম ও পবিত্রতা ক্রমাগত স্মরণ ও চিন্তা করিলে বিশেষ ফল পাইবেন। যাঁহার দৃষ্টি অপবিত্র, তিনি প্রতিদিন আপনার নেত্রদ্বয়ে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার নাম করিবেন—ইত্যাদি।

যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া শাস্ত্রবাক্য গ্রহণ করিতে হইবে।

যাঁহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া শাস্ত্র-বাক্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রেরই উপদেশ। শিশু যেমন মাতার প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ স্বাভাবিক নির্ভর হইলে তখন যুক্তি-তর্ক অন্তর্হিত হয়।

ঊর্দ্ধরেতা হইলেও স্ত্রীলোক হইতে অনিষ্ট হয়।

যেই কেন যেমন উন্নত হউন না, স্ত্রীলোক হইতে তফাৎ থাকিতে হইবে। ঊর্ধ্বরেতা হইলেও স্ত্রীলোক হইতে অনিষ্ট হয়।

শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় ও প্রয়োজনীয়তা।

যতদিন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়গণ বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, ততদিন শরীর বিস্মৃত

হইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কিছুতেই শরীর ভুলিতে পারা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। কোন উপায়ে ভগবানকে দর্শন করিলে তখন শরীরের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। সহজেই শরীর ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু এ অবস্থা সকলের ঘটে না। এজন্য কাহাকেও ভালবাসিতে হইবে। অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ভালবাসিতে হইবে। এ ভালবাসা লাভ করিবার জন্য অহিংসা অভ্যাস করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কষ্ট দিবে না। কেহ প্রহার করিলে, গালাগালি দিলে, এমন কি সর্ব্বনাশ করিলেও তাহার অমঙ্গল কামনা করিবে না এইরূপে দ্বেষ-হিংসা নষ্ট হইলে ভালবাসা আসে। সেই ভালবাসা কোন স্থানে অর্পণ করিয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্মৃত হওয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়।

পাপ—শারীরিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক

পাপ কি? স্বভাবের বিপরীত কার্য্য। আধ্যাত্মিক পাপ, শারীরিক পাপ, মানসিক পাপ, সামাজিক পাপ। আধ্যাত্মিক পাপ—অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ইত্যাদি। মানসিক—কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। সামাজিক—চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। শারীরিক—রোগ। আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক পাপ লোকে লক্ষ্য করে না, কেবল সামাজিক পাপই দেখে, তাহা নিবারণের জন্য রাজ-শাসন, সমাজ-শাসন ইত্যাদি।

ঈশ্বর-দর্শনের পূর্ব্বে দেবতা-দর্শন হয়।

ঈশ্বর-দর্শনের পূর্ব্বে মহাপুরুষ ও দেবতা-দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। ভগবৎ দর্শনই লক্ষ্য। দেবতা-দর্শনে যিনি যে দেবতাকে ভালবাসেন, তাহাই প্রকাশ হয়।

ধর্ম্ম বাহিরের কতকগুলি কার্য্য নহে।

বাহিরের কতকগুলি কার্য্য না করিলেই আজকাল সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। যদি কেহ বেশ্যাবাড়ী না যান, চুরি না করেন, ঘরে আগুন না লাগান ইত্যাদি, তাহা হইলে তিনি ভাল লোক বলিয়া গণ্য হন। কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে হিংসা-বৃত্তি, যাহা তুষানলের ন্যায় মানবচিত্ত দগ্ধ করে, তাহা থাকিতে পারে। হয়ত তিনি, যে পরনিন্দা, শাস্ত্র-নিন্দা, দেব-নিন্দা, নরহত্যা হইতেও অধিকতর পাপজনক, তাহা করিতে পারেন, তথাপি তিনি ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে গণ্য হন। ধর্ম্ম কেবল বাহিরের কতকগুলি কার্য্য নহে। যাঁহাদের আত্মপ্রবেশের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সর্ব্বদা নিজের চিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে যে, পঞ্চ উপাসনায় মুক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে। মুক্তির পর পঞ্চম পুরুষার্থ। তাহার জন্য রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রয়োজন।

ত্রিগুণাতীত না হইলে কাম নষ্ট হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এ তিন মায়া হইতে উৎপন্ন। মায়া কি? কামনা। যতদিন ত্রিগুণের মধ্যে থাকিবে, ততদিন কাম তাহার উপর আধিপত্য করিবে। এজন ত্রিগুণাতীত হইয়া, সিদ্ধ যোগীগণ অনায়াসে কামকে জয় করেন।

অক্ষম এই ভাব আনিবার জন্যই তপস্যা।

অক্ষম—এই ভাব আনিবার জন্যই তপস্যার প্রয়োজন। পুরুষকার যদি কার্য্য না করে, তবে প্রকৃত আত্ম-পরিচয় হয় না। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিবরণ পাঠ করিলে এই বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

ভক্তিবিষয়ক গানের উপকারিতা।

নীলকণ্ঠের গানে অনেক উপকার হইয়াছে। নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে। শান্তিপুরে একদিন আমি স্নানে যাইতেছি, শুনিলাম গান হইতেছে; মনে হইল একটু শুনে যাই। বেলা তখন চারিটা। এক ঠাকুরবাড়ীর নাট্-মন্দিরে গান হইতেছে। একজন মুসলমান মগ্ন হইয়া গান শুনিতে শুনিতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছিলেন। এমন সময় একজন গোস্বামী তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "ওঠ্ বেটা, তুই এখানে কেন? একি হাট বাজার?" নীলকণ্ঠ তখন যোড়হাত করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন—প্রভো! একি? কৃষ্ণ নামে জাতি বিচার! হরিদাস যবন হইয়াও হরিনামে জগৎ-পূজ্য হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তিকে আপনি "ওঠ্ বেটা" বলিতেছেন, এখন দেবতারা উহার চরণ-ধূলি প্রার্থনা করিতেছেন, এই ভাবের একটি গান রচনা করিয়া গাইলেন।

স্বপ্নে রামচন্দ্র-দর্শন উপলক্ষে জনৈক রাম-উপাসকের প্রতি উপদেশ।

প্রত্যেক উপাসকের এই অবস্থা, স্বপ্নে ইষ্টদেবতা দর্শন দিয়া আকর্ষণ করেন। ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তারপর যোগ, তারপর ভক্তি। ক্রমে রামচন্দ্র হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব প্রকাশ হইবে। রামই ব্রহ্ম; তাহা হইতে মায়া; মায়া হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। এই সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে মায়া হইতে মুক্তি পাইয়া পরাভক্তি লাভ হয়। তাহাই পঞ্চম পুরুষার্থ। গোলোক, বৃন্দাবন, কৈলাস এই তিন ধামে নিত্য দেবতা বিরাজমান। রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী একই দেবতা, একই

বিগ্রহ। সাধকের ভাবানুসারে ভিন্ন রূপ দর্শন—যেমন কোন খৃষ্টান-ভক্ত কালীঘাটের কালী ও দক্ষিণেশ্বরের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া যিশুখৃষ্টের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

কৃপা ও সাধনলব্ধ অবস্থার প্রভেদ।

কৃপা করিয়া অবস্থা খুলে দিলে এ সকল বস্তুর মূল্য থাকে না। তপস্যার যে একটা ফল আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তপস্যা কিছু দিন করা কর্ত্তব্য। পথে না চলিলে পথের সংবাদ কিছু জানা যায় না। এজন্য তপস্যার প্রয়োজন।

ভক্তি ও ভজন।

অভক্ত দীনহীন অকিঞ্চনভাবে যদি ভগবৎ চরণে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ভক্তি-দেবী অবশ্যই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। কিন্তু আমি ভক্ত, এই অভিমান যেখানে, সেখানে ভক্তি-দেবী গমন করেন না। যে বৃত্তি দ্বারা ভগবৎ-ভজন করা যায়, তাহাই ভক্তি। সাধকগণ এজন্য প্রথমে ভক্তিকে বৈধী এবং অহৈতুকী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈধী ভক্তি চারি শ্রেণীর জীবে দৃষ্ট হয়—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আর্ত্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ যে, যখন আমাদের প্রাণ অবিশ্বাস, অভক্তি, শুষ্কতা, পাপ-তাপে কাতর হইয়া পড়ে, তখনই আমরা আর্ত্তশ্রেণী-ভুক্ত। এই অবস্থায় ভগবানের নাম লইতেও বিরক্তি ও অবিশ্বাস আসে। তখন করযোড়ে নাম লইতে চেষ্টা করাই ভজন। শুষ্কতা ও অবিশ্বাসে নাম লইলেও তাহা বৃথা যায় না। ঔষধ তিক্ত—বিরক্তির সহিত সেবন করিলেও রোগ-শান্তি হয়।

যাঁহার যেরূপ ভজন, তিনি নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহা করিবেন। প্রত্যেক সাধক আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন, ইহা শিববাক্য।

প্রজ্বলিত দীপ ও জাগ্রত মহাপুরুষ।

প্রদীপ যদি প্রজ্বলিত থাকে, তাহা হইতে সহস্র প্রদীপ জ্বালা যায়। তৈল, সলিতা, তৈলাধার বর্ত্তমান সত্ত্বেও অগ্নির সংযোগ না হইলে একটী প্রদীপও জ্বলে না। অগ্নি সর্ব্বত্র ইহা বলিলে দীপ জ্বলে না। যে উপায় দ্বারা জ্বলে, তাহা না করিলে কিছুতেই দীপ জ্বলিতে পারে না। শক্তি-সঞ্চারও সেইরূপ।

শালগ্রাম-পূজার স্বার্থকতা।

শালগ্রাম-পূজা বড় কঠিন। কারণ মূলাধার প্রভৃতির কেবল এক চক্রে সহজে মন স্থির করা যায়, কিন্তু শালগ্রাম-চক্রে মন স্থির করা সহজসাধ্য নহে। সাধক দৃষ্টি-সাধন অর্থাৎ যোগ অভ্যাসের পর শালগ্রাম-চক্র ভেদ করিতে পারিলে, এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। তখন প্রত্যেক

পরমাণুতে বিষ্ণু-দর্শন করা যায়, এই কারণে প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণগণ শালগ্রামচক্র-পূজা ও ধ্যান করিয়া আসিতেছেন।

দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

যদি সাধন-গ্রহণের জন্য বাস্তবিক চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লোকের নিকট কোন কথা শুনিয়া কাহারও নিকট হইতে সাধন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। সামান্য বস্তু ক্রয় করিবার সময় বস্তু দেখিয়া শুনিয়া তবে লোকে ক্রয় করে। যাহার নিকট সাধন গ্রহণ করিবে, এবং যেরূপ সাধন লইবে, তাহা শাস্ত্র এবং সদাচারসম্মত কিনা, তাহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শত শত সন্দেহ হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রহণের পর একটী ঘটনা দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইলেও ক্ষতি হয়। এজন্য কিছুদিন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

প্রশ্ন—গুরু সমক্ষে অন্য পূজা, অর্চ্চনা ও সাধন-ভজনের প্রয়োজন নাকি নাই?

উত্তর—গুরুর অনুমতি থাকিলে করিতে পারে। যদি কোন প্রকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়, (লোক দেখাইবার ভাবে করিলে তাহাকেই ঔদ্ধত্য বলে) তবে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। গুরুতে বিশ্বাস হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। গুরুতে সর্ব্ব দেবের অধিষ্ঠান দর্শন হইলে পৃথক স্থানে অর্থাৎ গুরু ভিন্ন পূজা নিষেধ।

প্রশ্ন—গুরুর ধ্যানে ও পূজায় ভগবানের পূজা হয় কি না?

উত্তর—অগ্নি ত সকল স্থানেই আছে, কিন্তু সেই অগ্নি কি কেউ ধরতে পারে, না তাহা দ্বারা কোন কাজ হয়? আগুনের আবশ্যক হইলে, সর্ব্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেউ উহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনী, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত র'য়েছে, সেখানেই যে'য়ে আগুন নিয়ে থাকে। সেই রকম ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁহাকে ধরতে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎশক্তির প্রকাশ দেখে, তথায় পূজা করিতে হয়। গুরু ত আর মানুষ নন্। গুরুই ভগবান্, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।

প্রশ্ন—প্রকৃত গুরুর প্রসাদ কি? এবং কি প্রকারে তাহা লাভ করা যায়?

উত্তর—ভুক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ বলে না, উহা উচ্ছিষ্ট। প্রসন্ন ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ ভাবেতে হয়। কৃপাই প্রসাদ। গুরু যে সকল নিয়ম করে দেন, তাহা ঠিক্‌মত রক্ষা ক'রে চল্লেই যথার্থ গুরুর প্রসাদ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা লইলে উপকার হয় কি না? এবং স্ত্রীলোকের দীক্ষা দিবার অধিকার আছে কি না?

উত্তর—শাস্ত্রে আছে যে গুরুর দেহ সর্ব্বদা শুদ্ধ, তাহা দর্শন স্পর্শন

করিয়া শিষ্যগণ পবিত্র হইবেন। কিন্তু কোন কোন প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে শাস্ত্রকর্ত্তারা স্ত্রী-দেহ সর্ব্বদাই অশুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণীও ত যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্‌তে পারে না ; এখন যদি কেহ তাই করেন, কি করবে ? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এবং অনুশাসন যারা মানেন না, গ্রাহ্য করেন না, তাঁরা যা ইচ্ছা কর্‌তে পারেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর্‌লেও স্ত্রী দেহ শাস্ত্রানুসারে কখনও আচার্য্য হ'তে পারে না।

যেখানে স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্র গৃহীত হয়, সেখানে সেই গুরুবংশের কাহাকেও উপগুরু করতঃ, তাঁহার নিকট সমস্ত পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া পুরশ্চরণ করিলে উপকার হয় ; ইহা দেশাচার, কিন্তু শাস্ত্রশাসন নহে।

যোগতন্দ্রার লক্ষণ।

যোগতন্দ্রা—১ম। নাম জপ করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া নিদ্রার ন্যায় হইবে। ২য়। নিদ্রাভাব আসিলে দেহের ভিতর হইতে একরূপ ভাষার মধ্যে মধ্যে কোন কোন কথা শুনা যাইবে—ঐ সকল কথা ধরিয়া চলিতে হয়। ৩য়। ভবিষ্যৎ অবস্থার দর্শন স্বপ্নের ন্যায় হইবে। ৪র্থ। শরীরের কোন জ্ঞান থাকিবে না, কিন্তু ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিবে।

আত্মা মুক্তাবস্থা লাভ করে কখন ?

আত্মা পঞ্চ-কোষে আবদ্ধ আছে। পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া উঠিতে পারিলে আত্মা মুক্তাবস্থা লাভ করিল। পঞ্চকোষ যথা ঃ—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব বস্তুতে আকর্ষণ থাকে না। প্রাণময় কোষ ভেদ হইলে শারীরিক উত্তেজনা থাকে না। মনোময় কোষ ভেদ হইলে সংকল্প-বিকল্প নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলে সংশয়-বুদ্ধি থাকে না। আনন্দময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব আনন্দ মুগ্ধ করিতে পারে না।

কি প্রকারে ভগবৎস্মরণ-মননে রুচি জন্মে।

লোকে বলে ভগবানের চিন্তা অথবা নাম করিতে ইচ্ছা হয় না কেন ? ভগবান্‌ এই নাম মাত্র শুনিয়াছে, কিন্তু তিনি কে, কোথায় থাকেন তাহা জানে না। এইজন্য শাস্ত্রে আছে যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত আমাদের শরীর-মনকে রক্ষা করিতেছে, একারণ উহাদের যজ্ঞ করিবে। বৃক্ষ, লতা, ফুল, পুষ্প, শস্য ইহাদের যজ্ঞ করিবে। পশু, জীব-জন্তুদিগের যজ্ঞ করিবে। পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃপুরুষদিগের যজ্ঞ করিবে। মনুষ্যের সেবা, অতিথি-সেবা করিবে। এইরূপ করিলে তবে ক্রমে ভগবানকে জানা যায়।

মিথ্যা কল্পনাও মিথ্যা কথার মধ্যে গণ্য।

মিথ্যা বলা যেরূপ পাপ, মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ পাপ।

সাধকদিগের পক্ষে বিবাহ করা উচিত কি না।

শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রম সাধকের দুর্গ। বিবাহ করিলেই যে অনিষ্ট হইবে, তাহা নহে, বরং অবস্থা অনুসারে বিবাহ করিলে উপকার হয়। নিজের যে বিষয়-ভোগ তাহা বিষয়ে পুনঃপুনঃ টানে, এজন্য অনেক সন্ন্যাসী বহু বৎসর বনে অনাহারে তপস্যা করিয়াও পুনঃপুনঃ সংসারী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষে সংসার করা পাপ নহে। সংসার ক্ষয় করিবার জন্য সংসার করিলে উপকার হয়। স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-কর্ম্ম থাকিলে যে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নহে। তবে যদি বাস্তবিক বৈরাগ্য সমস্ত ছেদন করিয়া সন্ন্যাস অবস্থা প্রদন করে, সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু তাহা কর্ম্ম থাকিতে হয় না।

এ কার্য্য করিলে পাপ, এ কার্য্য করিলে পুণ্য—ইহা সকলের পক্ষে এক কথা নহে।

পাপ সম্বন্ধে অনেকে কেবল শেখা কথা বলিয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে জানিয়া শুনিয়া এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, 'ইহা পাপ', 'ইহা পুণ্য' এইরূপ একটা সংস্কার হইয়াছে। এ কার্য্য করিলে পাপ, এ কার্য্য করিলে পুণ্য, ইহা সকলের পক্ষে এক কথা নহে। ক্ষত্রিয় সম্মুখ-সমরে নরহত্যা করিতেছে, তাহাতে তাহার পাপ হইতেছে না, কিন্তু মোক্ষার্থীর পক্ষে একটা পিপীলিকা নষ্ট করাও মহা পাপজনক। চুরি করা লোকে পাপ বলিতেছে, আবার কোন স্থানে ভগবানের চক্ষে পুণ্য হইতেছে। বাহিরের কার্য্য মানুষ দেখে, ভগবান্ উদ্দেশ্য দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক পাপ পুণ্য কি ? যে কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়, তাহাই পাপ, আর যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই পুণ্য।

স্ত্রীলোক হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য।

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোবসেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"

অর্থাৎ মাতা, ভগিনী কিংবা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে বসিবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয় সমস্ত বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে।

এক দণ্ডী সন্ন্যাসী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিদ্যাশক্তি কখনও ইন্দ্রিয়পরবশ হয় না। পরে ঘটনাচক্রে ঐ দণ্ডী অন্ধকার রাত্রিতে যাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন একটী স্ত্রীলোক। তিনি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। দণ্ডী রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রীলোকটীকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না এবং বলিলেন, "তুমি বিদ্বান্ হইয়া রিপুর বশীভূত হইতেছ কেন ?" তখন দণ্ডী ঘরের চাল ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া, নীচেও নামিতে পারেন না, উপরেও উঠিতে

পারেন না। প্রাতঃকালে সমস্ত লোক দণ্ডী-স্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিল, ইনিই ব্যাসের লেখা কাটিতে গিয়াছিলেন! এ অবস্থা সকলেরই ঘটিতে পারে। এজন্য স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে।

ধর্ম্ম সাধনে চরিত্রই প্রধান। চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে যত্ন করিবে।

"উপাধি ব্যাধিরেবচ।"

সমস্ত জীব কেবল উপাধিতে আবৃত বলিয়া অন্ধবৎ আছে। উপাধি যত কাটে, ততই দেবত্ব লাভ হয়। এইজন্য জীবকে চিৎকণ বলা হইয়াছে। জীব মুক্ত হইলেই চিৎসমুদ্রে ডুবিয়া শিব হয়।

কলিযুগকে শূদ্রযুগ বলে।

কলিকালের নাম শূদ্রযুগ, অর্থাৎ এই যুগে শূদ্র জাতি ধর্ম্মসাধন করিয়া মহৎ জীবন লাভ করিবে।

প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা কি?

মিথ্যা—যাহার লক্ষ্য অসৎ। সত্য—যাহার লক্ষ্য সৎ।

পরচর্চ্চা বর্জ্জনীয়।

সাধকের পক্ষে অন্যের জীবন বিচার করা ভাল নহে। নিজের জীবন দেখাই ভাল।

প্রশ্ন—ধর্ম্ম এক, কিন্তু পন্থা ভিন্ন হয় কেন?

উত্তর—সকলের এক নিয়মে (ধর্ম্মসাধন) হয় না। শরীরের প্রকৃতি, মনের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং পন্থাও ভিন্ন।

ভগবানের কৃপা ভিন্ন গতি নাই।

যে আপনার বলে ভবসাগর পার হ'তে চায়, সে যেন পাথর গলায় বাঁধিয়া জলে সাঁতার দেয়। কেবল নীচেই যাইতে থাকে।

বীর্য্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উপায়।

সাধককে বীর্য্য-রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। গৃহীর ব্যবস্থা ভিন্ন। যাহারা বিবাহিত, তাহাদের দুই তিনটি সন্তান হইলেই বীর্য্য-রক্ষা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল পুরুষের ইচ্ছায় হইবে না। এ কার্য্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সাহায্য চাই। স্ত্রীর ইচ্ছা না হইলে পুরুষ সক্ষম হইবে না। স্ত্রী-পুরুষের পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা উচিত। বাহিরের উপায় দ্বারা নিবারণ করা উচিত নয়। ভিতরে প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে, তাহাকে বলপূর্ব্বক কেহই নিবারণ করিতে পারে না। খুব চেষ্টা করিবে। যখন শক্তিতে কুলাইবে না, তখন আত্মসমর্পণ ব্যতীত উপায় কি?

বীর্য্য-রক্ষা দ্বারা শরীর নীরোগ হয় এবং মন সুস্থির হয়। যদি কোন কারণে বীর্য্য-রক্ষা না হয়, তাহাতে মুক্তির ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সাধন পথের বিঘ্ন হয়, এজন্য বীর্য্য-রক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রকৃত সাধন শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করা। তাহা অভ্যাস হইলে বীর্য্যও স্থির হয়। তথাপি বীর্য্য রক্ষার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

মৎস্য মাংসাহারের দোষ-গুণ।

মৎস্য-মাংস উভয়ই দূষণীয়। মৎস্য অপেক্ষা মাংস বেশী দূষণীয়। মৎস্যে কাম বৃদ্ধি করে এবং নানা প্রকার ব্যাধি আনয়ন করে। কিন্তু মাংসে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে, কাজেই ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়।

প্রশ্ন—বঙ্গদেশে মৎস্য-ব্যবহার কিরূপে আসিল?

উত্তর—প্রথমতঃ বঙ্গদেশে কেবল অনার্য্য জাতির বাস ছিল। এদেশে যে সকল আর্য্য আসিলেন, তাঁহারা শাপগ্রস্ত হইয়া আসেন, পরে অনার্য্যদিগের ব্যবহার গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন—বিষয়ের প্রতি আসক্তিই কি পরলোকগত আত্মার পুনর্জ্জন্মের একমাত্র কারণ?

উত্তর—ঐ সকল আকর্ষণ একটা কারণ বটে, তদ্ভিন্ন আরও গুরুতর কারণ আছে।

সৎগুরুর শাসন প্রণালী।

দুই রূপ চিকিৎসা দেখা যায়, এক নিদানবিৎ, অপর অজ্ঞ। জ্বর হইলে কাহারও কাহারও মাথা ধরে, পায়ে ব্যথা হয়, প্লীহা-যকৃত বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। অজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের মূলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া মাথা-ধরা প্রভৃতির ঔষধ দেয়। নিদানবিৎ চিকিৎসক জ্বরের ঔষধ দেন। উহা গেলেই আনুষঙ্গিক সমস্ত উপসর্গ অন্তর্হিত হয়। ইঁহারা ভিতরের ব্যারাম বাহিরে প্রকাশ করিয়া বিনষ্ট করেন। তদ্রূপ সৎগুরু কাম, ক্রোধ প্রভৃতির দিক্ দৃষ্টি না রাখিয়া অভিমানের প্রতি আঘাত করেন। অভিমান বিনষ্ট হইলে সকলই বিনষ্ট হইবে। বাহিরে ক্রোধ প্রভৃতির প্রয়োজন। উহা দ্বারা অভিমান নষ্ট হয়।

দোষদর্শী নিজেই দোষী।

দোষদর্শী নিজেই দোষী, কারণ তাহার ভিতরে ঐ দোষ না থাকিলে সে অপরের দোষ ধরিতে পারিবে কি করিয়া?

দ্বৈতভাব—জীবাত্মার পৃথক সত্তা।

মনুষ্য যতই উন্নত হউক না কেন, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া যায় না। যদি কেহ সমুদ্র পরিমাণ করিবার জন্য ডুব দেয়, এবং যদি তাহার পৃথক্

ভাব জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে যে অবস্থা হয়, মনুষ্য চিদানন্দ-সাগরে ডুবিলেও তাহার সেইরূপ অবস্থা হয়। অন্য লোকে ভাবে যে, সে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য তাহার পার্থক্য বোধ থাকে। তখন সে ভগবানের রাসলীলা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্য হয়, এতদবস্থায় সে কখনও মধুর সাগরে, কখনও চিনির সাগরে ডুবিতে থাকে। মধু, চিনির উপমা কল্পনা মাত্র, কেননা সে আনন্দের তুলনা নাই। তখন জীবাত্মা যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে—মনে হয় কেন আনন্দে থাকিলাম। মধুরং মধুরং।

ধর্ম্মরাজ্যে অভিমানের মত আর শত্রু নাই।

যাঁহারা ধর্ম্ম সাধন করেন তাঁহাদের মাথার উপর পাথর ঝুলান, কোনরূপ অহঙ্কার কি অভিমান হইলে অমনি মাথায় চাপা পড়িল। যাহাদের ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহাদের কথা ভিন্ন। তাহাদের যদি কিছু হয়, তাহা অন্য রকম। ধান বাতাসে উড়াইলে ধান একদিকে এবং চিটা অন্যদিকে যায়। ভগবান এইরূপে ভালমন্দ বাছিয়া নেন। ধর্ম্মরাজ্যে অভিমান হইলে আর রক্ষা নাই; যিনিই হউন মোচড় খাইতেই হইবে। ভগবান্ দর্পহারী।

প্রশ্ন—ভগবানের দয়ার অনুভূতি কিরূপে হয়?

উত্তর—নিজের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়। অন্যের জীবনের দ্বারা বুঝা যায় না। অনেক ঘটনাতে আশু কেমন কেমন বোধ হয়; কিন্তু বিশেষভাবে দৃষ্টি করিলে, উহাতে যে ভগবানের ইচ্ছা এবং দয়া নিহিত আছে তাহা বুঝা যায়। সুখের সময় যে দয়া তাহা একরূপ—দুঃখের সময় যে দয়া তাহা শান্তিকর।

ভগবানের লীলা কি বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার সাধ্য আছে? কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে গোপীগণের গৃহে ননী চুরি করিতে গেলেন। যাহা পান তাহাই খান আর ফেলেন। হাতে না পাইলে কিছু দিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন। যাওয়ার সময় নিদ্রিত বালকগণকে চিমটি কাটিয়া জাগাইয়া দৌড়িয়া পালান। কোন গোপী একদিন শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ দৌরাত্মোর কথা যশোদাকে বলাতে তিনি বলিলেন,—সে কি? সে ত বাটীতেই থাকে, কোথাও যায় না, আমার কিসের অভাব? আচ্ছা আবার যখন যাইবে ধরিয়া আনিও। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন যে, একটী লীলা করা যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া সেই গোপীর গৃহে ননী চুরি করিতে গেলেন। গোপীও তাকে তাকে ছিলেন—হঠাৎ পিছন দিক দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'হাত ছাড়িয়া দেও'। গোপী বলিলেন—'হাঁ, ছাড়িব বৈ কি? তোমাকে আজ যশোদার নিকট লইয়া যাইব।' এই বলিয়া কৃষ্ণকে কাপড়ে জড়াইয়া ঘোমটা টানিয়া (পাছে পথে ভাসুর শ্বশুরেরা দেখিতে পায়) একেবারে যশোদার নিকট লইয়া হাজির। যশোদা ঘরের বাহির হইয়া বালককে দেখিতে চাহিলে, গোপী অঞ্চল খুলিয়া

দেখেন যে কৃষ্ণ নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারই পুত্র রহিয়াছে। গোপী ত একেবারে অপ্রস্তুত। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আজ তোমার পুত্রকে দেখাইলাম। আবার যদি এরূপ কর, তবে তোমার অঞ্চলের ভিতর হইতে তোমার স্বামীকে দেখাইব।" গোপী তখন বুঝিলেন যে ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে এইরূপেই করেন।

ভগবানের মত নিকটস্থ বস্তু আর কিছুই নাই।

ভগবান্ যে আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে আছেন তাহা নহে। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের কাছে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম দ্বারা অন্তরের পাপরাশি জ্বলিয়া গেলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে নাম করিতে করিতে সম্মুখে একখানা আয়নার মত বস্তুর প্রকাশ হয়, তাহাতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ধূলি হইতে সৌরজগৎ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। মনুষ্যের পাপ-পুণ্য প্রকাশিত হয়। গ্রহ-উপগ্রহ সমস্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, বীর্য্য এই আয়নার পারা স্বরূপ।

প্রশ্ন—যাহারা ভগবানে অবিশ্বাসী, তাহাদের পরলোকে কি অবস্থা হইবে?

উত্তর—এই অবিশ্বাস অপরাধ নয়, ভ্রম মাত্র। পরলোকে ইহা সংশোধিত হয়। পরলোকে অবিশ্বাসজনিত একটা ক্লেশ হয় এবং স্বীয় কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়।

মন্ত্রদাতা গুরু ও আচার্য্য গুরু।

মনুসংহিতায় মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয় বলা হয় নাই, আচার্য্য গুরু অর্থাৎ যিনি বেদ পড়ান তাঁহার বিষয় বলা হইয়াছে। বেদ উপনিষদে আচার্য্য গুরুর বিষয় আছে। মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয় তন্ত্র, সনৎকুমারসংহিতা গৌতমসংহিতা নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি গ্রন্থে আছে।

বৌদ্ধশাস্ত্র যোগমূলক।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক। অথর্ব্ববেদে যোগের উপদেশ অধিক। তন্ত্র সকল তাপনিশ্রুতির অন্তর্গত। বৌদ্ধদিগের উপাসনা তন্ত্রমূলক। নির্ব্বাণ, তন্ত্রের উদ্দেশ্য। এইজন্য উহাকে বৌদ্ধ শাস্ত্র বলে। যখন বৌদ্ধদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ হয়, তখন ঐরূপ বচন পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়। দেবীভাগবতে আছে যে, কলিতে যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত তাহাদের জন্য মহাদেব তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ দেহেতেই ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে।

স্থূল দেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইলেই তাহা স্থূলদেহে গ্রহণ করে। উত্তম পদার্থ হইলে, প্রতি গ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহের

কেবল আহার্য্য বস্তু দর্শনমাত্র তৃপ্তি, ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। কারণ-শরীরে শরীর নিজে কিছু করিতে পারে না। কোন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ যদি খাদ্য বস্তু দ্বারা স্বীয় জঠরাগ্নিতে হোম করেন, তদ্দ্বারা পরলোকবাসী কারণদেহের তৃপ্তি, ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি হয়। এজন্য শ্রাদ্ধপাত্র, ঘৃত, পায়স ব্রাহ্মণকে দিবার প্রথা আছে।

প্রশ্ন—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ মানুষ কি উপায়ে লাভ করিতে পারে?

উত্তর—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ একমাত্র নাম-সাধন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিলেই দেহটী সাত্ত্বিক হ'য়ে যাবে। দেখ, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাই দেহ রক্ষিত হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হইতেছে। রক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসেই বিশুদ্ধ হইতেছে। এককথায় দেহের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই চলছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটী যখন গেঁথে যাবে—প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে যখন আপনাআপনি নাম চল্‌তে থাক্‌বে, তখন যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সমস্ত দেহে হইবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হইবে। নামটী শ্বাস-প্রশ্বাসে মিলিত হ'য়ে গেলে, ক্রমে দেহটীও নামময় হ'য়ে যাবে। দেহ নামময় হ'লে উহা দ্বারা আর অন্য কার্য্য সম্ভব হয় না, শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মই হয়।

মানুষের শরীরের প্রতি পরমাণুতে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন অস্থি, মাংস, রক্তে ও নামের ছাপ প'ড়ে যায়। মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে একটী ফকির সম্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাহার রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক ফোটা রক্তে "আনুয়েল হক" এই শব্দ দেখ্‌তে পাওয়া গেল। (ফকির সাহেব ঐ নাম জপ করিতেন। উহার অর্থ আমাদের শাস্ত্রোক্ত 'সোহহং' শব্দের অনুরূপ)।

প্রশ্ন—আজকাল অনেক পুস্তকে যোগাভ্যাসের প্রণালী সমস্ত লেখা আছে দেখতে পাই, সে সব দেখে যোগাভ্যাস করাতে কি তেমন উপকার হয় না?

উত্তর—উপকার কি! গ্রন্থাদি দেখে যোগাভ্যাস করতে যাওয়া আরও ভয়ানক। অনেকে ওরকম কর্‌তে গি'য়ে হার্ণিয়া, কুষ্ঠ, মস্তিষ্কের রোগ, কখন বা অন্য কোন প্রকার উৎকট রোগে প'ড়ে একেবারে সর্ব্বনাশ করে ফেলেন। সাধন-ভজনের কোন ক্রিয়াই, কৌশল না জেনে, শুধু পুস্তক দেখে অভ্যাস কর্‌তে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানবিধি শাস্ত্রকর্ত্তারা খুব সঙ্কেতে লিখে গিয়েছেন। ওসব ক্রিয়ার অভ্যাস ক'র্‌তে হলেই, ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকটে গিয়ে সন্ধানটি জান্‌তে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা কর্‌তে হয়। না হ'লে হয় না।

মানুষ রজ্জুবদ্ধ পশুর মত স্বাধীন।

মানুষের স্বাধীনতা কিছু আছে। যেমন একটা গরুর গলায় দড়ি বাঁধা থাকিলে, দড়ি যতদূর লম্বা ততদূর সে ঘুরিতে ফিরিতে পারে, সেইরূপ মনুষ্য

আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু, ততটুকু স্বাধীনভাবে চলিতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণ—চক্ষু দৃশ্য দেখে, কর্ণ শব্দ শোনে, নাসিকা ঘ্রাণ লয়, তাহার উপর যাইবার ক্ষমতা নাই। মানুষ নিজের ছেলেকে যেমন ভালবাসে, অন্যের ছেলেকে তেমনভাবে ভালবাসিতে পারে না। হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে তাহা আনিতে পারে না। সুতরাং মানুষ বাঁধা গরুর মত স্বাধীন।

দান, দাতা ও দানের পাত্র।

যে সর্ব্বদা যাচঞা করে, সে ব্যক্তি দানের পাত্র নহে। ভয়, স্নেহ, লজ্জা, মান, বংশমর্য্যাদা, প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা এই সমস্ত ভাবে দান অপাত্রে দান,—প্রকৃত দান নহে।

স্বর্গকামনা, পাপমোচন, পরকালের জন্য অর্থ-সংগ্রহ ইত্যাদি ভাবে দান করিলে, তাহা দান শব্দ বাচ্য নহে। দান করিয়া অনুতাপ হইলে তাহা দান নহে।

যেমন পিপাসা হইলে ব্যগ্রতার সহিত জল পান করে, সেইরূপ যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি দুঃখ দূর করিতে পারেন, তাহাতেও কুণ্ঠিত হন না। দান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ—তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দাতা বলিয়া মহাভারতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রশ্ন—"কৃষ্ণনামে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যার অপেক্ষা না করে।" এই কথার অর্থ কি?

উত্তর—কৃষ্ণনাম অর্থাৎ শক্তিশালী কৃষ্ণনাম—সদ্‌গুরুদত্ত কৃষ্ণনাম। সদ্‌গুরু-দত্ত নামে তন্ত্রোক্ত কোন দীক্ষা বা পুরশ্চরণের কোন দরকার নাই, এই অর্থ।

কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস।

যতদিন আসক্তি না যায়, প্রকৃত অনুরাগ না হয় ততদিন কর্ম্ম শেষ হয় না। সুতরাং সন্ন্যাসাদি নিলেও কোন না কোনরূপ কর্ম্ম করিতেই হইবে। ধন, বাড়ী-ঘরকে সংসার বলে না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার।

আসক্তি থাকিলে বৈরাগ্য হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণাদিতে কার্য্যের ব্যাঘাত করিলে জানিতে হইবে যে, ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই। বিষয়ে অনাসক্তি ও ত্রিতাপ নষ্ট হইলেই বৈরাগ্য হয়। ইহার পূর্ব্বে পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হয় না।

বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মেতে সময় কাটাইতে হয়। কোন কারণেই ঐ সকল নিয়মে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সংসারে থাকিয়া যাঁরা না পারেন তাঁরা যে অবস্থায় পারেন তাহাই করিবেন। কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাস। সম্যক্ প্রকারে আত্মসমর্পণ সন্ন্যাস।

প্রশ্ন—পুরুষকার কোন পর্য্যন্ত? নির্ভর কখন করিতে হয়? এবং কৃপাই বা কি?

উত্তর—পদ্মা মেঘনার ন্যায় খুব বড় এবং বেগবতী নদী পার হইতে হইলে, গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) দ্বারা নৌকা বাঁধিয়া, নদীর পরপারের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতেও অনেক দূরে উজানে যাইয়া গুণ খুলিয়া লইতে হয়। এই স্থানে পুরুষকারের শেষ। এই সময় মাঝির (গুরুর) উপর নির্ভর করিতে হয়। শক্ত সুচতুর মাঝি তখন পাল তুলিয়া দিয়া হাল ধরিয়া ঠিক হইয়া বসে। অতঃপর কৃপা-বাতাস ভিন্ন আর গতি নাই। বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে, সুচতুর মাঝি ঢেউ কাটিয়া আরোহীসহ তরণীকে নিরাপদে পরপারে লইয়া যায়।

কলির অধিকারের বিস্তার।

পরীক্ষিত যখন কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কলি বলিলেন—"তোমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আমাকে বধ করিবার তোমার কি অধিকার আছে? তারপর তিনি পরীক্ষিতের নিকট কতিপয় স্থান প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষিত বলিলেন—"যে স্থানে দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী ও প্রাণী-হত্যা রূপ চারি অধর্ম্ম দেদীপ্যমান, তুমি সেই স্থানে গিয়া বসতি কর।" কলি আরও স্থান প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা তাহাকে মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা ও বৈরী প্রদান করিলেন। আমাদের প্রাণ যাইবে, তবুও ঐ সকল হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

মহাপুরুষদিগের শক্তিসঞ্চারের প্রণালী।

মহাপুরুষেরা তিন প্রকারে শক্তি সঞ্চার করেন। দৃষ্টি দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা এবং ধ্যানের দ্বারা। দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চারের উদাহরণ মৎস্য। মৎস্য ডিম পেড়ে সর্ব্বদা তাহা দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে রাখে এবং সেই দৃষ্টিশক্তি ডিমে সঞ্চারিত হইয়া ডিম প্রস্ফুটিত হয়। স্পর্শশক্তির উদাহরণ পক্ষী। পক্ষী ডিম পেড়ে তা' দিতে থাকে। তাহার স্পর্শশক্তি ডিমে সঞ্চারিত হইয়া ডিম ফুটে। ধ্যানের উদাহরণ কচ্ছপ। কচ্ছপ ডিম পাড়িয়া মাটী চাপা দিয়া চলে যায়, কিন্তু সে মনে মনে সর্ব্বদা উহা ধ্যান করে। সেই ধ্যানশক্তি দ্বারা ডিম ফুটে।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মসমাজে যতদিন ছিলাম, সেই সময় মনের যেরূপ একটা তেজ, সত্যানুরাগ, জীবনের উৎকর্ষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে একটা সুন্দর অবস্থা ছিল, আজকাল তাহা নাই। তবে সাধন গ্রহণ করিয়া আমার অবনতি হইল না কি?

উত্তর—এই সাধনের ভিতরে যত লোক আছেন, সকলেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, আমাকে আমি উন্নত করিতে পারি, অবনত করিতে পারি, এইরূপ যে একটা অভিমান, উহা নষ্ট করিবার জন্যই এই সকল অবস্থার দরকার। মানুষ যে কিছুই নয়, তার কিছুই করিবার অধিকার নাই, ইহাই

বুঝিতে হইবে। নচেৎ উন্নতি হইতে পারে না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন। এই সংগ্রাম সাধকমাত্রেরই জীবনে আসিবে। নানা প্রলোভনের মধ্য দিয়া সাধক সংগ্রাম করিতে থাকিবে। কখন জয়, কখন পরাজয়। এইরূপ বিষম সংগ্রামে বহুদিন কাটাইতে হয়। এই সংগ্রামের সময় গুরুদত্ত নামকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া, অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে রিপুদিগকে পরাজয় করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেকেই এই সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সাধনে অবিশ্বাসী হইয়া যায়। সাধক-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর ভয়ানক অবস্থা নাই। এই রণে যাহারা গা ছাড়িয়া দেয়, তাহাদের কালবিলম্ব হয়। অনেক ভোগে পতিত হইতে হয়। আর যাহারা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে পারে, তাহাদের সংগ্রাম শীঘ্রই শেষ হয়। যার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপ যুদ্ধ করে। যার রজোগুণ খুব বেশী, তাহাকে বেশীদিন যুদ্ধ করিতে হয়। এই সংগ্রামে সকলকেই পরাস্ত হইতে হইবে। পরে পরাজয় হইতে হইতে যখন হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চুর্ণ হইবে, সাধক দেখিবে যে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সকল বিষয়েই সে অত্যন্ত হীন, নিজের চেষ্টায় নিজের জীবন উন্নত করিতে অসমর্থ, তখন নিজেকে সে নিতান্ত হীন অক্ষম জ্ঞান করিয়া অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করিবে। তখনই সে ভক্তির পথে চলে। তখন আর কোন প্রকার চেষ্টা, ইচ্ছা বা স্বাধীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান্ করেন—ইহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে।

সংগ্রামের কথা গীতায় কর্ম্মযোগ। ইহার পরেই ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে। এই ভক্তিযোগ আরম্ভ হইলে ভক্ত ক্রমে সকল বিষয়ে ভগবানের হাত প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। তখন নানা আশ্চর্য্য তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে। এই অবস্থাকে জ্ঞানযোগ বলে। সুতরাং সংগ্রাম করিতে থাক। এই সংগ্রাম জীবনে আসাও সহজ নয়। অনেকের জীবনে এই সংগ্রাম হয় না। সংগ্রাম আসিলেই মনে করিবে যে, এই ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইল। এই সাধনের মধ্যে যত জন আছেন, কেহই এই সংগ্রাম না করিয়া পারিবেন না। সকলকেই সকল প্রকার রিপুর নিকট পরাভাব স্বীকার করিতে হইবে। নিজের যাহা প্রকৃত অবস্থা তাহাতে দাঁড়াইতে হইবে। এই সময় দীনবন্ধু পতিতপাবন বলিয়া ডাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। নিজের দুরবস্থা অনুভব করিয়া ডাকিলে তাহা পূর্ণ হইবে।

প্রশ্ন—সংসারে থাকিয়া মন একান্ত করা যায় কিরূপে? কিসে ঐকান্তিকতা হয়?

উত্তর—মন অন্তর্ম্মুখীন না হইলে হয় না। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, জপ এই সকলে মন অন্তর্ম্মুখীন হয়। নিকটে মানুষ না থাকিলেই যে একান্ত হওয়া যায়, তাহা নহে, মন হয়তো ভোঁ ভোঁ করিয়া বেড়াইতেছে। নির্জ্জনে থাকা,

কোন ঘরে দ্বার বন্ধ ক'রে থাকা, কোন বনে সঙ্গহীন হইয়া থাকা, ইহা ঐকান্তিকতা বটে; কিন্তু মূল কথা হচ্ছে—মন অন্তর্ম্মুখীন হওয়া চাই। আমি একটি ফকিরকে দেখিয়াছি, তিনি বাজারের মধ্যে ব'সে থাক্তেন, ধ্যান করিতেন, কি জপ করিতেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এইরূপ কোলাহলের মধ্যে থাকেন কেন? তিনি বলিলেন,—ইহার মধ্যে যদি আমার মন ঠিক থাকে তবেই হ'ল।

মন যদি একান্ত হয়, তবে এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে, ইহার সহিত সর্ব্বদা নাম (গুরুদত্ত মন্ত্র) চলিতে থাকে। হয়ত ভগবৎ-প্রসঙ্গ, কি সঙ্গীত শুনিতেছেন, কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন, গল্প করিতেছেন, প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, কিন্তু ভিতরে নাম চলিতেছে। মনে কোন বিষয়ে আসক্তি রাখিতে হয় না; শাস্ত্রকর্ত্তারা দেখাইয়াছেন যে, তপস্যার নিয়মে পর্য্যন্ত আসক্তি জন্মে। এই অবস্থায় তপস্যার এবং নিয়মের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া মাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রশ্ন—যদি নামে আসক্তি হয়?

উত্তর—হাঁ, তাহা তো হওয়া দরকারই। অসৎ বিষয় অর্থাৎ যাহা থাকে না, যাহা অনিত্য, তাহাতে আসক্তি করিবে না। সত্য যাহা, তাহাতে ত আসক্তি হইবেই।

প্রশ্ন—একটী জন্তু অপর একটি জন্তুকে আহার করে; ইহা মঙ্গলময় ভগবানের কিরূপ ব্যবস্থা?

উত্তর—এই সকল তত্ত্ব বুঝা ভার। জীব, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, পরে মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। মনুষ্য-জন্ম অতি দুর্ল্লভ। নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রে দীর্ঘায়ু হলে, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিতে বিলম্ব হয়। ভগবানের এই বিধান যে একে অন্যকে ভক্ষণ করে, উহাতে মনুষ্য-জন্ম নিকটতর করে।

প্রশ্ন—প্রকৃত যোগলাভ করিতে হইলে কি নিয়মে চলিতে হইবে?

উত্তর—বীর্য্য ও সত্যরক্ষা না হইলে যোগলাভ হয় না। কল্পনাও সত্য হওয়া দরকার। বীর্য্যধারণ যেমন একপক্ষে শরীর, মন ও আত্মা রক্ষার কারণ, সত্যও তদ্রূপ। বৃথা চিন্তায় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ভগবৎ চিন্তায় মস্তিষ্কের শক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে বলা যায় না। বৃথা চিন্তায় অর্থাৎ মিথ্যা চিন্তায় মস্তিষ্ক নষ্ট হয়। মিথ্যা বলায় যেরূপ পাপ, মিথ্যা কল্পনাতেও ঠিক সেইরূপ পাপ। যাঁহারা যোগপথে চলিবেন, তাঁহাদের সকলেরই সত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে। নাটক নভেল ইত্যাদি কল্পনাপ্রসূত গ্রন্থাদি পাঠ করা যোগশাস্ত্রে নিষেধ।

সাধকের পক্ষে অহঙ্কারের মত শত্রু আর নাই।

ধূলি হইতে হইবে, মাটি হইতে হইবে, জ্যান্তে মরা হইতে হইবে। যতদিন

ভিতরে অহংভাব আছে, ততদিন মাথার উপর পাহাড় পর্ব্বত। ভগবান্ দর্পহারী, কোন রকমে একটু অহঙ্কার হলেই, এ-গালে এক চাপড়, ও-গালে এক চাপড়, নাকমলা, কাণমলা, মারে বাপরেও বলতে দেবে না। এতে যদি হ'ল তো হ'ল, নতুবা ঘাড় ধ'রে একেবারে কোথায় নিয়ে ফেলবে, তার ঠিক নাই।

সাধন-ভজন ক'রে আমার এই অবস্থা লাভ হ'য়েছে, আমার এত উন্নতি হ'য়েছে—এই ভাব যদি মনে হয়, তাহা হইলেও রক্ষা নাই। ভগবানের বিচার নিক্তির কাঁটার মত। লক্ষ্মণ সীতার পায়ের দিকে মাত্র তাকাইতেন। তিনি কি আর কিছুই দেখিতেন না? তাহা নহে। তিনি সমস্তেরই পায়ের দিকে তাকাইতেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সকলেরই নিকটে অবনত হইবে। এই প্রকার হইতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ইহা হইলে আকাশে অল্প সাদা মেঘ থাকিলে যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায়, সেইরূপ দেখা যায়। তখন ধনুকধারী রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

গোস্বামী প্রভুর সমাধি-অবস্থার উক্তি।

১। নূতন নূতন ঘট স্থাপন হ'ল, জীবের আর ভয় নাই। মৃদুমন্দ বাতাসে পতাকা দুলছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধূলি গ্রহণ কর।

২। উজ্জ্বল নিশান উড়িয়াছে, ডঙ্কা পড়িয়াছে। শিশুদের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিও না, তাহ'লে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িতে পারে।

৩। যাহারা প্রথমে আসিয়াছে, তাহারা পাছে যাইবে। যাহারা পাছে আসিয়াছে, তাহারা প্রথমে যাইবে।

৪। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হউক, আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন কর। ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কর। দেহে ঘট স্থাপন কর। পূজা কর, মর্য্যাদা কর, সেবা কর। মর্য্যাদা না করিলে মা চলিয়া যান। পূজা না করিলে থাকেন না।

৫। স্ত্রীলোক সকল মায়ের মত দেখ্‌তে হবে। মা জননী, সেই বিশ্বজননী মা, গর্ভধারিণীর সমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে, মাকে দেখে প্রণাম কর। মা আনন্দময়ী যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি একটি নারীকে যদি সেইভাবে ভালবাসিতে পার, সে দেবী! দেবী! দেবী! তাঁহাকে প্রণাম করিলে পাপ দূর হয়—এরূপ যদি পার, একদিনে সিদ্ধিলাভ করিতে পার। চণ্ডীদাস যেমন রজকিনীর দ্বারা ক'রেছিল। লোকে দোষ দেয়, ও কিছু নয়, মিথ্যা কথা। নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে, তাহার মরণ ভাল।

৬। বৃথা কথা কহিও না। বাক্য সংযত কর। সত্য কথা বলা এক, আর সত্যবাদী হওয়া আর এক। সত্যবাদী যাহা বলিবে, তাহাই ঠিক হইবে। যখন প্রেম না হইবে, তখন মনে ভাবিও যে, কাহাকেও তুমি অহঙ্কার, অপমান, অভক্তি, অবজ্ঞা করিয়াছ। তিনি দর্পহারী, তিনি ভক্তের অভক্তের দর্প চূর্ণ করেন।

৭। গুরুকৃপাই পরম, সাধন—অন্য সাধন মাত্র। গুরুশিষ্যে ভেদ নাই। যেখানে তুমি আমি, সেখানে গুরুতত্ত্ব নাই। অনেক জন্মের পুণ্য তপস্যার সুকৃতিতে গুরুতত্ত্ব বোধ হয়। গুরুতত্ত্ব বোধ হইলে পরতত্ত্ব পাওয়া যায়।

৮। ভক্তি ভালবাসা নয়, ভক্তি ভজন। ভালবাসা আসক্তি। পুত্রকে স্নেহ করি, বন্ধুকে ভালবাসি, এ সকল মায়ার। পুত্রকে পূজা করি, কন্যাকে পূজা করি, স্ত্রীকে ভক্তি করি, পূজা করি। পূজা কি? ভগবানের চরণপদ্ম যেভাবে পূজা, পুত্রকে বন্ধুকে সেইভাবে পূজা করি—এই ভক্তি। এই সব মায়ার নয়। ভক্তি মায়া নয়।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের আদেশ কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়?

উত্তর—বাল্যকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। ঘটনাক্রমে বিশ বৎসর তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন হঠাৎ সেই বন্ধু নাম ধরিয়া ডাকিল—তাহার স্বর কিরূপে জানিতে পারি? ইহা যেমন কখনও প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের আদেশ কিরূপে জানা যায়, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

ঈশ্বরের আদেশ বিবেক নহে, মনের ভাবও নহে। তাহা আত্মাতে শ্রবণ করা যায়।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবদিগের মধ্যে দুইজন গুরু কেন?

উত্তর—মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শিক্ষা পেলেন রামানন্দের কাছে। লোকশিক্ষার জন্য এ সমস্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। জাতি-গৌরব নষ্ট করিবার জন্য শূদ্র জাতির নিকটে শিক্ষা লইলেন। মহাপ্রভুর নিকটে কোন ব্রাহ্মণ শিখিতে গেলে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠাইতেন। সেই হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু-ভেদে দুইজন গুরুকরণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে! প্রকৃত-পক্ষে দুইজন গুরুর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাতে অনেক সময় বরং নিম্নাধিকারী সাধকের পক্ষে গুরুনিষ্ঠার ব্যাঘাত ঘটে।

বিনয় ধর্ম্মের ভূষণ।

প্রকৃত ধার্ম্মিক কি না, তাহা স্বভাব দ্বারাই বিচার করা যায়। প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা বিনয়ী। রোমের পোপ একবার দেখিলেন, বহুলোক একটী স্ত্রী-লোকের নিকটে যাইতেছে। ঐ স্ত্রীলোকটীর উপর না কি খৃষ্টের ভর (আবেশ) হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পোপ অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। তাঁহার কার্ডিনেল বলিলেন—আমি পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। তিনি ঐ স্ত্রীলোকটীর নিকটে গিয়া বলিলেন—আমার পায়ের জুতা খুলিয়া দাও। স্ত্রীলোকটী তাহা করিলেন না। কার্ডিনেল এই ব্যবহার দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পোপের নিকট

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—এ ব্যক্তি ভণ্ড, যদি খৃষ্ট হইতেন, তবে তিনি বিনয়ী হইতেন এবং আমার কথানুযায়ী কাজ করিতেন।

পরসেবাই ধর্ম্ম।

পরসেবাই ধর্ম্ম। এক স্থানে যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিবেন। একজনের দ্বারা কার্য্য আদায় করিলে অপরাধ হইবে। সকলেই নিজের কার্য্যের জন্য দায়ী। যত পরসেবা করিতে পারিবে, ততই ধর্ম্মলাভ হইবে।

অভিমান কি সহজে যায়? ইহাকে কেবল পরসেবা দ্বারাই জয় করিতে হইবে। সংসারে তোমাদের চেয়ে যাহাদিগকে ছোট মনে কর, (প্রকৃত ছোট কেহই নহে) তাহাদিগের সেবা করিতে হইবে। সেবায় বিরক্ত হইলে তাহা সেবা হইবে না।

প্রশ্ন—প্রকৃত সেবা কাহাকে বলে?

উত্তর—যেমন নিজের প্রয়োজন হইলে তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ অন্যের প্রয়োজন যদি আমার মনে লাগে, তাহাও পূর্ণ করিতে ব্যাকুলতা হয়। মা শিশুর সেবা করেন এই ভাবে। শিশুর অভাবে মাতা অস্থির। ইহারই নাম সেবা। নতুবা ভিতরে অনুরাগ নাই, দেখাদেখি খাইতে দিলাম, কি অন্য প্রকার সাহায্য করিলাম, তাহাকে সেবা বলে না। বৃক্ষ-সেবা, পশুপক্ষী-সেবা, পিতামাতার সেবা, পত্নী-সেবা, প্রভু-সেবা, রাজ-সেবা, ভৃত্য-সেবা, এ সমস্ত এইভাবে করিলেই সেবা। নতুবা সেবা নাম করা উচিত নহে।

অপমৃত্যু।

এ সকল মৃত্যু পূর্ব্বজন্মের নিতান্ত অপরাধে হইয়া থাকে। অপমৃত্যু কিছুই নয়, কেবল দেহের ভোগ মৃত্যুর সময়ে ভগবানের নাম স্মরণ থাকিলে তাহাকে অপমৃত্যু বলে না এবং পরেও আত্মাতে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বর যাহার দেহে যে ভোগ, তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। দেহের ভোগ ভুগিতেই হইবে। এইজন্যই পৃথিবীতে কত রকমের মৃত্যু। শাস্ত্রেতে অপমৃত্যুর যে ভোগের কথা আছে, তাহা কিছু নয়, লৌকিক মাত্র।

অবতারের বর্ণ নির্ণয়।

সত্ত্বগুণী অবতার শ্বেতবর্ণ, রজোগুণী অবতার রক্তবর্ণ; সত্ত্ব রজঃ মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ; গুণাতীত পীতবর্ণ।

নাম-কীর্ত্তনের প্রণালী।

শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আগে গৌরচন্দ্র, তারপর যুগল নামকীর্ত্তন এবং অবশেষে হরিনাম কীর্ত্তন—এই নিয়ম।

আত্মদানের অর্থ—সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

লোকালয়ে থাকিয়া ভগবৎ ইচ্ছার অধীন হওয়া বড় কঠিন, এইজন্য পাহাড়ে গিয়া থাকিতে পারি কিনা প্রার্থনা করিলাম ; উত্তর পাইলাম—দত্ত-বস্তুতে দাতার কোন সম্বন্ধ নাই। পাহাড়ে যাওয়া, কি নগরে থাকা, ইহা যখন তুমি ভাব, তখন আমাকে আত্মদান কর নাই। সাবধান, লুকোচুরি করিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না। আমার বস্তু আমি আগুনে ফেলিব, সুখে রাখিব, দুঃখে রাখিব।

শিষ্য যখন যেখানে যেভাবে থাকেন, তথায় সেই ভাবের মধ্যেও তাহার উপর গুরুর স্নেহ-দৃষ্টি থাকে।

ভগবান্ যখন যেরূপে রাখিবেন তাহাতেই আনন্দ করিয়া খেলিতে হইবে। আমার নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই।

শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের সাধন-তত্ত্ব।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে সমস্ত সাধনতত্ত্ব বিবৃত আছে ; প্রথমে গোপীদিগের মধ্যে দ্বেষ হিংসা, তাহাতে ভগবানের অন্তর্দ্ধান। তখন গোপীরা বিরহে আকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া একপ্রাণে তরুলতার নিকট ভগবানের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল—ইত্যাদি। তখন আবার ভগবানের আবির্ভাব।

প্রশ্ন—যাহার যে জিনিসের উপর লোভ হয়, তাহার সেই জিনিসের উপর একটী আকৃতি পড়ে নাকি ?

উত্তর—মানুষ যাহা কিছু দেখে তাহাতেই তাহার একটী আকৃতি পড়ে। সেই আকৃতি আসক্তিতেই স্থায়ী হয়—যেমন ফটোগ্রাফ রসেতে স্থায়ী হয়। আয়নাতে ছায়া পড়ে, কিন্তু বস্তু যতক্ষণ আয়নার নিকট রাখা যায় ততক্ষণ তাহার ছায়া দেখা যায়। সেইরূপ সাধারণ দৃষ্টিতে চেহারা পড়িলেও তাহা স্থায়ী হয় না। ফটোগ্রাফের আয়নাতে যে চেহারা পড়ে তাহার কারণ রস। রসেতেই আকৃতি স্থায়ী হয়। সেইরূপ যে বস্তুতে আসক্তি-রস আছে, তাহাতে আকৃতি পড়িলে আর উঠে না, বদ্ধ হইয়া থাকে। যাহাদের সেই চক্ষু ফুটিয়াছে, তাহারা আয়নাতে দৃষ্টিমাত্রই ছায়া দেখিতে পায়, ইহা শুনিয়া বুঝা যায় না। যেসকল বিষয়ে যাহার লোভ হইবে, তাহাতে তাহার নিশ্চয় ঐরূপ আকৃতি পড়িবে। যতদিন সেই বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততদিনই ঐ আকৃতি স্থায়ী হইবে। যখন আসক্তি চলিয়া যাইবে আকৃতিও চলিয়া যাইবে।

অবিশ্বাসীর পক্ষে ধর্ম্মলাভের উপায় কি ?

শাস্ত্রে অথবা আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বাস না থাকিলে যদি ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা হয় তবে পূর্ব্বপুরুষগণ এবং দেশপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ভক্তগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন, সেই মহাজনদিগের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

যাহাদের ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হয়, তাহাদের তীর্থভ্রমণে উপকার হয়।

ভাবের ঘরে চুরি করা ভয়ানক অপরাধ।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, কলিযুগে অনেকে নাচিয়া গাহিয়া নরকে যাইবে। কপটতা করিয়া নাচিবে, তাহাতেই ঐরূপ হইবে। স্ত্রীলোকের স্তন উঠিলে যেমন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে, ভাব ইত্যাদি সম্বন্ধেও সাধকদিগের ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অপরকে দেখাইলেই ক্ষতি।

কীর্ত্তনে ভাব তিন প্রকার।

কীর্ত্তনে সাধারণতঃ তিন প্রকার ভাব উপস্থিত হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক ভাবে উপস্থিত লোক উপকৃত হয়। রাজসিক ভাবে অন্য লোকের কখনও উপকার, কখনও অপকার হয়; এজন্য তাহা সংবরণ করা উচিত। তামসিক ভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হয়। কারণ তমোগুণের নৃত্যে অধিকাংশ বেতালা হইয়া লম্ফঝম্ফ হয়। নৃত্যকারীর পা লাগিয়া অনেক সময় খোঁড়া হয়; ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। বালকগণ ভয় পাইয়া চীৎকার করে।

প্রশ্ন—জীব পরাধীন, তবে আর কর্ম্ম-বন্ধন কেন?

উত্তর—যাহার যেরূপ বাসনা তাহার সেইরূপ কর্ম্ম-বন্ধন। জীব সম্পূর্ণ পরাধীন বটে, কিন্তু এই বাসনাই বন্ধনের হেতু।

যোগৈশ্বর্য্য লাভের সহজ উপায় এবং তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন।

অন্যান্য ত্যাগ কোন কাজেরই নয়, সহজেই উহা পারা যায়। যোগের অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহা ত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ। ঐশ্বর্য্য যে অতি সহজে লাভ হয় তাহাও নহে। কোন বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হইলে উহা লাভ হয়।

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করার উপকারিতা অন্য রকম। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম সাধন ঠিক হইয়া গেলেই ক্রমে ক্রমে আত্মদর্শন লাভ হয়। শরীর হইতে আত্মা পৃথক জানিলেই সেই আত্মার দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য করা যায়। অনেক লোক দেখা গিয়াছে, যাহারা ঐরূপ সামান্য একটু বুঝিয়াই ঐ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ অবস্থায় ইচ্ছানুরূপ নানাপ্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহা এক ভয়ানক প্রলোভন। এই সকল শক্তি প্রয়োগ না করিলে ক্রমে নানারূপ আশ্চর্য্য অবস্থা লাভ হয়। আর ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়।

শরীর হইতে আমি ভিন্ন বুঝিলেই শরীরের অভ্যন্তর দর্শন হয়। এই

শরীর যেন নিকটে রহিয়াছে বোধ হয়। উহার উদরের ভিতরের নাড়ী-ভুড়ী, রগ, মাংস ইত্যাদি স্পষ্ট চোখে পড়ে। তখন কোন্ জিনিষটী শরীরের কোন্ স্থানে থাকে, শরীরের কোথায় কি অভাব আছে তাহা দেখা যায়। কোন্ বস্তুর সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ সমস্ত জানা যায় ইত্যাদি।

প্রশ্ন—শঙ্করাচার্য্য নাকি রামকৃষ্ণের স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন? কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে?

উত্তর—শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকে একদিন বলিলেন, 'তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে বল'। শিষ্যগণ বলিলেন—'আমাদের ভক্তি লাভ হয় নাই, তাহার উপায় কি বলুন'। তিনি বলিলেন—'সগুণ উপাসনা ভিন্ন ভক্তি হবে না।' ইহার পর তিনি সরস্বতী মঠ, ঝুসী মঠ প্রভৃতি চারিটি মঠ স্থাপন করেন। সকলে এক রকমের সগুণ উপাসনা ভালবাসেন না। কেহ শক্তি-উপাসনা, কেহ বিষ্ণু-উপাসনা, কেহ বা শিব-উপাসনা ভালবাসেন। শঙ্করাচার্য্য এই সময় নানাবিধ স্তব স্তোত্র রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের স্তোত্রও এই সময় লিখেন। শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে এই সকল স্তোত্র আছে। এদেশে শঙ্করবিজয় প্রচলিত আছে। 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের' কথা অনেকে জানেন না।

শূন্যসমাধি ও তাহার অকিঞ্চিৎকরতা।

কোন প্রকার প্রাণায়ামে শরীর সুস্থ থাকে ও মনের একাগ্রতা হয়। এরূপ একাগ্রতা অভ্যাস করিতে করিতে মন নিরোধ হইলে সমাধি হয়, ইহাকে শূন্য সমাধি বলে। এরূপ শূন্য সমাধিতে সহস্র বৎসর থাকিলেও কোন উপকার হয় না। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে যে, একদা বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া বনভ্রমণে বাহির হন। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটী সমাধিস্থ বালিকাকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেন। বালিকাটী একটী বটবৃক্ষের শিকড়ের দ্বারা এমনভাবে জড়িত অবস্থায় ছিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন কত কাল এইভাবে সমাধির অবস্থায় আছে। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়া কি একটু প্রক্রিয়া করতঃ তিনটী তুড়ি দিবা মাত্র বালিকাটী গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুরস্কার প্রার্থনা করতঃ মস্তক অবনত করিল। রামচন্দ্র দেখিয়া অবাক্! বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে, এই স্থানে বহু বৎসর পূর্ব্বে একটী রাজবাড়ী ছিল। তথায় এই বালিকাটীকে সঙ্গে লইয়া কয়েকজন বাজীকর ভৌল্কি দেখাইতে আসিয়াছিল। অন্যান্য প্রক্রিয়া দেখাইবার পর, এই বালিকাটী সমাধিস্থ হইয়া শূন্যে উঠিবার কৌশল দেখাইতে গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্যেই রহিয়া গেল, কিছুতেই পুনরায় ভুতলে অবতরণ করিতে পারিল না। সঙ্গের অন্য সকলে বলিল যে, এই ব্যক্তি নামিবার প্রক্রিয়া ভুলিয়া গিয়াছে; আমরাও তাহা জানি না, আমাদের আর নামাইবার সাধ্য নাই, তবে যত দিন এ অবস্থায়

থাকিবে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় উহাকে কাতর করিতে পারিবে না। তথাকার রাজা দয়াপরবশ হইয়া বালিকাটীর আসনের নীচ পর্য্যন্ত একটী বেদী গাঁথিয়া, একটী বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন সে রাজ্য নাই, রাজপুরী এখন জঙ্গল হইয়াছে, বটবৃক্ষটীও কত বড় হইয়াছে, কিন্তু উহার শরীর পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তদ্রূপই আছে। তবে আশ্চর্য্য এই যে, উহার মানসিক ভাব ঠিক্ পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। তাই আমাদের নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করিল।

প্রক্রিয়া দ্বারা যে সমাধি লাভ হয়, তাহা কিছুই নয়। অধ্যাত্মযোগে অর্থাৎ জীবাত্মায় পরমাত্মার সংযোগ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতেই ব্রহ্মলাভ হয়। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন এরূপ সমাধি হয় না।

প্রক্রিয়ালব্ধ অবস্থা ও ভগবৎকৃপালব্ধ অবস্থার তারতম্য।

গুরু নানক এক সময়ে সশিষ্য রামেশ্বরদেব দর্শন করিতে গিয়া সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনটী হটযোগী তথায় গিয়া গুরু নানককে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে নানকের প্রভাবের কথা অবগত ছিলেন। কিছুক্ষণ সদালাপের পর তাঁহারা নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামেশ্বর দর্শন করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?" নানক বলিলেন, "কিরূপে এত লোকজন লইয়া সমুদ্র পার হইব ইহাই ভাবিতেছি। রামেশ্বরদেবের কখন দয়া হইবে তা' তিনিই জানেন।" ইহা শুনিয়া যোগী তিনটী বলিলেন—"সে কি! আপনি এত বড় মহাত্মা, কিন্তু সমুদ্র পার হইতে পারেন না, এতদিন ধরিয়া কি শিক্ষা করিয়াছেন?" এই বলিয়া তাঁহারা তিন জন কি এক প্রক্রিয়া দ্বারা শূন্যে উঠিয়া সমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। কিন্তু পরপারে গিয়া দেখেন, গুরু নানক সশিষ্য তথায় উপবিষ্ট আছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহারাজ, আপনি কি প্রকারে এতগুলি লোকজন লইয়া, এত অল্প সময়ের মধ্যে এপারে আসিলেন?" গুরু নানক উত্তর করিলেন, "রামেশ্বরদেব কৃপা করিয়া এপারে রাখিয়া গেলেন, আমি নিজে কোন কৌশল জানি না। ভগবানের কৃপার উপরই নির্ভর করিয়া থাকি।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যোগী তিনটী আত্মদুর্গতি বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহারা এতদিন ধর্ম্মের নামে যে সকল উৎকট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা যে বৃথা গিয়াছে ইহা অবগত হইয়া নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

নারীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিতে না শিখিলে এ দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই।

স্ত্রীলোক ও পুরুষ একস্থানে থাকিলে সর্ব্বদা সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য, কখনই ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়। স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করিবে ততই নিজে পবিত্র,

থাকিবে। যাহাকে সম্মান করি তাহাকে কুৎসিতভাবে দৃষ্টি করা যায় না। বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করা যেন একটা উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি বাবুদের বলা যায় যে, স্ত্রীজাতিকে সম্মান কর, তখনই তাহারা হো হো করিয়া হাসিবে।

উত্তর পশ্চিমে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান আছে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে নারীজাতির সম্মান অধিক, তাহাতেই তাহাদের মধ্যে সব বীর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজ কেবল নারীজাতিকে সম্মান করিয়া জগতের মধ্য প্রধান জাতি হইল। পুরাণে আছে যেখানে নারীজাতির সম্মান, সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করেন।

নারী জাতিকে সম্মান করিতেই হইবে, নচেৎ দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই। এক সতীর (দ্রৌপদীর) অপমানে ভারতবর্ষ এখনও জ্বলিতেছে।

গৃহস্থ পত্নীকে ভগবৎশক্তি জ্ঞান করিয়া মর্য্যাদা করিবেন। পত্নী স্বামীকে নারায়ণ মনে করিয়া সেবা করিবেন। যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে সংসারের কখনও অমঙ্গল হয় না। আর যে সংসারে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নাই, সে সংসারের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না।

নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য পতিসেবা।

পতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে, পতিকে সর্ব্দা কটু বাক্য বলিলে নারীর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রকর্তারা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। এই রোগের একমাত্র ঔষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পতি দেবতা, তিনি অত্যন্ত দুঃখ-দরিদ্রতায় পতিত হইলেও নারীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবৎ-শক্তি জানিয়া সর্ব্দা সদ্ব্যবহার এবং আদর যত্ন করিবেন।

নিজের মতের ন্যায় অপরের মতকেও যথাযোগ্য সম্মান করিতে হইবে।

বিবেক উজ্জ্বল থাকিলে নিজের মতকে যেমন সম্মান করা যায়, অপরের মতকেও তেমনি সম্মান করা যায়। তবে ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি সকলের মধ্যেই থাকে, কালে চলিয়া যায়। কেবল নিজের মতের সহিত যাহা মিলে তাহাই উত্তম,—এ অতি অনুদার মত। সত্য উদার, সঙ্কীর্ণ নহে।

সম্বন্ধ—দৈহিক ও আত্মিক।

সম্বন্ধ দুই প্রকার—দৈহিক ও আত্মিক। আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল। যে দুই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য, তাহাতেই আত্মিক সম্বন্ধ হয়, যেমন ভক্তে ভক্তে।

শোক, মোহ দৈহিক সম্বন্ধ-জনিত। তজ্জন্য যে শোক মোহ হয়, তাহা অস্থায়ী, অনিত্য। আত্মিক সম্বন্ধে শোক নাই, কিন্তু বিরহ আছে ; সে বিরহ

আশাজনক এবং নিত্যকালস্থায়ী। এরূপ আত্মিক সম্বন্ধ হইলে পুনরায় মিলন হয়। দূরে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটি সূত্রে বন্ধন থাকে, তাহাতে সর্ব্বদা মিলিত মনে হয়।

বন্ধুর আবশ্যকতা।

পুত্র অপেক্ষাও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। "পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনাৎ।" বন্ধু চিরদিনই বন্ধু, সর্ব্বকাল সর্ব্বক্ষণ বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই। পূর্ব্বকালে সকলেরই দুই একজন বন্ধু থাকিত। দুই ব্যক্তির মতের মিলন বন্ধুতা নহে। এখন বাস্তবিক বন্ধু লাভ অসম্ভব হইয়াছে। বন্ধু পাওয়া দূরের কথা, মনের কথা বলিয়া প্রাণ খোলসা করা যায়, এরূপ বিশ্বাসী লোক পাওয়াও দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাস করিয়া অতি গোপনে যাহা বলিয়াছ, অব্যবহিত পরে তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে, তাহা লইয়া উপহাস করিতেছে। ইহা কালের অবস্থা। নিজের মনের দুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে, তবে হৃদয় ক্রমেই কুটিল হইতে থাকে। কুটিলতা মহাপাপ। লোকে যদি কোন প্রকার সাধন-ভজন না করে, তাহা হইলেও কেবল সরলতা প্রভাবেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। সরল হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ সত্যবাদী। কপট হৃদয় সহস্র যাগযজ্ঞ সাধন-ভজন করিলেও নরকগামী হয়। কপট হৃদয় সর্ব্বদা অসত্য চর্ব্বণ করে, অসত্য রোমন্থন করে। এক বন্ধুহীনতায় এত দুর্গতি।

প্রশ্ন—শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিদের শোক নিবারণের সদুপায় কি?

উত্তর—শোক যাহার না হইয়াছে তিনি ইহা বুঝেন না। মহর্ষি বশিষ্ঠ পর্য্যন্ত পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন, শোকে আগুন জ্বলে বলিয়াই শোকাগ্নি বলে। ভগবান্ কালস্বরূপ। কাল সৃষ্টি করেন, পালন করেন, নাশ করেন। কালে দুঃখ দেয়, শান্তি দেয়। শোক দুঃখ ক্রমে কালেতেই উপশমিত হয়। সমানভাবে তীব্রতা থাকিলে কি আর রক্ষা থাকে? শোকের সময় কিছুতেই কিছু হয় না। তবে যদি শোকার্ত্ত ব্যক্তির সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি করিয়া তাহার সহিত একত্র হইয়া কাঁদিতে পারেন, তবে শোকের বেগ সাময়িক একটু কমিতে পারে। যাহার জন্য শোক করে, তখন তাহার গুণগানই করিতে হয়। তাহার দোষ দেখাইয়া, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া শোক নিবারণ করিতে চেষ্টা করা ভয়ানক ভুল, তাহাতে শোক শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট জনৈক পুত্রশোককাতরা বিধবা উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—"যাহারা শোকে কাতর, তাহাদের চক্ষের জল নিজ হস্তে মুছাইয়া দিও, তবেই তোমার জ্বালা যাইবে।" বিষয়ের মধ্যে থাকিলে সহজে শোক নিবৃত্ত হয় না। এই অবস্থায় তীর্থভ্রমণ করা উচিত। তীর্থস্থানের প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও তাঁহার আরতি দর্শন করা ভাল। ইহাতে মনের ময়লা দূর হয়। তীর্থভ্রমণ, সৎসঙ্গ ও সৎকথায়ও শোক দূর হয়।

সকলের অবস্থার প্রতি সহানুভূতি করিতে হইবে।

সকলের অবস্থার সহানুভূতি করিতে হইবে। একজনের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিলেও তাহাকে সহানুভূতি যে করিতে না পারে, সে মানুষই নহে। ভগবানের রাজ্যে কোন দুইটী বস্তু একরূপ নহে। কিছু পার্থক্য আছে এবং উহা থাকিবেই। এই নানা বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একটী সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিতে না পাইয়াই লোকে গোলমাল করে। বাগানে যেমন নানা রকম গাছে এক সুন্দর শোভা করিয়া থাকে, সংসারেও তদ্রূপ বিভিন্ন লোকে এক সুন্দর শোভা করিতেছে।

দুর্ভিক্ষের কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়।

এখন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয়। পূর্ব্বে ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন তাহা নাই। অধিকাংশ লোকে কোন শিল্প-কার্য্য না করিয়া চাকুরী করিতেছে। কলিকাতার দিকে অনেক কল-কারখানা হওয়াতে লোকে কৃষি প্রভৃতি কার্য্য না করিয়া টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করে, রেলওয়ে, কয়লার খনি প্রভৃতি অনেক স্থানে টাকা উপার্জ্জন করিয়া পূর্ব্বকার কৃষকেরাও কৃষিকার্য্য ভুলিতেছে, মনে করে টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করিবে। কেবল বর্দ্ধমান, বীরভুম, নোয়াখালী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল এইরূপ কতকগুলি স্থানে কৃষিকার্য্য হইতেছে, এবং তদুৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত বঙ্গদেশে ভাগ করিয়া লইতেছে; সুতরাং চাউলের মূল্য কিরূপে কমিবে? ইহার পর আবার বিদেশে চাউল রপ্তানি হয়।

পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য-বিভাগ না হইলে এই দুর্ম্মূল্য চিরদিনই থাকিবে, তখন স্বাভাবিক বোধ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে কিছু কিছু ইংরাজী শিখিয়া যে জাতির যে ব্যবসায়, তাহা গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

একপ্রকার খাদ্য অভ্যস্ত হইলেই শীঘ্র শীঘ্র দুর্ভিক্ষ হয়। তাহা কলিতে হইবে, কারণ মনুষ্যের পাপে অন্যান্য খাদ্য হ্রাস হইবে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমিবে, গাভীর দুগ্ধ হ্রাস হইবে। এজন্য পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ হইবে। তাহাতেও কাতর না হইয়া যদি ভগবানকে ডাকে, তবেই মঙ্গল।

ভগবান্ স্বপ্রকাশ।

কোন ব্যক্তি মহাপ্রভু সম্বন্ধে দুই একখানি পুস্তক লিখিয়া বলিতেছেন যে, আমরাই শ্রীগৌরাঙ্গকে উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করিলাম। ইহার ন্যায় ধৃষ্টতার কথা আর কি আছে? সূর্য্য অন্ধকারে পড়িয়াছিল, শিশিরবিন্দু তাহাকে জগতে প্রচার করিল!

প্রশ্ন—দুশ্চরিত্র নেশাখোর লোককে কি দান করা উচিত?

উত্তর—যে নেশাখোর, না খেলে থাক্‌তে পারে না, তাহাকে যদি কেহ কিছু না দেয় তবে সে চুরি করিবে।

ক্ষুধার্ত্তেরই প্রকৃত অন্নের অধিকার। যে কেহ হউক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইলে অন্ন দিতে হইবে। ক্ষুধা-নিবৃত্তির পর সরল ও সহজভাবে তাহাদের দোষ দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সসম্মানে অতিথিকে সেবা করা আবশ্যক্।

অতিথির ধর্ম্মমতে ভ্রম থাকিলে তাহার সংশোধন করিয়া অতিথি-সেবা করিবে না। তখন তাঁহার যাহা প্রয়োজন তাহা প্রদান করিতে হইবে। তাহার পরে যদি তিনি থাকেন, তবে তাঁহার মতের অবৈধতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতিথির অর্থ—যিনি কোন দিন আসেন নাই, অথচ ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুধার সময় তাহাকে সংশোধন করিতে যাওয়া নিষ্ঠুরতা।

যে দেশের দাতাকর্ণ স্ত্রী-পুরুষে সন্তান কাটিয়া অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন, সেই দেশের লোকের অতিথি-সেবা ভুলিলে চলিবে কেন?

বিধবা-বিবাহ।

বিধবা-বিবাহ বিশুদ্ধ অবস্থা নহে। তবে রাশি রাশি ভ্রূণহত্যা না করিয়া সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরাশর এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিবাহ হইলে পুনর্বিবাহ হয় না।

প্রশ্ন—ভুত কি? মানুষ মরিয়া ভুত হয় কি?

উত্তর—না, মানুষ মরিয়া পৃথক অবস্থা লাভ করে। ভুত একপ্রকার যোনি; যেমন কুকুর যোনি, বিড়াল যোনি ইত্যাদি। হিমালয় পর্ব্বতে ইহাদের ঘরবাড়ী আছে। ইহারা সময় সময় লোকালয় হইতে মানুষ ধরিয়া লইয়া গিয়া বেগার খাটাইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি ক্ষমতা মানুষ অপেক্ষা বেশী আছে; যেমন অলক্ষিতে ভ্রমণ ইত্যাদি।

নিরপেক্ষ না হইলে সত্য প্রতিপালন করা অসম্ভব।

নিরপেক্ষ না হইলে সত্য কথা বলা যায় না। আমি যদি কাহাকে ভালবাসি তবে তাহার দোষকে দোষ বলিয়া ধরিতে পারি না। যদি কাহারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে, তাহার প্রতি অনর্থক দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে সত্যরক্ষা হয় না। নিরপেক্ষ হইতে হইবে। বালক যেমন সকলকে সমান দেখে, সেইরূপ দেখিতে হইবে। কাহারও প্রতি আমার বিদ্বেষ থাকিলে, সেই ব্যক্তি আমার অনিষ্টকারী এইরূপ ধারণা থাকে। তাহার বিরুদ্ধে যেকোন কথা শুনিব তাহাই বিশ্বাস করিব, তাহা ঠিক নহে।

মিষ্ট বাক্য অতি প্রয়োজনীয়।

মিষ্ট বাক্য অতি প্রয়োজনীয়। শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞকালে হনুমানকে

ভাণ্ডারী রাখিলেন, কেননা হনুমান্ অজস্র প্রাণ ভরিয়া দান করিবেন। হনুমান্ যে ব্রাহ্মণ যাহা চাহিতেন তাহাকে তাহাই দান করিতেন, তবে মধ্যে মধ্যে ভেংচি দিতেন, খেচর-মেচর করিতেন, ব্রাহ্মণেরা ইহাতে বড়ই ভয় পাইত। সর্বদর্শী ভগবান্ রামচন্দ্র ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি হনুমান্কে বলিলেন—"বৎস! তুমি নীলপদ্ম আহরণের নিমিত্ত অমুক পাহাড়ে যাও।" হনুমান্ অমনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্বর্ণকায় পুরুষ বসিয়া আছেন, কিন্তু উহার মুখ শূকরের মত। ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন সুন্দর, সর্বাঙ্গ স্বর্ণময়, আপনার মুখ শূকরের মত কেন? উক্ত মূর্ত্তি বলিলেন ঃ—

নানা দানং ময়া দত্তং রত্নানি বিবিধানি চ।
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শূকরমুখঃ॥

হনুমান তখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহার শিক্ষার নিমিত্তই শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ করিয়াছেন। তখন সমীপে যাইয়া বলিলেন "ঠাকুর! মুখে বলিলেই ত হইত, এজন্য আর পাহাড়ে পাঠালেন কেন?" শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখিয়াছ, ইহাতে যতদূর প্রতীতি জন্মিয়াছে কথায় ততটা হইত না।" পরে হনুমান্ দর্শন করিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের গলায় মালা অর্পিত হইবামাত্র তাহারই গলায় দুলিতে লাগিল।

দত্তবস্তুতে দাতার কোন অধিকার নাই।

সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ দান। যাহাকে দিবে সে যদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তবুও দাতা কিছু বলিতে পাবে না। কারণ তখন সে বস্তু তাহার নহে। দাতা যদি কিছুমাত্র মনে করেন যে, আমার অভিপ্রায়মত আমার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাকে দান বলে না, তাহাকে গচ্ছিত রাখা বলে। শাস্ত্রে ইহাকে ন্যস্তবস্তু বলিয়াছেন। এইরূপ দান করা ও গ্রহণ করা উভয়ই পাপ।

ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব।

বিপদে যতই অধীর হওয়া যায় ততই বিপদ চাপিয়া ধরে। অধীর হইলে কিছুই লাভ হয় নাই বরং উপায় গ্রহণে ব্যাঘাত হয়। ধৈর্য্যের অভাবই মানুষের সকল অশান্তির মূল। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির কারণ।

বলিদান—বলি অর্থ পূজোপহার।

বলির অর্থ পূজোপহার। পূজায় যাহা দেওয়া যায় তাহা সকলই বলি। ছাগাদি হনন করিতে হইবে এমন বিধি নাই। পূর্ব্বে যজ্ঞাদিতে পশু হনন করা হইত, কিন্তু উহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া দেওয়া হইত। অন্যথা পশু

হত্যা করিলে হত্যাকারীদিগকে আবার তাহারা হনন করিবে। সুরথ রাজা তাহার প্রমাণ।

অহিংসার মাহাত্ম্য।

অন্তঃকরণ হইতে হিংসা নষ্ট হইলে যদি কেহ ছারপোকা, মশা, মাছি, পিঁপড়া প্রভৃতিকে আঘাত না করিয়া বাস্তবিক সরল মনে দয়া করে, তবে হাজার হাজার ছারপোকা প্রভৃতির মধ্যে থাকিলেও তাহারা সেই ব্যক্তিকে দংশন করিবে না। কিন্তু মনে একটু হিংসা থাকিলে দংশন করিবে। সাধুরা অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদে থাকেন। তাহাদের তন্ত্র মন্ত্র বা অন্য বুজরুকী নাই, কেবল অহিংসাই ইহার কারণ। মনে কিছুমাত্র হিংসা না থাকিলে ব্যাঘ্রাদিও আপন হইয়া যায়।

গঙ্গাস্নানের উপকারিতা।

গঙ্গাজলের অশেষ মহিমা। হিমালয়ের অতি উচ্চশিখর হইতে গঙ্গা নামিয়া আসিয়াছেন। অনেক প্রকারের ঔষধ ইহার মধ্যে আছে, গঙ্গাজলে সেই সমস্ত ঔষধের পরমাণু নিহিত থাকে। গঙ্গামৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া পরে গঙ্গাজলে স্নান করা উচিত। গঙ্গাজলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ভক্তি হয়। অবিশ্বাসীদেরও উপকার হয়।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।।"

শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি ভজনশীল ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্বিষয়ক যাবতীয় তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতঃ অচিরকালমধ্যে পরাশান্তি লাভ করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।